পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৷০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ
"শান্তিনিকেতন
পত্রিকা বিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

সূচীপত্র

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩২৭

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। এক বৎসরের জন্য মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কমিশন দেওয়া হয়।

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে মাসের ২রা তারিখের মধ্যে জানান প্রয়োজন।

৩। মাসের ২রা তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন না দিলে সে মাসে বিজ্ঞাপন ছাপান সম্ভব হইবে না।

৪। বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রেরিত ব্লক হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা সেজন্য দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

১।	সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	মাসিক	৮৲
	"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	৪৷৹
	"	সিকি পৃষ্ঠা	"	২॥৹
	"	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"	১৸৹
২।	কভারের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার	১ পৃষ্ঠা	মাসিক	১০৲
	"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	৫৷৹
	"	সিকি পৃষ্ঠা	"	৩৲
	"	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"	২৲
৩।	"	চতুর্থ বা শেষ পৃষ্ঠা ১ পৃষ্ঠা	"	১২৲
	"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	৬৷৹
	"	সিকি পৃষ্ঠা	"	৩৷৹
	"	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"	২৷৹

কার্য্যাধ্যক্ষ,

"শান্তিনিকেতন,"

পত্রিকা বিভাগ

পোঃ শান্তিনিকেতন E. I. Ry. Loop.

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩২৭ সাল

উদ্বোধন

শা ন্তি নি কে ত ন দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। আকারের সহিত অন্যান্য অনেক বিষয়ে এবার ইহার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে; আশা করা যায়, ইহা আমাদের কল্যাণই আনয়ন করিবে। যাহা কল্যাণ, চিত্ত যেন আমাদের তাহারই সঙ্কল্প করে! স্বদেশ-বিদেশের সমস্ত অভিমান, সমস্ত সীমা, ও সমস্ত গণ্ডীকে বিস্মৃত হইয়া আমাদের চিত্ত যেন বিশ্বের কল্যাণকে চিন্তা করিতে পারে! আমাদের দৃষ্টি যেন কেবল নিজের দিকে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বের প্রতি প্রসারিত হয়! স্বদেশ-প্রীতির ব্যর্থ অভিমানে আমরা যেন বিশ্বকে অস্বীকার করিয়া না ফেলি! যেখানেই কেন থাকুক না, যাহা সত্য, তাহাই যেন আমরা সাদরে বরণ করিয়া লইতে পারি! যে কোনো ক্লেশই উপস্থিত হউক না, সত্যকে যেন আমরা ত্যাগ না করি, এবং সত্যও যেন আমাদিগকে ত্যাগ না করে! আমরা যেন এইরূপেই সত্যনিষ্ঠ, এবং সেই জন্যই নির্ভীক হইয়া এই পত্রিকা-পরিচালনায় সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারি—

"মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ !

জয় জয় সত্যের জয় !

মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্য ধন।

জয় জয় সত্যের জয় !

যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয় !

যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয় !

যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যা বাক্য নয় !

জয় জয় সত্যের জয় !"

পারসীকপ্রসঙ্গ

অষেম্ বোহূ

মুসলমান- ও পারসীক-গণের সহিত আমাদের বহুকাল হইতে সম্বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্ম- ও শাস্ত্র-সম্বন্ধে আমরা এতদূর অজ্ঞ যে, ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাদের অতিনিকট প্রতিবেশী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিরূপে আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। কিছুই তাঁহাদিগকে বুঝা হয় নি। ইহার পরিণাম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং যদিও ইহা এখনো অনেকে অনুভব করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না, তথাপি দেখা যাইতেছে বুঝিবার সময় আর বেশী দূরে নাই। আমরা অনেককে লইয়াছি আবার ঠেলিয়া ফেলিয়াছিও অনেককে ; ফেলিবার যোগ্য না হইলেও যাহা ফেলিয়াছি, এখন আবার তাহা তুলিয়া লইতে হইবে।

পারসীকগণের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভাষার সাহায্যে যাহাতে আমরা তাঁহাদিগকে

বুঝিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে পা র সী ক-প্র স ঙ্গে আমরা সময়ে-সময়ে তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা করিব।

ভাষাতত্ত্বে অনুরাগী পাঠকগণের অনুকূল হইবে ভাবিয়া আমরা এই আলোচনায় কখনো-কখনো মূল অবেস্তার সংস্কৃত-অনুবাদে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু-কিছু টিপ্পনীও লিখিব।

ব্রাহ্মণগণের সংসর্গে পারসীকগণ মূল অবেস্তায় লিখিত নিজেদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু অংশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে জেন্দ অর্থাৎ পহ্লবী ভাষায় লিখিত অবেস্তার ব্যাখ্যাকেই প্রধানভাবে অনুসরণ করা হয়, মূল অপেক্ষা ইহাই প্রধানত সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছে। এই অনুবাদকগণের মধ্যে নের্যো স ঙ্ঘ* ধ ব ল (১২০০ খ্রী.) শ্রেষ্ঠ। ধ ব ল ইঁহার পিতার নাম ছিল, তাহাই ইঁহার নামের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল সংস্কৃত অনুবাদের কতক-কতক প্রকাশিত হইয়াছে।† আক্ষরিক সংস্কৃত অনুবাদ পাওয়া যায় না। আজ-কাল কেহ কেহ যৎসামান্য কিঞ্চিৎ করিয়াছেন বা করিতেছেন। আমরাও যাহা পারি আক্ষরিক অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিব। ইহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

আজ আমরা এখানে পারসীকগণের একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনার কথা বলিব। ইহা সুপ্রসিদ্ধ, সুপ্রচলিত ও প্রাচীন তিনটি প্রার্থনার অন্যতম। ইহার নাম অ ষে ম্ বো হূ, অপর দুইটির নাম অ হু ব ব ই র্য, ও, যে ঙ্হে হা তাঁ ম্। আলোচ্য প্রার্থনাটির প্রথমেই অ ষে ম্ ও বো হূ এই পদ দুইটি থাকায় ইহার

---

* এই নামের অনেক বানান পাওয়া যায়, যথা, ন ই রি ও সং ঘ, নি রি উ সং ঘ, ইত্যাদি। অবেস্তায় ন ই র্যো স ঙ্ হ অগ্নিবিশেষ ও অহুর-মজদার দূতবিশেষ। ইঁহাকে বৈদিক ন রা-শং সে র সহিত তুলনা করা হয়। কেহ আবার ন র সিং হ অর্থাৎ নারায়ণের সহিত এখানে যোগ দেখিতেছেন। Govindacharya Svamin's *Mazdaism in the Light of Vaishnaism*, pp 102-103.

† Collected Sanskrit Writings of the Parsis Series-এ কতক প্রকাশিত হইয়াছে। ঠিকানা—The Secretary, Parsi Panchayat, Bombey। অন্যত্রও কোনো-কোনো সংস্কৃত অনুবাদ পাওয়া যায়।

নাম অ ষে ম্ বো হূ। ইহার অর্থ পবিত্রতা উত্তম অথবা মঙ্গল। জরথুশ্ত্রের ধর্ম্মে চিত্ত, বাক্য ও কর্ম্মে পবিত্র হইবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে (যস্ন, ৪৮·৫, দ্র;—বেন্দিদাদ, ৫·২১)—"জন্মের পর পবিত্রতাই মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল" ("যওঝ্দাউ মশ্যাই অপী জাঁথেম্ বহিশ্তেম্" —'যোধা মর্ত্যায় অপি জনথং বসিষ্ঠম্')। এই প্রার্থনাটি আমাদের স্বস্তিবাচনের মত সমস্ত কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার মূল এই :— *

অষেম্ বোহূ বহিশ্তেম্,
অস্তী উশ্তা, অস্তী উশ্তা
অহ্মাই হ্যদ্ অষাই বহিশ্তাই অষেম্।

[অষেম্ (ক্লীব, প্রথ, এক,) = ঋতম্। সত্য, পুণ্য, পবিত্রতা।

বোহূ (ক্লীব, প্রথ, এক,) = বসু। উত্তম, মঙ্গল। গাথার ভাষা বলিয়া এখানে দীর্ঘ উকার। গাথায় পদান্তস্থিত স্বর সর্ব্বত্রই দীর্ঘ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী অস্তী প্রভৃতি পদ দ্রষ্টব্য। বঙ্গীয় পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, বকারস্থিত অকার এখানে ওকার হইয়াছে।

বহিশ্তেম্ (ক্লী, প্রথ, এক,) = বসিষ্ঠম্। উৎকৃষ্টতম, মঙ্গলতম।

অস্তী = অস্তি।

উশ্তা (বশ্ + ত) = উষ্টম্। শোভন, স্বস্তি।

অহ্মাই = অস্মৈ

হ্যদ্ = যৎ। Prof. Westergaard এর সম্পাদিত অবেস্তার গাথা অংশে অনেক স্থলে হ্যদ্ পাঠের পরিবর্ত্তে য্যদ্ দেখা যায়।

অষাই = ঋতায়।

বহিশ্তাই = বসিষ্ঠায়।

অষেম্ = ঋতম্।]

* যথাযথ অনুলিপি (transliteration) করিতে হইলে যে সমস্ত অক্ষরের প্রয়োজন, আমাদের ছাপাখানায় তাহা না থাকায়, সম্প্রতি যতদূর সম্ভব অন্য অক্ষরের দ্বারা আমাদিগকে ঐ কাজ চালাইতে হইতেছে, অভিজ্ঞ পাঠকগণ সম্প্রতি এ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন। এবার মূল অবেস্তা ও সংস্কৃতের মধ্যে ব-গুলি সমস্তই অন্তস্থ ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃত অনুবাদ

ঋতং বসু বসিষ্ঠম্,
অস্তি স্বস্তি, অস্তি স্বস্তি
অস্মৈ যদ্ ঋতায় বসিষ্ঠায় ঋতম্॥

বঙ্গানুবাদ

পবিত্রতা উৎকৃষ্টতম মঙ্গল!
স্বস্তি! স্বস্তি ইঁহার
(যিনি) পবিত্রতায় উৎকৃষ্টতম পবিত্র!

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

অন্তর-বাহির

(১৭ই অগ্রহায়ণ মন্দিরে)

পৃথিবীর সমস্ত পশুপাখী বাহিরের দিকে যেমন চোখ মেলে দেখ্‌লে, মানুষও তেমনি দেখ্‌লে, সমস্ত জগৎ তার ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সমস্ত মনকে দখল করে নিলে।

সুখকর দুঃখকর নানা ঘটনায় আন্দোলিত এই বহির্জগৎটা যখন আমাদের কাছে খুব একান্ত হয়ে ওঠে তখন অন্য অসংখ্য প্রাণী এই জগতের যেমন অন্তর্গত হয়ে অঙ্গ হয়ে থাকে আমরাও তেমনি থাকি। যা কিছু ঘটচে চলচে সেই বাহিরের ধারারই অংশ হয়ে আমরা বয়ে চলি।

কিন্তু একেবারে সুরু থেকেই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। বরাবর মানুষ অনুভব করে আস্‌চে, সে যা দেখ্‌চে তার ভিতরে ভিতরে একটা রহস্য রয়ে গেচে। চোখের সামনে যা আছে কেবল মাত্র তাই আছে একথা মেনে

নিলে কোনো আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু মানুষ একথা মান্‌তে পারলেই না।

এই রহস্যের বোধটাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্যে মানুষ কত রকমের শব্দ আওড়ালে যার কোনো মানেই নেই, কত রকমের কাণ্ড করলে যাকে পাগ্‌লামি বল্লেই চলে। এম্‌নি করে নিজেকে সহজের স্বাভাবিকের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে এই কথাটা কোনোমতে বলবার চেষ্টা করেচে যে, যেটা প্রত্যক্ষ জানচি তার চেয়েও জানবার একটা কিছু আছে। যা বাইরে আছে সেটাই শেষ কথা নয়। সে যে-অনুষ্ঠানগুলো করলে সেগুলো ভয়ঙ্কর; পশুবলি দিলে, নরবলি দিলে, নিজেকে অসহ্য কষ্ট দিলে, অন্যকেও দিলে, বেশভূষা যা করলে তা উৎকট। তার মনে হয়েচে একটা দুঃসহ এবং ভয়ঙ্কর আঘাত করা চাই, নইলে স্বভাবের আবরণকে বিদীর্ণ করে তার গুপ্তধন পাওয়া যাবে না।

তার পরে ক্রমে ক্রমে মানুষের সাধনার প্রণালী বদ্‌লাতে লাগ্‌ল। বাইরের স্বভাবের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে এতদিন বাইরের দিকে সে সৈন্য লাগিয়েছিল অস্ত্র মেরেছিল, ক্রমে সেই লড়াইটার গতি ভিতরের দিকে চল্‌ল। সে বল্‌লে হৃদয়ের স্বাভাবিক যে সব ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে সেইটেকে চরম বলে মান্‌ব না; সেটাকে যদি ভেঙে ফেলতে পারি তা হলেই তার ভিতর থেকে আসল রহস্যময় শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারব। এই বলে মানুষ নিজেকে দুঃখ দিতে লাগ্‌ল। সমস্ত ত্যাগ করে করে দেখ্‌তে চাইলে সব ত্যাগের শেষে কি বাকি থাকে।

একটা জিনিষ মানুষ দেখচে বাহিরের সুরের একেবারে উল্টো সুর সেই ভিতরের দিকে। বাইরের ক্ষেত্রে ক্রোধ, ভিতরের ক্ষেত্রে ক্ষমা; বাইরে ধনের মাহাত্ম্য, ভিতরে ত্যাগের; বাইরে গতি, ভিতরে শান্তি।

ফুলে দেখা যায় তার পাপড়ির বিস্তার, তার বর্ণের ছটা; ফলে দেখতে পাই তার বাইরের সঙ্কোচ, তার পাপ্‌ড়ির খসে পড়া, অন্তরের মধ্যে তার বীজের বিকাশ। এই বীজের মধ্যেই ভাবী জীবন নিস্তব্ধ কেন্দ্রীভূত।

তেমনি মানুষ প্রবৃত্তির রাজ্যে বাইরে আপন রঙ্ ফলিয়েছে, বাইরে যতদূর পারে আপনাকে সমারোহে বিস্তীর্ণ করচে। অন্তরে তার সমস্ত উল্টে গেল। বাহিরের যে আয়োজন সব চেয়ে বেশি করে চোখে পড়েছিল সে সবই পাপ্‌ড়ির মত খসে পড়ল। সেইখানে সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি সংক্ষিপ্ত হল ভাবী জীবনের একটি বীজের উপর। যেমনি তাই হল অমনি অন্তর রসে ভরে উঠল।

একদিক থেকে একদল মানুষ বল্‌লে, এই ফুলের জীবন, এই পাপ্‌ড়ির বিস্তারই চরম,—তার উর্দ্ধে আর কিছুই নেই। তারা কোমর বেঁধে লাগল লড়াই করতে, বোঝাই করতে। দেহ-মনকে ভোগের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়াকেই তারা সকলের চেয়ে বড় করে দেখ্‌লে।

আর একদিক থেকে আর একদল মানুষ বল্‌লে, অন্তরের নিভৃতে বাইরের শাসন থেকে নিষ্কৃতি আছে; সেখানে বসে আমি বাইরের বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি বাইরের আঘাতকে প্রতিহত করতে পারি, সেখানে আপনার মধ্যেই আমার আপনার রাজসিংহাসন আছে। সেই সিংহাসনেই আমি একান্তভাবে প্রতিষ্টিত হব—বাইরের দিকে তাকাবই না।

তারা বল্লে, বাইরের দিকে যে শক্তির টানে সমস্ত জীব পাক খেয়ে বেড়াচ্চে, যে শক্তি কেবলই এক জিনিষ ভেঙে আরেক জিনিষ গড়চে, যার বিস্তারের আর অন্ত নেই সেই হল প্রকৃতি। সেই ত একদিকে বাসনা আর একদিকে ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে সংসার নাট্যমঞ্চে হাসিকান্নার অবসানহীন পালা জমিয়েচে। আর অন্তরের মধ্যে এই নাট্যের বাতি নিবিয়ে দিয়ে সমস্ত সামগ্রীকে ত্যাগ করে ভোগকে নিবৃত্ত করে যে সত্তা আপনাকে মুক্তভাবে উপলব্ধি করে, আনন্দ পায় সেই হল আত্মা। এই আত্মাকেই মান্‌ব, প্রকৃতিকে মান্‌বই না।

এ কথা যে বলেচে তাকে প্রাণপণ জোর করেই বল্‌তে হয়েচে। কেননা মানবজীবনের সবচেয়ে আদিমতম অভ্যাস হচ্চে বাহিরেই ছড়িয়ে যাওয়া, বাহিরকেই একান্ত করে জানা। ইন্দ্রিয়-বোধই তার প্রথম আলো জ্বেলেচে, প্রবৃত্তিই তাকে প্রথম চালনা করেচে। এইজন্যে তার মন এই বাহিরের জগতে

অনেক দূরে শিকড় চালিয়ে দিয়েচে—তার বিশ্বাস একেই বড় শক্ত করে আঁকড়ে রয়েচে। এই জন্যে তত্ত্বজ্ঞানী আর ধর্ম্মউপদেষ্টা যিনি যাই বলুন, আর মানুষও মুখের কথায় যাই প্রচার করুক, বুদ্ধির দ্বারা যা'ই চিন্তা করে জানুক, আচারে ব্যবহারে আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে এমন মানুষ লক্ষের মধ্যে একটি পাওয়াও কঠিন। বাহিরটাই তার ইন্দ্রিয়কে মনকে বিশ্বাসকে বুদ্ধিকে এমন প্রবল শক্তিতে এবং অতিমাত্রায় অধিকার করে বসেচে বলেই তার একান্ত প্রভাবকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই মানুষ এমন বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে এমন একনিষ্ঠ বৈরাগ্যের সঙ্গে বাহিরকে একেবারে অস্বীকার করবার প্রস্তাব করেচে।

সত্য এমনি করে দুইভাগ হয়ে গেল। নদীর দুই তীর যে একই নদীর, জলের ধারার মধ্যে উভয়েরই ঐক্য চিরকাল প্রবহমান একথা মানুষ ভুলে গেল।

উপনিষদ্ বলেচেন, "যশ্চায়মস্মিন্ পুরুষঃ আকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ," তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বাইরে এই আকাশে সমস্তকে অনুভব করে আছেন। পরক্ষণেই বল্‌চেন, "যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ," এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আত্মাতে সমস্ত অনুভব করে আছেন। অর্থাৎ অসীম সত্য অন্তরকে বাহিরকে এক করে বিরাজ করেন।

সত্যের এই যে অন্তর বাহির দুই দিক আছে, এদের সামঞ্জস্য তখনি নষ্ট হয় অন্তর যখন বাহিরের উপর আপন কর্ত্তৃত্ব হারায়, বাহির যখন অন্তরকে অভিভূত আচ্ছন্ন করে। আবার বাহিরকে যদি নির্ব্বাসিত করা যায় তবে আপন কর্ত্তৃত্বের অধিকার হারায়।

রাজা আছে তার রাজত্ব নেই একথা বলা ত চলেনা। আত্মাকে যদি বলি রাজা, তবে এই সংসারের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে তারই প্রভুত্বকে প্রচার করতে হবে। তার প্রভুত্বের ক্ষেত্রকে দূর করলে তাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়।

আসল কথা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সত্যের কোনো একটা অংশকে ছাঁটতে চেষ্টা করলে সে ছাঁটা পড়ে না, সে উপদ্রব হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে আম,

তার মধ্যেই থেকে আঘাত করে, তাকে যদি দূর করতে চেষ্টা করি তাহলে সে দূর হয় ভেঙে পড়ে আমাকেই চেপে মারে।

ভারতবর্ষ আপন সাধনায় আত্মার দিকে একান্ত ঝোঁক দিয়েছিল। তার ফলে স্থূল ও জড় প্রকৃতির প্রভাব ত মরল না। বরঞ্চ ভারতবর্ষ আপন ধর্ম্মে আচারে এই স্থূলকে যত বেশি মেনেছে এমন অন্য কোনো সভ্য দেশ মানে নি।

য়ুরোপে মধ্যযুগের সাধক কৌমার্য্য ব্রত নিলে, একান্ত দারিদ্র্যব্রত নিলে, দেহকে চাবুক মারলে, কাঁটার শয্যায় শুয়ে রইল,—এ যেমন সমাজের এক অংশে প্রকৃতির প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচার, তেমনি আরেক অংশে খুনোখুনি কাড়াকাড়ি; উন্মত্ত ভোগলালসা পৃথিবীকে নিংড়ে নিংড়ে খেয়েও আপন তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। সত্যকে একদিক দিয়ে যখন মারি সে আরেক দিক্ দিয়ে আমাদের সাত গুণ মারে। দেহের দিকে যাকে বিনাশ করি ভূত হয়ে সে আমাদের বেশি করে পেয়ে বসে।

তবে একথা মানি, বাহির যখন অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে উদ্দাম হয়েচে, তখন তাকে দমনের জন্যে আঘাত করতে হবে। সেটা কেবল একটা ক্ষণিক চিকিৎসা। বাহির আত্মার রাজ্য, অতএব আত্মা তাকে পালন করবে—কিন্তু রাজ্য যদি বিদ্রোহী হয় তবে শত্রুর মত করেই তাকে মারতে হবে, তাকে পীড়া দিতে হবে। বাইরের প্রবৃত্তি যখন আত্মার শাসনকে লঙ্ঘন করে তখন তাকে মেরে, তার দুর্গ ভেঙে, তার সর্ব্বস্ব লুঠ করে তাকে হয়রান করতেই হবে। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পরে রাজায় প্রজায় সত্যকার মিলনের দিন। তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বারা শুচি হবে, ভোগে সংযমের শান্তি আসবে; তখন আত্মা তার বাইরের আধিকারে আপনার ইচ্ছার বাধাহীন বিস্তার দেখে আনন্দিত হবে। তখন বাইরে চারিদিকে দেখবে সব সুন্দর সব মঙ্গল।

এই যে দ্বন্দ্বকে সামঞ্জস্যে নিয়ে আসা, এ দল বেঁধে কোনো বিশেষ নামধারী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করে হবে না। এর ভার প্রত্যেক মানুষের উপর ব্যক্তিগত ভাবেই আছে। তুমি যদি পার তবে তোমার ভিতর দিয়েই সংসার সফলতা

লাভ করবে। একটি সংসারেও যদি আত্মার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আত্মার কর্তৃত্ব সেইখান থেকেই সমস্ত মানবজগৎকে ধন্য করবে।

আমাদের দুর্ব্বলতার মস্ত একটা কারণ এই যে, চারদিকে আমরা দুর্ব্বলতার নানারূপ সর্ব্বদা দেখি। তাতে করে আত্মার স্বরূপ দেখ্‌তে পাইনে, আত্মার স্বরূপের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না, তখন শক্তিহীনতার জন্যে লজ্জা চলে যায়। সত্যকে যদি বিশ্বাস করতে পারি তবে সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারি। চারদিকের দুর্ব্বলতায় সত্যের প্রতি সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়, তখন মনে হয় তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করা নিতান্ত যেন ঠকা, সে যেন মূঢ়তা।

এইজন্যেই তোমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য স্মরণ করে নিজেকে নিয়ত এই কথা বল্‌তে হবে, অন্তরে সত্য হও বাহিরে সুন্দর হও। সকল মানুষ তোমার মধ্যে আপনারই পূর্ণতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখুক, সে জানুক সে কি। তুমি যে সত্য হবে সে কেবল নিজের জন্য নয়, তোমার মধ্য দিয়ে সত্য সকলেরই অধিগম্য হবে বলে। তোমার আত্মার সঙ্গে সকল আত্মার যোগ আছে বলেই আত্মার পরম দায়িত্ব একান্ত যত্নে বহন করতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন ভারতে শ্রমজীবি-সমস্যা

বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জগতের সর্ব্বত্র শ্রমজীবীদের সমস্যা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন কথার দোহাই দিয়া ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাকেই আমরা বর্ত্তমান যুগের বাণিজ্য-প্রধান সভ্যতার মূলভিত্তি করিয়াছি। বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীর সভ্য রাষ্ট্রগুলি একথা বিস্মৃত হইয়াছিল যে, শ্রমজীবীরা কেবল কোম্পানীর কর্ত্তাদের অনুজীবী জীব নহে, তাহারাও সমগ্র সমাজদেহের অঙ্গীভূত। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যদি গ্রাসাচ্ছাদনের উপ-

যোগী যথোপযুক্ত আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহারা যে হীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে, তাহার কুফল সমগ্র সমাজকেই ভোগ করিতে হইবে। দারুণ জীবনসংগ্রামে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া তাহারা যে সকল দুর্নীতির পঙ্কে নিমগ্ন হয়, তাহা সমগ্র সমাজেরই দেহকে অসুস্থ করিয়া তোলে। এই অস্বাস্থ্য অবস্থার প্রতীকারের জন্য বর্ত্তমান জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রমজীবিগণ সমাজের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা তাহাদের স্বচ্ছন্দ গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী মজুরী নির্দ্ধারণের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে বাধ্য করিতেছে। কারখানার ধনীদিগের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার হস্তে মজুরদিগকে সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্রশক্তি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না।

আমাদের ভারতবর্ষেও বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বড়-বড়, ধর্ম্ম-ঘট করিয়া শ্রমজীবীরা সমাজকে নাড়া দিতেছে। তাতার লোহার কারখানার বহু সহস্র শ্রমজীবীর মর্ম্ম-বেদনা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের মনে যখন এই সমস্যার আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন প্রাচীন ভারতের নীতিশাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে এ বিষয়ে কোনও আলোকরেখা পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

শুক্রনীতিতে আমরা শ্রমজীবি-সম্বন্ধে (২.৩৯৮) নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে পাই—

"যথা যথা তু গুণবান্ ভৃতকস্তদ্ভৃতিস্তথা।
সংযোজ্যা তু প্রযত্নেন নৃপেণাত্মহিতায় বৈ ॥"

'শ্রমজীবিগণের গুণানুসারে রাজা যত্নের সহিত, তাঁহার নিজেরই হিতের জন্য তাহাদের মজুরী নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।'

এখানে "আত্মহিতায়" কথাটী বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। রাজা যে, কেবল দুঃখী শ্রমজীবীদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই ব্যবস্থা করিবেন তাহা নহে; তাঁহার নিজের কল্যাণ ইহার উপর নির্ভর করে। ইহারা অন্নাভাবে

অসন্তুষ্ট জীবন যাপন করিলে তাহা সমগ্র রাজ্যেরই পক্ষে অকল্যাণকর। ইহা হইতে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইতে পারে। "আত্মহিতায়" কথাটির মধ্যে এই ভাবটিই রহিয়াছে।

যাহারা অল্প বেতন পায় তাহারা যে রাষ্ট্র ও সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, পরবর্ত্তী শ্লোকে (২.৪০০) তাহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে—

"যে হীনভৃতিকা ভৃত্যাঃ-শত্রবস্তে স্বয়ং বৃতাঃ।
পরস্য সাধকাস্তে তু ছিদ্র-কোশ-প্রজা-হরাঃ ॥"

'যে সকল ভৃত্য অল্প বেতন পায় তাহাদিগকে নিজেই শত্রু করিয়া তোলা হয়। তাহারা শত্রুর কার্য্য সাধনের সাহায্যকারী হয়, তাহারা ছিদ্রান্বেষী, অর্থাপহারী ও প্রজাগণের উৎপীড়ক।'

এই শ্লোকে বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, হীনভৃতিকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া ছিদ্রান্বেষী হয়, অর্থাৎ ইহারা সর্ব্বদাই অশান্তি সৃষ্টি কবিকার সুযোগ অন্বেষণ করে; ইহারা রাজকোষ অথবা ধনীর অর্থ অপহরণ করে, এবং রাজ্যের প্রজাগণের উপর নানাবিধ উৎপীড়ন করিতে থাকে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও শুক্রনীতি আলোচনা কবিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শুক্র নীতির সময়ে শ্রমজীবি-সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা শুক্রনীতির ব্যবস্থা আরও ব্যাপক। ইহাতে আমরা এ বিষয়ে বহু অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই। তখন ভারতে বিশাল নগরীর সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল নগরীর ধনিসম্প্রদায়ের পাশেই দরিদ্র ভৃতক-শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য-সমস্যা কঠোরতর হইয়া উঠিয়াছে।

ভৃতক-গণের * বেতন নির্দ্ধারণের মূলনীতি সম্বন্ধে চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও শুক্র-নীতিতে কোনও বিশেষ ভেদ নাই। সাধারণ নিয়ম এই—প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিতে যে সর্ত্ত স্থির হইবে তদনুযায়ী বেতন দিতে হইবে। পূর্ব্বে

* বর্ত্তমানে আমরা যে অর্থে 'শ্রমজীবী' বলি চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও শুক্রনীতিতে সেই অর্থে 'ভৃতক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোনও প্রকারের চুক্তি স্থির না থাকিলে "কর্ম্মকালানুরূপ" বেতন স্থির করিতে হইবে। এই বিষয়ে উভয়ের মত এক। শুক্রনীতিতে (২.৩৯২) এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"কার্য্যমানা কালমানা কার্য্যকালমিতিস্ত্রিধা।
ভৃতিরুক্তা তু তদ্বিজ্ঞৈঃ সা দেয়া ভাষিতা যথা॥" *

'কার্য্য অনুসারে, কাল অনুসারে, অথবা কার্য্য কাল উভয় অনুসারে বেতন স্থির করিতে হইবে। বিজ্ঞগণ বেতন নির্দ্ধারণের জন্য এই তিন প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে পূর্ব্বে যে প্রকার কথা দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপই বেতন দিতে হইবে।'

শুক্রচার্য্য দৃষ্টান্ত দ্বারা (২.৩৯৩-৯৫) বিষয়টীকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। কোনও দ্রব্য অমুক স্থানে বহন করিয়া দিলে তোমাকে এই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইবে, এইরূপ সর্ত্তকে 'কার্য্যমান' চুক্তি বলে। তুমি যে কার্য্য করিবে তজ্জন্য তোমাকে প্রতি দিন, মাস বা বৎসর হিসাবে এই পরিমাণে বেতন দিব, এইরূপ চুক্তিকে 'কাল-মান' বলে। আর, এত সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ কার্য্য করিলে তুমি এত অর্থ পাইবে, এইরূপ চুক্তিকে 'কার্য্য-কাল-মান' বলে।

কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ চুক্তির কোন প্রকারই পূর্ব্বে স্থির না থাকিলে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে? এ বিষয়ে কৌটিল্য (১৮৩ পৃঃ) বলিতেছেন—

"কর্ষকঃ সস্যানাং গোপালকঃ সর্পিষাং বৈদেহকঃ পণ্যানামাত্মনা ব্যবহৃতানাং দশভাগ-মসম্ভাবিতবেতনো লভেত।"

'পূর্ব্বে বেতন স্থির না থাকিলে, হলচালক উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ লাভ করিবে, রাখাল উৎপন্ন ঘৃতের দশমাংশ লাভ করিবে, এবং ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের দশমাংশ গ্রহণ করিবে।'

নারদ এই দশমাংশই সমর্থন করিতেছেন—

* "কর্ম্মকালানুরূপ-মসম্ভাবিতবেতনম্।" অ শা ১৮৩ পৃঃ।

"ভৃতাবানিশ্চিতায়াং তু দশমং ভাগমাপ্নুয়ুঃ।
লাভে গোবীর্য্যশস্যানাং বণিগ্‌গোপকৃষীবলাঃ।"

বর্ত্তমান সময়েও দেশের নানা স্থানে কৃষিপরিচালনায় এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমজীবী গৃহস্থের জমির চাষ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়া এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়। কোনও ফসল ক্ষেত হইতে তুলিয়া দিয়া ভৃতক তাহার পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

কৃষি, বাণিজ্য, ও গোপালন ছিল তখনকার দিনের প্রধান উপজীবিকা। এই সমস্ত বিষয়ে তখন অধিকতর সহযোগিতার ভাব বর্ত্তমান ছিল। নির্দ্দিষ্ট বেতন গ্রহণ অপেক্ষা লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার প্রথা প্রাচীন কালে এদেশে অপেক্ষাকৃত সফলতা লাভ করিয়াছিল। বৃহস্পতির মতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভৃতক লাভের তৃতীয়াংশ বা পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিবে। ভৃত্য যদি আহার ও বস্ত্রাদি পায় তবে লাভের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিবে, নতুবা উৎপন্ন শস্যের তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবে। *

গোপালনে এই সহযোগিতার প্রথাই বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। মনুর মতে, কোনও গৃহস্থের দশটী গাভী থাকিলে তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাখাল তাহার দুগ্ধ পাইবে। বহু ধেনুপালন সম্বন্ধে নারদ বলেন :—

"গবাং শতাদ্ বৎসতরো ধেনুঃ স্যাৎ দ্বিশতাদ্ ভৃতিঃ।
প্রতিসংবৎসরং গোপে সংদোহশ্চাষ্টমেঽহনি॥"

'একশত গাভী রক্ষা করিলে রাখাল প্রতি বৎসর একটী বৎস পাইবে। দ্বিশত গাভী রক্ষা করিলে একটী ধেনু গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক অষ্টম দিনের সমস্ত দুগ্ধ তাহার প্রাপ্য। †

সমুদ্রগামী নাবিকদের বেতন সম্বন্ধে বৃদ্ধমনুতে (বিবাদার্ণবসেতু, ১৬৮ পৃঃ) নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাওয়া যায়—

* বিবাদার্ণবসেতু, ১৬৮ পৃঃ। † বিবাদার্ণব সেতু, ১৭৪ পৃঃ।

"সমুদ্রযাত্রাকুশলা দেশকালার্থবেদিনঃ।
নিয়চ্ছেয়ুর্ভৃতিং বাং তু সা স্যাৎ প্রাণকৃতা যদি॥"

'পূর্ব্বে কিছু নির্দ্ধারিত না থাকিলে সমুদ্রযাত্রায় কুশল, দেশকালার্থবিদ্‌গণ তাহাদের বেতন স্থির করিয়া দিবেন।'

অবশ্যপ্রতিপাল্য স্বজন বর্গের ভরণ পোষণের ক্লেশ না হয় শুক্রচার্য্য এইরূপ বেতন নির্দ্ধারণের জন্য উপদেশ দিয়াছেন (২.৩৯৯)—

"অবশ্যপোষ্যবর্গস্য ভরণং ভৃতকাদ্ ভবেৎ।
তথা ভৃতিস্তু সংযোজ্যা তদ্‌যোগ্যাভৃতকায় বৈ॥"

শ্রমজীবিগণ অতিকষ্টে নিজ-নিজ উদরের অন্ন সংস্থান করিতে সমর্থ হয়। নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী, বিধবা ভগ্নী ইত্যাদি অবশ্য-প্রতিপাল্য স্বজনবর্গের কথা দূরে থাকুক, তাহারা নিজের শিশুসন্তানেরও ভরণ-পোষণের উপযোগী বেতন লাভ করে না। সেইজন্য শিশুশ্রম (child labour) নামে নিদারুণ ব্যাপার এদেশের কল-কারখানায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে রক্ষণীয়া নারীগণকে যদি জঠর জ্বালার তাড়নায় কারখানা-ঘরে প্রবেশ করিতে হয়, তবে দারিদ্র্যের দুঃখ-তাপের মধ্যে একমাত্র শান্তির স্থল যে গৃহ, তাহাও শ্মশানে পরিণত হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ পারিবারিক আদর্শকেই সমাজসৌধের মূলভিত্তি মনে করিতেন বলিয়া শ্রমজীবিগণের পারিবারিক জীবন যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া "অবশ্য-পোষ্যবর্গ" কথাটির উপর জোর দিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে যেমন Old Age Pension, Providend Fund ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে, প্রাচীন ভারতে তদনুরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এই ভাবটা একেবারে তখন অজ্ঞাত ছিল না। শুক্রনীতির নিম্নলিখিত শ্লোকে (২.৪১৪) আমরা তাহার পরিচয় পাই—

"ষষ্ঠাংশং বা চতুর্থাংশং ভৃতের্ভৃত্যস্য পালয়েৎ।
দদ্যাৎ তদর্দ্ধং ভৃত্যায় দ্বিত্রিবর্ষৈঃখিলং তু বা।"

'ভৃত্যের বেতনের ষষ্ঠাংশ বা চতুর্থাংশ রক্ষা করিবে। সময় বা অবস্থা

বুঝিয়া) দুই কিংবা তিন বৎসর পর তাহার অর্দ্ধেক অথবা সমস্তই ফিরাইয়া দিবে।'

বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে যাহাতে নিরাশ্রয় হইতে না হয়, তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

যে দেশে লোকে ইচ্ছা-সত্ত্বেও উপযুক্ত কার্য্য পায় না, সেখানে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই বেকার সমস্যার (unemployment problem) মীমাংসা করাই রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রধান কর্ত্তব্য।

এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অযোগ্য লোকের সংখ্যা ত কম নহে, তাহাদের দ্বারা কি কার্য্য হইবে? তদুত্তরে শুক্রাচার্য্য (২.১২৬) বলিতেছেন—

"অমন্ত্রমক্ষরং নাস্তি নাস্তি মূল-মনৌষধম্।
অযোগ্যঃ পুরুষো নাস্তি যোজকস্তত্র দুর্লভঃ॥"

'এমন কোনও অক্ষর নাই যাহা মন্ত্র নহে, এমন কোনও মূল নাই যাহা ঔষধ নহে, এবং এমন কোনও পুরুষ নাই যে অযোগ্য। কেবল তাহাকে (যথাযথ ভাবে) নিয়োগ করিবার উপযুক্ত লোকই দুর্লভ।'

বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই, অক্ষর মাত্রই শক্তিহীন বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু কোনও সুনিপুণ কবি যখন অক্ষর সকলকে যথা স্থানে যেজেনা করিয়া ছন্দের সাহায্যে ভাব সঞ্চার করেন, তখন সেই সকল অক্ষরই শক্তির আধার হইয়া উঠে। সাধারণ লোকের নিকট যে তরুগুল্মের কোনও মূল্য নাই, রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ে সুনিপুণ বৈদ্যের নিকট তাহা কত মূল্যবান্। সেইরূপ মনুষ্যমাত্রই শক্তির আধার। মানুষকে বেকার বসিয়া থাকিতে দেওয়া প্রভূত শক্তির অপচয়-মাত্র। এই জগতের কর্ম্মক্ষেত্র এত বিচিত্র ও বিপুল যে, এখানে ছোট-বড় পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই করণীয় বহু কার্য্য রহিয়াছে। সেই সকল মহাপুরুষ কোথায় যাঁহারা এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের দৃঢ় সংস্কার সাধন করিয়া, ছোট-বড় সর্ব্বশ্রেণীর মানুষকে যথাস্থানে যোজনা করিয়া, প্রত্যেকের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিবেন, এবং বাধাসঙ্কুল ব্যবস্থাকে অপসারিত করিয়া মানবের

আত্মোন্নতির পথকে অব্যাহত করিবেন ? সমগ্র জগদ্ব্যাপী গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই শ্রমজীবি-সমস্যা লইয়া হানাহানি চলিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে এমন যোগ্য লোক কোথায় ? "যোজকস্তু সুদুর্লভঃ!"

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।
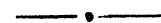
রাগচর্চ্চা।

যে ধ্বনিবিশেষ লোকের চিত্তরঞ্জন করে তাহাকে রাগ বলা হয়। সঙ্গীত-পারিজাতে (৩৩৯ শ্লোঃ) ইহাই উক্ত হইয়াছে—

"রঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভো রাগ ইত্যভিধীয়তে।"

আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগের তিনটি জাতি উক্ত হইয়াছে; শুদ্ধ, সালঙ্ক, ও সঙ্কীর্ণ। যে রাগে অন্য রাগের কোন মিশ্রণ নাই তাহাকে "শুদ্ধ" রাগ বলে। যে রাগের মিশ্রণে অন্য রাগ উৎপন্ন হয় তাহাকে "সালঙ্ক" বলে। আর বহুরাগের মিশ্রণে যে রাগ উৎপন্ন হয় তাহাকে "সঙ্কীর্ণ" বলে।

আবার সমস্ত রাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ওড়ব, ষাড়ব, ও সম্পূর্ণ।

"সপ্তভিশ্চ স্বরৈঃ পূর্ণঃ, ষড়্ভিস্তৈঃ ষাড়বো মতঃ।
ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্ত, এবং রাগস্ত্রিধা মতঃ॥"

সঙ্গীতপারিজাত, শ্লোক ৩৩১।

যে রাগে ছয়টি মাত্র সুর থাকে তাহা "ষাড়ব"; যথা বসন্ত, পূরিয়া, সোহিনী. (শোভিনী)। যে রাগে পাঁচটি মাত্র সুর থাকে তাহাকে "ওড়ব" বলা হয়, যথা ভূপালী (সা, রে, গা, পা, ধা), হিন্দোল (সা, গা, হ্ম, ধা নি), ইত্যাদি।

যে রাগে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সাতটি সুরই থাকে, তাহা "সম্পূর্ণ"। যথা :—ভৈরব, শ্রী, কেদার, ইত্যাদি।

আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রধানত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী প্রচলিত আছে।

"ভৈরবো মালকোষশ্চ হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাঃ স্মৃতাঃ॥"

আজ উল্লিখিত ছয় রাগের মধ্যে প্রথম ভৈরব রাগের আলোচনা করিব। এই রাগের জাতি "সম্পূর্ণ"। ইহার আসল নাম মালবগৌড়। ইহার উৎপত্তি স্থান মালব দেশ। গৌড় দেশে এইরাগ সাধারণত প্রাতঃকালে গীত হইয়া থাকে। এইজন্য কাশী ও অযোধ্যা অঞ্চলে প্রভাতীভজন প্রায়ই এই রাগে গান করা হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মা ল ব গৌ ড়ে র নাম ভৈরব হইল কি করিয়া? মুসলমানদের সময়ে অধিকাংশ রাগেরই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং কোন কোন রাগের সময়েরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই জন্যই দাক্ষিণাত্যে এখনো এই রাগের "মালবগৌড়" নামই প্রচলিত আছে; কিন্তু উত্তর ভারতে ইহাকে ভৈরব বলা হয়। আবার দাক্ষিণাত্যে যে রাগকে ক ল্যা ণ বলে, উত্তর ভারতে তাহা ই ম ন। এইরূপ বহু উদাহরণ দিতে পারা যায়।

মুসলমানদের পূর্ব্বে যে দেশে যে রাগের উৎপত্তি হইত, তাহার নাম সেই দেশেরই নামানুসারে করা হইত। যথা গুর্জ্জরী, মালবশ্রী, ইত্যাদি। গুর্জ্জর দেশে জন্ম বলিয়া গুর্জ্জরী এবং মালব দেশে জন্ম বলিয়া মালবশ্রী। এই প্রথা আজ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। অপর পক্ষে মুসলমানদের আমলে যে রাগ যে সময়ে গান করা হইত তাহার নাম প্রায়ই সেই সময়েরই নামানুসারে রাখা হইত। যথা :—ভোরে গান করা হইত বলিয়া মা ল ব গৌ ড়ে র হিন্দী প্রাচীন নাম ভো রোঁ ছিল, ইহা হইতে ক্রমে ভৈ রোঁ, এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ইহাকেই সংস্কৃত করা হইয়াছে ভৈ র ব।

রাগ সম্বন্ধে আরো একটি কথা চিন্তা করিবার আছে। মূল ছয়টি মাত্র রাগ হইতে এক শত পঁয়তাল্লিশটি রাগের উৎপত্তি হইল কিরূপে? রাগগুলির পরস্পর সাদৃশ্য দেখিলে ইহার একমাত্র ইহাই সঙ্গত উত্তর মনে হয় যে, কাল-বিশেষের অনুকূল করিবার জন্য মূল এক-একটি রাগেরই অংশবিশেষকে এক-আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত উদাহরণে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে :—

১।	সকালের ভৈরব	সা, ঋ, জ্ঞা, মা, পা, দা, ণি, সা।
	বিকালের গৌরী *	সা, রে, গা, মা, হ্মা, পা, ধা, নি।
২।	সকালের তোড়ী	সা, ঋ, জ্ঞা, হ্মা, পা, দা, ণি।
	বিকালের শ্রী	সা, ঋ, গা, হ্মা, পা, দা, নি।
৩।	সকালের ললিত	সা, ঋ, গা, মা, হ্মা, দা, নি।
	বিকালের পূরিয়া	সা, ঋ, গা, হ্মা, দা, নি।
৪।	সকালের বেলাবর	সা, রে, গা, মা, হ্মা, পা, ধা, নি।
	বিকালের কল্যাণ	সা, রে, গা, মা, হ্মা, পা, ধা, নি।

এইরূপ আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

এখানে সকালের রাগকে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বিকালের রাগ করা হইয়াছে, অথবা বিকালের রাগকে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া সকালের রাগ করা গিয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, একেরই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনে অপরটি উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রকৃত ভৈরব রাগের রে, ধা, কোমল; এবং কোমল ধৈবত জীবন। যে সুরের অভাবে রাগের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না তাহার নাম জীবন। ভৈরবে কোমল ধৈবত না দিলে ইহাকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। এইরূপ প্রত্যেক রাগের এক-

---

* বস্তুত মূল "গৌড়ী", কেননা ইহা গৌড় দেশে উৎপন্ন। "গৌড়ী" হইতেই "গৌরী" হইয়া পড়িয়াছে।

একটি সুর জীবন হয়। আজ আমরা ভৈরব রাগের উৎপত্তি ও তাহার সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করিলাম। ক্রমশ মালকোশ প্রভৃতি অন্যান্য রাগের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী।

যশ্রুতি

প্রাকৃতের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, অসংযুক্ত ও অনাদিস্থিত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য, ব এই কয়টি বর্ণের প্রায় * লোপ হইয়া থাকে (বররুচি ২.২ ; হেম, ৮.১.১৭৭, শুভ.১.৩.১ ; মার্কণ্ডেয়,২.১ ; ইত্যাদি)। যেমন, সংস্কৃত সা গ র প্রাকৃতে সা অ র। অর্দ্ধ মাগধী, আর্ষ, প্রাকৃত বা জৈন প্রাকৃত-সম্বন্ধে এখানে আর একটা নিয়ম আছে যে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণগুলির লোপে যে অবর্ণ (অর্থাৎ অকার-আকার) অবশিষ্ট থাকে, তাহার পূর্ব্বেও অবর্ণ থাকিলে, ঐ অবশিষ্ট অবর্ণের উচ্চারণটা এরূপভাবে করিতে হইবে যে, তাহা যেন অতিলঘু প্রযত্নে উচ্চারিত যকারের মত শুনায়। † যেমন,

---

* প্রা য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, লোপ না করিলেই যেখানে শুনিতে ভাল লাগে, সেখানে লোপ হয় না। "প্রায়োগ্রহণাদ্ যত্র শ্রুতিসুখমস্তি তত্র ন ভবতোব"—ভামহ, বররুচি ২.২। মর্কেণ্ডের এ সম্বন্ধে একটি কবিতা দিয়াছেন :—

"প্রায়ো গ্রহণতশ্চাত্র কৈশ্চিৎ প্রাকৃতকোবিদৈঃ।
যত্র নশ্যতি সৌভাগ্যং তত্র লোপো ন মন্যতে ॥"

যথা, সু কু সু ম শব্দের ক-লোপ করিলে সু উ সু ম হয়, কিন্তু ইহা ভাল শুনায় না তাই সু উ সু ম না করিয়া সু কু সু ম রাখাই উচিত।

† "অবর্ণো যশ্রুতিঃ ॥" ক-গ-চ জেত্যাদিনা লুকি সতি শেষঃ অবর্ণঃ অবর্ণাৎ পরো লঘুপ্রযত্নতরযকার শ্রুতির্ভবতি।" হেম ৮.১, ১৮০ ; ত্রিবিক্রম, ১৩.১০ ; শুভ, ১.৩৫ ; চণ্ড, ৩৩৫ (Bibliotheca Indica, See App, C D) ।

উল্লিখিত প্রাকৃত সা অ র শব্দের মধ্যবর্ত্তী অকারটি ঠিক অকারেরও মত উচ্চারিত হইবে না, আবার ঠিক য়কারের মত নহে, কিন্তু অতিলঘুভাবে য়কারকে উচ্চারণ করিলে তাহা শুনিতে যেরূপ লাগে ঐ অকারটিকেও শুনিতে সেইরূপ লাগিবে। অপর কথায় ঐ অকারটির ধ্বনি য়কার-ধ্বনি-রঞ্জিত। প্রাকৃত বৈয়াকরণিকেরা ইহাকেই য শ্রু তি বলিয়াছেন। এই ধ্বনিটিকে প্রকাশ করিবার অন্য কোনো বর্ণ না থাকায়, প্রাকৃত ব্যাকরণ বা সাহিত্য সর্ব্বত্রই য়কারই লিখিত হইয়াছে। তাই, সা অ র অর্দ্ধমাগধীতে লিখিত হয় সা য় র, এইরূপ পা আ ল (সং. পা তা ল) পা য়া ল ; র অ অ (সং. র জ ত), র য় য় ; ইত্যাদি।

অবর্ণেরই পরস্থিত অবর্ণের এই যশ্রুতি হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে। তাই লো অ (সং. লো ক) লো য় হয় না ; দে অ র (সং. দে ব র) দে য় র হয় না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন ক্বচিৎ ইহার ব্যাভিচার দেখা যায়, অন্য বর্ণেরও পরে অবর্ণের ক্বচিৎ যশ্রুতি দেখা যায়। তিনি একটিমাত্র উদাহরণ দিয়াছেন পি য় ই (প্রা. পি অ ই, সং. পি ব তি)। বস্তুত প্রচলিত প্রাকৃত সাহিত্যগুলির পাঠ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বলিতেই হইবে যে, অ ব র্ণে র ই পরে ("অবর্ণাদ্ ইত্যেব," হেম. ১.১৮০) অবর্ণের যশ্রুতি হয়, এ নিয়ম করা চলে না। বলিতে হইবে অন্যান্য স্বরেরও পরে অবর্ণের যশ্রুতি হয়। ধ ম্ম-সং গ হ ণি (শেঠ দেবচন্দ লালভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার কাণ্ড, বোম্বাই), দ শ বৈ কা লি ক (ঐ) ইত্যাদি বিবিধ প্রাচীন জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ, এবং স ম রা ই চ্চ ক হা (Biblio. Indi.), সু র সু ন্দ রী চ রি অ (জৈন-বিবিধসাহিত্যশাস্ত্রমালা, কাশী) ইত্যাদি জৈন সাহিত্য অর্দ্ধমাগধীতে লিখিত। এই সমস্ত পুস্তকে অবিশেষে সমস্ত স্বরেরই পরে অবর্ণের যশ্রুতি প্রকাশিত হইয়াছে। * হইতে পারে হেমচন্দ্র যখন (১৩শ শতাব্দী)

---

* Pali Text Society হইতে প্রকাশিত আ য়া র ঙ্গ সু ত্তে র আদর্শ দুইখানি পুঁথির একখানির (B) বহুলাংশে অবর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণের পরে যশ্রুতি দেখা যায় না। এ পুঁথী খানার তারিখ ১৪৪২ খ্রী। অপর পুঁথীখানা (A) তাহা অপেক্ষা প্রাচীন (১২৯২খ্রী), কিন্তু তাহাতে অবিশেষে সর্বত্রই যশ্রুতি আছে। Preface, xv

তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণ লেখেন, তখন তিনি যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পরে এই পদ্ধতির প্রসার হইয়াছে। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে আরো অনুসন্ধান আবশ্যক।

বস্তুত দেখা যায় অর্দ্ধমাগধীর এই যশ্রুতি কেবল ইহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। যদিও কোনো প্রাকৃত ব্যাকরণে মহারাষ্ট্রী-সম্বন্ধে এই নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায় না, তথাপি দেখিতে পাই, ক্রমশ ইহা ইহাতেও উপস্থিত হইয়াছে। দণ্ডীর কথানুসারে (কাব্যাদর্শ, ১.৩৪), এবং প্রাকৃতের লক্ষণানুসারেও সে তু ব ন্ধ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত; ইহাতে যশ্রুতি নাই। কিন্তু বাক্‌পতির গ উ ড় ব হ কাব্য মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃতে লিখিত হইলেও তাহাতে যশ্রুতি রহিয়াছে। মারাঠী ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে তাহাতে যশ্রুতি আছে, যথা সং. সো দ র ক, প্রা. সো অ র অ, মা. সো য় রা; ইত্যাদি। অতএব গ উ ড় ব হে র মহারাষ্ট্রীতে যশ্রুতি অমূলক বলিতে পারা যায় না। মার্কণ্ডেয়েরও লেখা (২.২) দেখিয়া মনে হয়, মহারাষ্ট্রীতে যশ্রুতি বস্তুত ছিল, যদিও যকার দিয়া ঐ ধ্বনিটা প্রকাশিত হইত না তিনি মহারাষ্ট্রী-প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন—

"অনাদাবদিতৌ বর্ণৌ পঠিতব্যৌ যকারবৎ॥
ইতি পাঠশিক্ষা।"

'পাঠশিক্ষায় * উক্ত হইয়াছে যে, অনাদিস্থিত অকার ও ইকারকে যকারের ন্যায় পাঠ করিবে।'

হেমচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য বৈয়াকরণিকেরাও এরূপ বিশেষ বিধান করেন নি যে, কেবল অর্দ্ধমাগধীতেই যশ্রুতি হইবে, যদিও পুঁথীসমূহে অধিকাংশ স্থলে অর্দ্ধমাগধীতেই ইহা দেখা যায়। ক্রমদীশ্বরও এই নিয়ম সাধারণ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।† বর্ত্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহ আলোচনা করিলে মনে করিতে পারা

* ইহার রচয়িতা ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার কিছুই জানা নাই।

† "ক্বচিদ্ যত্বং বা।" সংক্ষিপ্তসার, ২২। মনে হয়, হেমচন্দ্রও এইরূপ মনে করেন— "বহুলাধিকারাদ্ ঈষৎ স্পৃষ্টতর যশ্রুতিরপি। স রি য়া।" ৮.১.১৫।

যায়, ক্রমদীশ্বর ও মার্কণ্ডেয়ের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য অন্যান্য প্রাকৃতেরও সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল। আমরা পরে দেখিতে পাইব, এই যশ্রুতি প্রাকৃতেরই বিশেষত্ব নহে, ইহা প্রাকৃত-সৃষ্টির বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার সংসৃষ্ট অন্যান্য প্রাচীন ভাষার ভিতর দিয়া ব্যাপক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

যশ্রুতি ব্যাপারটা কি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সংস্কৃতে কয়েকটি বিশেষ স্থান * ছাড়া দুইটী স্বর পরে-পরে একসঙ্গে সাধারণত † থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রাকৃতে তাহা পারে। প্রাকৃতে যেমন পা আ ল (সং. পাতাল) শব্দে দুইটি স্বর (আদ্য ও মধ্য আ) পরে-পরে রহিয়াছে, সংস্কৃতে এক পদের মধ্যে এরূপ থাকিতে পারে না। মধ্যবর্ত্তী তকারটা লুপ্ত হওয়ায় মধ্যে যে ফাঁকটা (hiatus) হইল, প্রাকৃত তাহা কতকটা সেইরূপই মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ঐরূপ ফাঁক রাখিতে চায় নাই, তবে ক্বচিৎ কখনো দুই একটা আসিয়া গিয়াছে। প্রাকৃতে যেখানে যশ্রুতি, মনে হয়, সেখানে এই ফাঁকটাকেই পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আবার পূর্ব্বে সংস্কৃতে বা প্রাকৃতে যেখানে যকারের শ্রুতি মাত্র ছিল, কালক্রমে সেখানে পূর্ণ যকারই হইয়া উঠিয়াছে।

এই পদ্ধতি কতদূর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাওয়া যায় দেখা যাউক। পাণিনির সূত্রানুসারে (৮.৩.১৭) কঃ + আ স্তে সন্ধি করিলে ক য়া স্তে হয় (কঃ + আ স্তে = ক + আ স্তে = ক য়্ + আ স্তে = ক য়া স্তে)। এখানে বিসর্গটা লোপ হওয়ায় যে ফাঁকটা হইল (ক আস্তে) যকার আসিয়া তাহাই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। পাণিনির

---

* যথা, সজাত বিসর্গের লোপে, যথা রামঃ (স্) + আগতঃ = রাম আগতঃ। পদের অন্তস্থিত যকার ও বকারের লোপে; যথা, বিষ্ণো + এহি = বিষ্ণব্ এহি = বিষ্ণ এহি, এইরূপ হরে + এহি = হরয্ + এহি = হর এহি। দ্বিবচনের ঈ ঊ, একার ও অন্যান্য প্রগৃহ্য স্বর স্থলেও দুইটি স্বর পরে-পরে একত্র থাকে, যথা, অগ্নী অত্র। অন্যান্য প্রগৃহ্য স্বরসম্বন্ধেও এই নিয়ম।

† বৈদিক ভাষায় এক পদের মধ্যে দুই-তিনটি মাত্র শব্দে দুইটি স্বরের পরে-পরে অবস্থান দেখা যায়; যথা, প্র উ গ (প্রযুগ, বাজ প্রাতি ৪.১২৮), 'গাড়ীর যুগ কাষ্ঠের অগ্রভাগ'. তি ত উ, 'চালুন'; সু উ তি, 'সুরক্ষণ' (ঋ, স, ১০. ১৩০. ৩; ১০.৭১.২; ৮.৪৭.১)।

সময়ে এই যকারটা পূর্ণ যকারই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনো লোকে বলিত যে, স্থানে-স্থানে উল্লিখিত স্থলসমূহে পূর্ণ য-ধ্বনি না হইয়া যশ্রুতি মাত্র ছিল। পাণিনি শাকটায়নের নাম করিয়া এই মতটির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কথাটি এই (৮.৩.১৮)—

"ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য॥"

শাকটায়নের মতে পদান্তস্থিত অন্তস্থ বকার ও যকারের ল ঘু প্র য ত্ন ত র আদেশ হয় (অর্থাৎ তাহারা অত্যন্ত লঘু প্রযত্নে * উচ্চারিত হয়)।

এই ল ঘু প্র য ত্ন ত র ও যশ্রুতি আদেশ যে, একই তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কোনো-কোনো প্রাকৃত বৈয়াকরণিক যশ্রুতি-শব্দকে ল ঘু প্র য ত্ন ত র শব্দ দিয়াই ব্যখ্যা করিয়াছেন। † পাণিনি শাকল্যের নাম করিয়া বলিয়াছেন (৮.৩.১৯) যে, তাঁহার মতে উল্লিখিত স্থলে যকারের ‡ কোনো সম্বন্ধ নাই, খাঁটি ক আ স্তে ইহাই হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে, পাণিনির সময়ে অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যশ্রুতি-সম্বন্ধে তিনটি পদ্ধতি ছিল; (১) কেহ-কেহ পূর্ণভাবে যকার উচ্চারণ করিতেন (পাণিনি এই দলে); (২) কেহ-কেহ তাহা অতি লঘুভাবে উচ্চারণ করিতেন (শাকটায়ন-সম্প্রদায়); (৩) আর কেহ-কেহ বা যকারের কোনো সম্বন্ধই রাখিতেন না (শাকল্য-সম্প্রদায়)। প্রাকৃতের মধ্যে এই ত্রিবিধ উচ্চারণই চলিয়া আসিয়াছে।

প্রাকৃতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি, অবর্ণের (অথবা অন্যান্য স্বরের) পরে

* "অতিশয়েন লঘুপ্রযত্নো লঘুপ্রযত্নতরঃ"—পদমঞ্জরী (কাশিকা-ব্যাখ্যা)।

† "অবর্ণো যশ্রুতিঃ॥ কগচজেত্যাদিনা (৮।১।১৭৭) লুকি সতি শেষঃ অবর্ণঃ অবর্ণাৎ পরো ল ঘু প্র য ত্ন ত র যকারশ্রুতির্ভবতি।—হেম. ৮।১।১৮০; 'যোঽবশিষ্যতে অবর্ণঃ সঃ অবর্ণাৎ পরো ল ঘু প্র য ত্ন ত র যকারশ্রুতির্ভবতি।'—লক্ষ্মীধর ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা, পৃ ১৪ (১.৩.১০)। চণ্ড (৩.৩৫) ও ক্রমদীশ্বর (২২) সাধারণত যকারেরই কথা বলিয়াছেন, বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি।

‡ পদের অন্তস্থিত বকার সম্বন্ধেও এই বিধি।

অবর্ণেরই যশ্রুতি হয়, কিন্তু সংস্কৃতে শাকটায়নের কথানুসারে (পাণিনি ৮.৩. ১৮) অবর্ণের পরস্থিত যে-কোনো স্বরেরই যশ্রুতি হয়। প্রাচীন সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা হইতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায় ; ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

পাণিনি স্বয়ং নিজের মতে যশ্রুতির কথা বলেন নি, সম্পূর্ণ যকারেরই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যশ্রুতি যে ছিল, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নি, ইহা আমরা দেখিয়াছি। উচ্চারণটা পূরা বা কম মাত্রায় হউক তাহাতে বিশেষ কিছু আমাদের এখানে বলিবার নাই, আমরা এখানে ইহাই দেখিতে চেষ্টা করিব যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই উভয় স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানটা (hiatus) পূর্ণ করিবার জন্য যকার * আগম করিয়া বহু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত সংস্কৃত শব্দগুলি সমস্তই বৈদিক :—

দা + ই (কর্ম্মবাচ্য লুঙ্. ৩য়. এক.) = দা য়ি ; ধা + ই (ঐ) = অ ধা য়ি ; জ্ঞা + ই (ঐ) = অ জ্ঞা য়ি, দা + ই ন্ = দা য়ি ন্, ইত্যাদি অনেক। † লৌকিক সংস্কৃতে ও ঈদৃশ প্রয়োগ প্রচুর। এতাদৃশ স্থলে অবর্ণের পর য আসিয়াছে, কিন্তু পরে অবর্ণ নাই। আবার ভূ + ই ষ্ঠ = ভূ য়ি ষ্ঠ, ‡ পা + উ = পা য়ু 'রক্ষক', এই অর্থে অবেস্তাতেও পা য়ু ; বা + উ = বা য়ু, অবেস্তায় ব য়ু ; ইত্যাদি।

---

* এবং কখনো-কখনো অন্তস্থ বকার।

† কেহ-কেহ বলিতে চাহেন সম্ভবত ঐকারান্ত ধাতুর সাদৃশ্যে এইরূপ পদ হইয়া থাকিবে ; যেমন গৈ ধাতু হইতে গা য় তি। বস্তুত আমার মনে হয়, আলোচ্য গৈ ধাতুটিকে প্রচলিত ব্যাকরণসমূহে ঐকারান্ত বলিয়া মনে করিবার ইহাই একমাত্র কারণ যে, তাহা না হইলে গা য তি পদ করিতে পারা যায় না, ঐকারান্ত করিলে সন্ধির নিয়মে স্বর (অ) পরে থাকায় ঐ = আয হইয়া যায়, ও তাহাতে ঐ পদটি হইতে পারে। কিন্তু ধাতুটিকে আকারান্ত ধরিলে প্রদর্শিত উপায়ে গা য তি অনায়াসেই হইতে পারে। মূলে প্রদর্শিত দা যি প্রভৃতি পদ সাধিবার জন্য পাণিনি আকারান্ত ধাতুর উত্তর য্ (যুক্) আগম করিয়াছেন (৭ ৩ ৩৩)।

‡ পাণিনি বলিয়াছেন (৬ ৪.১৫৯), ই ষ্ঠ প্রত্যয় পরে থাকিলে ব হু শব্দ স্থানে ভূ আদেশ হয়, আর য (যিট্) আগম হয়। পাণিনি যাহাই বলুন না, এই জাতীয় পদগুলি (৬ ৪ ১৫৭) যে, মূল ধাতু হইতেই (প্রাতিপাদিক হইতে নহে) ইষ্ঠাদি প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আবার, মি ত্রা ব রু ণ + ও স (৬ষ্ঠী. দ্বি.) = মি ত্রা ব রু ণ য়োঃ ; য ম + ও স্ (৬ষ্ঠী. দ্বি.) = য ম য়োঃ, ইত্যাদি। সপ্তমীতেও এইরূপ। বলা বাহুল্য লৌকিক সাহিত্যেও এইরূপই হইয়া থাকে।

এই-জাতীয় উদাহরণের যকারকে আমরা পূর্ব্ব প্রদর্শিত যশ্রুতি বা যকার-আগমেরই দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারি, অন্য কোনো রূপে নহে। * পর-পর দুইটি স্বরের মধ্যে য আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে এবং এইরূপে (সন্ধির নিয়মে) একত্র মিলিয়া স্বরান্তরে পরিণত হইতে বাধা দিয়াছে।

স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত শব্দেরও তৃতীয়া হইতে সপ্তমীর এক বচন পর্য্যন্ত ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর দ্বিবচনে যকার-আগম এইরূপে ব্যাখ্যেয়। †

অবেস্তা হইতে দুইটি উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি, আরো প্রচুর আছে। জ স্ত (সং. জ স্ত) শব্দের সপ্তমীর দ্বিবচনে (জ স্ত + ও =) জ স্ত-য়ো (সং জ স্ত য়োঃ); উ ব (= সং. উ ভ) শব্দের সপ্তমীর দ্বিবচনে (উব + ও =) উ ব য়ো (সং. উ ভ য়োঃ) দ এ না, সং. ধ্যা নো 'সংবিৎ' 'ধর্ম্ম' শব্দের চতুর্থীর এক বচনে (দ এ না + আই =) দ এ ন-য়া ই (সং ধ্যা না য়ৈ), ইত্যাদি।

---

* পাণিনি এখানে ব্যা ক র ণে র প দ সা ধ ন মা ত্র করিবার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অকার স্থানে একার করিয়া তাহার পর ঐ এ-স্থানে অ য্ করিয়া সমাধান করিয়াছেন (৭.৩.১০৪)। ভাষাতত্ত্ব-আলোচনায় সর্ব্বত্র ব্যাকরণের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা চলে না।

† যেমন, প্রি য় যা, প্রি য়া যা ম্, ইত্যাদি। প্রি য়া + আ = আলোচ্য নিয়ম অনুসারে প্রি যা যা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনে হয়, য দ্, ত দ্, কি ম্ ইত্যাদি সর্ব্বনামের তৃতীয়ার একবচনের রূপের প্রভাবে বা সাদৃশ্যে আকার স্থানে অকার হইয়াছে। দ্রষ্টব্য য + আ = য য়া; ত + আ = ত য়া; ক + আ = ক য়া; এইরূপ প্রি যা + আ = প্রি য় (া) য়া। আবার প্রি য়া + আ ম্ = প্রি য়া য়া ম্; ইত্যাদি। বেদে (ঋ ১ ২৭ ৮, ইত্যাদি) ক সা চি ৎ অর্থে ক য সা চি ৎ দেখা যায়। ক য় স্য কিরূপে হইল? স্য-এর পূর্ব্বে Epenthetic ই আসিয়া (যথা সং ম স্য, অবেস্তা ম ই স্য) তাহাই য়কারে পরিণত হইয়াছে? অথবা Epethetic অ আসিয়া (যেমন গ্রীক spairo ও aspairo 'I strike convulsively', এখানে a হইয়াছে prothetic) যশ্রুতি হইয়াছে? অথবা ক স্য শব্দের শেষে সংযুক্ত বর্ণ থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের মাত্রাটা একটু বাড়িয়া লম্বা হইয়া ক-অ-স্য হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত যশ্রুতির নিয়মে পরে ক য় স্য হইয়াছে? শেষ পক্ষই সঙ্গততর মনে হয়।

ফারসীতেও এই যশ্রুতি লক্ষ্য হয়। আমাদের 'পা' অর্থাৎ 'চরণ' অর্থে সংস্কৃত পা দ (অথবা প দ)* আর ফারসী পা য়্, † এই দুই শব্দ যে, মূলত একই ইহাতে সন্দেহ নাই। পা দ হইতে প্রা. পা অ, তাহার পর যশ্রুতিতে পা য়, ক্রমশ পা য়্। যেখানে যশ্রুতি ছিল না, সেখানে প্রা. পা অ হইতে প্রাদেশিক পা। ফারসীতে অন্যত্রও যশ্রুতির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহাতে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, পদের শেষে যদি আ অথবা উ কিংবা ও থাকে, তাহা হইলে বহু বচনের বিভক্তি অ ন্ যোগ করিলে মধ্যে যকার আগম হয়। ‡ যেমন, দা না 'ঋষি' শব্দের বহুবচনে দা না য়া ন্; প রী রু 'যাহার মুখ পরীর মত সে', বহুবচনে প রী রু য়া ন্; ইত্যাদি। আবার অ ন্ দা খ্ ত্, 'সে নিক্ষেপ করিয়াছিল'; কিন্তু নিষেধ বুঝাইবার জন্য ইহার পূর্ব্বে ন যোগ করিলে ন য় ন্ দা খ্ ত্, 'সে নিক্ষেপ করে নাই'; ইত্যাদি অনেক। দ্রষ্টব্য Forbes. Perssian Grammar, p. 53. §

স্বরদ্বয়ের মধ্যে ব্যঞ্জন না থাকায় যে ফাঁকটা হয় তাহা পূর্ণ করিবার জন্য যেমন যকার আগম হইয়া থাকে বা যশ্রুতি হয়, সেইরূপ স্থানে-স্থানে (পূর্ব্বে অথবা পরে প্রায়ই উবর্ণ বা ও থাকিলে) অন্তস্থ বকার আসিয়া থাকে। পালি-প্রাকৃতে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। যথা, সং. আ য়ু ধ হইতে প্রা. আ উ ধ, তাহার পর পা. আ বু ধ; সং. ক ণ্ডূ য় ন, প্রা ক ণ্ডূ অ ন, পা. ক ণ্ডু ব ন; সং ক ণ্ডূ য় তি, পা. ক ণ্ডু ব তি) পালিপ্রকাশ, ১ § ৯৮, ঙ, পৃ. ৬৩), সং. স্তো কে ন, প্রা. থো এ ণ, আবার থো বে ণ) ধম্মসংগহণী, শেঠ দেবচন্দ লালভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার

---

* এই শব্দটী ভারত-ইউরোপীয় পদ্ অথবা পেদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। অতএব বহু ভাষাতেই ইহার সদৃশ শব্দ আছে।

† এতাদৃশ স্থলে অন্ত্য যকারের ধ্বনিটা প্রায় কিছুই শুনা যায় না, তাই সাধারণত যকার বাদ দিয়াই লিখিত হইয়া থাকে।

‡ Forbes · A Grammar of Persian Langnage, London 1869 p 28

§ ইংরাজিতে tune, few, human ইত্যাদি শব্দে dipthong ধ্বনি, এবং ইহার অন্তর্গত স্বরদ্বয়ের ধ্বনির মধ্যে y-এর ধ্বনি স্পষ্টই পাওয়া যায়। ইহাকেও যকার আগমের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। Bain's Higher English Grammar, 1884, p 4

ফণ্ড, বোম্বাই, উত্তরার্দ্ধ ২৯০ পৃ.) সং. স্থ ভ গ, প্রা. সু হ অ, আবার সু হ ব (সংক্ষিপ্তসার ২.৩)। তুলঃ সং. প্র কো ষ্ঠ. প্রা. প ও ট্ ঠ, আবার প ব ট্ ঠ (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব ১.৪৭)। ক্রমদীশ্বর যকারের ন্যায় অন্তস্থ বকারেরও আগম বলিয়াছেন। * কিন্তু এই বকারের উচ্চারণ সম্বন্ধে নিজের প্রাকৃতব্যাকরণে কিছু উল্লেখ নাই। যকারের যেমন লঘুতর প্রযত্নে উচ্চারণ হইত, মনে হয়, এতাদৃশ স্থলে বকারেরও সেইরূপ উচ্চারণ ছিল। কিন্তু এসম্বন্ধে দৃঢ়তর প্রমাণ এখনো আমি পাই নি।

যে সকল স্থলে যশ্রুতির কথা বলা হইয়াছে সেখানে নিজে-নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, পর-পর দুইটি স্বর পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিতে তেমন সুবিধা হয় না, এরূপ উচ্চারণ করিতে একটু বেশী প্রয়াস করিতে হয়; কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের যকারের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহা যেন ঐ স্বতন্ত্র স্বর দুইটাকে বেশ সহজে যুক্ত করিয়া দেয়, উচ্চারণটা অতি সহজে হইয়া যায়। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। সং. ব দ ন, প্রা. ব অ ণ, এখানে উপর্য্যুপরি দুইটি অকারকে স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিতে আমাদিগকে একটু বিশেষ প্রয়াস করিতে হয়, কিন্তু যদি উহাদের মধ্যে একটু যকারের আমেজ থাকে তাহা হইলে তাহা ঐ দুইটি স্বরকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে এরূপ সুযোগ প্রদান করে যে, আমরা সহজেই অনতিপ্রয়াসে দুইটিকেই উচ্চারণ করিতে পারি। ব অ ণ ও ব য় ণ শব্দ পাশাপাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। 'মাতার' এই অর্থে মা-এ র ও মা য়ে র এই শব্দ দুইটির প্রথমটিতে আ-এ এই স্বর দুইটিকে পৃথক্-পৃথক্ উচ্চারণ করিতে স্পষ্টতই আমাদের অধিক প্রয়াস হয়; আ-য়ে উচ্চারণ আমাদের নিকট তাহা অপেক্ষা অনেক সহজেই হইয়া থাকে। বকার সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

বাঙ্‌লা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী-প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাসমূহে যশ্রুতি

---

* "ক্বচিদ্ বত্বং বা।" সংক্ষিপ্তসার, ২.৩।

এখনো প্রচলিত আছে, এবং এই দিকেই তাহাদের গতি অধিক লক্ষিত হয়। * দ্রষ্টব্য—

প্রাচী-বাঙ্‌লা[illegible] তে ক, আধু-বাঙ্‌লা ক য়ে ক; সং. কে ত ক, প্রা. কে অ অ অথবা কে য় য়, বা. কে য়া; সং. কে দা রী, প্রা. কে আ রী, অথবা কে য়া রী, হি. কি য়া রী, ক্যা রী; সং. পি পা সা, প্রা. পি আ সা, পূ-হি. পি য়া সা, পি য়া স; পূ-হি. প ণ্ডি য়া ই ন্ (সং. প ণ্ডি ত, প্রা. প ণ্ডি অ, + আ ই ন্); সং. ব ণি জ ক, প্রা. ব ণি অ অ, হি. ব নি য়া, অথবা ব নি য়া; সং. পা দ ক, প্রা. পা অ অ, হি. বা. মা. ইত্যাদি পা য়া; সং. ভূ মি গৃ হ, প্রা. ভূ মি ঘ র, ক্রমশ মা. ভূ ভে র এবং ভূ য়ে র; সং. পি তৃ গৃ হ, প্রা. পি ই ঘ র, অথবা পি ই হ র, হি. পী হ র, গু. পী য় র; সং. মা তৃ কা, প্রা. মা ই আ, বা. ও. মা ই য়া; সং. হৃ দ য়, প্রা. হি অ অ, হি. বা. ও. হি য় অথবা হি য়া, পঞ্জা. হি য়া উঁ (প্রাচীন ম. হি যেঁ), সং. শৃ গা ল, প্রা. সি আ ল, হি. সি য়া র, বা. ও. শি য়া ল, গু. শি য়া ল.; সং. সা গ র, প্রা. সা অ র, অথবা সা য় র, প্রাচীন বা. সা য় র, এলু (= প্রাচীন সিংহলী) স যু ক, সং. শী ত, প্রা. সী অ. ইহা হইতে (আর-যোগে, কাল = কার = আর ?) সিন্ধীতে সি য়া রো, 'শীতকালে' (তুলঃ—উ ন্ হা রো 'উষ্ণকাল'); সং. ভ গি নী, প্রা. ভ ই ণী, ইহা হইতে সিন্ধীতে ভ য় ন্ রু; ইত্যাদি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

---

* শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পা ই ব, পা য়ি ব, অথবা পা ই বোঁ, সবই অনেক আছে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ল ই আ অথবা ল ই আঁ, কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্‌লায় কেবল ল ই য়া।

অজ্ঞানবাদ

জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রায় সকলেরই মনে থাকে। জ্ঞানের আলোক অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া মানুষের মনকে ধীরে-ধীরে যতই আলোকিত করে ততই সে নিজেকে ধন্য মনে করে। অজ্ঞানজালে জড়িত হইয়া মানুষ স্বভাবতই নানারূপ ভ্রমে পতিত হয়; জ্ঞান লাভ করিয়া সে ধীরে-ধীরে এই সকল ভ্রমপ্রমাদ হইতে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়। জ্ঞানলাভে মুক্তি, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। যে কোনও বিষয়েই হোক, বা যে কোনও প্রকারেই হোক, জ্ঞানলাভ বাঞ্ছনীয়, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।

কিন্তু অতিপূর্ব্বকালেই আমাদের দেশে একটি মত দেখা যায় যে, অজ্ঞানেই মুক্তি। জৈনশাস্ত্রে (ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, গুণরত্ন-কৃত টীকা, ২য় শ্লোক) পা ষ ণ্ডি ক গ ণে র প্রসঙ্গক্রমে চার প্রকার দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অ জ্ঞা ন বা দ এক প্রকার। অজ্ঞানিকগণ যুক্তি দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জ্ঞানলাভে মুক্তি নাই; বরং ইহা মানুষকে দৃঢ়তর ভাবে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধই করে। অতএব অজ্ঞানই শ্রেয়, অজ্ঞানই চিত্তকে নির্ম্মল পবিত্র রাখিতে পারে, এবং তাহাতেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

এই মতের ব্যাখ্যাতাদিগের মধ্যে আমরা সাত জনের নাম পাইয়াছি—শাকল্য, সাত্যমুগ্রি, মৌদ, পিপ্পলাদ, বসু, জৈমিনি, ও বাদরায়ণ। ইঁহাদিগের মধ্যে জৈমিনি ও বাদরায়ণ ভিন্ন অপর কাহারও নাম আমাদিগের নিকট সুপরিচিত নয়। কিন্তু এই জৈমিনি ও বাদরায়ণ কে? সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসা-সূত্রকার জৈমিনি ও বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণকেই যদি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে,

তবে তাহা অস্ফুট হইলেও, কোন্ অংশে বা কি প্রকারে তাঁহারা অজ্ঞানিক হইলেন, তাহা বিচার্য্য। যদি অপর কোনো জৈমিনি ও বাদরায়ণ থাকেন, তবে তাহাও অনুসন্ধেয়। শাকল্য একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ছিলেন; প্রাতিশাখ্যে, নিরুক্তে, ও পাণিনি-সূত্রে ইঁহার উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যকে এক শাকল্যের নাম পাওয়া যায়; যাজ্ঞবাল্ক্যের সঙ্গে বিচারে ইঁহার দুর্গতি হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুত কোন্ শাকল্যকে এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলা যায় না। সত্যমুগ্রির নাম পাণিনি-সূত্রে (৪.১.৮১০) পাওয়া যায়। স ত্য মু গ্রে র (সত্যম্-উগ্র) বংশে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার নাম সা ত্য মু গ্রি। সত্যমুগ্রের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বলিয়া সা ত্য মু গ্র নামে সামবেদের একটি শাখা ছিল। চরণব্যূহে (কাশী, ৪২পৃ) এস্থলে শা ট্য মু গ্র মুদ্রিত হইয়াছে। পাণিনির (৪.২.৬৬; ৬.২,৩৭) পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্য ও আন্যান্য ব্যাখ্যায় মৌদ ও পৈপ্পলাদ নাম (মৌদি ও পৈপ্পলাদির ছাত্র) একত্র পাওয়া যায়। ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের গুণরত্ন-কৃত টীকায় (এসিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল) পি প্প লা দ পাঠ আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মহাভাষ্য-প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয় পৈ প্প লা দ পাঠ হওয়াই সম্ভব। বসু-সম্বন্ধে আমারা এখানে কিছুই ঠিক করিতে পারি নি।

অজ্ঞানবাদীদিগের যুক্তিসমূহ নির্দ্দোষ বলিয়া আমাদের মনে না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা কি প্রকার যুক্তি দিয়াছেন অগ্রে তাহা দেখিয়া পরে নিজ-নিজ বিচার শক্তি দ্বারা ইহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে দোষ নাই।

অজ্ঞানিকদিগের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে অজ্ঞানবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তবে সাধারণ ভাবে তাঁহারা সকলেই বলেন যে, জ্ঞান বিভিন্ন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি বিরুদ্ধ জ্ঞানও আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি যে সত্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। একদল লোক এক পথ অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞানে উপস্থিত হন তাহাই তাঁহারা সত্য বলিয়া মনে করেন। আবার অপর একদল অন্যপথ অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ তাহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন। এই দুই অথবা ততোধিক বিরুদ্ধ-পক্ষীয় ব্যক্তিগণ নিজ-নিজ জ্ঞানের সত্যতা

প্রমাণ করিতে গিয়া কলহে প্রবৃত্ত হন, এবং এইরূপে অন্য পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া নিজ-নিজ চিত্তকে কলুষিত করেন। চিত্ত কলুষিত হইলে মুক্তি পাওয়া দূরের কথা, বরং দৃঢ়তর ভাবে বন্ধনই প্রাপ্ত হইতে হয়।

আবার কোনও এক মহাপুরুষের শিষ্যগণ সেই মহাপুরুষের বিবৃত মতকেই সত্য বলিয়া সকলের নিকট প্রচার করেন। কিন্তু সকলের নিকট তাহা যুক্তিযুক্ত না-ও হইতে পারে। সেই মহাপুরুষ তত্ত্বদর্শী বা বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু যথাযথ যুক্তি ভিন্ন তাঁহার মতকে সত্য বলিয়া কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? তাঁহার জ্ঞান যে, যথার্থ জ্ঞান তাহার প্রমাণ কৈ? তাহার পর, সেই বিশেষ ব্যক্তির নিজমুখ হইতে যদি তাঁহার মতটি শোনা যায় তাহা হইলেও নিজের বিচার শক্তি দ্বারা তাহা সত্য কি অসত্য স্থির করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই মহাপুরুষের উক্তি যে, শিষ্য-পরম্পরায় সম্পূর্ণ বা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় নাই, তাহা কে বলিবে? আবার যদি তাঁহার বাক্যগুলি যথাযথ আকারেই আমাদিগের নিকট আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের অর্থ যে ঠিক ঐরূপ, অথবা তিনি যে অন্য কোনও অর্থে সেই সব শব্দ প্রয়োগ করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি?

অতএব দেখা যাইতেছে জ্ঞানের কোনও স্থিরতা নাই। মানুষেরা বিরুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কেবল পরস্পরকে আঘাত করে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, এবং এইরূপে চিত্ত কলুষিত হইয়া উঠায় দৃঢ়তর ভাবে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হয়।

অজ্ঞানবশত মানুষ নানারূপে সংসারবন্ধনে বদ্ধ হয়, এবং সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আবার প্রাণপণ প্রয়াস করে। না-জানায় না-শুনায় যে বন্ধন হয়, তাহা হইতে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া, আপনা হইতে যে বন্ধনে বদ্ধ হওয়া যায়, তাহা সহজে দূর করা যায় না। অতএব আপনা হইতে দৃঢ়তর ভাবে সংসারে আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা কোন প্রকার জ্ঞানের আস্বাদ না পাওয়াই শ্রেয়; কেননা জ্ঞানই সকল বিদ্বেষের মূল।

সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে আর অন্যের প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ

আসিবার আশঙ্কা নাই, চিত্ত সকল প্রকার কলুষতা হইতে মুক্ত থাকে। অতএব অজ্ঞানকেই অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অন্যান্য দার্শনিকগণ অজ্ঞানিকগণের কুটিল তর্কের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদের অ জ্ঞা ন বা দে র অ জ্ঞা ন শ ব্দে র অর্থ করিয়াছেন কু ৎ সি ত-জ্ঞা ন।

বলা বাহুল্য এখানে আরো অনুসন্ধান আবশ্যক।

শ্রীমতীসুধাময়ী দেবী।

খাদ্যের কথা

যে সকল জিনিষকে আমরা খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করি উপাদান হিসাবে সেগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়; (১) Proteins অর্থাৎ ছানা-জাতীয়, (২) Fats অর্থাৎ মাখন-জাতীয়, (৩) Carbo-hydrates অর্থাৎ চিনি-জাতীয়, (৪) Mineral matters অর্থাৎ লবণ-জাতীয় ও (৫) জলীয়।

মাছ মাংস ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য এবং শর ছানা ডাল প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য, প্রটিন্ অর্থাৎ ছানা জাতির মধ্যে পড়ে। রাসায়নিক উপায়ে পরীক্ষা করিলে এগুলিতে নাইট্রোজেন্, অঙ্গার, হাইড্রোজেন অক্সিজেন্, এবং একটু গন্ধক ধরা পড়ে। চলা ফেরা নড়া-চড়া প্রভৃতি জীবনের কার্য্যে প্রাণিদেহের নিয়তই যে ক্ষয় হইতেছে তাহার পূরণের জন্য ঐ সকল খাদ্যের প্রয়োজন। দেহের অস্থি মজ্জা এবং মাংসও এগুলি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং শিশু বালক যুবক বা বৃদ্ধ সকলেরই জীবনরক্ষার জন্য ছানা-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন আছে।

"অধিকন্তু ন দোষায়" কথাটা অন্য জায়গায় হয়ত খাটে, কিন্তু ছানা-জাতীয় খাদ্যের আহার ব্যাপারে ইহা একবারেই খাটে না। যেটুকু প্রয়োজন তাহার অধিক আহার করিলেই বিপদ হয়। প্রদীপে তেল দিয়া আলো জ্বালাইলে আলোর জন্য যেটুকু তেলের প্রয়োজন ঠিক্ সেইটুকুই খরচ হয়। প্রদীপে বেশী তেল আছে বলিয়া তাহা কখনই বেশী পোড়ে না। সাধারণ খাদ্য হইতে সারবস্তু টানিয়া লইবার সময়ে আমাদের দেহ কতকটা প্রদীপের মতই কাজ করে। বেশি খাইলেও প্রাণরক্ষার জন্য যেটুকুর প্রয়োজন তাহাই দেহস্থ হয়, বাঁকি সকলি দেহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, অথবা চর্বির আকারে শরীরের নানা জায়গায় জমা থাকিয়া যায়।

ছানা-জাতীয় খাদ্য হইতে যে সারবস্তু রক্তের সহিত মিশে, ক্ষয়পূরণ ও শরীর-গঠনের জন্য ব্যয় হওয়ার পরেও যদি তাহার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেটুকুকে লইয়া বড়ই মুস্কিল হয়। এই জিনিসটাকে জমা রাখিবার বা হঠাৎ দেহ হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা শরীরের কোন জায়গাতেই থাকে না। কাজেই ইহাকে নষ্ট করিবার জন্য একটা তাগিদ আসে। চর্বি অনেক লোকেরই দেহে জমা থাকে। যখন প্রয়োজন হয় দেহ এই সঞ্চিত চর্বির ক্ষয় করিয়া, জীবনের কাজ চালাইয়া লয়। চর্বির ক্ষয়ে একটু অঙ্গারক বাষ্প, ও একটু জল দেহে জমা হয় এবং তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। তাগিদে পড়িয়া ছানা-জাতীয় খাদ্যের উদ্বৃত্ত সারবস্তুকেও এই রকমে নষ্ট করিবার জন্য দেহে আয়োজন চলে। জিনিষটা অক্সিজেনের সাহায্যে নষ্টও হয়, কিন্তু নষ্ট হওয়ার পরে নষ্টাবশেষ যাহা থাকে, তাহা জল ও অঙ্গারক বাষ্পের মত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহের বাহিরে আসিতে পারে না। যকৃতের ভিতরে কিছুকাল বাস করার পরে মূত্রাশয় দিয়া বাহির হওয়াই ইহার পথ। এই প্রকারে দেহের ভিতরে থাকার সময়ে এই জিনিষটা যে অপকার করে তাহা অতি ভয়ানক। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর বিকার এবং অকাল বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ব্যাধির ইহাই মূল কারণ। যকৃত এবং মূত্রাশয়ও ইহা দ্বারা ভারগ্রস্ত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। সুতরাং

শরীর গঠন করে বলিয়া ছানা জাতীয় খাদ্য অধিক খাওয়া কখনই নিরাপদ নয়।

ঘি তেল চর্বি, এইগুলি মাখন-জাতীয় খাদ্য। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, এই তিনটিই ইহাদের প্রধান উপাদান। চাল চিনি আলু সাগু বার্লি এবং ময়দা প্রভৃতি যে সকল খাদ্যকে কার্বোহাইড্রেট্ অর্থাৎ চিনি-জাতীয় দ্রব্য বলা হয়, সেগুলির উপাদান মাখনের উপাদানেরই মত। নাইট্রোজেন জিনিষটাই রক্তমাংসের প্রধান উপাদান। কার্বোহাইড্রেট্ এবং মাখন-জাতীয় খাদ্যে তাহার একটুও সন্ধান পাওয়া যায় না। কাজেই এই দুই-জাতীয় খাদ্য দেহের গঠন বা তাহার ক্ষয়পূরণের কাজে লাগে না। দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করাই ইহাদের প্রধান কাজ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘি মাখন চিনি প্রভৃতি দ্রব্য পরিমাণ মত খাইলে ঠিক প্রয়োজন মত তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিয়া সেগুলি অঙ্গারক বাষ্পের আকারে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বেশি খাইলে উহার উদ্বৃত্ত অংশ চর্বির আকারে দেহে জমা থাকে।

ঘি তেল মাখন বেশি খাইলেই যে গায়ে বেশি চর্বি জমে, এই ধারণাটা ভুল। চাল ময়দা চিনি প্রভৃতি তৈলবর্জ্জিত খাদ্যেও দেহে চর্বি জমিতেছে, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। কার্বোহাইড্রেট্ খাদ্য আপনা হইতেই দেহের ভিতরে গিয়া চর্বিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক লিবিগ্ সাহেব গরু লইয়া এসম্বন্ধে একবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন খাদ্যের সহিত কতটা মাখন-জাতীয় দ্রব্য গরুর পেটে পড়িতেছে তিনি তাহা লিখিয়া রাখিতেন। তার পরে সেই গরুটি দুধের সহিত কতটা মাখন উৎপন্ন করিত, তাহারও একটা হিসাব রাখিতেন। কিছু দিন পরে এই জমা ও খরচের হিসাব দাঁড় করাইয়া দেখা গিয়াছিল গরুটা যে পরিমাণে মাখন-জাতীয় দ্রব্য খাইয়াছে, তাহার অনেক বেশি মাখন সে দুধে মিশাইয়া শরীর হইতে বাহির করিয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হয়, এখানে চিনি-জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট্ রূপান্তরিত হইয়া মাখন হইয়াছিল। শূকরের দেহে অত্যন্ত অধিক চর্বি জমে। ইহারা যেটুকু মাখন-জাতীয় খাদ্য খায়, তাহার চতুর্গুণ চর্বি দেহে সঞ্চয় করে।

প্রাণীর দেহ বিশ্লিষ্ট করিলে তাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগ লবণ-জাতীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। এখানে লবণের অর্থ সৈন্ধব বা লিভারপুলের লবণ নয়। আকরিক পদার্থকেই আমরা লবণ বলিতেছি। কাল্‌সিয়ম্ ফস্‌ফেট্ নামে একরকম লবণ প্রাণীদের অস্থির প্রধান উপাদান। তা ছাড়া রক্তেও প্রচুর লবণ মিশানো থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সম্পূর্ণ লবণবর্জ্জিত খাদ্য খাইয়া কোনো প্রাণীই বাঁচে না। চাল ডাল শাক সব্‌জি মাছ মাংস এবং ফলমূলাদি খাদ্যে লবণ পদার্থ স্বভাবতই মিশানো থাকে। এইজন্য ভাত বা তরকারি লবণ মিশাইয়া না খাইলে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হয় না।

জল দেহের প্রধান উপাদান। ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থাৎ বারো আনাই জল। শরীর পোষণের উপযোগী খাদ্যের সারবস্তুকে জলই দেহের সর্ব্বত্র চালনা করে এবং যাহা দেহের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর ও আবর্জ্জনা স্বরূপ সেগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়।

আমরা খাদ্য সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা খুব মোটামুটি কথা। চাল আলু চিনি ময়দা প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট্ খাদ্য লইয়া আমরা একটু বিশেষ আলোচনা করিব। এই জিনিষগুলি সকল দেশের লোকেরই প্রধান খাদ্য। এই জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এগুলির উপরে নজর রাখিয়া অনেক পরীক্ষা করিতেছেন, এবং ইহাতে নিত্য নূতন কথা জানাইতেছেন।

কার্বোহাইড্রেট্ খাদ্যগুলিকে পরীক্ষা করিলে তাহাতে শ্বেতসার চিনি এবং সেলিউলস্ (cellulose) এই তিনটি প্রধান জিনিষ পাওয়া যায়। শ্বেতসার আমাদের খুব সুপরিচিত—চাল ময়দা যবের ছাতু এরারুট্ প্রভৃতি খাদ্য শ্বেতসারেই পূর্ণ। চিনিও আমরা বেশ জানি, আক খেজুর ও বীটের মূল হইতে ইহার উৎপত্তি। কিন্তু সেলিউলস্ জিনিষটার সহিত আমাদের সে রকম পরিচয় নাই। প্রাণিদেহের মাংসকে একত্র বাঁধিয়া রাখার জন্য যেমন সংযোগসূত্র থাকে, উদ্ভিদের দেহেও তাহা আছে। এই সংযোজক বস্তুকেই সেলিউলস্ বলা হয়। অর্থাৎ গাছ পাতা ফুল বা ফলের কাঠামো যে জিনিষ দিয়া প্রস্তুত

তাহাই সেলিউলস্। সুতরাং শাল কাঠের শুক্‌না কড়ি, তাজা বা শুক্‌না ঘাস, কপির কচি পাতা এবং পাকা আমের রস,—সকলই সেলিউলস্ দিয়া প্রস্তুত। কিন্তু ইহাদের সকলই আমাদের খাদ্য নয়। যে সেলিউলস্ সুস্বাদু ও সুকোমল তাহাই আমরা খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করি, এবং খাইয়া মনে করি বুঝি তাহা দ্বারা শরীরপোষণের কাজ চলিতেছে। সম্প্রতি Forecast নামে একখানি মাসিকপত্রে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই সংস্কারের একটি প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মুখে যাহা ভাল লাগে তাহাই খাদ্য, এই ধারণা ঠিক নয়। যাহা পাকযন্ত্রে পড়িয়া সহজে হজম হয়, তাহাই প্রকৃত খাদ্য। এমন অনেক মুখরোচক সেলিউলস্ খাদ্য আছে যাহা দীর্ঘকাল পাকযন্ত্রে থাকিয়াও শেষে অবিকৃত অবস্থায় শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। এগুলি শরীরপোষণের হিসাবে অখাদ্য। আবার ইহাদের মধ্যে এরকম খাদ্যও আছে, যাহা আমাদের অন্ত্রের মধ্যে আসিয়া কোন রকম রস বা জীবাণুর সাহায্যে বিকৃত হয় এবং তাহার ফলে কতকগুলি বাষ্প উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থ্যহানি করে। এরকম খাদ্য শরীর হইতে অবিকৃত অবস্থায় বাহির হয় না, অথচ শরীরপোষণের কাজেও লাগে না। সুতরাং সেলিউলস্ খাদ্য উদরস্থ হইয়া সত্যই হজম হইতেছে কি না তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

সুপক্ব ফলের সেলিউলস্ সুখাদ্য, কারণ ইহার কতক অংশ চিনিতে রূপান্তরিত হইয়া ফলেই সঞ্চিত থাকে এবং অবশিষ্ট অংশ এমন অবস্থায় থাকে যাহা খাইলে হজম হইয়া যায়। যে স্বাভাবিক কৌশলে অখাদ্য সেলিউলস্ সুখাদ্য চিনি প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকদের জানা আছে। পরীক্ষাগারে তাহারা করাতের গুঁড়াকে চিনিতে পরিণত করিতেছেন। কিন্তু নেপালী শাল-কাঠের প্রকাণ্ড গুঁড়িকে মিছরির কুঁদোতে পরিণত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা এখনো সম্ভব হয় নাই। কাজেই অনেক বিচার করিয়া সেলিউলস্ দ্রব্যগুলিকে আমাদের খাদ্য তালিকায় স্থান দিতে হইবে। কুমড়া আলু প্রভৃতি তরকারির খোসা আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহারে লাগাই না। ইহাতে ভিটামিন্ নামে যে

অংশও পদার্থটি থাকে, তাহা দেহের বড়ই উপকারী এবং ইহার সেলিউলস্ একবারে দুষ্পাচ্য নয়।

কার্বোহাইড্রেট্ খাদ্যগুলির মধ্যে শ্বেতসার জিনিষটার একটু আলোচনার প্রয়োজন। ধান গম ভুটা প্রভৃতি মানুষের প্রধান খাদ্য মাত্রেই শ্বেতসারই অধিক আছে। অনেক ফলেও প্রচুর শ্বেতসার ধরা পড়ে। এই জিনিষটা সাধারণত সেলিউলস্ নির্ম্মিত ছোটো কোষে আবদ্ধ থাকে। সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখাই যায় না। যাঁতায় পিশিলে বা ঢেঁকিতে কুটিলে কোষের আবরণ ছিন্ন হয় না। সিদ্ধ করিবার সময়ে যে জল ও তাপ কোষে প্রবেশ করে কেবল তাহাই আবরণ বিদীর্ণ করিয়া শ্বেতসারকে বন্ধনমুক্ত করে। এই বন্ধনমুক্ত শ্বেতসারই সহজে হজম হয়। এই জন্যই ভাত সহজে হজম হয়, কিন্তু চাল হজম হইতে চায় না।

অনেক খাদ্যেরই হজমের কাজ উদরে বা অন্ত্রে আরম্ভ হয়। কিন্তু শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যের পরিপাক-কার্য্য মুখ হইতেই সুরু হয়। এজন্য এগুলিকে অনেকক্ষণ মুখে রাখিয়া চিবাইয়া খাওয়া উচিত। মুখের লালাই শ্বেতসার খাদ্যের প্রধান পাচক রস। অর্দ্ধসিদ্ধ খাদ্য তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিলে, তাহার সহিত লালা মিশিতে পারে না। কাজেই এরকম খাদ্য হজম হয় না।

গলা ভাত অনেকের রুচিকর নয়। কিন্তু ইহার একটা উপকারিতা আছে। শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য মাত্রই লালার সহিত মিশিয়া উদরে গেলে, প্রথমে তাহা তরল হইয়া পড়ে এবং শেষে তাহা চিনিতে পরিণত হয়। চিনিতে রূপান্তরিত না হইলে তাহার সার অংশ কখনই দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। ভাত বা রুটি স্বভাবত মিষ্ট নয়; কিন্তু এগুলিকে অনেক ক্ষণ মুখে রাখিয়া চিবাইলে একটু বেশ মিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায়। চিবানো ভাত লালায় মিশিয়া চিনিতে পরিণত হয় বলিয়াই এই স্বাদ পাওয়া যায়। কাঁচা আম বা কাঁচা কলা মিষ্ট নয়। পাকিবার সময়ে শ্বেতসার গলিয়া চিনিতে পরিণত হয় বলিয়াই পাকা ফল এত সুমিষ্ট। ভাত অনেকক্ষণ হাঁড়িতে রাখিয়া ফুটাইতে থাকিলে ইহার প্রথম পরিপাক-কার্য্য

অর্থাৎ তরল অবস্থায় আসা, হাঁড়িতেই শেষ হয়। কাজেই এই রকম ভাবে লালার সহিত মিশিয়া পেটে পড়িলে তাহা শীঘ্রই চিনিতে পরিণত হইয়া হজম হইয়া যায়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, যব গম ইত্যাদির দানাগুলিকে সুপাচ্য করিতে হইলে সেগুলিকে সাত আট ঘণ্টা উনানে চাপাইয়া রাখা প্রয়োজন। ইহাতে শ্বেতসার কোষ বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসে এবং তরল হইয়া পড়ে। চাল যব গম বা এরোরুট্ সিদ্ধ করিবার সময়ে একটু লেবুর রস বা ভিনিগার পাকপাত্রে ঢালিয়া দিলে ঐ কার্য্যগুলি খুব শীঘ্র হয়।

চিনি একরকম কার্বোহাইড্রেট্ খাদ্য ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইক্ষু-চিনি দুগ্ধচিনি এবং বীট্‌চিনির রাসায়নিক উপাদান একই দেখা যায়। কিন্তু এগুলির মিষ্টতার অনেক প্রভেদ। আকের চিনির মিষ্টতা অত্যন্ত অধিক। বিলাতী বীট্‌চিনির মিষ্টতা যে কত কম, তাহা আমরা ভুক্তভোগী হইয়া জানি। দুধ হইতে উৎপন্ন চিনির মিষ্টতা এত কম যে, তাহা নাই বলিলেও চলে। দ্রাক্ষা বা অন্য ফলের রস হইতে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার রাসায়নিক সংগঠন একটু পৃথক; ইহার মিষ্টতাও ইক্ষুচিনির প্রায় অর্দ্ধেকের সমান। ফলের মোরব্বা প্রস্তুতের সময়ে আপনা হইতেই চিনি উৎপন্ন হইয়া মোরব্বাকে সুমিষ্ট করে। পাকা গৃহিণীরা মোরব্বা পাকের সময়ে প্রথমেই ফলের সহিত চিনি মিশাইতে নিষেধ করেন। পূর্ব্বে চিনি মিশাইলে তাহা ফলের সহিত মিশিয়া ফলের চিনিতে পরিণত হয়। ইহার মিষ্টতা খুব কম। কাজেই আগে মিশাইলে চিনি দ্বারা মিষ্টতা বাড়ে না। পায়েস রাঁধিবার সময়ে পাকের শেষাশেষি দুধে চিনি মিশাইবার রীতি আছে। অল্প চিনিতে সুমিষ্ট পায়েস রাঁধিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে হয়।

মাখন-জাতীয় খাদ্য এবং চিনি উভয়ই দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। কিন্তু মাখনের তুলনায় চিনির কাজ অতি দ্রুত চলে। কঠিন পরিশ্রমের পরে চিনি বা মিছরির সরবত খাওয়ার যে রীতি আছে, তাহার উপযোগিতা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পঞ্চপল্লব

ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার অনুবৃত্তি

By. E. Vredenburg. *Rupam* No. I.

ভারতশিল্প যেমন কালের করাল কবলে বিনাশ পেয়েচে, এমন কোন দেশের শিল্পের ভাগ্যে ঘটে নি। এদেশের ধ্বংশাবশেষগুলির প্রতি আধুনিক ঐতিহাসিক-দের কৃপা দৃষ্টির বড়ই অভাব দেখা যায়। এমন কি প্রায়ই দেখা যায় যে, ভগ্নচিহ্ন-গুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তাঁরা অনেক স্থলে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন; তাঁরা নানাপ্রকার কাল্পনিক যুক্তির দ্বারা সেগুলি বিদেশজাত বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। অনেক গ্রন্থকার মজার-মজার যুক্তি দিয়ে সাজাহানের জগদ্‌বিখ্যাত কীর্ত্তিকে ফরাসী, ইটালী, তুর্কী, পারসীক পর্ত্তুগীজ, বা আইরিস-প্রভৃতি কোন-না-কোন জাতীয় রচনা ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রে ভারতবর্ষের গৌরবকে অপহরণ করতে চান। যাহাই হোক্, আমরা সাবধানতার সঙ্গে বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ করবো না। দেখতে পাওয়া যায়, আর্টের ইতিহাসের ভিতরে কোন এক যুগের আর্টের নিদর্শন না পাওয়া গেলেই ঐতিহাসিকেরা ঠিক তার পরবর্ত্তী যুগের শিল্পে বিদেশের প্রভাব দেখে থাকেন। কেবল দৈবগতিকে অজন্তা-গিরিগুহায় খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন চিত্রের নিদর্শন র'য়ে গেছে। মানুষের বসবাসের দূরে এবং তুরধিগম্য স্থানে গুহা-গুলি আছে ব'লে আধুনিক ভ্রমণকারীদের যুগের পূর্ব্বে মানুষের দ্বারা এসকল চিত্রের কোনও বিশেষ অনিষ্ট ঘটে নি। তা ছাড়া অপেক্ষাকৃত স্থানটি শুষ্ক ব'লে

প্রাকৃতিক আব-হাওয়ায় তার তেমন কিছুই অনিষ্ট করতে পরে নি। আমরা উপস্থিত এস্থলে, অজন্তার চিত্রকে যে, অনেক ঐতিহাসিকে গ্রীক, পারসী বা চীনা শিল্প বলবার অসংখ্য চেষ্টা করেচেন, সে সব কথার আলোচনা করতে চাই না; আমরা অজন্তাকে ভারতের জিনিষ বলেই ধরে নিয়েচি। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের চিত্রকলার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। আধুনিক যুগের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী কালে মোগল আমলের অসংখ্য ভারতীয় চিত্র দেখতে পাই, এগুলিকে একবাক্যে অনেকেই পারসীক বলে থাকেন। ভারত-শিল্প বিষয়ে একটি পাঠ্য পুস্তকে ('L' Art Indian-এ) Maurice Maindron মহাশয় মোগল আর্ট সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেন, মোগল আমলের ভারতীয় চিত্র পারসীক চিত্র থেকে কোন অংশে তফাৎ নয়।' তাছাড়া Gustave Le Bon এবং Fergu-ssion মোগল ছবিকে একেবারে অপদার্থ সামঞ্জস্যহীন, পরিপ্রেক্ষিকা(perspective)-হীন বলে মন্তব্য প্রকাশ করচেন। আমরা মার্টিনের Near and Middle East পুস্তকে মোগল চিত্রের অসংখ্য প্রশংসার কথা পড়ার পর যখন এই কথা পড়ি যে, কাংড়া-চিত্রগুলি ইউরোপীয় আদর্শে ইউরোপীয়দের বাজারে কাটতির জন্য বিশেষ-ভাবে আঁকা, তখন বাস্তবিক বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মোগল আমলের চিত্র সম্বন্ধে এসব অপবাদ Havell, Percy, Brown, এবং কুমারস্বামী তাঁদের গভীর গবেষণার দ্বারা ঘুচিয়েচেন। এক্ষেত্রে আমরা এঁদেরই এই নতুন আবিষ্কারের পন্থা অনুসরণ করতে যাচ্চি, কেননা পূর্ব্ব অপবাদ ঘোচাবার জন্যে আরো কিছু এঁদের দিক্ থেকে ভারতচিত্রের বিষয়ে বলার যথেষ্ট আবশ্যক আছে বলে মনে করি।

অজন্তার চিত্র দৈবগতিকে কিছু বেঁচে গেছে বলেই আমরা ভারতের চিত্রের প্রাচীন ইতিহাস আজ পাচ্চি। ঠিক তার পরে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন চিত্রকলার চিহ্ন আমরা পাই না। তা ছাড়া যদি বা মন্দির বা গুহাগাত্রে ছবি আঁকা হয়েও থাকে, তথাপ তা স্থায়ী হতে পারে নি বলেই ধরে নিতে হবে। যাই হোক, ঠিক এই মধ্যবর্ত্তী যুগের চিত্রকলার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া না গেলেও

কতকগুলি অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বৌদ্ধ আমলের বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত চিত্র-সম্বলিত তালপত্রের পুঁথির উপর আঁকা ছবি পাওয়া গেছে। পণ্ডিত ডাঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেটির পাঠোদ্ধার করে বলেন যে, বঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ রামপালের উনত্রিংশ (৩৯) বৎসরে উদয়সিংহ কর্ত্তৃক পিতামাতার আত্মার কল্যাণের জন্যে এগুলি লেখানো হয়েছিল। রামপালের রাজত্বকালের সমসাময়িক প্রাচীন লিপির যে তিনটি বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি তারই ভিতরকার একটি। যদি আমরা রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের পালরাজত্ব-সম্বন্ধে গবেষণা ঠিক বলে মেনে নি, তাহলে এইপুঁথি ১০৯০ খৃষ্টাব্দের ব'লে ধরা যেতে পারে। যাই হোক, যদি এগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী না হয়, তা হলে অজন্তার চিত্রাবলী ও মোগল আমলের চিত্রের ঠিক মাঝামাঝি কালে এগুলিকে ফেলা যেতে পারে। Mr. Foucher ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এই হাতের লেখা পুঁথির ছবি তাঁদের পুস্তকে প্রকাশ করেচেন।

পুঁথির মলাটের কাঠের পাটার উপর ও পুঁথির ভিতরকার পাতার মধ্যেকার ছবিগুলির মধ্যে একটি ছবি এইরূপ :—মাঝখানে পীতবর্ণের দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা অসংখ্য ছোট-ছোট দেবতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করচেন, আর তাঁর দুপাশের এক ধারে পীতবর্ণের মারীচী; অপর ধারের মূর্ত্তিটিকে চেনা যায় না। একেবারে শেষে সাতজন তথাগত এবং মৈত্রেয়, ঠিক চার-চার জন করিয়া দুই সারে আঁকা; সকলেরই মুখ ঠিক মাঝখানের দিকে ফেরানো। অপর একটি পাটায় নয়ভাগে ছবিটিকে ভাগ করা হয়েচে। আটটি ছবি বুদ্ধের জীবনের আটটি বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ আশ্চর্য্য শক্তির ছবি; যথা বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি, পাগল হাতীকে বশ করা, বারাণসীতে ধর্ম্মপ্রচার, ইত্যাদি। তার পরবর্ত্তী ছবিগুলিতে বুদ্ধের স্বর্গ থেকে নামা, কপিদের দান, এবং পরিনির্ব্বাণ। নবম ভাগে সবুজ রঙের ধর্ম্মপাল একটি হাঁটুর উপর ভর দিয়েপাশ ও তরবারী হস্তে বসে আছেন। সম্ভবত ইহা অচল বজ্রপাণি বা মঞ্জুশ্রীও হতে পারেন। মলাটের পাটার পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠার ছবি :—অমিতাভ বুদ্ধ, অনেক গুলি বোধিসত্ত্ব,— যেমন অবলোকিত, মঞ্জুশ্রী,

মৈত্রেয়, আকাশ-গর্ভ ; এবং অপর যেগুলি আঁকা আছে সেগুলিকে চেনা যায় না, কেননা কাপড় বা অপর সব চিহ্নগুলি প্রায় সব মুছে গেছে ; মারীচী বসুধরা, সবুজ রঙের তারামূর্ত্তি, অরো দুটি অচেনা শক্তিমূর্ত্তি এবং মহাকাল দেবের ছবি। তা ছাড়া অপর উপদেবতা, যেমন হয়গ্রীব এবং অশোককান্ত ; ছবিগুলির মধ্যে এদুটীকে একপ্রকার নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। এইসব ছবিতে বর্ণের মধ্যে পীত, এলামাটির রং, লাল, নীল, সাদা, কাল, ও গেরিমাটীর রং দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম একই, কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তার দিক্ থেকে দুটি বিশেষভাগে ভাগ করা। রুদ্রভাবের মূর্ত্তির মধ্যে ভৈরব ও কালীই প্রধান, এবং তা পরবর্ত্তী মহাযান-মূর্ত্তির ভিতরও দেখা যায়। ছবিগুলির উপদেবতার একটি দক্ষিণ-হাত-তোলা মূর্ত্তি দেখলে মনে হয় এটি হয়-গ্রীব ; এবং বোধহয় সব চেয়ে প্রাচীন মূর্ত্তির মধ্যে এটি একটি। অঙ্কন প্রণালীর দিক্ থেকে দেখলে এই সকল প্রাচীন পুঁথির ছবিগুলির চোখের দৃষ্টি নীচের দিকে ঘোরানো ; প্রায়ই তিব্বতী ও নেপালী চিত্রে ও ভাস্কর্যো এইরূপ ভাবের নত দৃষ্টির চোখ দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটিকে পদ্মপলাশলোচন ব'লে তাঁর ভারতীব মূর্ত্তিচিত্রের মাপ-প্রমাণের পুস্তকে (Indian Artistic Anatomy) উল্লেখ করেচেন। ছবির মূর্ত্তিগুলির মুখের গঠনের সমুন্নত ভাবটি লক্ষ্য করবার বিষয়। বসবার সহজ-সরল ভঙ্গী, বস্ত্রাবরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি সবই ঠিক অজন্তার ছবির মতই পরিচিত ব'লে আমাদের মনে হয়। সম্পাদক মহাশয়, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দেখিয়ে দিয়েচেন যে, এই সব পুঁথির ছবি যে, কেবল পুঁথিরই যোগ্য তা নয়, এগুলিকে আকারে বড় করে এঁকে দেখলেও অজন্তাগুহার ভিত্তি-গাত্রের বড় ছবি হিসাবেও বেশ মানায়। প্রাচীন ভারতের চিত্রগুলি এমন কি মোগল চিত্র পর্য্যন্ত সবই কেবল ছোট (miniature) ক'রে আঁকার জন্যে নয়, সবই বড় ছবির জন্যেই সৃষ্টি। * এথেকে বোঝা যায় পারস্য, চীন, জাপান, বা

* এ বিষয় আমরা অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর সঙ্গে একমত হতে পারলুম না।—অনুবাদক।

মধ্যযুগের পাশ্চাত্য শিল্পের মত বইয়ের পাতায় আঁকার ভাবে ছোট ক'রে ছবি আঁকার রীতি প্রাচীন কালের ভারতীয় শিল্পীরা জানতেন না। সকলেই বোধহয় জানেন যে, মোগল চিত্র enlargement করে দেখলে তাতে তার সৌন্দর্য্য বাড়ে বৈ কমে না। Mr. Havell-এর বইয়েতে স্পষ্ট ভাবে ছোট মোগলচিত্র বড় করে দেখানো আছে। যদি কেহ ভারতচিত্র-সম্বন্ধী বক্তৃতার ম্যাজিক ল্যান্টর্ণের সাহায্যে বিপুল আকারে বড় করা মোগল ছবি দেখে থাকেন তাহলে এই ব্যাপারটি সহজেই বুঝতে পারবেন। এইসব ছবি থেকে ভিত্তি গাত্রে আঁকার উপযোগী বড় ছবি সহজেই হতে পারে ব'লে মনে হয়। এথেকে আরো মনে হয় যে, অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের শিল্পীরা ভিত্তিগাত্রে ছবি আঁকা একেবারে ভুলে যায় নি। পৃথিবীর নানান স্থানে যাদুঘরে রক্ষিত তিব্বতী-নেপালী বহুপ্রাচীন পতাকায় আঁকা ছবিগুলি এই একই কথা মনে জাগিয়ে তোলে। এইসকল পতাকাচিত্র আঁকার রীতি মহাযান যুগের শেষ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল ব'লে মনে হয়। তিব্বতী-নেপালী ছবির মধ্যে একটি ছবি আমেরিকার বোষ্টন যাদুঘরে রাখা আছে, তার প্রতিলিপি আনেসাকি (Anesaki) রচিত Buddhist Art পুস্তকে দেখচি, তাতে সেটিকে ভারতীয় চিত্র থেকে নেওয়া ব'লেই মনে হয়। ফতেপুর-শীকরীতে ষোড়শ শতাব্দীর ভিত্তিগাত্রে আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

এই মধ্যবর্ত্তী যুগের ছবি বেশী না পেলেও এনামেলকরা টলিতে আমরা প্রচুর ছবির নিদর্শন দেখতে পাই। আশ্চর্য্যের বিষয় ভারত-চিত্রের বিষয়ে লিখিত পুস্তকাদিতে এগুলির কথা বড় একটা উল্লেখই হয় নি। ছাবির উপর এনামেল করার রীতি হয়তো বা পারসীদের কাছ থেকে ভারতীয়েরা শিখেছিল। সর্ব্বত্রই Seville, Kairawan, Jerusalem, গৌড়, Pagan, Nankin প্রভৃতি স্থানে মধ্যযুগে এইরূপ টালি প্রাদেশিকতা রক্ষা করে বিরাজ করচে। উৎপত্তি যেখানেই হোক, এদেশের এনামেলকরা টালিগুলি যে ভারতীয়, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। মানসিংহের প্রাসাদগাত্রে কলাগাছের ছবি বরং পারস্য অপেক্ষা অজন্তার কথাই মনে পড়িয়ে

দেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এগুলি তৈরি হয়েছিল। এখনও সেইজন্যে রং বদ্‌রং হয়ে যায় নি। লাহোরে ভিত্তিগাত্রে যে সকল প্রাচীন ছবির নিদর্শন আছে, সেগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, এবং ঐ একই উপায়ে তৈরী হলেও বিশেষ ভাবে পারস্যভাবাপন্ন। গোয়ালিয়ারের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন ভিত্তিচিত্রগুলিতে এরূপ পারস্যভাব মোটেই নেই গোয়ালিয়ারে যখন ষোড়শ শতাব্দীতে এমন শ্রেষ্ঠ চিত্র আঁকা হয়েচে, তখন ৮০ মাইল দূরত্বের মধ্যে আগ্রায় হুমায়ুন বা আকবর তাঁদের সভায় ছবি আঁকবার জন্যে সুদূর পারস্য দেশ থেকে শিল্পীর আমদানী করতে যাবেন কেন?

মোটকথা, যদিও অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর চিত্রকলার নমুনা অধিক পাওয়া যায় না, তবুও যা অল্প বিস্তর পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে ঐ সময়ে ছবি আঁকার প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং অজন্তার প্রাচীন ভাবের সঙ্গে বরাবর একটা যোগ রেখে এগুলি চলেছিল। আর এই অল্পসংখ্যক মধ্যযুগের ছবির বিশেষ একটী ধরণ থেকে বোঝা যায় যে, ভিত্তিগাত্রে ছবি আঁকার বা সজ্জা করার (decoration) প্রথা বরাবরই ভারতবর্ষে ছিল, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মানসিংহের প্রাসাদের ছবি, যাহা ঠিক মোগল ও মধ্যযুগের মাঝের যোড়।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জ

By Rev. Kyozui Oka

Journal of the Indo-Japanese Association, No. 26

প্রাচ্য দেশে প্রাচীনতম সভ্যতা চীন ও ভারতে বিকশিত হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে "দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জের" সভ্যতা এই দুই দেশ হইতেই আসে। ভারত-মহাসাগরের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জকে চীন ও ভারতের লোকে "দক্ষিণ সাগর" বলিয়া জানিত। আমরা ইহাকে "দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জই" বলিব। বৌদ্ধগ্রন্থে

ইহা রাক্ষস ও দৈত্যগণের দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় যে, এক বণিক্ প্রবাল ও মুক্তা-সংগ্রহের জন্য ঐ দেশে গিয়া ভীষণ বাত্যাতাড়িত হইয়া তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বীপবাসীরা বণিক্‌কে একটী স্ত্রীলোকের প্রলোভনে ফেলিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করে ও তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া অনাহারে মারিয়া ফেলে। এই দ্বীপগুলিতে নরভুক্ মানুষের বাস ছিল।

রাজা অশোক মধ্য বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মনে করেন যে, রাজার কর্ত্তব্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও সভ্যতার বিস্তার। তিনি "ধর্ম্মের দ্বারা দেশজয়" আরম্ভ করেন। তিনি দেশ-বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করেন। যুবরাজ মহেন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সিংহলে যাইয়া সেখানকার রাজা ও প্রজাগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অশোকের পরে অন্যান্য রাজারাও ঐরূপে ধর্ম্মপ্রচার করেন, এবং দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জ, অর্থাৎ যাবা, সুমাত্রা-প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য বিস্তার উপলক্ষ্যে উপনিবেশ স্থাপন করান। পরিতাপের বিষয় এই যে, এই যুগের ইতিহাস মুসলমানেরা দগ্ধ করিয়া ফেলে। কেবল চীন-পুরোহিত ফাহায়নের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা এবিষয়ে কিছু-কিছু জানিতে পারি। তিনি স্থলপথে ভারতে গমন করেন ও সাগর পথে শিঙ্টাউ দিয়া দেশে ফিরেন।

চৌদ্দ দিন-রাত্রি এক বাণিজ্য জাহাজে চড়িয়া ফাহায়ান তামরুক (তমলুক) হইতে সিংহলে পৌঁছেন। এখানে তিনি সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহার দেশে ফিরিবার সময় পথে সাগরে ভয়ানক ঝড় উঠিয়া তাঁহার যাত্রাকে-বিপৎ-সঙ্কুল করিয়া তুলে। চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চলিত, তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি।

পথে তিনি অনেক দ্বীপ অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল যবদাহী বা যাবার নাম পরিচিত ছিল। এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, কেবল যাবাতে হিন্দুসভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এখানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছিল না বলিলেই চলে।

সপ্তম শতাব্দীতে হাই-যুনসাঙ্ "সি-যু-চি" বা প্রতীচ্য দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ

করেন। তিনি ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত অনেকগুলি রাজ্যের আর দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কেবলমাত্র যাবার নাম উল্লেখ করেন। কারণ তিনি স্থলপথেই ভারতবর্ষে যান ও দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে সিংহল-দেশীয় একজন পুরোহিতের মুখে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত নারিকেল-নামক এক দ্বীপের কথা শুনেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা সিংহল হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সহস্র-সহস্র মাইল জাহাজ চালাইয়া গেলে নারিকেল দ্বীপে পৌঁছিতে পারি। সে দেশের লোকেরা মাত্র তিন ফুট লম্বা এবং সেখানে শস্য জন্মে না। ......সিংহল হইতে পশ্চিম দিকে বহু দূর যাইলে আমরা মহারত্নদ্বীপ বা মাদাগাস্কার পাইতে পারি। এখানে মানুষের বসবাস নাই, কেবল দেবতাদের বাস আছে।" নারিকেল দ্বীপ বর্ত্তমান ন্যাগোস দ্বীপ হইতে পারে।

ট্যাঙ্ বংশের রাজত্বকালে চীন ও ভারতের মধ্যে খুব বাণিজ্য চলিত এবং প্রায় পঞ্চাশ জন পরিব্রাজক চীন হইতে ভারতে আসেন। সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিঙ্ ভারতে আগমন করেন। তিনি শ্রীভোগে (প্যালেমবাঙ্, সুমাত্রাতে) পাঁচ বৎসর ছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণের নাম "দক্ষিণ সাগর হইতে প্রেরিত আভ্যন্তরিক আইনের বিবরণ"। ইৎসিঙ্ কোয়াঙ্টাঙ্ হইতে একটী পারসীক জাহাজে নভেম্বার মাসে যাত্রা করেন। ২০ দিনের পর জাহাজ শ্রী-ভোগে পৌঁছিল। সেখানে তিনি ছয় মাস থাকিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তার পর তিনি মালায়ু দেশে যান। সেখানে তিনি ছয়মাস থাকিয়া পশ্চিম সুমাত্রায় কচায় যাত্রা করেন। তিনি রাজকীয় জাহাজে পূর্ব্বভারতে পৌঁছেন। কিঞ্চিদধিক দশ দিন পরে তিনি উলঙ্গ লোকদের দেশে আসেন। প্রায় এক মাসের মধ্যে তিনি সেখান হইতে তাম্রলিপ্তি বা তমলুকে পৌঁছেন। ইহার পর তিনি নালন্দা বিহারে আসিয়া ১৬ বৎসর অবস্থান করেন ও সমগ্র বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এখান হইতে জাহাজে চড়িয়া কচায় গমন করেন ও সেখানে শীত ঋতু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। পরে সিলিএসি হইয়া কোয়ংফুতে পৌঁছেন।

তিনি চীন ভাষায় দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন ও সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার মতে দক্ষিণ দ্বীপমালা দুভাগে বিভক্ত ছিল, সি হ্লি-ফা-সি ও কুনলুন। প্রথমোক্তটিকে মালয়ভাষাভাষীদের দেশ মালয় বলা যায়; যথা শ্রীভোগ, পুলুসি, মালয়ু, কলিঙ্গ (যাবা), * মহাসীন (লম্বক ?), নতুন (সুম্বাওয়া), পেম্পেন (বোর্ণিও) ও বালি। বর্ত্তমান ফিলিপাইনকে কুনলুন-ভাষাভাষী কুনলুন-জাতির দেশ বলা হইয়াছে। পুলোকণ্ডোর (সেলিবিস্ ?), ভোগপুর (জহোর মালয়,-উপদ্বীপে), আশান বা ওশান, মাঘামান (লুজন দ্বীপ), এই সকল কুনলুন দেশের অন্তর্গত। কুনলুনেদের চুল কাল কোঁকড়া ও কর্কশ। চেহারা চীনাদের মত, এবং তাহারা খালি পায়ে থাকে ও কলমা পরে।

সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিঙ্ ভারত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনটী স্বাধীন রাজ্য ছিল; শিলিফাশি, মলয়ু ও পলুশী। সে সময়ে শিলিফাশি সুমাত্রা শাসন করিত।

"শি লি ফা সি" কথাটা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে; ইহার অর্থ "সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যের দেশ"। ভারতীয় সভ্যতা এই দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্যালেম্ব্যাঙ্ নদীর তীরে প্যালেম্ব্যাঙ্ ইহার রাজধানী ছিল। এখানে ভারতবর্ষ ও কোয়াঙ্‌টঙের মধ্যে বাণিজ্য চলিত; আর ভারতবর্ষ, পারস্য, ও চীন দেশের বণিকেরা বাস করিত।

মালায়ুর রাজধানী ছিল বর্ত্তমান সিয়াক। পলুশি বৈদেশিক বাণিজ্যের বন্দর ছিল। সুমাত্রার সর্ব্ব দক্ষিণ উপকূলে একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। ইহার নাম ছিল কচা। বর্ত্তমান ওঙ্গৈলী-লিউই বোধ হয় কচা।

ফোশিয়েন যাবাকে "যপোতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও হুয়েনসিয়াঙ্ ইহাকে "হোলিঙ্" দ্বীপ বলিয়াছেন। সুমাত্রা ও যাবা একই সময়ে ভারতের সভ্যতার প্রভাবে আসে।

* নদীয়া কৃষ্ণনগরের নিকটে "কলিঙ্গ" ও "জাবা" নামে দুটী কৈবর্ত্তপ্রধান গ্রাম আছে।—অনুবাদক।

এখানে সর্ব্ব ঋতুতেই জলবায়ু উষ্ণ। যাবাদ্বীপে ফেব্রুয়ারী ও আগষ্টে সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে থাকে। এ দুমাস খুব গরম।

ইৎসিঙের সময়ে দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জে মালয়ু ও কুরিন গণের বাস ছিল। মালয়ুরা পীতবর্ণ ছিল, এবং কাম্বোডিয়া. শ্যাম ও ব্রহ্ম দেশবাসীদের সহিত সমজাতীয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। কুরীণেরা কৃষ্ণবর্ণ ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের সহিত একজাতীয় ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

সংস্কৃত লেখ্য ভাষা ও কুনলুন চলতি ভাষা ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইৎসিঙের গ্রন্থে লেখা আছে যে, কয়েকজন চীন-পরিব্রাজক ফোসি (সুমাত্রা) দেশে গিয়া কুনলুন ভাষা আয়ত্ত করিয়া অভিধর্ম্ম-কোষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বর্ত্তমান মালয়ু ভাষা সস্কৃত, আরবী, ডাচ্, ও কুনলুন ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

কুনলুনদের পাঁচরকম খাদ্য ছিল; যব, ডাল, সিদ্ধরুটি, মাংস ও পিষ্টক। আর পাঁচরকম চিবাইয়া খাবার জিনিষ ছিল; মূল, পাতা, ডাঁটা, ফুল ও ফল। সুপারীরও ব্যবহার ছিল।

প্রকৃতি-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। ফাহিয়ান্ বলেন, পঞ্চম শতাব্দীতে যাবাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব ছিল, আর বৌদ্ধধর্ম্ম নামে মাত্র ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইৎসিঙ সুমাত্রায় ছিলেন, তখন সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খুব ছিল এবং পণ্ডিতেরা বাস করিতেন। সময়সূচক দুন্দুভি বড় বড় বিহারে বাজিত। বিহারগুলিতে বহুসংখ্যক ভিক্ষু থাকিত।

হীনযান সম্প্রদায় সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। মূলসর্ব্বাস্তিবাদনিকায়ে সকলের চেয়ে বেশী লোক ছিল। কথিত আছে যে, পরবর্ত্তী মহাযান সম্প্রদায় সুমাত্রা হইতে যাবায় প্রসারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এ প্রদেশে আসে, এবং সপ্তম শতাব্দীতে সুমাত্রায়, ও নবম শতাব্দীতে যাবাতে প্রভাব বিস্তার করে। চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলমানেরা ঐ দ্বীপগুলি আক্রমণ করার পর হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন হয়। এখন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশী। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম সুমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল, এবং ইহাতে তান্ত্রিকতার লেশ ছিল।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্প দক্ষিণ দ্বীপ-পুঞ্জে প্রবর্ত্তিত হয়। যাবার বরোবোদোরই আদর্শ শিল্পের নমুনা। অবশ্য আকারে এলোরা ও অজন্তার বৌদ্ধ কীর্ত্তির সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু গঠনভঙ্গীতে ইহা তাহাদের চেয়ে সুন্দর; ছোট ছোট চূড়ায় গঠিত সমগ্র মন্দিরটী একটী সুবিশাল মুকুটের মত। দেওয়ালে যে সকল মূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি ও পশু-পাখী, গাছ-পালা, ও ফুল ফলের আকৃতি আছে। কল্পনা ও শিল্পকুশলতায় সেগুলি উচ্চ শ্রেণীর। এই সমুদয় সংযম, পবিত্রতা, ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মেয়ে ও পুরুষের মূর্ত্তিগুলি হিন্দু বা গ্রীক বলিয়া বোধ হয়, আদৌ জাপানী ছাঁচের নয়।

দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জে দশের বেশী দ্বীপ আছে। এখানে পুরোহিত ও অন্যান্য সম্প্রদায় পূর্ব্বজন্ম-বিষয়ে জাতকমালা আবৃত্তি করে, তাহা এখনও চীনভাষায় অনূদিত হয় নাই। যাবা ও চীনের লোকে ললিতবিস্তর (বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্মের কথা) গান করে। ইৎসিঙ্ আরও বলেন, "রাজা শিলাদিত্য জীমূতবাহনের গল্প ছন্দোবদ্ধ করেন। ইহাতে গানের সুর দিয়া নাচ ও অভিনয়ের সহিত জনসাধারণের মধ্যে ইহা প্রচার করা হয়।" বর্ত্তমানে যে গান ও নাচ যাবাতে দেখা যায়, উহা শিলাদিত্যের সময়ের নাচগানের অবশেষ।

ইৎসিঙ্ সুমাত্রায় যে ঘড়ি ব্যবহার করিতেন, তাহা সূর্য্য-ঘড়ি বই আর কিছু নয়। চীনে খুব পূর্ব্বকালে এবং ইৎসিঙের সময়েও ইহার ব্যবহার ছিল।

অন্য রকমেও ঘড়ির কাজ করা হইত। তাম্রপাত্রে জল দেওয়া হয়, তাহাতে একটী তাঁবার পাত্র ভাসে এবং, ইহাতে একটী ছোট ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র দিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে। অবশেষে পানপাত্রটী ডুবিয়া যায়। পাত্রের এক-একবার নিমজ্জনে এক-একটী ঘণ্টা গণনা করা হয়।

আরও অনেক চীন পরিব্রাজক এই দেশ দেখিয়া তাহার বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইৎসিঙের বিবরণই বেশী প্রয়োজনীয়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

বিশ্ববৃত্তান্ত

চীনে ছাত্র-আন্দোলন

চীন-রাজসরকার বিদেশের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে গিয়া যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং প্যারী নগরের মহাসভা জার্ম্মেনির হাত হইতে শান্‌টাঙ্‌ কাড়িয়া লইয়া তাহা যে, চীনকে ফেরত না দিয়া জাপানকে দান করিয়া দিলেন, ইহাতে তাহার বিরুদ্ধে চীনের ছাত্রসমাজ ঘোরতর আন্দোলন তুলিয়াছে। কলেজের বড়-বড় ছাত্রেরা কলেজে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের কোন বিবাদ নাই, বরং ছাত্রেরা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তাহাদের এই কলেজে না-যাওয়া সম্বন্ধে উপদেশও চাহিয়াছে। বড়-বড় ছাত্রদের দেখাদেখি পাঠশালার ছাত্রেরাও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। এই ছাত্র-আন্দোলন সম্বন্ধে ১৯১৯ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের 'Nation' পত্রিকায় James Arthur Muller একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ; নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।

এই ছাত্র-আন্দোলন পিকিঙে প্রথম আরম্ভ হয়। প্যারী মহাসভার ব্যবস্থায় জাপান যেদিন শান্‌টাঙ্‌ পাইল, সেদিন তিন হাজার ছাত্র কুচ করিয়া মন্ত্রী (Minister of Communications) Tso Ju Lin মহাশয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। ইনি একজন বিখ্যাত জাপানী-ঘেঁসা লোক, ইনিই গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জাপানের কাছে চীনের জন্য অনেক টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। সম্মুখে ছাত্রগণকে দেখিয়া মন্ত্রী মহাশয় বুদ্ধিমানের মত পিছনের দরজা দিয়া অন্তর্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহারই মত জাপানী-ঘেঁসা জাপানের চীনদেশীয় মন্ত্রী, Mr. Chang Chung Hsiang, সেদিন তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন,

ছেলেরা ইঁহাকে ধরিয়া এমন প্রহার দিয়াছিল যে, তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তার পর, মন্ত্রীর বাড়ীতে আগুণ লাগাইয়া দেওয়া হইল, যদিও ছাত্রেরা সে সম্বন্ধে দোষ স্বীকার করে না। ৩৩ জন ছাত্র গ্রেপ্তার হইয়া আবার অল্পদিন পরেই মুক্তি পাইল। ছাত্রসমাজ তাহাদিগকে বীর বলিয় অভ্যর্থনা করিল।

এই ঘটনার ঠিক পর হইতেই তাহারা খুব উৎসাহের সঙ্গে শান্তভাবে তাহাদের আন্দোলনের কাজ চালাইবে বলিয়া সংকল্প করিল। তাহারা গভর্ণমেণ্টের জাপানী-ঘেঁসা তিন জন সভ্যের পদচ্যুতির প্রার্থনা গভর্ণমেণ্টকে বারংবার জানাইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট ছাত্রদের এই আন্দোলন যতই থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, ছাত্রেরা ততই দ্বিগুণ উৎসাহে তাহা চালাইতে লাগিল।

গভর্ণমেণ্ট উল্লিখিত তিন জন সভ্যের কাজ সমর্থন করিয়া বিজ্ঞাপন বাহির করিল, এবং ছাত্রদের জেলের ভয় দেখাইয়া আন্দোলন বন্ধ করিতে অনুরোধ করিল। তাহারা সে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বারংবার দলে দলে জেলে যাইতে লাগিল, তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য লোকও উত্তেজিত হইয়া সোৎসাহে আন্দোলনে যোগ দিল। চীনে এই প্রথমবার জনসাধারণের মধ্যে একটা একতার ভাব দেখা দিল, গভর্ণমেণ্ট তিনজন সভ্যের পদচ্যুতি করিতে বাধ্য হইল, ছাত্রেরাও মুক্তি পাইল।

একটা পরজাতি যে, বাণিজ্যের দ্বারা সমস্ত দেশ শুধু লুট করা নয়, এক রকম পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ছাত্রেরা যে, সংযত আন্দোলন করিতেছে, তাহা চীন দেশের কর্ণধারেরা বন্ধ করিতে এত ব্যাকুল কেন? আসল কথা এই যে, শাসনকর্ত্তার দলটি থামখেয়াল এবং দুষ্ট। তাহাদের হাতেই দেশের সৈন্যবিভাগ, এই বিভাগ পরিচালনার প্রয়োজনীয় টাকা তাঁহারা জাপান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ধার পান, সুতরাং তাঁহারা তো জাপানী-ঘেঁসা হইবেনই। এই যুদ্ধব্যবসায়ীরাই (**militarists**) দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা, জনসাধারণের

সভা বা পার্লামেণ্টের প্রভাব দেশে কিছুই নাই। বর্ত্তমান সময়ের এই ছাত্র-আন্দোলন ছাড়া গভর্ণমেণ্ট এতদিন জনসাধারণের কোন কথাই গ্রাহ্য করেন নাই, কেন না জনসাধারণের অধিকাংশই এতদিন অশিক্ষিত ছিল।

চীনের এই শাসনকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য দুইটি; প্রথম, তাহাদের নিজেদের পদ ও সম্মান বজায় রাখা; দ্বিতীয়, তাঁহাদের পকেট টাকার বোঝাই করা। প্রথমটির জন্য তাঁহারা সমস্ত রকম আন্দোলনই পিষিয়া ফেলিতে পারেন, দ্বিতীয়টীর জন্য তাঁহারা দেশবাসীর নিকটে যথেষ্ট কর গ্রহণ করেন, এবং দেশের যে কোন স্থানকে পৃথিবীর যে-কোন অন্য দেশের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন। এখন, শান্‌টাঙের উপর অনেকের লোভদৃষ্টি আছে, তবে জাপান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে দিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

জাপান বা পাশ্চাত্য জগৎ যদি চীনের এই শাসনকর্ত্তার দলটিকে অর্থ বা অন্য কোন উপায়ে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে ইহা বুদ্‌বুদের মত মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু ছাত্রদের এই আন্দোলন আর যাহারই কাছে ভাল লাগুক না কেন, চীনের যুদ্ধব্যবসায়ী কর্ত্তাদের নিকটে নিশ্চয়ই ইহা খুব অনুকূল বলিয়া ঠেকিতেছে না। যতদিন পিকিঙ্‌ নগরের রাজতক্তে বসিয়া এই দলটি চীনকে শাসন করিবে, ততদিন কিন্তু দেশে জনসাধারণের কথার মূল্য কিছুই থাকিবে না। এই দলটিই গোপনে গত বৎসর সেপ্টম্বর মাসে জাপানের সহিত সন্ধি করিয়া দশ লক্ষ ডলারের লোভে জাপানের কাছে শান্‌টাঙ্‌ বিক্রয় করিয়া যাহাতে এই ঘটনা প্রকাশিত না হয়, এই জন্য এমন কি প্যারীর মাহাসভাতেও প্রতিবাদ করিবার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইতে সাহস করিয়াছিল।

প্যারীর মহাসভা যদি জাপাদের নিকট হইতে শান্‌টাঙ্‌ লইয়া চীনের শাসনকর্ত্তাদের হাতে ফিরাইয়া দিত, তাহাতে বিশেষ কিছুই লাভ হইত না, কেন না পিকিঙের রাজপুরুষগণ নিজেদের অর্থাগমের জন্য আবার সুবিধা পাইলেই যার-তার কাছে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিতেন। ছাত্র-আন্দোলনের ফলে তিন জন রাজপুরুষ পদচ্যুত হইয়াছেন বলিয়াই চীনদেশে যে, আর তাঁহদের দলের

কোন প্রভাব নাই তাহা নহে। যে পর্য্যন্ত জাপান চীনকে সাহায্য করিবে এবং পাশ্চত্য জগৎ জাপানের পক্ষে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত চীনে যুদ্ধব্যবসায়ী কর্ত্তাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিবেই। কিন্তু এই আন্দোলনর ফলে কেবল যে, এই তিনজন বিশ্বাসঘাতকই পদচ্যুত হইয়াছেন তাহা নহে, চীনারা জাপানী জিনিস বয়কট করিয়া চীনে জাপানী দোকান প্রায় বন্ধ করিয়াছে, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। জাপানীরা বুঝিয়াছে যে, চীনদেশে সকলেই স্বার্থপরায়ণ রাজনৈতিক নহে। তাহারা ভয় পাইয়াছে যে, ঘুমন্ত চীনদেশেও জনসাধরেণের উদ্বোধন হইয়াছে। ছাত্রেরা যে রকম শৃঙ্খলা, আত্মসংযম, নিঃস্বার্থপরতা এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে সর্ব্বদেশ এবং সর্ব্বসাধারনের জন্য জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছে, তাহাতে চীনদেশও যে, অদূরভবিষ্যতে নিজের পায়ের উপর দাড়াইতে পারিবে তাহা নিঃসন্দেহে আশা করা যাইতে পারে।

ধী.

জাপান ও সন্ধিসভা

সন্ধির বৈঠকে ইউরোপের মিত্রশক্তিরা তাহাদের ভাগ-বাটোয়ারার আপাতত একটা রফা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এসিয়ার জাতিসমূহের স্বার্থ-সম্বন্ধে তাহাদের নিকট সুবিচার পাওয়া যায় নাই। বর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের সকল জাতির প্রতি সমান ব্যবহার করার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব জাপান উক্ত সভায় উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা না-মঞ্জুর হইয়াছে।

আফ্রিকা, আমেরিকা, ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে বহু লক্ষ বর্গ মাইল জমি পতিত রহিয়াছে। ধরিত্রী তাঁহার এই বিপুল ভাণ্ডারে কোটি-কোটি নিরন্ন সন্তানের অন্নের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। শ্বেত জাতি এই সকল মহাদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া অ-শ্বেত জাতিদিগের প্রবেশদ্বার বদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইউরোপের মিত্রশক্তি প্রাচ্যজাতি-সমূহের সাহায্যেই গত যুদ্ধে শত্রু দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতবাসী, জাপানী, ও আফ্রিকার অ-শ্বেত জাতি-সমূহ ইংরেজ, ফরাসী, ও ইটালীকে যে প্রকার সাহায্য করিয়াছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু জাপান যখন বর্ণগত সাম্যের (racial equality) প্রস্তাব উপস্থিত করে, তখন পাশ্চাত্য জাতিসমূহ একবারে তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইল। জাপান হইতে প্রকাশিত "এশিয়ান্ রিভিয়ু" নামক মাসিক পত্রে লিখিত হইয়াছে—"এই প্রস্তাবের বিফলতার প্রধান কারণ প্রাচ্যজাতিসমূহের একতার একান্ত অভাব। সে যাহাই হউক, জাপান দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে যে, এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার মর্ম্মান্তিক অপমান দূর করিতেই হইবে। যদি ন্যায় ও মানবধর্ম্ম বলিয়া কোনো পদার্থ থাকে, এবং অশ্বেত জাতির পক্ষে তাহার অর্থ অন্য ভাবে প্রয়োজ্য না হয়, তবে চিরকালের জন্য শ্বেত-অশ্বেতের বৈষম্য দূর করিতেই হইবে।"

অন্যান্য জাপানী কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে যে, অপরাপর দুর্ব্বল প্রাচ্য জাতিব ন্যায় জাপানীরা এই অবিচার নীরবে সহ্য করিবে না। এই ব্যাপার লইয়া ভবিষ্যতের শান্তিব আকাশে ভীষণ অশান্তির কাল মেঘ সঞ্চিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

কানাড়া ও প্রাচ্য জাতি

ব্রিটিশ কোলম্বিয়াতে ৩৮,০০০চীনা,১০,০০০জাপনী,ও ২,৫০০ ভারতীয় লোক বাস করিতেছে। ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ দেশে বাস করিয়া অন্যান্য অধিবাসীদের ন্যায় সেখানকার সকল বিষয়ে সমান অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহারা মিতব্যয়ী পরিশ্রমী ও মিতাচারী বলিয়া সহজে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। কানাডার সমুদ্রতীরে মৎস্য ধরিবার ব্যবসায় প্রায় ইহাদেরই হাতে। বিগত যুদ্ধের পর Dominion গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর শ্বেতজাতীয় লোক ব্যতীত আর কাহাকেও ঐ মৎস্য ধরিবার অধিকার দেওয়া হইবে না।

যাহারা কানাডায় নূতন যায় তাহাদের বিরুদ্ধে যদি এইরূপ আইন হইত, তাহা হইলে আমাদের সে সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য ছিল না; কিন্তু যে সকল ভারতীয় অথবা

চীনা ও জাপানী সে দেশে পূর্ব্ব হইতেই বসবাস করিয়া এই সকল ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, হঠাৎ তাহাদের রুটী মারার ব্যবস্থা করা হৃদয়বানের কার্য্য নহে।

চীন ও কোরিয়ার প্রতি জাপানের ব্যবহার

বর্ত্তমান সন্ধির বৈঠকে বসিয়া জাপান পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ভাব গতিক দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং ইহাতে তাহার চোখ ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। চীনকে বিনষ্ট করিলে আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া যাইবে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া জাপান চীনের উপরে পূর্ব্বে যে রাষ্ট্রনৈতিক চাল চালিতেছিল, বোধ হয় তাহা বদলাইয়াছে। শানটঙ্ প্রদেশের কোনও কোনও অধিকার চীনের হস্তে ফিরাইয়া দিয়া জাপান তাহার সহিত আপোষে রফা করিয়াছে।

চীন দেশে জাপানী জিনিষ বয়কট্ করার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার ফলে জাপানী দ্রব্যের কাট্‌তি এত কমিয়াছে যে, জাপানী বণিক্‌গণকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হইয়াছে। গত বৎসর মে মাসে চীনে ৮লক্ষ ৬০ হাজার গজেরও বেশী জাপানী কাপড় বিক্রী হইয়াছিল। আর বয়কটের ফলে সেপ্টেম্বর মাসে ১ লক্ষ ৬০ হাজার গজের অধিক বিক্রী হয় নাই। বয়কটের পূর্ব্বে যেখানে সাড়ে তিন লক্ষ ছাতা বিক্রী হইয়াছে, বয়কটের ফলে সেখানে ৫ হাজারও বিক্রী হয় নাই। এই বয়কট্ জাপানের চৈতন্যোদয়ে অনেকটা সাহায্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোরিয়াতেও জাপান স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করিয়াছে। প্রতিবেশী জাতি-গুলির প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে জাপানের মনে এই ভাব জাগ্রত হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ দুইটী। প্রথমত, জাপান জানিতে পারিয়াছে, চীন ও কোরিয়াতে যে সকল বিদেশী খৃষ্টান আছে তাহারা এই সুযোগে চীনকে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। সহৃদয়তার দ্বারা চীন ও কোরিয়ার হৃদয় জয় করিতে না পারিলে ঐ সকল দেশে বিদেশীরা জাপানের বিরুদ্ধে ক্রমাগত

চক্রান্ত পাকাইবে। "এশিয়ান রিভ্যুয়্" স্পষ্ট বলিতেছে—

"The Foreigners in China & Korea are openly carrying on their pernicious propaganda and instigating the Koreans & Chinese against Japan."

জাপানের ভাব পরিবর্ত্তনের দ্বিতীয় কারণ, তাহার নিজের দেশে সোশিয়োলিষ্ট দলের ক্ষমতাবৃদ্ধি। টোকিও ও কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ওয়াসেডা ও কিইড প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রাইভেট কলেজের বহুসংখ্যক জ্ঞানবান্ পণ্ডিত সোশিয়োলিষ্টদল-ভুক্ত। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ নিটোরি এবং "জাপান্ ও জাপানিজ" নামক কাগজের প্রবীণ সম্পাদক ডাঃ মিয়াকি তাঁহা-দের প্রখর লেখনীর সাহায্যে জাপানে নবীন সম্প্রদায়কে সোশিয়োলিজমের মন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন। জাপানী সোশিয়োলিষ্টদের মধ্যে তিনটী দল রহিয়াছে। ইহাদের দ্বারা পরিচালিত উচ্চ অঙ্গের বহুসংখ্যক মাসিক ও দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় এই যুদ্ধের পর হইতে জাপানেও সোশিয়ালিষ্টদিগের দলবৃদ্ধি হইতেছে। তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদের দুরাকাঙ্ক্ষা কতক পরিমাণে মন্দীভূত হইতেছে।

নরওয়েতে মদের নির্ব্বাসন

মাদক-নিবারণের আন্দোলন এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নারীগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের পর হইতেই আন্দোলন আরো প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমেরিকার নারীগণ নিজেদের ভোটের জোরে সে দেশ হইতে মদ্যকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি নরওয়ে দেশের নারীগণও নিজেদের ভোটের জোরে, মদ্যপানের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করাইয়া দেশে মদ্যের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, পাশ্চাত্য অধিবাসিগণ জল ত্যাগ করিলেও মদ্য ত্যাগ করিতে পারিবে না, কিন্তু অসম্ভব ও সম্ভব হইয়াছে।

আর আমাদের দেশে ? অথবা থাকুক, এ কথায় কাজ কি !

আয়র্লণ্ড

আয়র্লণ্ডের লোকসংখ্যা ৪,৪০০,০০০। ১৮৫১ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি লক্ষ আইরিশ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ৮০ জন আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে উ ানিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করে। তাহাদের বংশধরগণ স্বদেশের কথা ভুলিতে পারে নাই। তাহারা আমেরিকায় একটি শক্তিশালী দল গঠন করিয়া দূর হইতে আয়র্লণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রভূত সাহায্য করিতেছে। ইহাদেরই চেষ্টায় আয়র্লণ্ডের ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকায় তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। Current Opinion-নামক কাগজে প্রকাশ যে, আমেরিকায় আইরিশ শিন্‌ফিন্‌ দলের প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত ব্যপৃত হইয়াছে, তাহা পবিমাণ করিবার জন্যই স্যার এড্‌ওয়ার্ড গ্রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। গ্রে সাহেব সেখানে শিন্‌-ফিন্‌ দলের নেতা ডি. ভেলেরার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। আমেরিকা-বাসীরা খুব সম্ভব তাঁহাকে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে যে, আগামী জুন মাসের মধ্যে আইরিশ্‌ ব্যাপারের একটা রফা না হইলে যুক্তরাজ্যের আগামী সভাপতি-নির্ব্বাচনের সময় উভয় দলের সভা-সমিতি হইতেই আইরিশ হোম-রুলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা হইবে। গ্রে সাহেব আমেরিকা হইতে যে প্রতিবেদন প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে আয়র্লণ্ডে অবিলম্বে সংস্কার প্রবর্ত্তন করার জন্য মন্ত্রি-সভার নিকট বি েষ অনুরোধ আছে। তাঁহার প্রতিবেদন পাঠে লর্ড কার্জ্জেনের মত লোকও আশু সংস্কারের" পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু কিরূপ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা লইয়াই গোল বাধিয়াছে। আয়র্লণ্ডের প্রধান দলই হইল

শিন্‌ফিন্‌দিগের। "শিন্‌ফিন্" কথাটার অর্থ "আমরা আলাদা"। নাম হইতেই তাহাদের ভাবটাও হৃদয়ঙ্গম হয়; অর্থাৎ তাহরা চাহে পূর্ণ স্বাধীনতা। এই দলকে জব্দ করিবার জন্যই বিগত যুদ্ধের সময় ইংরেজকে আয়র্লণ্ডে একলক্ষ সৈন্য রাখিতে হইয়াছিল। হত্যা, খুন, ও লুট, ইত্যাদি অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিয়া শিন্‌ফিন্‌রা ইংরাজ-শাসনে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে।

ইহা ব্যতীত সার হোরেশ্ প্লাঙ্কেটের মতাবলম্বী আরএকটি দল আছে। ইনি বিপ্লববাদী নহেন। আয়র্লণ্ডে অচিরে নিউজিল্যাণ্ডের ন্যায় ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করা তাঁহাব অভিপ্রায়। কিন্তু তিনি দেশচ্ছেদের অত্যন্ত বিরোধী। তিনি চাহেন, একই পার্লামেণ্টের অধীনে অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ আয়র্লণ্ড। আরর্লণ্ডের আইন-কানুন তাহার পার্লামেণ্টেই তৈয়ার হইবে; কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত তাহার যোগ ছিন্ন হইবে না।

এ ছাড়া উত্তর আয়র্লণ্ডের আলষ্টার নামক প্রদেশের অধিবাসগণের নেতা স্যার এড্‌ওয়ার্ড কার্শনের এক দল আছে। এই দলের সকলেই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ইংরেজবংশ-সম্ভূত। ইহারা ক্যাথলিক্ আইরিশদের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড পার্লামেণ্ট গড়িয়া তুলিতে নারাজ। তাহারা উত্তর বিভাগের জন্য আলাদা পার্লামেণ্ট চাহিতেছে। ইংরেজ-মন্ত্রিসভা বর্ত্তমানে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসার আয়র্লণ্ডে দুইটি পার্লামেণ্ট বসিবে। একটি আইরিশ্‌দের জন্য, আর একটি আয়র্লণ্ড-বাসী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ ইংরেজদিগের জন্য। তাহা হইলে আয়র্লণ্ডকে কার্য্যত দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে। অবশ্য লয়েড্ জর্জ্জ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই দুই মহাসভায় যোগরক্ষার জন্য একটা সম্মিলিত কাউন্সিল থাকিবে, এবং এতদ্ব্যতীত বৃটিশ পার্লামেণ্টে সংখ্যার অনুপাত অনুসারে উভয় প্রদেশেরই প্রতিনিধি থাকিবে। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে একটী গুরুতর গলদ রহিয়াছে। Atlantic পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, দুঃখের বিষয়, এই সংস্কারে আইরিশগণ তাহদের দেশের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়ে কোন অধিকার আপাতত লাভ করিবে না। বৃটিশ পার্লামেণ্টে এই সংস্কার কি আকারে গৃহীত হইবে তাহা এমন

বলা যায় না। কিন্তু কার্শন সাহেবের দল ব্যতীত অপর কোনও আইরিশ্ দল এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত নহে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

বৈচিত্র্য

প্রাচীনতার প্রতি মানুষের একটা বিশেষ আসক্তি আছে। জিনিসটায় কল্যাণ বা অকল্যাণ হইতেছে, ইহা ভাবিবার অবসরও হয় না। কিন্তু তাহা ভাল, এই জন্যই ভাল যে, তাহা প্রাচীন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, বস্তুত তাহা যদি খারাপও হয়, তথাপি মানুষে তাহা সহজে ছাড়িতে পারে না, কেননা তাহা যে, ঐরূপই চলিয়া আসিয়াছে, তাহা যে প্রাচীন। আবার এই ধারণাটা এত দূর বাড়িয়া যায় যে, বস্তুত তাহা প্রাচীন কি না, তাহা বুঝিয়া-শুনিয়া দেখিবারও আবশ্যকতা মনে আসে না। বহু স্থলে দেখা যায়, যাহা বস্তুত নবীন তাহাকেও অনেক সময়ে প্রাচীনের কোঠায় ফেলা হয়। তখন তাহাকে বলা হয় স না ত ন। সনাতন হইলেই তাহা নিত্য, আর নিত্য হইলেই তাহা অত্যাজ্য, ছাড়িতে পারা যায় না। প্রাচীনতার মোহে এইরূপ বহু অসত্য সত্যের স্থান অধিকার করে, এবং বহু অকল্যাণ কল্যাণ নামে চলিতে থাকে। প্রাচীনকে এতদূর আদর করিতে হইবে কেন ?

মানুষে বলে এটা ত বাপ-বড়দাদার আমল হইতে বরাবর চলিয়া আসিতেছে, ইহা কি ছাড়া যায় ? সে আরো বলে, এ কোথাকার কিম্ভূত কিমাকার নূতন উদ্ভট্টি কথা, ইহা কি শুনিবার যোগ্য ? কিন্তু সে ভাবে না যে, কোন্‌টায় মঙ্গল বা অমঙ্গল হয়। তার বাপ-বড়দাদারা পূর্ব্বে যে জন্য কোনো একটা কিছু কাজ করিয়াছিলেন, এখন তাহা ঠিক ঐরূপ করিবার কোনো কারণ আছে কি না, একথা তাহার মনেই আসে না। অথবা এখন যে নূতন কোনো একটা কথা হইতেছে, তাহা অনুসরণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে কি না, কিংবা ইহা অনুসরণ

না করিলে যে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রতীকার কি ; এ সব চিন্তা তাহার চিত্তে উদিত হয় না। নূতনকে সে স্বীকার করবে না, কেননা ইহা যে নূ ত ন ! নূতন ত আর সনাতন হয় না !

পূর্ব্বে যাহা যেরূপ ছিল, এখন তাহাকে সেইরূপই হইতে হইবে, ইহা হইতে পারে না। আবার, পূর্ব্বে ইহা এইরূপ ছিল না, এই বলিয়াই এখনো ইহা এইরূপ হইবে না, ইহাও হইতে পারে না। যদি বস্তুত মঙ্গল হয়, তাহা হইলে যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহাও বরণ করিয়া লইতে হইবে ; আর যাহা ছিল তাহাও বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রা চী ন প্রাচীন বলিয়াই গ্রাহ্য নহে, আর নূতনও নূ ত ন বলিয়াই ত্যাজ্য নহে।

* * *

নির্বিশেষে যদি কতকগুলি লোককে ঠিক একই রকমের কোনো কাজ করিতে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই সফলতা লাভ করিতে পারে না, পারিবার কথাও নহে। কারণ, মানুষগুলি দেখিতে এক রকম হইলেও তাহাদের যোগ্যতা এক রকমের নহে। যাহার যেমন যোগ্যতা, তাহাকে তদনুরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিলে, সেই কাজটিও হয়, আর যে তাহা করে সেও একটা সফলতা লাভ করে। সে যে একবারে অপদার্থ নহে, সেও যে, কোনো প্রকারে কল্যাণ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে, যদি এই ব্যক্তিকেই তাহার অযোগ্য বা অসাধ্য কোনো কার্য্যে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে যে, কেবল ঐ কার্য্যটাই অসম্পন্ন থাকে তাহা নহে, সেও অপদার্থ বলিয়া গণ্য হইয়া নিজের ন্যায় সমগ্র সমাজের বা দেশের জীবনকে দুঃখভারাক্রান্ত করে।

আমাদের দেশে এখন যে শিক্ষাপদ্ধতিচালান হইয়াছে তাহাতে গোড়ার দিকে এই কথাটাকে ভাল করিয়া ভাবা হয় নাই। সকলকেই এক জোয়ালে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তা তাহারা বহিতে পারুক আর না পারুক, তাহার কোনো ব্যবস্থা নাই। নীচের দিকে সমস্ত ছাত্রকেই চার-পাঁচটা বিষয় এক সঙ্গে পড়িবার জন্য

বাধ্য করা হয়। পরীক্ষার তাহাদিগকে ঐ সবগুলি বিষয়েই পাশ করিতে হইবে। আর যদি কেহ তাহা না পারে, তাহা হইলে কোনো-কোনো বিষয় অতিউৎকৃষ্টরূপ জানিলেও, ধরিয়া লওয়া হইবে, সে কি চু ই জানে না, সে অযোগ্য। যে বিষয় সে খুব ভাল জানে তাহাও আরো ভাল করিয়া পড়িবার জন্য তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তাহার নিকট চিরদিনের জন্য রুদ্ধ। সে ইংরাজীতে পাশ করিলে কি হইবে, গণিতে যে ফেল করিয়াছে, অতএব সে ইংরাজীতেও উচ্চতর শিক্ষা পাইবার যোগ্য নহে। এ যুক্তি বুদ্ধির অগম্য। এই পদ্ধতি অনুসরণ করায় দেশের কত ভাল ভাল মস্তিষ্ক ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং এখনো হইতেছে। ফেলকরা ছাত্রদের মধ্যে যাহারা যে বিষয়ে ভাল, সেই বিষয়েই তাহাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে প্রভূত উপকার হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, এ প্রণালী বিদেশের আমদানী। এ দেশেও শিক্ষার ব্যবস্থা বহু প্রাচীন কাল হইতেই ছিল, এবং মনে হয় তাহা নানা বিষয়ে খুব ভালই ছিল। ইহার একটা বিশেষত্ব ইহাই ছিল যে, ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করা হইত। একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, যে যতটা পারিত, এক সঙ্গেই হউক বা ভিন্ন-ভিন্ন সময়েই হউক, সে ততটাই পড়িত। তখন তাহাকে এমন কথা বলা হইত না যে, যেহেতু তুমি তাহা জান না সেই জন্য ইহাও জানিতে পাইবে না। অবশ্য যে সকল বিষয়ের পরস্পর অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যাহাতে একের অভাবে অন্যটি হইতে পারে না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

*
* *

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে পরীক্ষার বিধান একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার গুরুতর চাপে শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, অথবা ভাঙিয়াই গিয়াছে। বেচারীদের দেখিলে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু ইহার ফলে তাহারা কে কতটা কি লাভ করিতে পারে? ছাত্রদের অধিকাংশেরই পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর বা রুচিকর আহার ত জুটেই না, অনেক সময়ে অপর্য্যাপ্ত অতিকদর্য্য ও অখাদ্য আহার গ্রহণ করিতে হয়। শহরের ছাত্রদের অনেকের

ভাল বাসা থাকিলেও মফস্বলের অনেকেরই বাসা অতি জঘন্য। ইহার উপর গাদা-গাদা পুঁথী-পাঁজী পড়িয়া সপ্তাহে-সপ্তাহে পক্ষে-পক্ষে মাসে-মাসে ইত্যাদি ক্রমে সমস্ত বৎসর ধরিয়া ইস্কুলে কলেজে, আবার তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়া যে, কত কষ্ট তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এত করিয়াও কত জনে কতটা কি লাভ পায়? যোগ্যতা নির্দেশ করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য, এ উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না। যোগ্য বলিয়া যাহাদের গায়ে ছাপ লাগাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, দেখা গিয়াছে, অনেকে তাহাদের মধ্যে বস্তুত অযোগ্য; আবার যাহারা ঐ ছাপ পাইবার গৌরব পায় নি, তাহাদেরও মধ্যে অনেক যোগ্য থাকে। যোগ্যতা-অযোগ্যতা খাঁটিভাবে ঠিক হয় হাতে-কলমে কাজের দ্বারা। যাহার যোগ্যতা থাকে, সে শত শত অযোগ্যের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হইবেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষকে বলিয়া দিতে হয় না সে লোকটা যোগ্য কি না। অপর পক্ষে বস্তুত যে অযোগ্যকে যোগ্যের ছাপ দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে যোগ্যের আসনে দুইচার দিন আত্মগোপনে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পর আর পারে না। কে যোগ্য বা কে অযোগ্য ইহা বলিয়া দিবার ভার অন্যের উপর দিবার আবশ্যকতা নাই, ইহা সে ব্যক্তির নিজের কাজ, তাহাকেই ইহা নিজের কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। এজন্য তাহাকে মুহুর্মুহু পরীক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু সে পরীক্ষা অন্যের নিকট নহে, তাহা তাহার নিজেরই নিকট; অথবা যদি অন্যেরই নিকটে দিতে হয় তবে তাহা বিশ্বের নিকটে, কোনো মণ্ডলীবিশেষের নিকট নহে।

কল্পনা নহে, অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখিয়াছি, পাশের ছাপের দিকে একমাত্র লক্ষ্য থাকায় যাহা যেরূপ পড়া উচিত অধিকাংশ স্থলেই ছাত্র তাহা পড়ে না, আর অধ্যাপকও তাহা পড়ান না। অনেক স্থলে পাঠ্য পুস্তক শেষ ত হয়ই না, এমন কি বইখানা কেনাও হয় না, বা কিনিলেও পাতা কাটা হয় না, কিন্তু পাশের ছাপটা আটকায় না, তাহা পাওয়া যায়। আর তাহাতে ছাত্র ও অধ্যাপক

উভয়েই আনন্দ পান, কেননা সফলতা লাভ হইয়াছে। কিন্তু এ সফলতা যে, কিরূপ সফলতা, তাহা তাঁহাদের একজনো ত ভাবিলেনই না, যাঁরা এইরূপ পরথ করার কারবার খুলিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদেরও ইহা ভাবনার মধ্যে আসে না। আসিলেই বা করিবেন কি? যেখানে মূল ব্যাপারটাই ফাঁকিবাজী, সেখানে আইন-কানুনে কি করিতে পারে? কে কত আইন-কানুন করিবে? তাই পাশ করিলেও অনেককে পাশ-না-করা ছাত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেখা যায় না।

বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালী না থাকিলে কি চলে না? সেকালে যতদূর সম্ভব আমাদের দেশে শিক্ষার অতি-উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে এইরূপ উৎকট পরীক্ষাবিধি ছিল না। তথাপি কে যোগ্য কে অযোগ্য তাহা অজ্ঞাত থাকিত না, আর যোগ্যও অপুরস্কৃত হইয়া থাকিত না। বর্ত্তমানে আমেরিকাতেও কোনো-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। আমাদিগকেও এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে।

***

উপনিষদের মধ্যে এক জায়গায় আছে, প্রজাপতিকে একা-একা থাকিতে ভাল লাগে নি. তাই তিনি নিজেকে দুই ভাগ করিলেন, তাহা হইতে পতি ও পত্নী হইল। শ্রুতির আর এক জায়গায় আছে, পত্নী পতির অর্দ্ধেক। গৃহস্থ জীবনে স্ত্রীর সহিত পুরুষের সম্বন্ধ এই। একে অন্যকে লইয়াই পূর্ণতা লাভ করে, অন্যথা সে অসম্পূর্ণ বিকল, এবং সেই জন্যই গৃহস্থের কর্ত্তব্যপালনে অযোগ্য। গাড়ীর দুইটি চাকাই সমান ও সমান ভারবহনক্ষম হইলেই তাহা যথাযথরূপে গম্য স্থানে উপস্থিত পারে, অন্যথা নহে। শরীরের একখানি হাত পুষ্ট ও অপরখানি ক্ষীণ হইতে থাকিলে তাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, সে শরীরে কাজ চলে না। আমাদেরও স্ত্রী-পুরুষ দুইটি অঙ্গ, একটিমাত্র পূর্ণ হইলে তাহা দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। এটা একটা অতি মোটা কথা, এবং ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহাই যদি হয়, তবে বলা বাহুল্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, পুরুষের শিক্ষার আবশ্যকতা যেমন স্ত্রীলোকেরও শিক্ষার আবশ্যকতা ঠিক তেমনিই। তাই

সেদিন পুনা শহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে বালক ও বালিকাগণের শিক্ষাবিধি আলোচনায় যাহারা বালিকাগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া কেবল বালকগণেরই শিক্ষাকে অবশ্যবিধেয় (Compulsory) করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের যুক্তি অমরা অনুসরণ করিতে পারি নি।

*
* *

পাঞ্জাবে যে অমানুষিক অত্যাচার ঘটিয়াছে তাহার বিচার চলিতেছে। আমরা রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলিব না। আমরা শাসনকর্ত্তাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। ধর্ম্মনীতির দিক হইতে এই ব্যাপারের বিচার-কালে আমাদের স্বদেশীয়দের চরিত্র আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। যে ঘটনা কেবল-মাত্র দুঃখকর তাহার দ্বারা কাহারও অবমাননা হয় না। কিন্তু মানুষের প্রতি পশুর মত আচরণ করা সম্ভবপর হইলে সেই লজ্জা দুঃখকে ছাড়াইয়া উঠে। পাঞ্জাবের ব্যাপারে আমাদের পক্ষে সেই লজ্জার কারণ ঘটিয়াছে। ইহাই বুঝিতেছি যে আমাদের চরিত্রে এমন গভীরতর হীনতা ঘটিয়াছে যে আমাদের প্রতি শুদ্ধমাত্র দুঃখ প্রয়োগ করা নহে আমাদের মনুষ্যত্বের অসম্মান করা সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহা আমাদের নিজেরই আন্তরিক দুর্গতির লক্ষণ। "পীড়ন যতই কঠিন হউক সহিব কিন্তু আত্মাবমাননা কিছুতেই সহিব না" পাঞ্জাবে এইরূপ পৌরুষের বাণী শুনিবার আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন তাহা শুনিলাম না তখন সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগকেই ধিক্কার দিতে হইবে। এই কারণেই আমরা বলি কোনও চিহ্নের দ্বারা পাঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, কাপুরুষতা নৈব নৈবচ। নিরস্ত্র নিঃসহায়ের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষতা, সেই অত্যাচার দীনভাবে বহন করাও কাপুরুষতা, কেননা কর্ত্তব্যের গৌরবে বুক পাতিয়া অস্ত্র গ্রহণ করায়, মাথা তুলিয়া দুঃখ স্বীকার করায় পরাভব নাই। যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনও পক্ষেই বীর্য্যের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না সেখানে কোন্ কথাটা সমারোহপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া রাখিব?

আমাদের রাজপুরুষেরা কানপুরে ও কলিকাতায় দুষ্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদেরই অনুকরণ করিব? এই অনুকরণ চেষ্টাতেই কি আমাদের যথার্থ পরাভব নহে?

Printed & Published by—Jagadananda Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop.

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ
"শান্তিনিকেতন"
পত্রিকা বিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

সূচীপত্র

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা — জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। এক বৎসরের জন্য মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কমিশন দেওয়া হয়।

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে মাসের ২রা তারিখের মধ্যে জানান প্রয়োজন।

৩। মাসের ২রা তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন না দিলে সে মাসে বিজ্ঞাপন ছাপান সম্ভব হইবে না।

৪। বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রেরিত ব্লক হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে আমরা সেজন্য দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

১।	সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	মাসক	৮৲
	"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	৪।০
	"	সিকি পৃষ্ঠা	"	২॥০
	"	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"	১৸০
২।	কভারের	২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার ১ পৃষ্ঠা	মাসিক	১০৲
	"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	৫।০
	"	সিকি পৃষ্ঠা	"	৩৲
	"	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"	২৲
৩।	"	চতুর্থ বা শেষ পৃষ্ঠা ১ পৃষ্ঠা	"	১২৲
	"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	৬।০
	"	সিকি পৃষ্ঠা	"	৩॥০
	"	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"	২।০

কার্য্যাধ্যক্ষ,

"শান্তিনিকেতন,"

পত্রিকা বিভাগ

পোঃ শান্তিনিকেতন E. I. Ry. Loop

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল

বৌদ্ধদর্শন

আত্মতত্ত্ব

বৌদ্ধদর্শনের আত্মার কথা লইয়া অনেকের নিকট অনেক প্রকারের অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। আত্মা আছে কি না? থাকিলে তাহার স্বরূপ কি? মরণের পর জীবের কিছু থাকে কি না? থাকিলে তাহা কিরূপ? না থাকিলে কিরূপে পর জন্ম হয়? কে পর জন্মে কর্ম্মফল ভোগ করে? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন বেদপন্থী দার্শনিকগণের নিকট উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ-দর্শন অবলম্বন করিয়া অনেকে অনেক প্রকারের মত প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে স্থানে-স্থানে আরো বিষম জটিলতা উপস্থিত হইয়াছে। তাই আমরা আধুনিক কোনো লেখকের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া মূল শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। এই উদ্দেশ্যে আমরা মূল পালি বা সংস্কৃত বৌদ্ধ

শাস্ত্র হইতে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশসমূহ যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গের নিকট ক্রমশ উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহাতে কেবল লেখকের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেও তাঁহারা স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, স্থানবিশেষে বলা হইয়াছে আত্মা আছে, অন্যত্র বলা হইয়াছে আত্মা নাই, আবার অপর স্থানে বুঝা যায় আত্মা বা অনাত্মা কিছুই বলা হয় নি। নাগার্জ্জুনের মধ্যমকবৃত্তিতে (১৮.৬) ইহাই বলা হইয়াছে :—

"আত্মেত্যপি প্রজ্ঞপিতমনাত্মেত্যপি দেশিতম্।
বুদ্ধৈরাত্মা ন চানাত্মা কশ্চিদিত্যপি দর্শিতম্॥"

এইরূপ বিভিন্ন কথার বিভিন্ন-বিভিন্ন অভিপ্রায় আছে। যাঁহারা সমগ্র অংশটি না *দেখিয়া একদেশমাত্র দর্শন করেন, তাঁহারাই গোলমালে পড়েন, আর বুদ্ধের উপদেশপ্রণালীর ("দেশনাবিলাসের") সহিত পরিচয় না থাকাতেও অনেক গোল* হয়। আমরা ক্রমশ এই সমস্ত কথা আলোচনা করিব।

আজ আমরা মূল পালি সংযুত্তনিকায় (২২.৮৫ ; P.T.S, Vol III,pp. 109-115) হইতে সারিপুত্র ও ভিক্ষু যমকের সংবাদ বাঙ্‌লায় অনুবাদ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আত্মতত্ত্বনির্ণয়-সম্বন্ধে এই অংশটি অত্যন্ত উপাদেয়। পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিবেন, (১) মৃত্যুর পর জীবের উচ্ছেদ হয়, বিনাশ হয়, তাহার কিছুই থাকে না,—ভিক্ষু যমক ইহাই বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যে বস্তুত বুদ্ধের মত নহে, সারিপুত্র তাহা তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তিনিও নিজের সেই পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পর জীবের উচ্ছেদ হয়, বিনাশ হয়, তাহার কিছুই থাকে না, ইহা উচ্ছেদবাদ।[১] বুদ্ধদেব উচ্ছেদবাদী ছিলেন না। আবার ঠিক

১। "খীণাসবো ভিক্খু কায়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি, বিনস্সতি, ন হোতি পরং মরণা।"

এই জীবই মৃত্যুর পরে থাকে, ইহা শা শ্ব ত বা দ, ইহা উপনিষৎ অথবা বেদপন্থীর সম্মত, বুদ্ধদেব শা শ্ব ত বা দী ও ছিলেন না। তাঁহার বাদ হইতেছে অ নু চ্ছে দ - অ শা শ্ব ত। এ সমস্ত আমরা পরে সবিশেষ আলোচনা করিব।

এখানে (২) অপর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভিক্ষু যমক প্রথমত রূপ-প্রভৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরে যখন সারিপুত্র দেখাইয়া দিলেন, তখন বুঝিলেন যে, রূপ-প্রভৃতি অনিত্য, যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ, যাহা দুঃখ তাহাকে 'ইহা আমার', 'ইহা আমি', বা 'ইহা আমার আত্মা,—ইহা মনে করা চলে না; ইহা আত্মা নহে। আবার রূপাদিতেও জীব বা আত্মা নাই, আর রূপাদিহীনও আত্মা নহে। তবে আত্মা কি? এ প্রশ্নের উত্তর এখানে নাই।

নিম্নে যে অনুবাদ করা হইয়াছে তাহার কয়েকটি শব্দের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। পালি আ স ব, সংস্কৃত আ স্র ব শব্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চারিটিকে বুঝায়। কাম অর্থাৎ কাম্য বিষয়ে রাগ, ভব অর্থাৎ জন্ম বিষয়ে রাগ, দৃষ্টি অর্থাৎ নানাবিধ (৬২) অসৎ মতবাদ, এবং অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান,—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখধ্বংসের উপায়ের অজ্ঞান। যাহার এই চতুর্বিধ আসব বা আস্রব ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তিনি "খীণাসব" বা "ক্ষীণাস্রব"।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই কয়টিকে স্ক ন্ধ বলা হয়। স্কন্ধ শব্দের অর্থ রাশি, কতকগুলি বস্তুর একত্র সমষ্টি। আমাদের দেহে বা দেহের বাহিরে যাহা কিছু জ্ঞানগোচর হইতে পারে, সেই সমস্তকে বৌদ্ধদর্শনে রূপ-প্রভৃতি এই পাঁচটি স্কন্ধ, রাশি, সমূহ, সমষ্টি বা বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। শীত-উষ্ণ বা অন্যান্য কারণে যাহা কিছু বিকার প্রাপ্ত হয় তৎসমস্তই রূ প, যেমন পৃথিবী জল, বায়ু, ইত্যাদি। শরীরের (বা অন্য কোনো পদার্থের) ভিতরে-বাহিরে স্থূল-সূক্ষ্ম যাহা-কিছু এইজাতীয় পদার্থ রহিয়াছে, তাহার নাম রূপ, এবং এই সমস্ত রূপকে একত্র করিয়া বলা হয় রূ প স্ক ন্ধ।

রূপ ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, এক কথায় তাহাকে না ম বলা হয়।[২] ইহাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, চি ত্ত ও চৈ ত সি ক। চি ত্ত ও চৈ ত সি ক শব্দকে আমরা ম ন ও মা ন সি ক শব্দে ব্যাখ্যা করিতে পারি। ইহাদের মধ্যে চিত্তের নাম হইতেছে বি জ্ঞা ন। ভাল-মন্দ নানাস্থানে নানাপ্রকারে নানাপ্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়, যেমন কাম্য বিষয়ে উৎপন্ন চিত্ত কামচিত্ত, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোনো চিত্ত ভাল (কুশল), কোনো চিত্ত মন্দ (অকুশল), আবার কোনো চিত্ত ভালও না, মন্দও না (অব্যাকৃত), ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভেদ আছে (মোট ৮৯, প্রকারান্তরে ১২১)। এইরূপে যত প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে, তৎ-সমুদয়কে একত্র করিয়া বলা হয় চি ত্ত স্ক ন্ধ, সাধারণ পারিভাষিক শব্দে বি জ্ঞা ন স্ক ন্ধ।

এক-একটি চিত্ত উৎপন্ন হইলে তাহা কেবল নিজেই উৎপন্ন হয় না, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার নানা অবস্থাও উৎপন্ন হইয়া থাকে; চিত্তের সঙ্গে-সঙ্গেই বিতর্ক, বিচার, একাগ্রতা, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, সন্দেহ, শ্রদ্ধা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, আবার চিত্তের নিরোধ হইলে ইহারাও সঙ্গে-সঙ্গে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। চে ত স্-এ অর্থাৎ চিত্তে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদিগকে চৈ ত সি ক বলা হইয়া থাকে। যত প্রকার (প্রধানত মোট ৫২টি)-চৈ ত সি ক আছে, তাহা-দিগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, (১) বে দ না, (২) সং জ্ঞা, ও (৩) সং স্কা র।

চিত্ত উৎপন্ন হইলেই সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের হয় সুখ, না হয় দুঃখ, অথবা না-দুঃখ-না-সুখ এইরূপ একটা বেদনা বা অনুভব হইয়া থাকে। এই যে সুখাদির বেদন-মাত্র, অনুভব মাত্র ইহাই বেদনা। বস্তুত পূর্ব্বোক্তরূপে এক হইলেও এই বেদনার অবান্তর নানা ভেদ আছে। এই সমস্ত ভেদকে একত্র করিয়া বলা হয় বে দ না স্ক ন্ধ।

কোনো বিষয়ে চিত্ত উৎপন্ন হইলেই সেই বিষয়টি নীল-পীত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্থূল-

২। উপনিষদে না ম রূ পে র যে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সূক্ষ্ম ইত্যাদি যেরূপই হউক তাহার উপস্থিত আকারকে জানা যায়, এই যে এইরূপে বিষয়টিকে জানা-মাত্র ইহার নাম সং জ্ঞা। স্বরূপত এক হইলেও ইহারও অবান্তর নানা ভেদ আছে। এই সমস্ত ভেদকে একত্র করিয়া বলা হয় সং জ্ঞা স্ক ন্ধ।

বে দ না ও সং জ্ঞা কে ছাড়িয়া দিয়া আর যত কিছু চৈতসিক ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্তকে একত্র করিয়া বলা হয় সং স্কা র স্ক ন্ধ।

পুনরুক্তি-নিবারণের জন্ত নিম্নের অনুবাদকে কয়েক স্থানে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে, কিন্তু মূল বিষয় কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই।

যমক-সারিপুত্র-সংবাদ

এক সময়ে মাননীয় সারিপুত্র শ্রাবস্তির জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বিহরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে যমক-নামে এক ভিক্ষুর এইরূপ পাপ মত উৎপন্ন হইয়াছিল, তিনি বলিতেন, 'ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম ত আমি এইরূপ জানি যে, দেহ নষ্ট হইলে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পর থাকে না।'

যমকের এই পাপ মতের কথা বহু ভিক্ষু শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা মাননীয় যমকের নিকট উপস্থিত হইয়া যথোচিত সাদর-সম্ভাষণাদির পর এক দিকে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—" হে বন্ধু, আপনার কি সত্যই এইরূপ পাপ মত উৎপন্ন হইয়াছে? আপনি নাকি বলিতেছেন যে, 'ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম ত আমি এইরূপই জানি যে, দেহ নষ্ট হইলে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পরে থাকে না'?"

"হাঁ বন্ধুগণ; আমি ত ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম এইরূপ জানি যে, দেহ নষ্ট হইলে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পর থাকে না।"

" হে বন্ধু, আপনি এইরূপ বলিবেন না, ভগবানকে মিথ্যা দোষ দিবেন না;

ভগবান্‌কে মিথ্যা দোষ দেওয়া ভাল নয়। ভগবান্ এরূপ বলিতে পারেন না যে, 'দেহ নষ্ট হইলে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পর থাকে না'।"

ভিক্ষুগণ এইরূপ বলিলেও তিনি তাহাতেই বলপূর্ব্বক অভিনিবিষ্ট হইয়া (তদনুরূপ) আচরণ করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন 'আমি ত ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম এইরূপ জানি যে, দেহ নষ্ট হইলে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়; বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পর থাকে না।'

ভিক্ষুগণ যখন মাননীয় যমককে এই পাপ মত ছাড়াইতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা আসন হইতে উত্থিত হইয়া মাননীয় সারিপুত্রের নিকট গমন করিলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন 'আপনি অনুগ্রহ করিয়া ভিক্ষু যমকের নিকট চলুন।'

মাননীয় সারিপুত্র মৌনাবলম্বনে তাহা স্বীকার করিয়া সায়ংকালে ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া ভিক্ষু যমকের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার সহিত আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া মাননীয় যমককে বলিলেন "বন্ধু, সত্যই কি আপনার এইরূপ পাপ মত উৎপন্ন হইয়াছে? আপনি কি বলিতেছেন "ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম ত আমি এইরূপই জানি যে, দেহ নষ্ট হইলে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রপ্ত হয়; মরণের পর থাকে না'?"

"হাঁ বন্ধু; আমি ত ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম এইরূপ জানি।"

"আচ্ছা, বন্ধু যমক, আপনি কি মনে করেন? রূপ নিত্য কি অনিত্য?"

"অনিত্য বন্ধু।"

"বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান,—ইহারা নিত্য কি অনিত্য?"

"অনিত্য।"

"যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ না সুখ?"

"দুঃখ।"

"যাহা অনিত্য দুঃখ, যাহা ভিন্ন-ভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কি এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত যে, 'ইহা আমার', 'ইহা আমি,' 'ইহা আমার আত্মা?'

"নিশ্চয় ইহা নয় বন্ধু।"

"তাহা হইলে, বন্ধু যমক, যে-কোনো রূপ, যে-কোনো সংজ্ঞা, যে-কোনো সংস্কার, ও যে-কোনো বিজ্ঞান, যাহা অতীত, অনাগত, বা বর্ত্তমান ; যাহা আধ্যাত্মিক (শরীরস্থিত) বা বহিঃস্থিত ; যাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম ; যাহা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ; যাহা দূরে বা নিকটে ; সেই সমস্তকেই এইরূপ যথাযথ ভাবে দেখা যুক্তিযুক্ত যে, 'ইহা আমার নয়,' 'আমি ইহা নই,' 'ইহা আমার আত্মা নহে।'

"হে বন্ধু যমক, এইরূপ দেখিয়া শ্রুতবান্ আর্য্য শ্রাবক রূপে, বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে ও বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া বিরাগ অনুভব করে, বিরাগের দ্বারা বিমুক্ত হয়, এবং বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত' এই জ্ঞান তাহার উৎপন্ন হয়। তখন সে জানে জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, ব্রহ্মচর্য্যবাস সম্পন্ন হইল, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইল, আর কিছু ইহার (ইহলোকের) জন্য নাই।'

"বন্ধু যমক, আপনি কি মনে করেন? রূপ জীব,[৩] ইহাই কি আপনি দেখিতেছেন?"

"নিশ্চয়ই ইহা নহে বন্ধু।"

"বেদনা···, সংজ্ঞা···, সংস্কার···, ও বিজ্ঞান জীব, ইহাই কি আপনি মনে করিতেছেন?"

"নিশ্চয়ই ইহা নহে বন্ধু।"

"তাহা হইলে বন্ধু যমক, আপনি কি মনে করেন? রূপে জীব আছে, ইহাই কি আপনি দেখিতেছেন?"

"না বন্ধু।"

"রূপ হইতে অন্যত্র জীব, ইহাই কি আপনি দেখিতেছেন?"

"ইহা নহে বন্ধু।"

"বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে, বা বিজ্ঞানে জীব ইহাই কি আপনি মনে করেন?"

৩। মূল "তথাগত," কিন্তু এতাদৃশ স্থলে ইহার অর্থ জীব।

"নিশ্চয়ই ইহা নহে বন্ধু।"

"বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বা বিজ্ঞান হইতে অন্যত্র জীব, ইহাই কি আপনি মনে করেন?"

"বন্ধু, ইহা নহে।"

"তাহা হইলে, বন্ধু যমক, আপনি কি মনে করেন? আপনি কি ইহাই দেখিতেছেন যে, এই সেই রূপহীন, সংজ্ঞাহীন, বেদনাহীন, সংস্কারহীন ও বিজ্ঞান-হীনই জীব?

"নিশ্চয়ই ইহা নহে বন্ধু।"

"বন্ধু যমক, এই জন্যেই ত আপনি যখন সত্যরূপে তথ্যরূপে জীবকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তখন ইহা কি প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত যে, 'আমি ত ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম এইরূপ জানি যে, দেহ নষ্ট হইলে, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পর থাকে না'?"

"বন্ধু সারিপুত্র, আমি পূর্ব্বে অজ্ঞ ছিলাম, আমার সেই পাপ মত উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু এখন মাননীয় সারিপুত্রের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই পাপ মত বিনষ্ট হইল, ধর্ম্ম আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে!"

"বন্ধু যমক, লোকেরা যদি আপনাকে প্রশ্ন করে যে, 'যে ভিক্ষু অর্হৎ হইয়াছেন, যাঁহার সমস্ত আস্রব ক্ষীণ হইয়াছে, শরীর নষ্ট হইলে তিনি কি হন?'—তাহা হইলে আপনি কি উত্তর প্রদান করিবেন?"

"বন্ধু, আমি এই উত্তর প্রদান করিব—'রূপ অনিত্য, যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ, যাহা দুঃখ তাহা নিরুদ্ধ হয়, অস্তমিত হয়। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান অনিত্য, যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ, যাহা দুঃখ তাহা নিরুদ্ধ হয়, অস্তমিত হয়।' আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি এইরূপই উত্তর দিব।"

"সাধু, সাধু বন্ধু যমক! এই বিষয়টিরই আরো অধিকতর জ্ঞানের জন্য আমি উপমা প্রদান করিব:—

"যেমন, (মনে করুন), এক সমৃদ্ধ মহাধনশালী ও মহাভোগসম্পন্ন গৃহপতি

বা গৃহপতিপুত্র আছেন, এবং তিনি নিজের উপযুক্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এখন যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার অনর্থ, অহিত ও অকল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার মনে এইরূপ হয় যে, 'সমৃদ্ধ মহা-ধনশালী মহাভোগসম্পন্ন সুরক্ষিত গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে বলপূর্ব্বক বধ করা সহজ নহে, অতএব আমি ইঁহাকে অনুসরণ করিয়া বধ করিব।' সে এই ভাবিয়া ঐ গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রের নিকট এই বলিয়া উপস্থিত হয় যে, 'মহাশয়, আমি আপনার পরিচর্য্যা করিব।' তিনি ইহা শুনিয়া তাহাকে নিযুক্ত করেন। সে পরিচর্য্যা করে; সে প্রভুর পরে শাসন করে, কিন্তু উঠে তাঁহার পূর্ব্বে; (ডাকিলেই) কি করিতে হইবে বলিয়া উত্তর দেয়, সুন্দর ব্যবহার করে, আর প্রিয় কথা বলে। সেই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র তাহাকে মিত্রভাবে বা সুহৃদ্‌ভাবে গ্রহণ করেন, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। যখন এই ব্যক্তির মনে হয় যে, 'এই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র আমার উপর অতি বিশ্বাসী,' তখন সে তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে আছেন জানিতে পারিয়া তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রাণবিয়োগ করে।

"বন্ধু যমক, আপনি কি মনে করেন?—যখন সেই ব্যক্তি ঐ গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, 'মহাশয়, আমি আপনার সেবা করিব,' তখনো সে হত্যাকারীই, কিন্তু হত্যাকারী হইলেও তিনি তাহাকে 'এ আমার হত্যাকারী' এই বলিয়া জানেন নি। আবার যখন সে তাঁহার সেবা করে, পরে শুইয়া পূর্ব্বে উঠে, কি করিতে হইবে বলিয়া উত্তর প্রদান করে, সুন্দর ব্যবহার করে, প্রিয় কথা বলে, তখনো সে হত্যাকারীই, কিন্তু হত্যাকারী হইলেও তিনি তাহাকে 'এ আমার হত্যাকারী' এই বলিয়া জানেন নি। আবার যখন সে তাঁহাকে নির্জ্জন-স্থিত জানিয়া তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রাণবিয়োগ করে, তখনো সে হত্যাকারীই, কিন্তু হত্যাকারী হইলেও তিনি তাহাকে 'এ আমার হত্যাকারী' এই বলিয়া জানেন নি।"

"হাঁ বন্ধু; এইরূপই।"

"এইরূপই হে বন্ধু, অশ্রুতবান্ প্রাকৃত ব্যক্তি, যে আর্য্যগণকে দেখে নাই, যে আর্য্যধর্ম্মে অপণ্ডিত ও আর্য্যধর্ম্মে অশিক্ষিত; যে সৎপুরুষগণকে দেখে নাই, যে সৎপুরুষগণের ধর্ম্মে অপণ্ডিত ও অশিক্ষিত, সে রূপকে (বেদনাকে, সংজ্ঞাকে, সংস্কারকে, ও বিজ্ঞানকে) আত্মা বলিয়া দেখে; আত্মাকে রূপবান্ (বেদনাবান্ ইত্যাদি) বলিয়া দেখে; কিংবা আত্মাতে রূপ (বা বেদনাদি), অথবা রূপে (বা বেদনাদিতে) আত্মাকে দেখে।

"রূপপ্রভৃতি (রূপ,বেদনা,সংজ্ঞা,সংস্কার,ও বিজ্ঞান) অনিত্য, রূপপ্রভৃতি অনিত্য, সে ইহা যথাযথভাবে জানে না। রূপপ্রভৃতি দুঃখ, রূপপ্রভৃতি দুঃখ; রূপপ্রভৃতি অনাত্মা, রূপপ্রভৃতি অনাত্মা; রূপপ্রভৃতি সংস্কৃত (অর্থাৎ কৃত্রিম) রূপপ্রভৃতি সংস্কৃত; সে ইহা যথা-যথভাবে জানে না। সে ইহাও যথাযথভাবে জানে না যে, রূপপ্রভৃতি হত্যাকারী রূপ প্রভৃতি হত্যাকারী।

"সে রূপপ্রভৃতির নিকটে যায়, তাহাদিগকে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করে। এইরূপে (রূপ-প্রভৃতি) পাঁচটি উপাদান-স্কন্ধ আসক্তিতে গৃহীত হইয়া তাহার চিরকাল অহিতের জন্য দুঃখের জন্য হইয়া থাকে।

অপর পক্ষে শ্রুতবান্ আর্য্য শ্রাবক···রূপপ্রভৃতিকে ঐরূপ আত্মা বলিয়া মনে করেন না। এবং উপাদানস্কন্ধ সমূহ আসক্তিতে গৃহীত না হওয়ায় তাহারা তাহার চিরকাল হিতের জন্য সুখের জন্য হইয়া থাকে।"

"বন্ধু সারিপুত্র, তাহারা এইরূপই হইয়া থাকে যাহাদের আপনার ন্যায় সব্রহ্ম-চারী, দয়ালু ও হিতৈষী উপদেশক ও অনুশাসক থাকেন। আর আমারও মাননীয় সারিপুত্রের ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া আসক্তির পরিত্যাগে আস্রবসমূহ হইতে চিত্ত বিমুক্ত হইল!"

মাননীয় সারিপুত্র এই বলিয়াছিলেন, এবং মাননীয় যমক আনন্দিত হইয়া তাঁহার উক্তিকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

শিল্পে সাময়িক প্রভাব

সব দেশে দেখা যায় যে কবিরা কখন কখন তাঁদের দেশের সাময়িক জীবনের চিত্র এঁকে থাকেন, কিন্তু চিত্রকর বা ভাস্কর তাঁর সমকালের জীবনের সঠিক চিত্র প্রায়ই আঁকেন না। বিশ্ববিধাতার সৃষ্টিতে সবই সুন্দর! মানুষের জীবনকেও তিনি সুন্দর করেই গড়েচেন। কিন্তু কালের গতিকে মানুষ ক্রমশ সভ্যতার আলোক পেয়ে তাদের জীবনকে নানা উপায়ে অস্বাভাবিক করে-তুলেচে। গাছপালা পশুপক্ষীর মত প্রকৃতির বক্ষে নগ্ন অবস্থায় বিরাজ করাই আদিম কালের মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। তার পর ক্রমশ পাতাপরা পালক-গোঁজা থেকে সুরু করে মানুষ আধুনিক কালে বিচিত্র বেশভূষায় নগ্নতাকে ঢেকে ফেলেচে। সেই আদিমকালের পালক-গোঁজার প্রথা ইউরোপীয় মহিলাদের টুপিতে এবং আমাদের দেশের আধুনিক রাজাদের বহুমূল্য শিরোপায় বর্ত্তমান। শিল্পীরা চান তাঁদের শিল্পকলায় রূপরেখার সাহায্যে চিরন্তন ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে। তাই দেখি যে আধুনিক জীবনের ছবি আঁকতে গেলে তাতে অস্বাভাবিক বা অস্থায়ী অর্থাৎ যেগুলি চিরন্তন নয় এরূপ বেশভূষা, আসবাবপত্রের স্থূলতা দ্বারা শিল্পকলাকে তাঁরা কলঙ্কিত করতে চান না। পোষাক পরিচ্ছদ বস্তুত মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যকে বাড়াবার জন্যেই বিশেষভাবে প্রয়োজন; যে পরিচ্ছদে যত শারীরিক গঠনসৌষ্ঠব ফোটানো যায় শিল্পীরা বেছে বেছে সেইরূপ পরিচ্ছদই শিল্পকলায় স্থান দেন। ইউরোপের ও ভারতের প্রাচীন চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এর যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় ভাবপ্রধান চিত্রে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা তাই হাল-ফ্যাসানের

কোট-প্যাণ্টের ইস্ত্রীকরা ছাঁটের কাপড়পরা নব্যজীবনের চিত্র না এঁকে প্রাচীন রোমীয় টোগা পরিহিত বা একেবারে নগ্ন মূর্ত্তিই গড়ে থাকেন। তার কারণ এ নয় যে তাঁরা আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত নন বা পরিচয় ঘটাতে চান না। তার কারণ হচ্চে যে আধুনিক অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার ভাব দেখাতে গেলে ছবিতে চিরন্তন ভাব দেখানো যেতে পারে না। ব্যালজ্যাকের প্রতিমূর্ত্তি যখন রোঁদা গড়েছিলেন, তখন তিনি ব্যালজ্যাক্‌কে dressing gownএর মত একটা কাপড়ের ভাঁজে জড়িয়ে কোটপ্যাণ্টের কদর্য্যতাকে ঢেকে মূর্ত্তিটিকে গড়েছিলেন এবং ভিক্টর হুগোর প্রতিমূর্ত্তি গড়বার সময়েও তিনি তাতে মানুষের আদিম নগ্নভাবই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রোঁদা ছাড়া পশ্চাত্য দেশের সবস্থানেই ভাস্করেরা যে সব নগ্নমূর্ত্তি গড়ে থাকেন তা হয়ত অনেকেই দেখেচেন। সাময়িক পরিচ্ছদের অস্থায়িত্ব বুঝে এবং তাতে দৈহিক গঠনসৌষ্ঠব দেখানো যায় না বলেই তাঁরা এরূপ নগ্নমূর্ত্তি দিয়ে সেগুলিকে চিরন্তন করেই গড়েচেন।

চিত্রকরেরা বেশীর ভাগ নৈসর্গিক ছবি এঁকে থাকেন। কেন না তাঁরা জানেন যে মানুষের জীবনের চেয়ে এগুলি একই ভাবে আবহমান কাল থেকে রয়ে গেছে। আদিম কালের পাহাড় আর এখনকার কালের পাহাড়, আদিম কালের গাছ আর এখনকার কালের গাছ, আদিম কালের নদী আর এখনকার নদী, আদিম কালের বসন্তশ্রী আর এখনকার বসন্তের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা চিরন্তন ধারা রয়েচে, তার কোনই তারতম্য হয়নি।

ইউরোপীয় শিল্পীরা যেমন আধুনিক কালের মনুষ্যজীবনের সঠিক ছবি আঁকা যেতে পারে না বুঝেচেন, আমদের দেশের শিল্পীরাও যদি ঠিক তাই বুঝে থাকেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আমাদের দেশের আধুনিক সভ্যজীবনের চিত্র আঁকতে গেলে ছবিগুলো এত বেশী উদ্ভট রকমের হয়ে পড়ে যে তাকে ব্যঙ্গচিত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আধুনিক কালের বিবাহে টোপর ও বেনারসী ধুতিচাদরের পরিবর্ত্তে যাত্রার দলের জরিজরোয়ার কিম্ভূতকিমাকার "বরের

পোষাক ভাড়া" করে পরার রেওয়াজ হয়েছে। এসেটিলিন গ্যাস জালিয়ে কেবল সহরে কেন ঘোরতর প্রাচীন হিন্দুপল্লীতেও মোটরগাড়ীতে বর শুভযাত্রা করচেন। সব দেশে সভাসমিতিতেই মানুষের ভদ্রবেশের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আমি একবার টাউনহলে সাহিত্যসম্মিলন দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকদের যেরূপ কাপড় চোপোড় পরার বিকট বৈচিত্র্য দেখেছিলুম, সেরূপ কদর্য্য ব্যাপার পৃথিবীর কোন সভ্য জগতে সম্ভব হতে পারে না। কেউ বুকখোলা বিলাতি ছাঁটের কোটের নীচে ইস্ত্রী করা শার্টের ল্যাজ ঝুলিয়ে কস্তা পেড়ে কাপড় কুঁচিয়ে পরেচেন, কেউ বা শামলার মত একপ্রকার অদ্ভুত ধরণের পাগড়ী আর ঘাগরার মত করে কোমরের কাছ থেকে কোঁচকানো লম্বা কোট পরে এসেচেন (শুনলুম তিনি নাকি কোন বেদান্তবাগীশ পণ্ডিত), কেউ বা ইংরাজদের ভিতরে পরবার কামিজ পোষাকী হিসাবে পরে তাতে চাদর ঝুলিয়ে বিলাতি পাম্প্‌শু পরে বেড়াচ্চেন। আমাদের দেশের শিল্পীরা কি এই সব বেশেরই ছবি আঁকবেন? হালফ্যাসানের মেয়েদের জ্যাকেট সেমিজের বাহারও কোনকালে কোন চিত্রকরের কাছেই চিত্রের বিষয় হতে পারে না।

যদি কোন চিত্রকর আধুনিক কালের বাঙলার সভ্যতার সঠিক চিত্র আঁকতে যান তাহলে যে কি বিভ্রাট হয়, একবার ভেবে দেখুন। যে সব বিলাতি ফ্যাসানের টেবিল চেয়ার আসবাবপত্র কুৎসিৎ বলে লোকে বর্জ্জন করেচে, আমাদের দেশের সভ্যসমাজের ঘরে ঘরে সেগুলি বিরাজ করচে। বীণার জায়গায় হারমোনিয়াম, গায়কের স্থানে গ্রামোফোন আসর জমকে বসে আছে। এ সব ছাড়া বিলাতী ফ্যাসানে চুল ছাঁটা, চশমা চোখে দেওয়া, চুরুট মুখে রাখা, বিলাতি ধরণের বাড়ীতে বাস করা প্রভৃতি অনেক ফ্যাসান আছে। এগুলির কোনটাও বাঙলাদেশের চিরন্তন ভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। অতএব এইগুলিতেই কি শিল্পীরা চিরত্বের ছাপ দেবেন? এবং শিল্পীরা কি এইগুলিকেই পাকা করে

ভবিষ্যতের জন্যে শিল্পকলায় গেঁথে রেখে যাবেন ? এইজন্যেই আধুনিক হলেও আমাদের দেশের আধুনিক যুগের চিত্রকরেরা এগুলিকে চিত্রে স্থানে দিতে পারেন না ; তাই কাল্পনিক জগতে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়।

অবশ্য আধুনিক জীবনের চিত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বঙ্গদেশের থিয়েটারের ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে, প্রবন্ধলেখক "বিধবা বধূ ও সধবা শাশুড়ী" "বিষয়াসক্ত" "রুগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন" প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রে, গগনেন্দ্রনাথের "বিরূপ বজ্র" ও "অদ্ভুত লোক" নামক দুটি ব্যঙ্গচিত্রের পুস্তকে এবং যতীন্দ্র, চঞ্চল, বীরেশ্বর প্রভৃতি নবীন শিল্পীদের আঁকা মাসিকপত্রিকাদির ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে বেশ ফোটানো হয়েচে। কিন্তু চিত্রকলার জগতে এগুলির স্থান কতটুকু ?

আধুনিক সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি শিক্ষিত সভ্যসমাজ, অপরটি অশিক্ষিত পল্লীসমাজ। এই পল্লীসমাজই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও চিরন্তনভাবে বর্ত্তমান। আধুনিক কালে এই সমাজে আবহমানকাল থেকে যে সব আচার পূজাপদ্ধতি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ একভাবে চলে আসচে তার সম্বন্ধেই ছবি (ডাবা হুঁকোটা বাদে) আঁকা যেতে পারে। সেখানেই চিত্রটি ঠিক্ আমাদের সাময়িক ছবি না হ'য়ে চিরন্তন হয়েই ফুটে ওঠে।

আমাদের বাঙলাদেশের চিত্রকরেরা সেইজন্যেই প্রথমত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চিত্র এঁকেচেন। তার পরে আধুনিক কালের ছবি এঁকেচেন —কিন্তু সেগুলি আধুনিক কালের সভ্যসমাজের ছবি একেবারেই নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অবনীন্দ্রনাথের "ভারতমাতা" "শেষ বোঝা" "কলঙ্কের বোঝা", নন্দলাল বসুর "জগাই মাধাই" "কুমারী পূজা" "গোকুল ব্রত" "পৌষপার্ব্বন", লেখকের "প্রণাম" "সান্ত্বনা" "নতুন আলো" "নুপুর", সুরেন্দ্রনাথ করের "বৈধব্য" "সাথী", "পথের ধারে", গগনেন্দ্রনাথের পল্লীদৃশ্যাবলী ও "মন্দির দ্বারে প্রতীক্ষা" "বর্ষায় চিৎপুর রোড" প্রভৃতি আরো অনেক ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছবির প্রকাশ তার বাইরের আকার থেকে। তাই তাকে প্রথমে চোখে

দেখতে হয়, তারপর তার ভাব মনের ভিতর সায় দেয়। কিন্তু কাব্যে কবির ভাব চোখ দিয়ে ধরা যায় না। সেটা পাঠের বা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়ভাবে একটা চিত্র এঁকে দিয়ে থাকে। পাঠক সে চিত্রের সঠিক কোন মূর্ত্তি দিতে পারেন না। এইজন্যেই ছবিতে যে সব বস্তু চোখে পড়বা মাত্রই মনকে পীড়া দেয় এমন জিনিষও কবির বর্ণনাতে পাঠকের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব এনে দিতে পারে। "চন্দ্রবদন" কথাটি কবির মুখে শুনলে একটি সুন্দর অবর্ণনীয় মুখশ্রীর কথাই আমাদের মনে আনে। কিন্তু ঠিক্ এই চন্দ্রবদন বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ চাঁদের মত করে মুখ এঁকে কোন শিল্পী যশস্বী হতে পারেন না। "যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল ভরই"—এ ছত্রে কবি প্রেমিকের যে নীলস্নিগ্ধ চাউনির ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা তিনি কবি বলেই দিতে পেরেছেন। ছবিতে চোখটাকে নীলোৎপলের নীল রঙ দিয়ে পদ্মাকারে গড়লে কখনই এই ভাবটি ফুটতো না। তখন নীল পদ্মাকারে আঁকা চোখটা "সোনার পাথর বাটির মত" অসম্ভবই ঠেকতো। বাক্যের একটি ইঙ্গিতে কবি যে ভাবটি ফোটাতে পারেন, রেখার টানেতে তা ঠিক সেই ভাবেই যে ফুটে উঠ্‌বে এরূপ ভাবা ভুল। কোন কবিকে যদি বর্ণনা দ্বারা কোনো ছবি সঠিক ভাবে চোখে ধরে দিতে বলা হয়, তা হলে ভাষায় ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে তিনি যেমন অসুবিধায় পড়বেন, কোন চিত্রকরকে যদি "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ" ঠিক এই কথাগুলির ভাবটিকে চিত্রের মধ্যে দেখাতে আদেশ করা হয়, তা হলে তিনিও সেই রকম অসুবিধায় পড়বেন। আবার একজন চিত্রকর ইচ্ছাক্রমে কোন নৈসর্গিক চিত্রে আকাশটাকে সবুজ এবং তৃণলতাকে প্রয়োজন মত কালো আঁকতেও পারেন, কিন্তু কবিকে সেই নৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনার দ্বারা দেখাতে বল্‌লে আকাশটাকে আকাশের রঙে ঘাসটাকে ঘাসের বর্ণে না বর্ণনা করলে চলবে না।

যখন কোন কবি আধুনিক কালের মাতৃত্বের ছবি কাব্যে ফলিয়ে তোলেন, তখন তিনি মায়েরা জ্যাকেট বা সেমিজ পরে আছেন কিনা বর্ণনা না

করেও আধুনিক যুগের সভ্য-মাতার চিত্র ফলাতে পারেন। কিন্তু এখনকার কালের সভ্য-মায়ের চিত্র আঁকতে গেলে চিত্রকরদের ছবিতে হাল ফ্যাসানের জ্যাকেট বা লেশপেড়ে সাড়ী না আঁকলে চলে না। মায়ের চিত্র মায়ের অবয়ব না এঁকে ছবিতে দেখাতে পারা যায় না। কাজেই আধুনিক সভ্য সমাজের জ্যাকেট-পরা মা না এঁকে যেখানে দেশের ভিতর চিরস্থায়ী ভাব রক্ষা করা হয়ে আসচে, সেই অশিক্ষিত পল্লীসমাজের মাতৃমূর্ত্তিই শিল্পী আঁকবেন—সেটাকে এযুগের মাও বলা যেতে পারবে আবার প্রাচীন যুগের বা ভবিষ্যতেরও বলা চলবে। শিল্পীর উদ্দেশ্য চিরন্তন সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলা। কাজেই আধুনিক কালের জীবনযাত্রার ভিতর যা অস্থায়ী এবং অসুন্দর তিনি তা বাদ না দিয়ে থাকতে পারেন না।

প্রাচীন কালের আঁকা যে সকল ছবি আমরা এখন দেখতে পাই, সেগুলিও ঠিক্ তখনকার দিনেরই যে সঠিক ছবি তা বলা যায় না। প্রাচীন কালের অজন্তা গুহা প্রভৃতির কথা অবশ্যই অনেকে জানেন। সে গুহাগুলি প্রকৃত-প্রস্তাবে একটা পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম অন্ধকার গহ্বরমাত্র নয়; সেগুলি মানুষের গড়া প্রচীনকালের চলিত প্রাসাদ প্রভৃতির স্থাপত্যের নিদর্শন। অজন্তার গুহা ছাড়া বহুপ্রাচীন গুহাহর্ম্মের ভগ্নাবশেষেও আমরা ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যের নমুনা দেখতে পাই। আমরা দেখেচি অজন্তা গিরিগুহায় যে সকল ছবি আছে এবং তার ভিতরে যে ঘরবাড়ীর নক্সা আছে, সেগুলি সেখানকার গিরিগুহার স্থাপত্যের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। তাতে মনে হয় চিত্রে যে স্থাপত্যের ছবি দেওয়া আছে সেগুলি গুহাহর্ম্মের চেয়ে অনেক আগেকার প্রাচীন যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন বা শিল্পীদের কাল্পনিক ছবি মাত্র। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, অজন্তার চিত্রকরেরাও ঠিক্ তাঁদের সমসাময়িক জীবনের ছবি আঁকেন নি। সেগুলি আরো প্রাচীন যুগের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে আঁকা বা কাল্পনিক ছবি মাত্র।

সব সময়ে সব দেশে শিল্পীরা ব্যক্তিগত ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যা রচনা

করেন তাতে একটি চিরন্তনভাব মূর্ত্তি পায়। এতে যদি তাঁরা কোনো ঐতিহাসিকতা রক্ষা করতে যান, তা হলে এক এক সময়ের শিল্পকলা এক একটা উদ্ভট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; তাতে কোন রসই থাকে না। সাময়িক ভাব বা ঘটনাকে ছবিতে জীবন্ত করে ধরে রাখতে গেলে ছবিটি সেই সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের সহায় হয় বটে, কিন্তু কোনো স্থায়ী ভাব তাতে না ফোটারই কথা। সেখানে ছবিটি একটা সাময়িক রেকর্ড স্বরূপ হয়ে পড়ে। ফটোগ্রাফী আজকালকার দিনে চিত্রকলার ঐদিকের কাজ সহজেই সম্পন্ন করচে।

জাতীয়তা, ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়েও শিল্পীদের কেবল বসে থাকলে চলবে না। তাতে খালি একটা সাম্প্রদায়িক শিল্পকলা গঠিত হতে পারে—খুব উঁচুদরের কিছু গড়ে উঠতে পারে না। অজন্তাগুহার প্রাচীন চিত্রাবলীতে যেখানে কেবল কোন বৌদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার, তখনকার কালের ঐতিহাসিক ঘটনা বা জাতকের গল্প আঁকা হয়েচে সেখানে ছবিগুলি তেমন প্রাণস্পর্শী হয়নি। কেননা সেখানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সেই সব কাহিনী বা ধর্ম্মগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত না হলে চিত্রগুলি দর্শককে ততটা প্রীতি দিতে পারে না। আবার যেখানে অজন্তার ছবিতে ঘটনাবাহুল্যবর্জ্জিত একটি "মা ও ছেলের" ছবি আঁকা আছে, সেখানে সেটি চিরন্তন হয়েই ফুটে আছে। আধুনিক যুগেও যেখানে অশিক্ষিত পল্লীসমাজের ভিতর চিরন্তন সরল ভাবটি ফুটে আছে সেইখানেই শিল্পীরা চির-সুন্দরকে দেখতে পান, কিন্তু যেখানে বৈদ্যুতিক আলোক ও সোডা-বরফের রেওয়াজ সেই উচ্চশিক্ষিত সভ্যসমাজে তাঁরা কোনই মাধুর্য্য দেখ্‌তে পান না। শিল্পীরা আধুনিক চাষা কোল সাঁওতাল আঁকতে কুণ্ঠিত নন; কিন্তু আধুনিক সভ্য ধনীর বা গৃহস্থের চিত্র এঁকে চিত্রকলাকে ব্যর্থ করতে চান না। সব দেশের চিত্রকরের চিত্রে তাঁর চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় বা প্রাদেশিক ভাব সহজেই আপনা থেকেই ফুটে ওঠে, সেজন্যে বিশেষ কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। দেশের বিশেষত্বটি দেশের আবহাওয়ায় এবং অস্থিমজ্জাতেই রয়েচে তার উৎকর্ষ বাইরের দিক থেকে না করলেও চলে। চিত্রের বিষয় ও ভাব

নির্ব্বাচন দেশের চিত্রকরেরাই বুঝে নেবেন, তার জন্যে নতুন কিছু বলবার নেই।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

জার্ম্মানী ও জাপানের শিক্ষানীতি

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে য়ুরোপের প্রায় সকল স্থানে, বিশেষত জার্ম্মানীতে মূলমন্ত্র ছিল আপনার দেশকে পৃথিবীর সমক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণ করা। জার্ম্মানী ইহাতে নিতান্ত অন্ধ স্বাদেশিকাতায় আচ্ছন্ন হইয়া তদনুরূপই নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

শিশুকাল হইতে নানা উপায়ে সরকার হইতে জার্ম্মান বালক-বালিকাদিগকে এই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইত যে, সকল দিক্ দিয়া জার্ম্মানীই প্রধান, অপর সকল দেশ তাহার অপেক্ষা হীন ; জার্ম্মানী সকল দেশের সম্মুখে শিক্ষার আদর্শ দিতেছে, আর অন্য সকল দেশ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

অন্ধ স্বদেশপ্রেম স্বভাবতই পরজাতি-বিদ্বেষের আকার ধারণ করে। এখানেও এই পরজাতি-বিদ্বেষকে আশৈশব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াসের অভাব ছিল না। আপনার দেশকে পৃথিবীর মধ্যে সকলের নেতা বলিয়া সপ্রমাণ করিতে হইলে যে পার্থিব শক্তির দরকার, তাহা দেশের সকল ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করিবার জন্য ইহাদের চেষ্টার অভাব ছিল না।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান বালক শিক্ষা করিত যে, একমাত্র বীরযোদ্ধাই ধন্য, বাহুবলে অপরকে পরাস্ত করাই বীরত্ব, এবং তাহাই শ্রেষ্ঠতা। তাহার

খেলার সামগ্রী ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত যোদ্ধুবেশী ছোট-ছোট পুতুল। তাহাদের চাকচিক্য ও বেশভূষায় শিশুর মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হইবার কথা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষুদ্র আকারে যুদ্ধের নানাপ্রকার সরঞ্জাম তাহার সম্মুখে দেওয়া হইত, সেগুলির ব্যবহার সে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলিত। যোদ্ধাদের মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই দুইদল করিয়া যুদ্ধে বিপক্ষের পরাজয়-সাধন তাহার খেলার প্রধান অঙ্গ ছিল।

জার্ম্মান বালক ক্রমাগতই শুনিত, ইংরাজ জাতি কেবলমাত্র ব্যবসাদার, যথার্থ বীর্য্য তাহাদের নাই; ফরাসীগণ বিলাসের আতিশয্যে পতনোম্মুখ। এইরূপে সকল জাতিরই কোনও না কোনও একটী দৈন্য তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। স্বজাতির বীরত্বের কাহিনী ছিল তার নিত্যশিক্ষণীয় বস্তু।

বীরগণের ও সমরাবলির তালিকা জার্ম্মান বালকের নখদর্পণে থাকিত। কবে কোন্ বীর কোন্ যুদ্ধে অপর জাতিকে ধ্বংস করিয়া স্বজাতির বিজয়পতাকা উড়াইয়াছে, সে সম্বন্ধে হয়ত কোন আগ্রহ ক্ষুদ্র বালকের না ও থাকিতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে এইপ্রকার সম্মোহনী শিক্ষায় জর্ম্মানগণ উৎকট স্বদেশপ্রেমের নেশায় মগ্ন হইয়া যাইত।

ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা অপেক্ষা দেশের সাধারণ কল্যাণ তাহাদিগের নিকট অধিক মূল্যবান্। সাধারণতন্ত্র কোনও অংশে দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়, এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা শিখিত, কাইসার সর্ব্বসাধারণের চালক ও পূজ্য, অবস্থাবিশেষে তাঁহার আদেশ নির্ব্বিচারে পালনীয়, দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও মতামত বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য।

বৎসরের মধ্যে দুইদিন জার্ম্মানীতে বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইত। ফ্র্যাঙ্কো প্রশিয়ান সমরের শেষ যুদ্ধে জার্ম্মানগণের বিজয়ডঙ্কা বজিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবৎসর সেই সিডান যুদ্ধের দিনে সেই সমরের কাহিনী স্মরণ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বজাতির মহিমাগানে মত্ত হইয়া যাইতেন।

কাইসারের জন্মোৎসব দ্বিতীয় উৎসবের দিন। সর্ব্বসাধারণের উপর রাজার

দৈব অধিকার (Divine right), সুতরাং তিনি সাধারণের পূজনীয়। এই বিশ্বাসে উৎসবের দিনে রাজার গুণগানে সমস্তই মুখরিত হইয়া উঠিত।

জার্ম্মান য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক ট্রিট্‌স্‌কে প্রুশিয়ার যে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ; কিন্তু প্রুশিয়ার বিজয়গান তাহাতেও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা দেখিতেছি জার্ম্মানী স্বদেশপ্রেমের নেশায় বিভোর হইয়া উদার সার্ব্বজনিক প্রেমকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই সমর তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সমর-অবসানে কেবল জার্ম্মাণী নয়, সমগ্র য়ুরোপীয় জাতির জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা বুঝিতেছেন, সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ না করিলে মঙ্গল নাই। শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এবং শিক্ষাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গঠন করিবার জন্য সর্ব্বত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

এই সঙ্গে আমরা একবার জাপানের বিষয় চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থার সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বেকার জার্ম্মানীর শিক্ষাতন্ত্রের কতকটা মিল আছে।

একটী বেসরকারী বৈঠক (commission) ভারতবর্ষ ও জাপান প্রভৃতির শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিয়াও সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছেন। জাপানের বর্ত্তমান শিক্ষার যে চিত্র তাঁহারা দিয়াছেন, তাহার সাহিত যুদ্ধের পূর্ব্বেকার জার্ম্মনীর হুবহু মিল দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। যে অন্ধ স্বাদেশিকতার নেশায় জার্ম্মনীকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, জাপানও তাহার শিক্ষাদীক্ষায় সেই অন্ধতার পথেই চলিয়াছে।

তাহার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে অবশ্য অনেক ভাল জিনিষও আছে। ছয় বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদিগের শিক্ষা জাপানে অবশ্যবিধেয় (compulsory) এবং শিক্ষার বেতনও যৎসামান্য। বিদ্যালয়গুলি প্রায় সবই সরকারী সাহায্যে

চলে, অতি অল্পসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভারই মিশনারীদিগের উপর। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে।

শিক্ষকদিগের বেতন অধিক না হইলেও নানা প্রকার উচ্চসম্মানে তাঁহাদিগকে তুষ্ট করা হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাদানুবাদের জন্য জাপানের স্থানে স্থানে যুবকদিগের সভা আছে। সাধারণের মতানুসারে এক এক জন শিক্ষক সেই এক-একটী সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যুবকদিগের চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে বাধ্য, এইরূপ একটী নিয়ম থাকিলেও অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে সেই আইন মানিতে হয় না।

অপর দিকে দেখি, নানা দিকে ভাল হইলেও জাপানের শিক্ষার প্রধান দোষ এই যে, ইহা স্বদেশের প্রয়োজনের দিকে না তাকাইয়া অপর দেশের অনুকরণে অধিক পরিমাণে তৎপর। একটীমাত্র আদর্শের উপর ইহা স্থাপিত, ব্যক্তিগত প্রয়োজনসিদ্ধির দিকে ইহার লক্ষ্যই নাই।

যেমন জার্ম্মনীতে তেমনি এখানেও সমগ্র জাতির কল্যাণই ইহাদিগের নিকট বড়। অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু—এই সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা সরকার ভাল করিয়া করেন নাই; যেহেতু ইহারা দেশের কোনও কাজে আসে না। সমগ্র জাপানে অন্ধ ও বধিরদের জন্য ৭০টী বিদ্যালয় আছে; তাহার মধ্যে ৬২টী বেসরকারী লোকদিগের দ্বারা চালিত।

নৈতিক শিক্ষার উপর জাপানীরা খুব জোর দেন। সকল বিদ্যালয়েই ইহার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু নৈতিক শিক্ষা বলিতে গেলে তাঁহারা প্রধানত স্বদেশ-প্রেমকেই বোঝেন। রাজা স্বর্গ প্রেরিত, তাঁহার দৈব অধিকার (Divine right) আছে, এই বিশ্বাস জাপানেও আশৈশব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়।

প্রতিবৎসরে, রাজার অভিষেকের দিনে বিশেষভাবে উৎসবের আয়োজন হয়। পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য নূতন নূতন সঙ্গীত ও কবিতা রচনা প্রভৃতি নানারূপ

আয়োজন চলিতে থাকে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সেইদিন রাজভক্তির নিদর্শনের জন্য উৎসব লাগিয়া যায়।

ইহা ব্যতীত প্রতিবৎসর একবার করিয়া রাজাজ্ঞা (Imperial rescript) পাঠ করা হয়। প্রতেক বিদ্যালয়ে এই দিনে একটী বিশেষ অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগের পিতামাতা ও গুরুজনেরা ইহাতে নিমন্ত্রিত হন। কার্য্যারম্ভে সকলে ভক্তিনম্রচিত্তে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কতিপয় ছাত্র নানা কারুকার্য্যখচিত একটী পাত্রে রাজার ঘোষণাপত্রটী বহিয়া আনিয়া প্রধান শিক্ষকের নিকট উপস্থিত করেন। তিনি তাহা অতিশয় ভক্তির সহিত সকলের সম্মুখে পাঠ করেন। পাঠ শেষ হইলে তেমনি গম্ভীরভাবে তাহা লইয়া যাওয়া হয়। এই সকলের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, জাপানীগণ কিরূপ অন্ধ স্বদেশিকতার পথে চলিয়াছেন।

জাপানের ইতিহাস যে বহু পুরাতন নয়, তাহা আমরা জানি। অতি অল্প কালের মধ্যেই যে জাপান সভ্যতার উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে, তাহাও কাহার অবিদিত নাই। কিন্তু আজকালও স্বদেশবাসীদিগের মনে স্বদেশপ্রেম উদ্রিক্ত করিবার জন্য তথাকার আধুনিক ইতিহাস-লেখকগণ কাল্পনিক বীরসমূহের সৃষ্টি করিতেছেন।

সাধারণভাবে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুঝা যায় অনেকাংশে জাপানের শিক্ষা উত্তম হইলেও জার্ম্মানী যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, এখানেও তাহার আভাস দেখা যাইতেছে। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে অন্ধশিক্ষার ফল কতদূর বিষময়, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

শ্রীসুধাময়ী দেবী

বেরি-বেরি রোগ

উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অখাদ্য খাইলে সকল প্রাণীই পীড়িত হয়। মানুষও ইহা হইতে মুক্তি পায় না। যুদ্ধের ফলে সমস্ত জিনিষেরই মূল্য চড়িয়া যাওয়ায় এবং দেশে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি হওয়ায় আমরা অনেক অখাদ্য খাইতেছি। ইহার ফল সকলেই দেখিতেছেন,—পীড়ায় দেশ উৎসন্নে যাইতেছে এবং যে নূতন পীড়া একবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে, তাহা আর দেশ ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না। বেরি-বেরি রোগের নাম আমরা বাল্যকালে শুনি নাই, কিন্তু আজকাল পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে এই রোগ দেখা যাইতেছে এবং ইহাতে হাজার হাজার লোকের অকাল মৃত্যু হইতেছে। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ না করাতেই যে এই রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহার জন্য কেবল যুদ্ধ এবং অজন্মাকে দোষ দিলে চলিবে না, খাদ্যনির্ব্বাচন-সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাই ইহার জন্য দায়ী। এই কারণে বেরি-বেরি রোগের উৎপত্তি এবং তাহার নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধে পৃথিবীর প্রচুর অকল্যাণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের যে একটু আধটু উন্নতি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। টরপেডো, কামান, বন্দুক বারুদ শেল ইত্যাদি মানুষ-মারা কলের কথা আমরা বলিতেছি না। যুদ্ধের তিন চারি বৎসরের মধ্যে টেলিগ্রাফ্, ব্যোমযান জাহাজ ইত্যাদির যে উন্নতির হইয়াছে, বোধ হয় কুড়ি বৎসরেও তাহা সম্ভব হইত না। তা'ছাড়া আহত সৈনিকদের অস্ত্রচিকিৎসায় চিকিৎসকেরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে যথেষ্ট

উন্নত করিয়াছে। বেরি-বেরি রোগ সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত চিকিৎসকদিগেরই নিকট হইতে জানিতে পারিতেছি।

১৯১৪ সালের নবেম্বর মাসে মেসপটেমিয়াতে যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠানো আরম্ভ হয়, এবং তার পর ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত সেখানে রীতিমত যুদ্ধ চলে। প্রথমে গোরা এবং দেশী সৈন্যদিগকে মামুলি তালিকা অনুসারে রসদ দেওয়া হইত। প্রত্যেক গোরা সৈন্য দিনে আধসের পাঁউরুটি, আধসের তাজা মাংস, দেড় ছটাক টিনের মাংস, আধসের আলু, এবং কিছু চা, চিনি, লবণ এবং মসলা পাইত। দেশী সৈন্যদের জন্য প্রতিদিনের বরাদ্দ ছিল,—তিন পোয়া আটা, দু'ছটাক তাজা মাংস, দু'ছটাক ডাল, এক ছটাক ঘি, আধ্ ছটাক গুড়, এক ছটাক আলু। ইহা ছাড়া আদা, রশুন, হলুদ এবং লবণ প্রভৃতি মসলাও তাহারা পাইত। এই রসদে সৈন্যদের মধ্যে কোনো পীড়া দেখা দেয় নাই। গোরাদের মধ্যে কেহ কেহ বেরি-বেরিতে ভুগিয়াছিল, এবং দেশীয় সৈন্যদের দুই চারি জনের স্কর্ভি হইয়াছিল। এই দুই রোগই উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে হয়, জানা ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ আহার্য্য-ব্যবস্থায় সাবধান হইয়াছিলেন। বস্‌রা এবং আমারা অঞ্চল সমস্ত মেসপটিমিয়ার মধ্যে সরস এবং উর্ব্বর। এই সকল স্থানে প্রচুর তরিতরকারি পাওয়া যায়। যে সকল সৈন্য বস্‌রা ও আমারায় ছিল, তাহাদের মধ্যে বেরি-বেরি বা স্কার্ভি একেবারেই দেখা যায় নাই।

১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালে যখন মেসপটেমিয়াতে ভয়ানক লড়াই চলিতেছিল, তখন সৈন্যদের খাওয়া দাওয়ার খুব ভাল বন্দবস্ত ছিল না। যে সব নৌকা এবং গাড়ী সেনাবিভাগের হাতে ছিল, তখন সেগুলি সাধারণ রসদ বহিয়া আনিতে এবং আহতদিগকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেই নিযুক্ত থাকিত। কাজেই তাজা মাংস তরিতরকারি বা ফলমূল দূরদেশ হইতে বহিয়া মরুময় যুদ্ধক্ষেত্রে আনিবার ব্যবস্থা করা যাইত না। ইহার ফলে সৈন্যরা বেরি-বেরি এবং স্কর্ভিতে ভয়ানক ভুগিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া, দেশীয় সৈন্যের খাদ্যতালিকার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সময়ে আমাদের দেশের প্রত্যেক সৈন্য দিনে তিন

ছটাক তাজা মাংস, তরিতরকারি ও আলু তিন ছটাক, টাট্‌কা ফল এক ছটাক, তেঁতুল এক ছটাক খাইতে পাইত। তা ছাড়া সপ্তাহে তিন দিন এক তোলা করিয়া লেবুর রসও দেওয়া হইত। আটা ডাল ঘি চা গুড় এবং মসলার পরিমাণ পূর্ব্ববৎ ছিল। এই ব্যবস্থায় বেরি-বেরি রোগ সিপাহীদের মধ্যে অনেক কমিয়া আসিয়াছিল।

যে সকল চিকিৎসক মেসপটিমিয়ার সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা খাদ্য পরিবর্ত্তনের এই শুভ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন, খাদ্যবিধান সম্বন্ধে আমাদের এপর্য্যন্ত যে ধারণা ছিল তাহা ভুল। শরীরকে গরম রাখা ও দেহের অস্থিমজ্জা-মাংস পুষ্ট করার দিকে নজর রাখিয়া খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হয় না। ঘি চিনি মাছ মাংস ডাল লবণ প্রভৃতি পদার্থ শরীরকে পুষ্ট এবং শক্তিশালী করে সত্য কিন্তু এগুলি কখনই শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারে না। ফল-মূল তরিতরকারিতে যে ভিটামাইন্ (vitamine) নামে পদার্থটি আছে, তাহাই বেরি-বেরি স্কার্ভি প্রভৃতি অনেক রোগ হইতে আমাদিগকে মুক্ত রাখে।

আমাদের কোন্ কোন্ খাদ্যের মধ্যে ভিটামাইন্ অধিক থাকে ইহাও তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। ঢেঁকিতে প্রস্তুত চাল এবং সাধারণ আটাতে অনেক ভিটামাইন্ আছে। কিন্তু কলে প্রস্তুত এবং মিহি ময়দায় ঐ জিনিষটা একেবারেই থাকে না। শস্যমাত্রেরই অঙ্কুর এবং শস্যের খোলার নীচেকার বাদামী রঙের কুঁড়োই ভিটামাইন্-প্রধান বস্তু। ফর্‌সা চাল এবং মিহি ময়দা প্রস্তুত করিবার সময়ে আমরা এই দুইটি স্বাস্থ্যবর্দ্ধক জিনিষ ত্যাগ করি। কাজেই কলের চাল এবং মিহি ময়দা অখাদ্য।

১৯১৫ সালে মেসপটেমিয়ার একটি গোরা পল্টনে হঠাৎ প্রায় চারি শত লোকের বেরি-বেরি হয়। তাহারা টিনের মাংস জ্যাম্ এবং ফর্সা ময়দার রুটি ও বিস্কুট খাইত। কর্ত্তৃপক্ষ ইহা দেখিয়া প্রত্যেক সৈন্যকে প্রতিদিন দুই ছটাক ছাতু এবং এক ছটাক করিয়া ডাল খাইতে দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তা ছাড়া ময়দার সহিত সমান পরিমাণে এবং শেষে আধা-আধি আটা মিশাইয়া পাউরুটি প্রস্তুত

করাইয়াছিলেন। ইহাতে রুটিগুলি কতকটা ভারি হইত বটে, কিন্তু সাধারণ পাঁউরুটির চেয়ে তাহা সুস্বাদু হইত। এই প্রকারে ভিটামাইন্-প্রধান খাদ্য পাইয়া পল্টনের কেহই আর বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হয় নাই। ১৯১৮ সালে যে একদল চীনে-মজুর বসরাতে কাজ করিত, কলে ছাঁটা ফর্সা চাল খাইয়া তাহাদের যে দুর্গতি হইয়াছিল, কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ মেডিকাল জর্নালে একজন ডাক্তার তাহা বিবৃত করিয়াছেন। হাতের গোড়ায় ফর্সা চাল পাইয়া এই মজুরগুলি কুঁড়োযুক্ত ময়লা চাল একবারেই ব্যবহার করিত না। শেষে তাহাদের দলের প্রায় আধা-আধি লোক বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হইয়াছিল।

মুগ ছোলা এবং মটর প্রভৃতির গোটা ডাল, কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলেই সেগুলি হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। এই অঙ্কুরিত শস্যে ভিটামাইন্ পদার্থ যে পরিমাণে থাকে, অন্য কোনো জিনিষে তত অধিক দেখা যায় না। ১৯১৭ সালে মিস্ চিক্ নামে এক ইংরেজ রমণী এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন। সেই বৎসরেই মেসপটেমিয়ার সৈন্যদের মধ্যে ইহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ঘোর যুদ্ধের সময়ে মরুভূমির মাঝে যখন টাট্‌কা ফল বা তরকারি দুর্লভ হইত, তখন অঙ্কুরিত ভিজা ডাল সৈন্যদের খাবারের সঙ্গে দেওয়া হইত। তা ছাড়া স্কার্ভি এবং বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হইয়া যাহারা হাঁসপাতালে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগের জন্যেও ঐপ্রকার ডাল পথ্যরূপে ব্যবস্থা করা হইত। ইহাতে চিকিৎসকগণ সর্ব্বত্রই সুফল পাইয়াছিলেন।

যাঁতার ভাঙা আটা এবং ঢেঁকিতে প্রস্তুত চাল আমাদের দেশে দুর্লভ নয়। দেখিতে একটু পরিষ্কার বলিয়া কলের চাল এবং মিহি ময়দা ব্যবহার করিয়া আমার যে সর্ব্বনাশ করিতেছি, পাঠক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝিতে পারিবেন। ছোলা এবং মুগ ভিজে কিছুদিন পূর্ব্বেও একটু গুড় বা চিনির সঙ্গে খাইয়া আমরা তৃপ্ত হইতাম। এগুলি আমাদের শরীরে যথেষ্ট ভিটামাইন্ জোগাইত। কিন্তু ঐসকল জিনিস এখন আমাদের জলখাবারের পাত্রে স্থান পায় না। যখন পেঁপে কলা পিচ আপেল প্রভৃতি ফল আমরা কিনিয়া খাইতে

পারিতেছি না; তখন কেনো আমরা ছোলা মুগ এবং মটর ভিজা খাইব না তাহা বুঝা যায় না।

মাংস আমরা সকলে খাই না এবং খাইতে চাহিলেও প্রতিদিন পাই না। চিকিৎসকরা বলিতেছেন, টাট্‌কা মাংস বেরি-বেরি রোগীর ভাল খাদ্য, কিন্তু টিনের মাংস ভয়ানক অপকারী। তেঁতুল জিনিষটাকে আমরা যে খুব ভাল খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা কথনই বলা যায় না। ভাল চাট্‌নি প্রস্তুত করিতে গেলে আমরা আলুবোখারা বা আমসত্ত ব্যবহার করি। শুক্‌না ফলে ভিটামাইন্‌ অতি অল্প থাকে সুতরাং তাহাতে শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু তেঁতুল সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। মেসপটেমিয়াতে সিপাহীরা তেঁতুল দিয়া প্রস্তুত চাট্‌নি এবং সরবৎ প্রচুর পরিমাণে খাইত। যখন চারিদিকেই খুব বেরি-বেরি রোগের প্রকোপ, তখন এই খাদ্য তাহাদিগকে সুস্থ রাখিয়াছিল।

লেবু জিনিষটা বেরি-বেরি রোগীর প্রধান পথ্য এবং ঔষধ। কিন্তু বোতলে-ভরা পুরানো লেবুর রসে (Lime Juice) কোনো উপকারই হয় না। ছয় মাস পূর্ব্বে প্রস্তুত লেবুর রস মেসপটেমিয়ার সৈন্যদের প্রথমে দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে কোন সুফলই পাওয়া যায় নাই। শেষে ভারতবর্ষ হইতে লেবুর টাট্‌কা রস (Lemon Juice) আমদানি করিয়া সৈন্যদিগকে দেওয়ার স্কার্ভি এবং বেরি-বেরি দুই রোগেরই প্রকোপ কমিয়া আসিয়াছিল। লেবুতে ভিটা-মাইন্‌ প্রচুর পরিমাণে আছে। খাঁটি লেবুর রসে শতকরা পাঁচভাগ এলকোহল এবং প্রতি পোয়াতে আধ গ্রেন্‌ সালিসাইলিক্‌ (Salicylic) এসিড মিশাইলে তাহা তাজা থাকে। এই প্রকারে প্রস্তুত রস তিন মাস পর্য্যন্ত টাট্‌কা রসের মতই কাজ দেয়।

তেঁতুল ও লেবু এখনো অমাদের দেশে সুলভ। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে এত অধিক লেবু জন্মে যে লোকে তাহা ফেলিয়াই দেয়। যাহাতে সেগুলির সদ্‌ব্যবহার হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

বিলাতযাত্রীর পত্র

১

পাড়ি দেওয়া গেছে। প্রথম কিছুদিন লাগে নিজের সঙ্গে নিজের যানবাহনের খাপ খাইয়ে নিতে। বিষ্ণু যখন প্রথম গরুড়ের পিঠে চেপেছিলেন নিশ্চয়ই তখন আরাম পান নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না, কারণ একে আমরা মর্ত্ত্য মানুষ তাতে আমরা কলিদেবতার কলবাহনকে ধার করে' নিয়েচি। গরুড়ের পাখার সঙ্গে অনন্ত আকাশের ঝগড়া নেই—কিন্তু আমাদের এই কলের জাহাজের সঙ্গে জলের দেবতার পদে পদে বিরোধ। ঠেলাঠেলি মারামারি করে' তাকে চল্‌তে হয়, চব্বিশ ঘণ্টা হাঁসফাঁস করে' মরে, তার সেই উদ্বেগ আমাদের সর্ব্ব শরীরকে উতলা করে' তোলে। যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এর গতি সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে এই বাহনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকাতে আমাদের এত দুঃখ। জাপানিদের জুজুৎসু ব্যায়ামের কায়দা হচ্চে এই যে বাধাকে আপনার অনুকূল করে' তোলা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকেই কৌশলে আপনার স্বপক্ষীয় করে' নেওয়া, শত্রুর অস্ত্রকেই নিজের অস্ত্র করা। পাখীর পাখা বাতাসেরই গতিকে নিজের শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার আকাশ-বিহারকে সুখময় সৌন্দর্য্যময় করতে পারে। মানুষের যন্ত্র প্রকৃতির সঙ্গে এখনো সম্পূর্ণ সন্ধি করতে পারে নি, এই জন্যে সে যতটা শক্তি ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তির অপচয় করে। যন্ত্র কেবলি বল্‌চে আমি জোর করে বাধা কাটিয়ে যাব। যন্ত্রের এই ঔদ্ধত্যে সমস্ত পৃথিবী তাপিত। প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রের অসামঞ্জস্যে যন্ত্রকে এত কুৎসিত

করে' তুলেচে। বাণিজ্যলক্ষ্মী যখন থেকে কলবাহনকে অবলম্বন করেচেন তখন থেকে তাঁর শ্রী নেই। তখন থেকে বিশ্বলক্ষ্মীর সঙ্গে বাণিজ্যলক্ষ্মীর মুখ দেখা বন্ধ। যন্ত্রের জবরদস্তি যে সব জঞ্জালকে ক্রমাগত জন্ম দিতে থাকে সেই তার আপন সন্তান, সেই জটিল জঞ্জালই তার সর্ব্বনাশ করে। আধুনিক কালের পলিটিক্স সেই যন্ত্র—বিশেষত বিদেশী রাজ্যশাসনে। মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' চলবার শক্তি এর নেই, উগ্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা কেবলি বাধা ভেদ করে' চলবার জন্যে এর উদ্যম। এই জন্যে এই পলিটিক্স দৃপ্ত কিন্তু শ্রীহীন। শ্রী হচ্চে সকল শক্তির চেয়ে বড় শক্তি; চারিদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যের গুণে যখন লীলাময় সহজতা জন্মে তখন দেখা দেয় শ্রী;- শক্তি তখনি সুন্দরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়—বিরোধের ভয়ঙ্কর অপচয় থেকে তখন শক্তি বেঁচে যায়। এই নিষ্ঠুর অপচয়ের হিসাব একদিন নিকাশ হবে। বোধ হচ্চে যেন সেই হিসাব তলব হয়েচে। পলিটিক্সের জঞ্জাল জমে উঠেচে; মিথ্যায় কপটতায় নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীতে দেবতার পথ-চলা বন্ধ। তাইত পশ্চিম গগনে ধূমকেতুর মত দেবলোকের ঝাঁটা দেখা দিয়েচে, সমস্ত ধরণী কেঁপে উঠ্‌ল।

জাহাজ ত চল্‌চে সমুদ্রের উপর দিয়ে—এদিকে আমাদের মনও চলেচে কালসমুদ্রে। বাইরে যেখানে সমস্ত পরিচিত এবং অভ্যস্ত, মন সেখানে আপন চিন্তার পথে বাধা পায় না। কিন্তু অপরিচিত মানুষের মত আমাদের মনের পক্ষে এমন বাধা আর কিছুই নেই। অপরিচয় যেখানে কেবলমাত্র পরিচয়ের অভাব সেখানে বাধা অতি সামান্য—কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় মানুষ অপরিচয়ের বর্ম্ম পরে' থাকে পরস্পরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। এই জিনিষটা কেবল অভাব নয়, ফাঁক নয়, এ একটা কঠোর জিনিষ, এ অদৃশ্যভাবে ঠেলা দেয়;— বিশেষত যেখানে ইংরেজ সহযাত্রী, এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজ। মনে হয় যেন জাহাজের আকাশটাও শূন্য নয়—সে যেন কুনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ভরা। আমি স্বভাবত অবকাশবিহারী জীব, আমি চিরদিন ফাঁকায় মানুষ হয়েচি—আমার চারিদিকের আকাশ যখন ঠেলাঠেলিতে ভরে যায়, তার মধ্যে যখন প্রকৃতির শান্তি

বা মানুষের নিমন্ত্রণ থাকে না তখন আমার সমস্ত প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদি আমার সেই শান্তিনিকেতনে, সেই উদার প্রান্তরের প্রান্তে ফিরে যাবার কোনো পথ থাকত তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি চলে যেতুম। কিন্তু পূর্ব্বে বলেছি আমি কলিযুগের ধার-করা বাহনে চলেচি, এ আমার ইচ্ছাকে মানবে না। সেইজন্যেই দেবতার প্রতি ঈর্ষ্যা হয়—আলাদিনের প্রদীপের স্বপ্ন দেখি।

কিসের জন্যে যাচ্চি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্যে নয় সে আমি জানি, আর কিসের জন্যে সে আমি স্পষ্ট জানি নে। কেবল একটা কথা মনে আসে সেটি হচ্চে এই ;—মন্থনে দুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে ; য়ুরোপে লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়েচে তাতে সেখানকার যাঁরা মনীষী যাঁরা ভাবুক তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধ হয় আজকের দিনে তাঁদের দেখ্‌তে পাওয়া সহজ। শুধু চোখে দেখতে পাওয়া নয়—আজ তাঁরা সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চিন্তা করচেন সেই চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে। একথা মনে করা ভুল তাঁদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সর্ব্ব মানবের সমস্যার যাঁরা সমাধান না করবেন তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না। কোনো জাতি যখন বড় রকমের দুঃখ পায় তখন একথা বুঝতে হবে সেই দুঃখের মূলে সর্ব্বমানবের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ আছে। স্থানীয় পলিটিক্সের ছিন্নতায় তালি লাগিয়ে এদুঃখের প্রতিকার হতে পারবে না। আমরাও সুদীর্ঘকাল ধরে যে দুঃখ বহন করচি তার কারণটাকে সঙ্কীর্ণ ও আকস্মিক করে দেখ্‌চি বলেই মনে ভাবচি মণ্টেগু্য ডাক্তারের হাতে এর ওষুধ আছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সভামঞ্চে রেজোল্যুশনের পটি লাগিয়ে ভারতের মর্ম্মান্তিক ক্ষতগুলির আরোগ্য ঘটবে।

২

আলোয়ারের মহারাজা আমাদের সঙ্গে যাচ্চেন। এঁকে দেখে বড় খুসি হয়েচি। এঁর বেশভূষা আদবকায়দা সমস্তই দেশী ধরনের। পশ্চিমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ

মোকাবিলা করবার সময় ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে আত্মপরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করে—আপনার ভাষা, আপনার বেশ, এমন কি, আপনার স্বভাবকে গোপন করে' তবেই যেন গৌরব বোধ করে। ইংরেজ আপনার কায়দাকেই সম্মান করে, তার সঙ্গে অল্পমাত্র পার্থক্যকেও অবজ্ঞা এবং উপহাস করে' থাকে। সেই কারণে, যেখানে অধিকাংশ লোক ইংরেজ, এবং যেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই ইংরেজি সেখানে নিজেকে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে ইংরেজি ধরনধারনের সুবিধে আছে, তাতে অন্তত বাইরের দিকে একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরের দিকে? এই ইচ্ছাকৃত দাসত্বের লজ্জা বহন করি কি করে?

এ সম্বন্ধে একটা তর্ক কিছুকাল পূর্ব্বে মাঝে মাঝে শোনা যেত। সে হচ্চে এই যে, বাঙালীর বেশভূষা ধুতিচাদর, কিন্তু ধুতিচাদরে পৃথিবী-পরিভ্রমণ চলে না। একথা সত্য যে, বাঙালী সুদীর্ঘকাল লোকসভার আড়ালে ছিল,—আপনার গ্রামে আপনার চণ্ডীমণ্ডপেই তার দিন কেটেচে। এইজন্যে বাঙালী স্ত্রীলোক এবং পুরুষের চিরপ্রচলিত বেশভূষা পৃথিবীর জনসভার পক্ষে অত্যন্ত বেশি আটপহুরে। শুধু তাই নয়, বাহিরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার যোগ্য আমাদের কোন আদবকায়দা নেই। এইজন্যে বাঙালী স্বভাবত উদ্ধত না হলেও বিনয়প্রকাশে সে অনভ্যস্ত, এমন কি, তাতে সে লজ্জা বোধ করে। এসমস্তই মানি তবু কিছুতেই মানিনে যে আগাগোড়া ইংরেজ সাজ্‌লেই সমস্যা মেটে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থাকে নিজের নিয়মে মিলিয়ে নেওয়াই হচ্চে প্রাণের লক্ষণ। বাহিরের পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে অস্বীকার করাও জড়ত্ব, আর সেই পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে স্বীকার করাও জড়ত্ব। অন্তর্নিহিত জীবনী-শক্তি এবং সৃজনীশক্তির সাহায্যে সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' নেওয়াই হচ্চে যথার্থ আত্মরক্ষা। পূর্ব্বাপর আমাদের কোনো একটা জিনিষের অভাব যদি থাকে তবে সেটাতে আমাদের দারিদ্র্য প্রকাশ পেতে পারে তবু তাতে তেমন বেশি লজ্জা নেই, কিন্তু কোনোকালেই সে অভাব আমাদের নিজের স্বাভাবিক শক্তিতে মেটাবার ভরসা যদি না থাকে তবে সেই চির-অক্ষমতার

অগৌরবই দুঃসহ। একদিন আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি সঙ্কীর্ণ ছিল, কারণ সে ভাষা কেবল ঘরের ভাষা গ্রামের ভাষা ছিল, এইজন্যে সে ভাষা বিদ্যার ভাষা ছিল না। এই কারণে, যারা জড়চিত্ত তারা অবজ্ঞা করে' বলেছিল বাংলা চিরকাল প্রাকৃতসাধারণের ভাষা হয়ে থাক্ আর নির্বিচারে ইংরেজি ভাষাকেই বিশিষ্টসাধারণে গ্রহণ করুক। কিন্তু আজ আমাদের গৌরবের কথা এই যে, সেই অবজ্ঞা বাংলা ভাষা স্বীকার করে নি। বাংলা ভাষা বিদ্যার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌ল। কেমন করে হল? আপনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে' নয়; নিজের মহলকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলে, আধুনিক কালের বিদ্যা ও ভাবকে দ্বারের বাহির থেকে বিদায় না করে দিয়ে, তাদের সকলকে আতিথ্যদান করবার উপযুক্ত আয়োজন করে'—অর্থাৎ নিজের প্রাণশক্তির বেগেই বিশ্ববিদ্যা বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজের সামঞ্জস্য সাধন করে'। বীণায় সুর বাঁধবার সময় বেসুর অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু তাতেও বোঝা যায় সুর বাঁধবার ওস্তাদটি বেঁচে আছে, সেইটেই মস্ত আশার কথা। তেমনি আকস্মিক অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের সময় আমাদের ব্যবহারে আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে নানা অদ্ভুত বিকৃতি দেখা দেবেই, কিন্তু তাতেও বোঝা যায় সজীব ওস্তাদের কাজ চল্‌চে, সেই ওস্তাদ সমস্ত বিকৃতিকে ক্রমশই প্রকৃতির অনুগত করে' নেবেন। অতএব এই সকল উপদ্রবকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই, কেননা এ হল প্রাণের উপদ্রব। ভয়ের কারণ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জড়তা। সেই জড়তা পরের ধনে যতই গর্ব্ব করুক তবুও তা জড়তা। যতক্ষণ নিজের শক্তি সচেষ্ট হয়ে সৃজন করচে ততক্ষণ অন্যের তৈরি জিনিষ সেই সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলে,—সেই রকম গ্রহণ করাকে ভিক্ষা করা ধার করা বলে না। তাকেই বলে অর্জ্জন করা। সমস্ত মহৎ এবং প্রাণবান সভ্যতা বাহির থেকে সেই রকম অর্জ্জন করে এবং করেচে। প্রাচীনকালে ভারতও তাই করেচে, যদি না করত তবে লজ্জা বোধ করতেম। শক্তিস্বাতন্ত্র্য অভাবাত্মক জিনিষ নয়—অর্থাৎ প্রাণপণে পরের পন্থা বাঁচিয়ে চলাই ওরিজিন্যালিটি নয়—

উপকরণ ঘরের হোক্ আর বাইরের হোক্ সমস্তই নিজের প্রকৃতিসঙ্গত করে নেবার শক্তিকেই বলে শক্তিস্বাতন্ত্র্য। বাহিরের জিনিষ নির্বিচারে নকল করাও যেমন দীনতা, বাহিরের জিনিষ নির্ব্বিচারে বর্জ্জন করাও তেমনি দীনতা। দুইয়েতেই আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়।

তাই আমার বক্তব্য এই যে, আজকের দিনে বিশ্বের সঙ্গে বাংলা দেশের যে সম্বন্ধস্থাপনের কাজ চলচে তার প্রত্যেক অঙ্গেই আমাদের নিজের পূর্ণ জাগ্রত সৃজনীশক্তির পরিচয় থাকা চাই। এই সৃজনের মানেই হচ্চে বাহ্য উপকরণকে নিজের আন্তরিক নিয়মের অনুগত করা, অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাই এই জাহাজে যখন কোনো বাঙালী সাহেবকে সগর্ব্বে পদচারণ করতে দেখি তখন সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করি—আবার যদি দেখতুম কোনো বাঙালী খালি গায়ে কাঁধের উপর একখানি চাদর ঝুলিয়ে এবং ফিন্‌ফিনে ধুতি পরে' অবিমিশ্র স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যে ডেকের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সমুচ্চস্বরে হাই তুলচেন, তাহলেও সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করতুম।
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পারসীকপ্রসঙ্গ

পা র সী ক গ ণে র ধর্ম্মশাস্ত্র অ বে স্তা নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে ইহাকে ভুল করিয়া জে. ন্দ অ বে স্তা বলা হইত।[১] পহ্লবী ভাষায় ইহাকে অ্‌বি স্তা ক অথবা আ প স্তা ক বলা হয়, উহার অর্থ 'জ্ঞান' বা 'জ্ঞানের পুস্তক'; আর তাহার টীকাকে ঐ ভাষায় বলা হয় জ. ন্দ (আবেস্তিক আ. জ. ই স্তি; আবে. জ. ন্, সং. জ্ঞা

১। * এই নাম প্রথমে Anquetil du Perron সাহেব চালাইয়াছিলেন।

ধাতু)। এই জ. ন্দ শব্দেরই রূপান্তর জে. ন্দ। মূল ও টীকা উভয়কে একত্র বলা হইয়া থাকে অ বি স্তা ক ব জ. ন্দ 'অবেস্তা ও জে.ন্দ', ইহা হইতে ক্রমে 'জে. ন্দ অ বে স্তা নাম মূল অবেস্তা অর্থে চলিয়া গেল।

অ বে স্তা শব্দের যৌগিক অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ[২] বলেন ইহা সংস্কৃত ব চ্ ('কথন') ধাতু হইতে, কেহ[৩] বলেন অব + স্থা ধাতু হইতে; কাহারো[৪] মতে আ + বিদ্ ('জানা') ধাতু হইতে, অন্যে[৫] আবার পজন্দ বা ফারসী অ ব স্তা[৬] শব্দের সহিত এখানে সম্বন্ধ দেখিয়াছেন; অন্য কেহ[৭] ব্যাখ্যা করেন, অবেস্তার 'ছন্দ' 'শ্লোক' অর্থে প্রযুক্ত অ ফ্ স্ম (ন্) হইতেই অ বে স্তা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও কাহারো-কাহারো কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

নের্য্যসঙ্ঘ অবেস্তার স্বকৃত সংস্কৃতানুবাদে অত্যন্ত কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন[৮]—অ ব স্তা অর্থাৎ অ বে জ স্তা, অ বে জ = নির্ম্মল, স্তা = শ্রুতি, অর্থাৎ নির্ম্মল শ্রুতি।

কিন্তু দস্তর কৈকোবাদ অদরবাদ নোশেরবন সাহেব এ বিষয়ে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন।[৯] তাঁহার মতে সংস্কৃত অ ভ্য স্ত (অভি + অস্ + ত) ও আবেস্তিক

২। Anquetil du Perron.

৩। Prof Muller of Munich অ ব স্থা, 'দশা', তুল—ইংরাজী 'text'

৪। Dr Haugh আ + বিদ্ + ত + আ = আবিত্তা = অবিস্তা (সংস্কৃত ত্ত = অবেস্তা স্ত), অতএব যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাত তাহাই আ বি স্তা, অ বে স্তা।

৫। Mons J Oppert.

৬। ?

৭। Dr, Spiegel

৮। খুর্দ-অবস্তার্থ (Collected Sanskrit Writings of the Parsis, Part I) পৃ. ১:—"অ ব স্তা ইতি অ বে জ স্তা, অ বে জ স্তা ইতি নির্ম্মল [স্তা ?] ইতি শ্রুতি (র্), নির্ম্মল শ্রুতি (র্) ইত্যর্থঃ।" "অবস্তা" শব্দ স্থানে অপর পাঠ "অবিস্তা" এবং "শ্রুতি" স্থানে অপর পাঠ "স্তুতি"। পারসীরা নিজে গুজরাটী ভাষায় ও অক্ষরে অ ব স্তা লিখিয়া থাকেন।

৯। K. R Gama Memorial Volume, Bombay, 1900, pp, 274—279.

অ বে স্তা একই। অবেস্তার "অ ই ব্যা স্ত শব্দ ("অনইব্যাস্তো দএনাঁম্", যিনি ধর্ম্মকে অভ্যাস করেন নি," বেন্দীদাদ্, ১৮.১, ২ ইত্যাদি) এই মতকে সমর্থন করে।[১০]

আজকাল অবেস্তার যতটুকু পাওয়া যায়, মনে হয়, তাহা প্রাচীন মূল বৃহৎ অবেস্তার এক চতুর্থাংশ হইবে। ইহাকে এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়—

১। য শ ন,

২। বী স্প র দ্,

৩। বে ন্দী দা দ্,

৪। খো র দ হ্ অ বে স্তা,[১১] ও

৫। বি বি ধ খ ণ্ডি ত র চ না।

১। সংস্কৃত য জ্ঞ (য জ্-ন) আর অবেস্তা য শ্ ন শব্দত ও অর্থত একই। যজ্ঞিয় স্তুতি বা প্রার্থনা সম্বন্ধে ইহাই প্রধান গ্রন্থ। গা থা-সমূহ ইহারই অন্তর্গত। জরথুশ্ত্রের মূল উপদেশ ও উক্তি প্রধানত এই গাথাসমূহেই আছে। এই গাথাগুলিই অবেস্তার সর্ব্বোপেক্ষা প্রাচীন অংশ। যশ্নে ৭২টি পরিচ্ছেদ আছে। পরিচ্ছেদগুলিকে হা ই তি, অথবা সংক্ষেপে হা বলা হইয়া থাকে। হা ই তি আবেস্তিক শব্দ, সংস্কৃতে ইহা সা তি (সো ধাতু=সা 'অন্ত করা'; অবেস্তায় ই হা হা ধাতু, 'কাটা' 'ভাগ করা'; শেষে তি প্রত্যয়)। ইহার যৌগিক অর্থ 'ভাগ'। অনুষ্ঠানের সময় মোবদ অর্থাৎ যাজক বা পুরোহিত এই সমস্ত পাঠ করেন। সমগ্র যশ্নকে স্থূলত তিন অংশে ভাগ করা যাইতে পারে, প্রথম অংশ হা ১—২৭। ইহাতে প্রথমে অহুর-মজ্দা ও বোহুমন প্রভৃতির গুণকীর্ত্তন করিয়া হ্ব ও থ্র (সংস্কৃত হো ত্র) অর্থাৎ যজ্ঞির জল, ও ব রে স্ম ন্ (সং. ব্র হ্ম ন্) অর্থাৎ যজ্ঞিয়

১০। বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বোক্ত স্থানে দ্রষ্টব্য। অবেস্তার 'শিক্ষক' 'উপদেশক' অর্থে অ ই বি শ্ তি (অইবি+অহ্—অভি +অস্, তি প্রত্যয়) শব্দও এখানে দ্রষ্টব্য। তুলঃ—সংস্কৃত অ ভ্যা স— আম্নায় (ম্না ধাতু 'অভ্যাস')

১১। কেহ কেহ খো র্ দে হ্, অথবা খু র্ দে বলেন।

অনুষ্ঠানে আবশ্যক ছোট-ছোট ডালের গুচ্ছের সংস্কার,[১২] হ ও ম অর্থাৎ সো মে র সংস্কার ও উৎসর্গ, অন্যান্য খাদ্যের[১৩] উৎসর্গ, স্তুতি, প্রার্থনা, ও জরথুশ্‌ত্রের ধর্ম্মকে স্বীকার করার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে (হা ২৮—৫৩) অবেস্তার সুপ্রসিদ্ধ গাথাসমূহ। যথাযথভাবে বলিতে গেলে গাথাগুলিকে মোট পাঁচভাগ করা যায়; ১ম, হা ২৮—৩৪; ২য়, হা ৪৩—৪৬; ৩য়, হা ৪৭—৫০; ৪র্থ, হা ৫১; ৫ম, হা ৫৩। এইরূপে মোট ১৭টি সূক্ত। বলা বাহুল্য, গাথাগুলি ছন্দোবদ্ধ। ইহার ভাষা প্রাচীন; পরবর্ত্তী অবেস্তা হইতে ইহার ভাষা কিছু ভিন্ন। জরথুশ্‌ত্রের নিকট অহুর মজ্‌দার ধর্ম্মপ্রকাশ, জরথুশ্‌ত্রের উপদেশ, তাঁহার ধর্ম্মের তত্ত্ব, ইত্যাদি এই গাথাসমূহেই পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে (বৈশাখ, ১৩২৭, পৃ.৩) অ ষে ম্‌ বো হূ প্রভৃতি তিনটি প্রাচীন প্রার্থনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাও এই গাথারই মধ্যে রহিয়াছে (অষেম্‌ বোহূ, হা ২৭. ১৪; অহুন বইর্য, হা ২৭. ১৩; যেঙ্‌হে হা তাঁ ম্‌, হা. ৪. ২৬)।

তৃতীয় অংশে প্রধানত বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে হবি প্রদান ও স্তুতি, প্রশংসা, ইত্যাদি।

২। অনন্তর বী স্পে রে দ, অথবা বী স্প র দ্‌। ইহা মূল অবেস্তার বী স্পে র ত বো (=বিশ্বে ঋতবঃ), অথবা বী স্প র তু (=বিশ্ব ঋতু) শব্দের অপভ্রংশ। র তু শব্দের অর্থ 'সত্যনিষ্ঠ,' (তুলঃ সং. ঋত) 'প্রভু' বা 'অধিপতি' ইত্যাদি। এখানে ইহা শেষোক্ত অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বী স্প র তু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক (ম ই ন্য ব), পার্থিব (গ এ ই থ্য) জলীয় (উ পা প)

১২। ইহা কোন্‌ উদ্ভিদের ডাল জানা যায় না। আজকাল ডালিমের ডাল, বা এই ডালের পরিবর্ত্তে পিতল বা রূপার তারের গুচ্ছ করা হয়। অনুষ্ঠানবিশেষে এই তারের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। বেন্দীদাদ ও বীস্পরদ্‌-বিধিত অনুষ্ঠানে ৩৫ খানা, যশ্‌নের অনুষ্ঠানে ২৫ খানা, অনুষ্ঠানবিশেষে আবার ৫ খানি তারও লাগে।

১৩। "ম্য জ. দ," আধুনিক পার্সীরা এখানে "মাখন" অর্থ করিতে চান। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিশেষত Spiegel বলেন "মাংস"।

ও অন্যান্য সমস্ত জীবের অধিপতিগণের উদ্দেশে স্তুতি ও প্রার্থনা করা হইয়াছে বলিয়া অবেস্তার এই অংশের নাম বী স্পে রে দ্ অথবা বী স্প র দ্। ইহা যশ্নেরই এক প্রকার পরিশিষ্ট। যশ্নের বিভিন্ন-বিভিন্ন মন্ত্র পাঠের ঠিক পরেই ইহার বিভিন্ন-বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যেমন যশ্নের ১. ৯ মন্ত্র পাঠের ঠিক পরেই ইহার ১ম মন্ত্রটি পাঠের ব্যবস্থা। ইহার পরিচ্ছেদগুলির নাম ক র্দে, ইহাতে মোট ২৪টি কর্দে আছে।

৩। ইহার পর বে ন্দী দা দ্। পহ্লবী ভাষায় ইহাকে বি দে ব দা ত্ বলা হয়, বে ন্দী দা দ্ শব্দ ইহারই অপভ্রংশ। মূল শব্দটি হইতেছে বী-দ এ ব-দা ত, সংস্কৃতে বি-দেব-ধাত (লৌকিক সংস্কৃতে বি-দেব-হিত; ধা ত= ধা+-ত; ধা ত=হিত) অর্থাৎ দে ব গ ণে র বি রু দ্ধে বি ধা ন। সংস্কৃত দে ব শব্দের অর্থ অবেস্তায় 'দানব,' 'দৈত্য।' যাহাতে দৈত্যগণের বিরুদ্ধে নিয়ম-বিধি রহিয়াছে তাহাই বে ন্দী দা দ্। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়, বে ন্দী দা দ্ ও তাহাই। আচার, নিয়ম, শৌচ, অনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সমস্তই ইহার মধ্যে আছে। সামাজিক ব্যবস্থা ইহারই মধ্যে সবিশেষ পাওয়া যায়। ইহাতে মোট ২৩টি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদগুলি ফ র্ গ র্ দ্, অথবা প র্ গ র্ দ্ নামে কথিত হইয়া থাকে।

প্রথম পরিচ্ছেদে অহুর-মজ্দার সৃষ্ট ১৬টি দেশ ও তদ্বিরুদ্ধে অঙ্রমইন্যু (সংস্কৃত অং হো ম ন্যু) [১৪] বা অহ্রিমানের সৃষ্ট ১৬টি উপদ্রব (যথা, হিম, তাপ, পঙ্গপাল, সাপ ইত্যাদি) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যমের উপাখ্যান, অহুর মজ্দার আদেশে জীবগণের সমৃদ্ধিবর্দ্ধন,ও হিমপ্রলয় (অর্থাৎ ইয়াণীয় মহাজলপ্লাবন)। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পৃথিবীর পক্ষে ৫টি সুখকর ও ৫টি দুঃখকর স্থান, ও কৃষিসম্পদ। চতুর্থে ঋণ, ঋণশোধ, চুক্তি (মি থ্র্, সং. মি ত্র) চুক্তিভঙ্গ (মি থ্র্ দ্রু জ্, সং. মি ত্র দ্রু হ্=মি ত্র দ্রো হ) নানাবিধ সাহস, অর্থাৎ আক্রমণ, বলাৎকার, আঘাত প্রভৃতি, এবং এতৎসংক্রান্ত দণ্ডবিধি। পারসীদের প্রাচীন দণ্ডবিধি

১৪। যাহা কিছু কু, পাপ, মন্দ, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা অ ঙ্ র ম ই ন্যু।

সম্বন্ধে যাহা কিছু এখানেই আছে। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত নানাবিধ অশুদ্ধি ও শুদ্ধিবিধি। শব ও সন্তানপ্রসব অশুদ্ধির প্রধান স্থান। শবের সংকার, প্রসূতির আচার, শব ও প্রসূতির সংসর্গে অশুচি দ্রব্যাদির শুদ্ধি, শবসংকারের স্থান (দ খ্‌ ম,[১৫] Tower of Silence) শবস্পর্শে শুদ্ধির জন্য বিহিত সুবৃহৎ শুদ্ধি-অনুষ্ঠান, ইত্যাদি এই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কুকুর, সজারু প্রভৃতির সম্বন্ধে বিবিধ কথা, তাহাদের বধের দণ্ড। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ উদ্বিড়ালের সম্বন্ধে, ইহার বধের প্রায়শ্চিত্ত। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে পঞ্চবিধ পাপ, অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গ, ভ্রূণহত্যা, অবৈধ সন্তানের ও তাহার মাতার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য, ইত্যাদি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ঋতু-অবস্থায় স্ত্রীলোকের আচারবিধি। অষ্টাদশে কাটা নখ ও চুলের সম্বন্ধে বিধান। কাটা নখ ও চুল অতি অশুচি পদার্থ। অষ্টাদশে বিবিধ বিষয় রহিয়াছে, যথা যোগ্য ও অযোগ্য যাজক বা পুরোহিতের (আ থ্র বা, সং. অ থ র্বা, অ থ র্ব ন্‌ হইতে) গুণ দোষ, মোরগের পবিত্রতা,—মোরগ অগ্নির রক্ষা ও পরমেশ্বরের স্তুতির জন্য জগৎকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দেয়; বেশ্যার (জ হি, সং. জ সি) দোষ; এবং ঋতুমতী (চি থ্র ব তী, সং. চি ত্র ব তী) স্ত্রীর সহিত সংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে অঙ্গ্রমইন্যু ও তৎপ্রেরিত দৈত্য বুইতির[১৬] জরথুশ্‌ত্রকে আক্রমণ, এবং জরথুশ্‌ত্রের বিজয় লাভ। ইহা বুদ্ধদেবের সহিত মারের দ্বন্দ্ব, এবং

১৫। এই শব্দটি দাহার্থক দ জ্‌ সংস্কৃত দ হ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন। হইতে মনে হয়, শবের দাহ-প্রথাও এই সমাজে অতিপ্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল।

১৬। কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধধর্ম্মকেই পুরুষধর্ম্মারোপে (personifaction) বু ই তি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে Darmesteter সাহেবের মন্তব্য এইরূপ:—"Buti is identified by the Greater Bundahish with B u t, the idol, worshipped by Budasp (a corruption of Bodhisattva). Buiti would be therefore a personitification of Buddhisim, which was flourishing in Eastern Iran in the two centuries before and after Christ. Buidhi (Frag. XI. 9) may be another and more correct pronunciation of Bodhi." S B. E Vol. IV (Second edition), p 209.

খৃষ্টের প্রতি সয়তানের প্রলোভন-প্রদর্শনকে মনে করাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া শবস্পর্শে অশৌচের প্রতিবিধান ; ব রে স্ ম ন্-অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধি; শবসংসর্গে অপবিত্র বস্ত্রাদির গোমূত্র (প ও ম এ ব,[১৭] সং. গো মে হ), জল, ও গন্ধ দ্রব্য দ্বারা শোধন ; মৃত্যুর পর আত্মার গতি, আত্মার চি ব দ্ সেতুকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গ বা নরকে গমন, জরথুশ্ত্রের জন্মে অঙ্গ্রমইন্যু ও ইন্দ্র-প্রভৃতি অন্যান্য দৈত্যগণের (অবেস্তার ভাষায় দেবগণের) নরকের দ্বারস্থিত পর্ব্বতে (অ রে জূ র)[১৮] পলায়ন।

বিংশ হইতে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে প্রধানত ঔষধের উৎপত্তি, নানাবিধ ব্যাধির ঔষধ, ভৈষজ্য ঔষধ, সম্মোহন, ও এতৎসংক্রান্ত আখ্যায়িকা।

৪। খো র দ হ্ অ বে স্তা। কেহ-কেহ উচ্চারণ করেন ও লিখিয়া থাকেন খু র দে অথবা খো র দে অ বে স্তা। নামেই বুঝা যাইতেছে ইহা ক্ষু দ্র অবেস্তা। যস্ন-প্রভৃতিতে উক্ত মন্ত্রসমূহকে প্রধানত যাজক বা পুরোহিত পাঠ করেন, খো র দ হ্ অবেস্তায় সংগৃহীত মন্ত্রগুলি প্রধানত গৃহস্থের নিজের পাঠ্য। ইহাতে বিভিন্ন-বিভিন্ন সময়ে ও দৈনিক পাঠ্য প্রর্থনাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে ; যেমন, অ ষে ম্ বোহূ, অ হু ন ব ই র্য্য, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, কু শ্ তী (অ ই ব্যা ও ঙ্ হ ন) অর্থাৎ বেদপন্থীর মোঞ্জীবন্ধন বা যজ্ঞোপবীত ধারণ, অহুর মজ্‌দার নামাবলী, এবং দিক্, উষা, ইত্যাদি বিবিধ দেবতার স্তুতি আছে। য শ্ ত নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্র-গুলি এই খো র দ হ্ অবেস্তারই অন্তর্গত। অহুরমজ্‌দা, সপ্ত অমেষ স্পেন্ত (অর্থাৎ অহুরমজ্‌দার অনুচর সপ্ত দেব), স্বর্গীয় নদী, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির স্তুতি ইহার মধ্যে আছে। এই য শ্ ত সমূহের মধ্যে অনেক প্রাচীন আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, এগুলি অত্যন্ত উপাদেয়। প্রাচীন ইরাণীয় আখ্যায়িকার প্রধান মূল এইখানেই পাওয়া যায়। যস্ন ও বেন্দীদাদেও মধ্যে কতক আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, কিন্তু যশ্‌তের তুলনায় সেগুলি সংক্ষিপ্ততর। খোরদহ্ অবেস্তার কতক অংশ, পাজন্দ বা ফারসীতে লিখিত।

১৭। পারসীরা সাধারণত গো মে জ: বলেন।

১৮। ইহা উত্তরদিকে ; বেদপন্থীর নরক দক্ষিণদিকে, অবেস্তাপন্থীর উত্তরদিকে।

৫। ইহা ছাড়া অবেস্তার কতক খণ্ডিত অংশ আছে। ইহার মধ্যে হোধোখ্ত নস্কের[১৯] দুই-একটি অংশ পাওয়া যায়। অন্যান্য নস্কেরও কোনো কোনো উদ্ধৃত বাক্য পাওয়া যায়। নীরঙ্গিস্তান প্রভৃতিরও কিছু-কিছু থাকিয়া গিয়াছে। এ সমস্তই বৃহৎ অবেস্তা-সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ। এই সমস্তকে লইয়া, পূর্ব্বোক্ত চারিটি ছাড়া, অবেস্তা-সাহিত্যের আর একটি বিভাগ করা হইয়া থাকে।

জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত মূল অবেস্তায় লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া তৎসংক্রান্ত পহ্লবী ভাষার লিখিত গ্রন্থসমূহও আলোচ্য। পহ্লবীতে লিখিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশ মূল অবেস্তার অনুবাদ। ইহাতে প্রাচীন মূল ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু কথা লিখিত হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পঞ্চপল্লব

জাপানের শিল্পোন্নতি

Asia, January 1920.

জাপানের শ্রমজীবীদের বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থার তুলনা করিয়া জনৈক-জাপানী Asia নামক মার্কিন-দেশীয় পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সামন্ততন্ত্রের শাসনকালে শ্রমজীবী ও শিল্পীদের অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল ছিল ইহাই তাঁহার বক্তব্য। আমাদের এদেশের ন্যায় জাপানেও তখন জাতিভেদ ছিল, এদেশের ন্যায় সেখানেও কোনো ব্যক্তি আপনার পেশা ত্যাগ করিতে পারিত না।

---

[১৯]। সমস্ত অবেস্তা ২২ নস্কে বিভক্ত। নস্ক শব্দের অর্থ শ্রেণী (Series)।

সেইজন্য সমাজবন্ধন কঠোর ছিল। শিল্পিগণের কার্য্য পাইতে কোনো কষ্ট হইত না। শিল্পশিক্ষার কোনো বিদ্যালয় না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ শিল্প পরিবারের মধ্যে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিত। জাপানের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার মূলে এই সমস্ত সাধারণ লোকই ছিল। সাধারণ লোক বলিতে আজকাল কতকগুলি শ্রমজীবী বা কলের কতকগুলি কুলি মাত্র বুঝায়, কিন্তু তাহারা যে একটা সজীব প্রতিষ্ঠানের জীবন্ত অঙ্গ, জাপান একথা এখন ভুলিতে বসিয়াছে। কিন্তু জাপানের মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের শাসনকালে অনেক তথাকথিত বর্ব্বরতা থাকা সত্বেও মানুষ তখন তাহার মনুষ্যত্বটুকু বজায় রাখিতে সক্ষম ছিল। পরে সভ্যতার বিস্তারের সহিত সে সমাজে স্থান হারাইয়াছে। তিন শত বৎসর ধরিয়া সামন্তদের কুশাসনের ফলে জাপানের খুব দুর্দ্দশা হওয়া সত্বেও সাধারণ লোকদের দশা বর্ত্তমানের ন্যায় শোচনীয় হয় নাই।

গত ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে জাপানের এই যুগান্তর সাধিত হইয়াছে। এখন প্রাচীন জাপানকে চেনা কঠিন। নূতন জাপানে যখন পশ্চিমের বাণিজ্যতরঙ্গ আসিয়া টোকিও সরকারকে উদ্বোধিত করিল তখন জাপানে কারিকরের অভাব হয় নাই। প্রাচীন সমাজের অশিক্ষিত কর্ম্মকার সূত্রকর ও তন্তুবায়গণই সরকারের স্থাপিত কারখানায় জটিল কলকব্জা এবং বাষ্পীয় যন্ত্রাদি চালাইতে আরম্ভ করে। তখনো জাপানের পলিটেক্‌নিকাল কলেজ হইতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজার হইয়া বাহির হন নাই। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকিল না। অল্প দিনের মধ্যে দেশের এক শ্রেণীর মহাজন দেখা দিলেন। সরকারের সাহায্যে তাঁহারা অচিরেই ক্ষমতাশালী ও ধনী হইয়া উঠিলেন। এক পুরুষের মধ্যেই জাপান য়ুরোপের শিল্পবাণিজ্যের নীতি অবিকল অনুকরণ করিয়া সভ্যজাতির পংক্তিতে গিয়া দাঁড়াইল। জাপানকেও নেশনের নেশায় ধরিয়াছে। তাই সাধারণ হইতে এক শ্রেণীর লোককে পৃথক করিয়া রাজা ও প্রজার মধ্যে খাড়া করানো হইয়াছে। তাহারাই বাণিজ্যনীতি রাজনীতির চালক। প্রজাদের কথা শুনিবার তাহাদের অবসর

নাই। জাপানের ন্যায় এমন আমলাতন্ত্রপ্রধান শাসনপদ্ধতি খুব কম স্থানেই আছে। শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে যে সব নিয়ম আছে, তাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। জাপানে শ্রমজীবীরা কোনো প্রকারে দলবদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্মঘট করিলে শ্রমজীবীদের ছয় মাস সশ্রম কারাবাস হয়।

শ্রমজীবীদের পত্নী ও কন্যাদের অবস্থা পুরুষদের অপেক্ষাও শোচনীয়। বয়নশিল্পের ও রেশমের কারখানার জন্য গ্রাম হইতে মেয়ে কুলি নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হয়। তাহারা প্রচুর বেতন ও নানারূপ সুবিধা পাইবে এই বলিয়া কলওয়ালাদের লোকেরা তাহাদিগকে ভুলাইয়া আনে। কোম্পানীর কারখানার সংলগ্ন উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত আবাসে তাহারা প্রায় কয়েদীর মতই দিন কাটায়। আহারাদি এমন জঘন্য যে, তাহা শূকরেও স্পর্শ করিবে না। জাপানে শ্রমজীবীরা কাজ করে দিনে ১৪ ঘণ্টা! মাসে ছুটি পায় মাত্র দুইদিন! জাপান পৃথিবীর সমস্ত বাণিজ্য লুটিতে বসিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে যে, সাধারণ লোকের প্রাণশক্তি শুষিয়া লইতেছে একথা বড় লোকে ও ব্যবসাদাররা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। যেমন করিয়াই হউক জাপান-'নেশনকে' বড় করিয়া তুলিতে হইবে ইহাই হইয়াছে তাহাদের মূলমন্ত্র।

বর্ত্তমানে জাপানে ৭ লক্ষ হতভাগ্য বালিকা বয়ন ও অন্যান্য কলে কাজ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনের বয়স বিশ বৎসরের কম। মেয়েদের ব্যাধির অনুপাত পুরুষদের অপেক্ষা শতকরা পাঁচেরও অধিক। অধিকাংশ মেয়েরা এই ভীষণ শ্রম সহ্য করিতে না পারায় প্রায়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। জাপানের কলকারখানা রাত দিন চলে। গড়ে প্রত্যেক মেয়েকে ১২ ঘণ্টা করিয়া রাতে-দিনে খাটিতে হয়। সাত বা দশ দিন পরে এক দিন রাতের কাজের সহিত দিনের কাজের সামঞ্জস্য করিবার জন্য ১৮ ঘণ্টা খাটিতে হয়। ১৯১২ সালে ৫ লক্ষ ১৫ হাজারের উপর মেয়ে ফ্যাক্টরীতে কাজ করিত; ৪৫ হাজার দিন-মজুরি করিত ও প্রায় ৩০ হাজার সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিল। ইহার মধ্যে বেসরকারী কারখানাতে ৫৪ হাজারের উপর ও

সরকারী কাজে নিযুক্ত ২ হাজার মেয়ের বয়স ১৪-এর কম। এখনো জাপানের ফাক্টারীতে ১২, এমন কি কোনে-কোনো জায়গায় ১০ বৎসর বয়সের মেয়েও কাজ করিতেছে। মহাজনেরা বিজ্ঞাপন দেন যে, তাঁহারা শ্রমজীবীদের জন্ম সামাজিক জীবনযাত্রার প্রণালী ও ভদ্রতা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা রাখেন। কিন্তু ১২।১৪ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমের পর কোনো বালিকা বা কোনো লোক কিছু শিক্ষা করিতে পারে কি? বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপানের বাণিজ্য বহুগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু প্রতিবৎসর দুই লক্ষ বালিকাকে তাহার নিকট বলি দিতে হইতেছে।

এই হইতেছে বর্ত্তমান জাপানের শিল্পোন্নতির একদিকের মূর্ত্তি। বাণিজ্যের তালিকা দেখিলে অকস্মাৎ আমাদের মন নাচিয়া উঠে; কিন্তু ইহার পশ্চাতে কত লক্ষ হৃদয়ের রুদ্ধ ক্রন্দন ও কত সুন্দর হৃদয়ের অকাল মরণের ইতিহাস রহিয়াছে তাহা জাপান ভাবিতেছে না।

ভারতবর্ষও সেই পথে চলিতেছে। য়ুরোপ বহুকাল ধরিয়া যে শিল্পবাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল,—এবং যাহাকে সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া মনে করিতেছিল, সেই সভ্যতার বোঝাই-নৌকা যখন আঘাত খাইয়া ডুবিয়া গেল, তখনো কি আমাদিগকে নূতন করিয়া এই সমস্যা ভাবিতে হইবে না?

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দলবদ্ধ ইতরপ্রাণীদের বিধিব্যবস্থা

By George R. Belton.

আইন বিধিনিষেধ প্রভৃতি কথাগুলো মানুষের সঙ্গে এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে, মানবেতর জীবের মধ্যেও যে নিয়ম এবং বিধি, সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়-ভাবে বিরাজমান, সে কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। বস্তুত পশুসমাজে নিয়ম যে

নিষ্ঠার সহিত অনুসৃত হয় এবং যেরূপ বলপূর্ব্বক পালন করাইয়া লওয়া হয়, মানবসমাজে তাহা দেখা যায় না। ভৌগোলিক সীমা কাটাইয়া, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্রই জন্তুদের দলবদ্ধ থাকার ভাব যেপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, মানুষের অনেক বুদ্ধি খরচ করা নিয়মের সঙ্গে তাহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। বস্তুত বড় বড় ছাঁদের কথার ছটার মধ্যে আমাদের যে সব আইন চাপা আছে, খোঁজ করিলে পশুদের আদিম সংস্কারের মধ্যে তাহাদের সবগুলিকেই পাওয়া যায়। সমাজবদ্ধ মানুষ এবং দলবদ্ধ জন্তুর মধ্যে যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে "Rod and Gun in Canada" নামক গ্রন্থে জর্জ বেল্‌টন তাহার আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত হইল।

গ্রন্থকার বলেন, সুদূর উত্তরে মানুষের আইনের প্রভুত্ব যেখানে পৌঁছায় না সেখানে হিমপ্রলয়ের পূর্ব্বে চামরী গাই জাতীয় (musk ox) পশুর দল যে নিয়মে চলিত আজও সেই নিয়মেই চলে। শত্রু আক্রমণ করিলে, ইহারা মধ্যে অবকাশ রাখিয়া চতুষ্কোণ ব্যূহ রচনা করে—ব্যূহের ভিতরে স্ত্রী ও শাবকদের রাখিয়া পুরুষেরা বাহিরে থাকে। তখন সর্ব্বাপেক্ষা বলবান পুরুষদের একটি ব্যূহ ত্যাগ করিয়া আগাইয়া যায়, তাহার শূন্য স্থান বাকিরা তখনই সরিয়া আসিয়া পূর্ণ করিয়া তোলে—এবং মরিয়া পড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সে আক্রমণকারীর সহিত লড়িতে থাকে। তাহার পতনের পর আর একজন অগ্রসর হইয়া যায়। আক্রমণকারী পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই ভাবে লড়াই চলিতে থাকে। ফ্রান্স হইতে ল্যাব্রেডর পর্য্যন্ত, সবে মাত্র বরফে ঢাকা পড়িয়াছে, এমন ভূভাগের উপর এই পশুর দল যে কালে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, তখনকার দিনে ইহাই ছিল শ্রেষ্ঠ যুদ্ধকৌশল। কিন্তু সেই যুদ্ধপদ্ধতিই আজিকার দিনে তাহাদের দলের সর্ব্বনাশ করিতেছে—কারণ আজ রিপিটিংরাইফেলে সজ্জিত নির্ম্মম মানুষই হইয়াছে তাহাদের শত্রু। অসীম উদ্যমশীল মানুষ আজ অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজেকে রক্ষা করিবার কোনও পদ্ধতি musk ox আজও অবলম্বন করে নাই। অবস্থান্তরের সহিত

সামঞ্জস্য ঘটাইয়া লইতে যে জীব পারিল না, মৃত্যু তাহার সুনিশ্চিত। সে হিসাবে musk ox এর আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে—যদি না এখন মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া তাহাকে রক্ষা করে।

মানুষের যে গুণ আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা যে নিয়মকে চিরদিন চরম বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন, যাহার বলে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে নিমজ্জমান জাহাজের উপর হইতে পুরুষের মুখে শোনা যায়—শিশু এবং স্ত্রীদের আগে রক্ষা কর আমাদের কথা থাক্—musk ox এর যুদ্ধপ্রণালীর মধ্যে দেখিতেছি সেই গুণ সেই নিয়মই কাজ করিতেছে। পৌরুষের এই বিধিই কি উত্তর ক্যানেডার লুপ্তপ্রায় এই পশুপালদের রক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠ মানুষের সেই মনুষ্যত্বের কাছেই তাহার মিনতি জানাইতেছে না!

লেখক আরও বলেন—এমনও অনেক নিয়ম আছে যাহা জন্তুদের অসহায় প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, দলই এগুলিকে জোর করিয়া ব্যক্তির উপর চালায়। আমেরিকার কাকদের মধ্যে দেখা যায়, দলের সকলে মিলিয়া একজনের উপর চড়াও হইয়া হঠাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলিল। কারণ খোঁজ করিতে গেলে দেখা যায়, হতভাগ্য হয়ত দলের অন্য কাহারও কিছু চুরি করিয়াছিল। অসতর্কভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়া দল কোথায় আছে শত্রুর কাছে তাহার সন্ধান বলিয়া দেওয়াও প্রাণদণ্ডের যোগ্য আর একটা অপরাধ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন দলের কেহ আহত হইয়া পড়িলে প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর দলই আহতকে মারিয়া ফেলে। এ হইল, সমাজরক্ষার জন্য ব্যক্তিকে বলিদান দেওয়া।

সমাজচ্যুত মানুষের ন্যায় সমাজচ্যুত নেকড়ে বাঘ আছে। ইহারা দল হইতে বহিষ্কৃত অর্থাৎ "এক ঘরে" হইয়া একলা ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্যানেডার একঘরে কাকেরা দলের সঙ্গে থাকে না এবং সুযোগ ঘটিলেই যেন বুদ্ধিবিবেচনা করিয়া, দল কোথায় কি অপকর্ম্ম করিতেছে সে সন্ধান তাহার পরম শত্রু মানুষের কাছে ফাঁস করিয়া দেয়। ঝাঁক অথবা দল হইতে এই যে বহিষ্কার, এ কেন হয়? ইহার কারণ ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—"যাহারা না মানে শাসন না মানে

বারণ না মানে কাহারে” সেই সব অদম্য মানুষরা যে কারণে সমাজের সম্প্রদায়ের এমন কি সভ্যতারও গণ্ডীর বাহিরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সেই কারণই কাজ করিতেছে।

গো-মহিষ প্রভৃতি জন্তুদের মধ্যে দেখা যায়, স্ত্রীজাতির শিং সোজা এবং ছুঁচাল, কিন্তু ষাঁড়দের শিং ভোঁতা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা পাক খাইয়া ভিতরের দিকে এমনভাবে হেলিয়া থাকে যে তাহার দ্বারা গুরুতর কোনও অনিষ্ট করা সম্ভবপর নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ যেন ঠিক হইল না। নারী-জাতির অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে কথাপ্রসঙ্গে কোনও লেখক এইজন্য বিধাতার প্রতি অনেক দোষারোপ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সৃষ্টির সময় সৃষ্টিকর্ত্তার পাশে ইঁহারা ছিলেন না, থাকিলে কিছু কিছু উপদেশ দিয়া অনেক ভ্রমপ্রমাদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন! আমেরিকার বিশাল তৃণারণ্যগুলির মধ্যে দেখা যায় গরুর বড বড় পাল এক-একটি বিরাট ষণ্ডের নেতৃত্বে চরিয়া বেড়াইতেছে এবং ইহাদের আওতায় পুরুষ শাবকগুলি ক্রমে সবল হইতে সবলতর হইয়া উঠিতেছে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এই সকল তরুণেরা দলপতির শৃঙ্গাঘাতে হত হোক, প্রকৃতির এ ইচ্ছা নয়। কাজেই প্রভুত্বের জন্য যখন লড়াই বাধে তখন সত্যকার দুর্ব্বলেরা মারা পড়িলেও, শক্তিতে যাহারা উনিশবিশ তাহারা পরাজিত হয়, মার খায়, কিন্তু এই বাঁকান শিংএর জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া যায়। কাজেই দলপতি কোনও কারণে মারা পড়িলে তাহার স্থান অধিকার করিবার মত জন্তুর অভাব ঘটে না। বৃদ্ধনেতা সত্যই যখন অশক্ত হইয়া পড়ে, তখন দলের নিয়ম-অনুসারে কোন অল্পবয়স্ক শক্তিমান তাহাকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। জাতির ভবিষ্যৎ যে সকল বিধির উপর নির্ভর করে, তাহার সবগুলির দিক দিয়া এই বিধিই ঠিক এবং প্রশস্ত।

পাখীর ঝাঁক এবং পশুপালের এই যে সব বিধি এ নিয়ম, এবং সকল প্রকৃতি-দেবীর আড়ালে থাকিয়া ঘুরাইয়া প্যাঁচাইয়া কাজ সিদ্ধ করিয়া লওয়ার ফন্দী ভিন্ন কিছুই নহে। এখনকার জ্ঞানী ও গুণীদের এই যে মত, লেখক এ সম্বন্ধে

দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এক বক্তৃতায় শুনিয়াছিলাম স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, গৃহের প্রতি অনুরাগ, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি যাহা কিছু, তাহা মানুষকে জীবসৃষ্টির কার্য্যে নিযুক্ত রাখার জন্যই।" কথাটা ঠিক এইভাবে না বলিলেও, অল্প একটু মাজিয়া ঘসিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার আর কোনও অর্থ হয় না। তাঁহার ভাবখানা এই—বিধাতা লুকাইয়া একটা চাল আমাদের উপর চালিয়া আসিতেছিলেন, বক্তা তাঁহার সে বুজরুকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাবিন পক্ষী যে চিরদিনের মত একটি সঙ্গিনীকে বাছিয়া লয় এবং আমরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলে, তাহার কি কৈফিয়ত? পশুপালের জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে সব নিয়ম আছে, ইহাও ত তাহারই মত অলঙ্ঘনীয়। কোনও রাজা বা পুরোহিত ত তাহার কাছে এ সম্বন্ধে কোনও আদেশ প্রচার করেন নাই। সিংহ যে সিংহীর প্রতি চিরদিন অনুরক্ত থাকে, সে কি সমাজের ভয়ে? ব্যাঘ্র যে তাহার শাবকদের জন্য শিকার ধরিয়া ফিরে, সে কি সন্তানদের না খাওয়াইলে পাছে জেলে যাইতে হয়, সেই আশঙ্কায়? এ কাহার লিখন যে রাজহংস তাহার শাবকদের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, লার্ক পাখী তাহার অসহায় শাবকদের খাওয়াইবার জন্য নিজের সঙ্গীত বন্ধ রাখিবে?

বিজ্ঞানের একদিক-ঘেঁসা অনেক মতবাদের বিরুদ্ধে পুরাতন ধর্ম্মসংস্কার আজও থাকিয়া থাকিয়া মাথা তুলিতে চাহিতেছে। লেখক বলেন, এমন কি সেই বিশ্বেশ্বরের পূজার একটি ভাবও পাখীর ঝাঁক ও পশুপালের মধ্যে আবছায়ার মত অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে।

বিলাপী বানরদের প্রত্যুষে সূর্য্যের অভিমুখে প্রণাম এবং উচ্চশব্দ, কে কিসে করায়? অন্ধকারের অবসানে বিহঙ্গের যে কাকলী, এ কেন আসে? শাবক-গুলিকে আহার-তৃপ্ত সুস্থ ও সুখী দেখিলে আনন্দের যে কল-গান যে উল্লাসে তাহার কণ্ঠে বাজিয়া উঠিয়া আকাশকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এ কেন? বনের নিভৃত ছায়ায় ইহা জীবনের স্তবগান,—জীবনের যিনি জীবন তাঁহার প্রতি সচেতন প্রণতি ইহা যদি না হয়!

প্রত্যূষে তৃণারণ্যের মধ্যে জন্তুদের যে সকল বিকট অদ্ভুত আচার-আচরণ দেখা যায়, মানুষের আদিম পিতৃপুরুষদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত তাহার খুবই সাদৃশ্য আছে। জন্তুদের মধ্যেও সৎ-অসৎ ভালমন্দ দল আছে, ইহা কেন হয়? বন্যজন্তুদের একই শাখার কোনও উপজাতি ভয়ঙ্কর হিংসাপ্রাণ, কোনটা বা শান্ত, কেহ নীচ প্রকৃতির, কেহ বা উদারহৃদয়। আবার উপজাতির মধ্যেও ছোট ছোট দল আছে, ইহাদের কোনটা অপেক্ষাকৃত ভাল, কোনটা মন্দ। 'ব্যক্তির' সমষ্টি হইল দল, কিন্তু অনেক ব্যক্তির বুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগের সমষ্টি দলের বুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগ নহে, শেষোক্ত পদার্থটি স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন আর একটি পদার্থ। আমেরিকায় দীর্ঘ তৃণাবৃত ক্ষেত্রে যে এক জাতীয় নেকড়ে বাঘ দেখা যায়, ব্যক্তি-হিসাবে তাহাদের মত ভীরু খেঁকী নীচ কাপুরুষ জন্তু আর আছে কিনা সন্দেহ। অথচ দলবদ্ধ অবস্থায় ইহাদের যে বীরত্ব তাহা বিস্ময়াবহ। তখন ইহাদের সকলেই সম্পূর্ণ ভয়হীন, শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত! দলের এই প্রভাব মানুষের মধ্যেও দেখিতে পাই। হত্যাকারী সন্দেহ করিয়া একজনের রক্তপাতের জন্য একদল লোক ক্ষেপিয়া চেঁচাইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে, এ দৃশ্য আমি নিজে দেখিয়াছি। পরমবিস্ময়ের বিষয় এই দলের নায়কদের মধ্যে এমন সব লোক ছিলেন, যাঁহারা তাহার পূর্ব্বদিনে, দণ্ড মাত্রই সভ্য মানুষের বর্জ্জনীয় এমন কি আইন আদালতেরও দণ্ড দিবার অধিকার নাই, এমন কথা খুব জোর করিয়া বলিয়াছিলেন। ব্যক্তি-হিসাবে ইঁহাদের শান্ত-শিষ্টতা এত বেশী যে তাহা বাড়াবাড়ি, অন্যায় বলিলেই হয়। কিন্তু যখন দলের পাঁচজনের একজন তখন অবস্থাক্রমে ইঁহারা রক্তপিপাসু দুর্বৃত্ত! পশুপাল এবং পক্ষীর ঝাঁকের মধ্যে দলের যে আবছায়া ভাব লুকাইয়া আছে, "সব্-সাইকলজি" হইল মানুষের মধ্যে তাহারই আবির্ভাব মাত্র!

গভীর স্থির জলের নীচে ক্ষুদে ক্ষুদে মাছের দল হয়ত একশত ফুট লম্বা বিশ ফুট চওড়া স্থান জুড়িয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমে যাইতেছিল, অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে নূতন ব্যূহ রচনা করিয়া তীরবেগে দক্ষিণে ছুটিয়া চলিল। একে একে আলাদা আলাদা আদেশ পাইলে এ ভাবে হুকুম তামিল করা কাহারও সাধ্য

হইত না। এ সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই যে, একটা সাধারণ আবেগের চালনায় ইহাদের সকলে একদিকে চলিয়াছে। যে কোনও জেলে বা যে কোনও শিকারী প্রাণিদলের এই অতীন্দ্রিয় ভাবের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে। পাখীর ঝাঁক, জন্তুর পাল, মাছের দল, মানুষের সমাজ,—ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজের স্বতন্ত্র একটি ভাব এবং ভাবনা আছে। যে ব্যক্তিদের সমষ্টি লইয়া দল গঠিত, সেই ব্যক্তিদের যে ভাব ইহা তাহার অতীত এবং তাহা হইতে পৃথক। বসন্তের আগমনে যে পাখী তোমার আমগাছে বসিয়া গানে গানে আকাশ ভরিয়া দিয়াছিল, বসন্তের অবসানে অন্য দেশের অন্য আবাসের আহ্বান যখন দলের ভিতর দিয়া তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিল, সে তখন আর সে পাখী নহে, তাহার স্বর পর্য্যন্ত বদল হইয়া গেছে। ব্যক্তিরা অনেকে মিলিয়াই সমাজ অথবা সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। কিন্তু সম্প্রদায় খাড়া হইয়া উঠিবামাত্র (অন্ততঃ কিছুকালের জন্য) নিজের প্রভাবে সেই ব্যক্তিদেরই সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলে; তখন ব্যক্তিরাও দলের প্রয়োজন-অনুসারে নিজেদের বদলাইয়া লইতে থাকে। জন্তুদের পক্ষে যেমন, মানুষেধ পক্ষেও তেমনি, যে ব্যক্তিদের লইয়া দল গঠিত তাহাদের ভাবভঙ্গী আশা-ভরসা একত্র করিয়া ঠিক্ দিলে দলের আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান মেলে না।

লেখক বলেন, যেমন বৃদ্ধশিকারীরা জন্তুর গুহার সম্মুখীন হইবার সময় অনুভব করিতে পারে, স্থানটা নিরাপদ্ কি বিপদ্-সঙ্কুল, তেমনি নূতন কোন সহরে ঢুকিলেই আমি বুঝিতে পারি তাহার ভাবখানা কি! আমাদের প্রত্যেকেরই এই বোধটি আছে। কিন্তু আমরা সকলেই যে ইহার অস্তিত্বসম্বন্ধে সচেতন তাহা নয়। শিকারীর অনুমান যেমন সচরাচর ঠিক হয়, তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নূতন আগন্তুকের কাছে সম্প্রদায় যে ভাবটি প্রকাশ করে মোটা-মুটি তাহাই তাহার সত্যপরিচয়। এক-একজন লোক দেখা যায়, যাহারা এক-একটা নগরকে, এক-এক সম্প্রদায়ের সব স্ত্রীপুরুষকে ইচ্ছামত ভাঙে-গড়ে, ইহারা দলের এই অতীন্দ্রিয় ভাবটিকে ধরিয়া কি করিয়া তাহার সহিত রফা করিয়া কাজ আদায় করিতে হয়, সেই দুর্লভ বিদ্যা লাভ করিয়াছে। এমন সকল লোকের সহিত আমি শিকার

করিতে গিয়াছি, পশুর যূথ তখন কি করিতেছে কি ভাবিতেছে, ক্ষণকাল পরেই তাহারা কোন দিকে কি ভাবে যাইবে প্রভৃতি ব্যাপার-সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান আমার কাছে অমানুষ বলিয়া ঠেকিয়াছে ; তাহা সহজ বুদ্ধির অতীত ঐন্দ্রজালিকের জ্ঞানের মত অত্যদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইয়াছে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝাঁক এবং দলের যে সকল বিধিবিধান ও আইন কাজ করিতেছে, সে সম্বন্ধে অন্ততঃ নিজেদের কাজ চালাইবার মত জ্ঞান এই সকল লোকে লাভ করিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণপরতার দ্বারা অন্তর্নিহিত এই নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে পারিলে, মনুষ্যত্বের আদিম প্রারম্ভসম্বন্ধে অন্ধকার অনেকটা কাটিয়া যাইবে এবং আমাদের মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান কালের আইন-কানুন বিধি-নিষেধের মূলগত তথ্যগুলির রুদ্ধ দ্বারও আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

বিশ্ববৃত্তান্ত

ভূগর্ভের তাপ

পৃথিবীর বড় বড় বনজঙ্গল মানুষের উৎপাতে প্রায় ধ্বংস পাইয়াছে। যেখানে বন ছিল, সেখানে এখন সহরের চল্লিশ পঞ্চাশ-তলা বাড়ি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে কাঠ দুর্লভ হইয়াছে এবং কাঠের জ্বালে কলকারখানার কাজ চালানোও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মাটির তলায় যে পাথুরে কয়লা লুকাইয়া ছিল, সেগুলিতে অনেক দিন মানুষের হাত পড়িয়াছে। কয়লা আর নূতন করিয়া উৎপন্ন হইতেছে না। কাজেই কয়লার ভাণ্ডারও ক্রমে ক্ষীয়মান।

অদূর ভবিষ্যতে কি করিয়া কলকারখানার খোরাক জোগানো হইবে, ইহা দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনো কোনো জায়গায় জলপ্রপাতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এবং নদীকে বাঁধে আটকাইয়া কল ঘুরাইবার কাজে লাগানো হইতেছে। কিন্তু জলপ্রপাত বা নদী সব জায়গায় নাই। কাজেই কল চালাইবার অন্য ব্যবস্থা আবিষ্কার করার দিকে বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়িয়াছে। ভূগর্ভে অনেক তাপ জমা আছে। আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া বাহির হইয়া ইহা এপর্য্যন্ত আমাদের অনিষ্টই করিয়া আসিতেছে। এই তাপকে সুসংযত করিয়া কাজে লাগানো যায় কিনা, ঐ প্রশ্ন লইয়া আজকাল কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তা করিতেছেন। ইটালিতে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। একটু গভীর করিয়া কূপ খুঁড়িলেই সেখানকার ভূগর্ভের তাপ ভূপৃষ্ঠে আসে। ইটালির বৈজ্ঞানিকেরা এই সুযোগটি ছাড়েন নাই। তাঁহারা গভীর কূপ খুঁড়িয়া পৃথিবীর ভিতরকার তাপ সংগ্রহ করিতেছেন। এই সকল কূপ হইতে যে গরম জলীয়বাষ্প উঠে, তাহা দিয়া কোনো কোনো স্থানে দশ হাজার ঘোড়ার জোরের টর্‌বাইন্ এন্‌জিন্ চলিতেছে।

সার্ টমাস্ পার্‌সন্ আজকালকার দিনের একজন বড় বৈজ্ঞানিক। টার্‌বাইন্ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ভূগর্ভের তাপে ইটালিতে কল চলিতে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন, যাহা ইটালিতে সম্ভব হইয়াছে, তাহা অন্যত্রও হইবে। ইঁহার গণনায় পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বারো মাইল গভীর কূপ খুঁড়িলেই নানা আকারে অজস্র তাপ ভূপৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কুলি-মজুরেরা যাহাতে ভূগর্ভের এত গভীর স্থানে গরমের মধ্যে নিরাপদে কাজ করিতে পারে, তাহার উপায়ও ইনি চিন্তা করিতেছেন। পার্‌সন্ সাহেব হিসাব করিয়া বলিতেছেন, পনেরো লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে পঁচাশী বৎসরে বারো মাইল গভীর কূপ খোঁড়ো যাইবে।

গত মহাযুদ্ধে কেবল ইংরেজের তরফে প্রতিদিন কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে শুনিয়াছি। সুতরাং কেবল পনেরো লক্ষ টাকা ব্যয় হিসাবের মধ্যে না আনিলেও চলে। পঁচাশী বৎসর সময়টা কিছু দীর্ঘ,—কিন্তু কূপখননের নূতন যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ

করিলে এই সময়টাকে খাটো করিয়া আনা অসম্ভব হইবে না। এই ব্যাপারে হাত দিলে অন্য কোনো বিঘ্ন আসিবে কিনা, এখন ইহা লইয়াই আলোচনা চলিতেছে। বারো মাইল গভীর কূপ খুঁড়িতে উপরকার মাটির চাপে পাছে পাশের পাথর খসিয়া পড়ে এবং কূপকে বুঁজাইয়া দেয়;—এই আশঙ্কা কাহারো কাহারো মনে জাগিয়াছে। জনৈক বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন—চুণের পাথরে পনেরো মাইল গভীর কূপ অনায়াসে টিকিয়া থাকিতে পারে এবং গ্রানাইটের মত কঠিন পাথরে কুড়ি মাইল গভীর কূপ খুঁড়িলেও কূপের কোনো অনিষ্ট হইবে না।

পার্‌সন্‌ সাহেবের প্রস্তাবে কোনো এজগবি কথা স্থান পায় নাই। ইহাতেই আশা হয়, আর কয়েক বৎসর পরে ভূগর্ভের তাপে চালিত কল হয় ত আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইব।

জ.

চীনের অক্ষর

Asia পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯১৯) প্রকাশিত হইয়াছে, জনৈক চীনবাসী একবার বলিয়াছিলেন যে, ভারতের অধঃপতনের কারণ সেখানকার জাতিভেদ, ও চীনের উন্নতির অন্তরায় সেখানকার ভাষা-বৈষম্য। একথা বর্ণে-বর্ণে সত্য। চীনের সরকারী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র উচ্চ-উপাধি লাভ করিয়া যখন বাহির হয়, তখন তাহার ভাষার সম্বল প্রায় ৪০ হাজার শব্দ। কিন্তু ৪০ হাজার শব্দ কোনো মানুষের ভাষা-ব্যবহারে লাগে না। এই ভাষার দুরূহতাই চীনের সাধারণ অজ্ঞতার প্রধান কারণ। চল্লিশকোটি লোকের মধ্যে শতকরা ৫ জন কোনোরূপ লেখাপড়া জানে। উত্তম চীন-ভাষাবিদের সংখ্যা শতকরা ২ জনেরও কম।

এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য ও জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি করিবার

উদ্দেশ্যে বর্ণমালা-সমস্যায় চীনসাধারণতন্ত্র মনোযোগ দিয়াছেন। চীন ভাষার বিশেষত্ব এই যে, ইহার এক-একটি শব্দ একাক্ষরিক (Monosyllabic)। পিকিনের বিভাষায় ৪২০টি একাক্ষরিক শব্দ আছে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ক্যাঙ্ হাই, চীনভাষায় যে অভিধান লিখিয়াছিলেন তাহাতে ৪৪,৪৪৯টি শব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ৪২০টি একাক্ষরিক শব্দের প্রত্যেকটির গড়ে ১০৫টি করিয়া অর্থ। এই অর্থ জানিবার উপায় দুটি—প্রথম উচ্চারণ করিয়া শুনা; দ্বিতীয় প্রয়োগ-স্থান বুঝা। চীনের সংস্কৃত বর্ণমালায় ৩৯টি অক্ষর তৈয়ারি করা হইয়াছে; এই বর্ণমালা ধ্বনিমূলক। এই প্রথানুসারে শিক্ষা দিয়া খৃষ্টান পাদরীরা চীনাদের বহুযুগের অজ্ঞতা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানলাভের উপায় সহজ হওয়ায় লোকের উৎসাহও সেই সঙ্গে বাড়িয়াছে। কুলী-মজুরেরা পর্য্যন্ত নূতন বর্ণমালা লিখিয়া সহজে চীনা ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিতেছে। যে সব চীনা কুলী যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সে গিয়াছিল তাহাদিগকে এই বর্ণমালার ভিতর দিয়া সহজে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। চীন সাধারণতন্ত্র ১৯১৮ সালে এই বর্ণমালাকেই রাষ্ট্রীয় লিপি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহার প্রচারকল্পে প্রথমে সরকারী নর্ম্মাল স্কুলে, ও তৎপরে নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে ধীরে ধীরে ইহা শিখাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই লিপিতে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঠশালায় বিদ্যার্থীদের চীনা অক্ষর আয়ত্ত করিতেই বহু বৎসর লাগিয়া যাইত, এখন সেখানে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই দুর্ব্বোধ্য বর্ণমালা অভ্যস্ত হইতেছে। খৃষ্টান্ পাদরীরা প্রথমে ইংরাজী (রোমান) হরফে চীন ভাষা শব্দান্তরিত করিবার প্রয়াস করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল; চীনাভাষাকে ইংরেজি ভাষায় শব্দান্তরিত করার সুবিধা হয় নাই। সেইজন্য দেশীয়ভাবে এই বর্ণমালার সংস্কারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সংস্কারের চেষ্টা এই প্রথম নহে, ইহার পূর্ব্বেও ৩০।৪০ বার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানের চেষ্টাই দেশব্যাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চীনের এই বর্ণমালার সহিত আমাদের বর্ণমালার খুব একটা যোগ

দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা বিজ্ঞানসম্মত। ইহার উচ্চারণবিধি স্বাভাবিক ধ্বনিকেই অনুসরণ করে। চীনের নূতন ৩৯টি বর্ণের মধ্যে ভারতীয় বর্ণমালার প্রভাব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ইহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্গেরই দুই-তিনটি করিয়া বর্ণ আছে। ধ্বনির জন্য শ, স, ষ, হ, ল, ক্ষ, প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই এই নূতন বর্ণমালায় সংযোজিত হইয়াছে। স্বরবর্ণের মধ্যেও অ, ও, এ, ঐ, ঔ, ং ইত্যাদি বর্ণও রহিয়াছে।

বর্ণমালা সংস্কৃত হওয়ায় ও অক্ষরগুলি সরল করায় চীনাদের নানাদিক দিয়া সুবিধা হইয়াছে। এখন চীনাভাষার জন্য টাইপ্‌রাইটিং যন্ত্রও ব্যবহৃত হইতেছে।

প্র.

—o—

রুষ-বিপ্লব

রুষের অবস্থা এখনও রহস্যময়, বল্‌ষেভিক্ দলের বিরুদ্ধে যে সকল বড সেনাপতি যুদ্ধ করিতেছিলেন তন্মধ্যে য়ুডেলিং, ডেলিকেন ও কুল্‌চাক্‌ই প্রধান। এই তিন জনেরই শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। একমাত্র পোলাণ্ডই বল্‌ষেভিক্‌দের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল, কিন্তু সেও এখন সন্ধির প্রার্থী হইয়াছে। বল্‌ষেভিক্‌গণের বিরোধীদলের সেনাপতিদের পরাজয়ের কারণ কি? বিপ্লবের পরে রুষের পশ্চিম সীমান্তে তিনটি ক্ষুদ্র জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের নাম—লেট্‌স্, ফিন্ ও লিথুনিয়ান্। এই তিন জাতি মিত্রশক্তির খাতিরে ডেনিকেনের দলের প্রতি সহানুভূতি দেখাইত বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদিগকে কোনও সাহায্য করে নাই। "করেণ্ট ওপিনিয়নের" মতে রুষিয়ার উদ্ধারপ্রয়াসী সেনানায়কগণ এই সকল ক্ষুদ্র জাতির স্বতন্ত্র স্বাধীনতার পক্ষপাতী নহেন। এই সকল জাতি মনে করে, রুষিয়ায় এই উভয় দলের মারামারিতে তাহাদের

কোনও বিশেষ লাভ নাই। সুইস্ সংবাদপত্রাদি হইতে জানা যায়, এই গোলমালে পোল্যাণ্ডেরই লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ফরাসীর সহায়তায় সে তাহার রাজ্যবৃদ্ধির কল্পনা করিতেছে।

লয়েড্ জর্জ্জ ও রুষনীতি

ইংলণ্ডের মন্ত্রী চার্চ্চহিল সাহেব বল্‌শেভিক্ দলের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু শ্রমজীবিগণ তাহার ঘোরতর বিরোধী। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ভদ্রসম্প্রদায়ও বল্‌শেভিক্‌দিগের সহিত সন্ধি করার পক্ষপাতী নহেন। প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ পূর্ব্বে এই দলের মতের সহিতই সায় দিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে ডেনিকেনের দলের উপর্য্যুপরি বিফলতা দেখিয়া তিনি মত বদলাইয়াছেন। তাহাতে শ্রমজীবিদল তাঁহার উপর কতকটা সন্তুষ্ট হইয়াছে। লয়েড্ জর্জ্জের মতপরিবর্ত্তনে ফরাসী-সরকারের মুখপত্র "টেম্‌পস্" অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। বিলাতের "লণ্ডন পোষ্ট"ও তাঁহার উপর অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ দ্বীপের সংস্কারপন্থিদল তাঁহার উক্তিতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। কারণ তাহারা যুদ্ধবিগ্রহে আর লোক ও অর্থক্ষয় করিতে চাহে না। বর্ত্তমান সময়ে অবার যুদ্ধ বাধাইবার পক্ষপাতী লোক ইংলণ্ডে বড় বেশী নাই।

এদিকে রুষের বিপ্লবনায়ক লেসিনের মনটাও একটু নরম হইয়া আসিয়াছে। তিনি জগদ্ব্যাপী বল্‌শেভিক্ লড়াইয়ের বিভিষীকা দেখাইয়া যে সকল লম্বা-চৌড়া কথা বলিতেন, তাহা সংযত হইয়া আসিয়াছে। "করেণ্ট ওপিনিয়নে" লিখিত হইয়াছে—"বিলাতের রক্ষণশীল ভদ্রসম্প্রদায়ের তুমুল আপত্তি সত্ত্বেও লয়েড্-জর্জ্জ রুষিয়ার সোভাইত্ গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধির আলাপ চালাইতেছেন। কথাবার্ত্তা খুব গোপনেই চলিতেছে। লণ্ডন ও মস্কোতে কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া

গেলে ওয়াশিংটন ও প্যারিসের দরবারে তাহা পেশ করা হইবে।" বিলাতের ম্যান্চেষ্টার গার্ডেন্ ও হেরল্ড কাগজ সন্ধির পক্ষ অবলম্বন করিয়া লয়েড্ জর্জ্জকে সমর্থন করিতেছে।

ফরাসীরা কিন্তু এই সন্ধির অত্যন্ত বিরোধী। এদিকে প্রতি-বল্‌শেভিক্ রাজ্যের প্রতিনিধি বল্‌শেভিক্ দলের বিনাশকল্পে এবং ইউরোপে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে এক মন্ত্রণাসভায় সমবেত হইয়াছিলেন। "করেণ্ট্ ওপিনিয়নে" প্রকাশ যে, উইল্‌সন্ সাহেবও বোধ হয় শীঘ্রই লয়েড্ জর্জ্জের প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন। ক.

ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা

By F. H. Symonds.

American Review of Reviews. April, 1920.

যুদ্ধশেষের পর দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। মিত্রশক্তির প্রতিনিধিগণ ইউরোপের শান্তিস্থাপনের জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, কিন্তু শান্তি কোথায়! তুর্কি, রুসিয়া এবং এড্রিয়াটিক্ সংক্রান্ত নানা সমস্যার কি মীমাংসা হয় তাহা দেখিবার জন্য পৃথিবী উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। জার্ম্মনির সহিত সন্ধিস্থাপনের ব্যাপার লইয়া ঘরে ঘরে লড়াই চলিতেছে। একদল বলিতেছেন সন্ধির সর্ত্ত বড় কড়া হইয়াছে, একটু সুর নামাইতে হইবে; অন্যদল একেবারে নাছোড়বন্দা।

এই ভীষণ কুরুক্ষেত্রের ফলে ইউরোপের সমস্ত ব্যবস্থা এমনি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে শান্তি আনয়ন করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু শান্তি-স্থাপনকর্ত্তাদের দোষ দেওয়া চলে না। স্বার্থসংঘাতে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে শান্ত করা সহজ নহে।

একদল লোক আছেন যাঁরা ক্রমাগত এই এক বুলি আওড়াইতেছেন যে,

আমেরিকার যুক্তরাজ্য সন্ধির সর্ত্তে সায় দিলে এবং সেই সঙ্গে জার্ম্মনদের সহিত সন্ধিসর্ত্তের কিছু পরিবর্ত্তন করিলেই বুঝি হাতে-হাতে শান্তি লাভ হইবে। ইংলণ্ডের অর্থনীতি-বিশারদেরা এই ধুয়া ধরিয়াছেন। আসল কথা হইতেছে এই যে, এত বড় একটা প্রলয়ব্যাপারের পর ইউরোপের সমস্ত সুব্যবস্থার যে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে, একদিস্তা কাগজের উপর আঁচড় কাটিলেই তাহার ভাঙা দাগ জোড়া লাগিবে না।

ইউরোপে এখন এমন একটা শক্তিকেন্দ্র নাই যার হুকুম কেহ নির্বিচারে মানিয়া লইবে। পারিসের আন্তর্জাতিক মজলিসে কর্ত্তারা নানা আলোচনা করিয়া নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তকে কাজে লাগাইতে পারে এমন শক্তি কাহারো নাই। কাজেই পারিস-মজলিস হইতে যাঁহাদের প্রতি হুকুম জারি করা হইল, তাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে কতক গ্রহণ এবং কতক বর্জ্জন করিলেন।

এই রুসিয়ার কথাই ধরুন—অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সৈন্য লইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া জোর করিয়া তাহাকে বশ না করিতে পারিলে পারিস-মজলিসের মতে উঠিতে-বসিতে সে কোনোক্রমেই রাজি হইবে না। হয় জোর করিয়া তাহাদের বাধ্য কর, না-হয় তোমাদের মতামত তাহাদের ঘাড়ে চাপাইতে যাইও না। মিত্রশক্তিগুলি কখনো রুসিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে, কখনো তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে উদ্যত হইয়াছে যথেষ্ট সৈন্যবল না লইয়া; কখনো বা রুসিয়ার সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছে এমন সময় যখন সে দেশ একেবারে বল্‌শেভিকদের মুঠার মধ্যে।

তুর্কির সমস্যাও রুসিয়ার সমস্যারই সামিল। এখানে ইংরাজ, ফরাসিস্, ইটালিয়ান পরস্পরকে কেহই বিশ্বাস করে না, কেন-না সকলেরই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে। ইটালি এখন ইংরাজদের সহিত মিলিত হইয়া জার্ম্মনির পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ বিভীষিকারূপে তাহাকে দাঁড় করাইবার জন্য নহে, নিজের বাণিজ্যক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিবার জন্য।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এবং ইটালির হস্তে ইউরোপের শান্তিস্থাপনের ভার দিয়া যুক্তরাজ্য এখন সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই তিন জাতির সম্পূর্ণ মনের মিল কখনই হইবে না, কোনোরূপে জোড়া-তাড়া দিয়া তালি দিয়া এখন ইঁহারা কার্য্যোদ্ধার করিবেন। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রতরীর মাঝি উইল্‌সন সাহেব দেখিয়া-শুনিয়া বিরক্ত হইয়া ইঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে জার্ম্মনিকে যে অর্থদণ্ড দিতে হইবে তাহা কমাইবার জন্য ইংলণ্ড এখন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং আমেরিকাকে তাঁহাদের এই মত সমর্থন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ইহা হইলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের খুবই সুবিধা হইবে। এড্রিয়াটিকের মামলার নিষ্পত্তির জন্য ইংলণ্ড ইটালির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমেরিকার পক্ষ লইতে প্রস্তুত, যদি আমেরিকা জার্ম্মনির মামলায় ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন করে। আমেরিকা কৃতসংকল্প না হওয়া পর্য্যন্ত ইংলণ্ড নীরব থাকিবেন। যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে তখন ইংলণ্ড ইটালিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন এবং ইটালি ও ফ্রান্স দুয়েরই বিপক্ষতা-চরণ করিবার জন্য আমেরিকার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন।

ইংলণ্ড কেবলমাত্র নিজের বাণিজ্যবিস্তারের পথ খোলা রাখিবার দিকে দৃষ্টি দিতেছেন। যুদ্ধে ইংলণ্ডরই "পাথরে পাঁচকিল।" যুদ্ধে এবং সন্ধিসর্ত্তে তাঁহারাই জয়ী, প্রতিদ্বন্দ্বী নৌ-বল বিনষ্ট হইল, বাণিজ্যের একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সর্ব্বস্বান্ত হইল; ইউরোপের গৌরবরবি মধ্যগগনে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

ফ্রান্স এবং ইটালির অবস্থা সুখকর নহে। যুদ্ধে এই দুই জাতির যে অর্থদণ্ড হইয়াছে তাহার বিনিময়ে তাহাদের ক্ষতিপূরণ সামান্যই হইয়াছে। জার্ম্মন নৌ-বল শক্তিহীন হওয়াতে ইংলণ্ডেরই সুবিধা হইল, এবং জার্ম্মন উপনিবেশগুলির অধিকাংশ ইংলণ্ড লাভ করিলেন। এদিকে রাইন্ অঞ্চল জার্ম্মনদের দখলে থাকিলে এবং পোলাণ্ড দুর্ব্বল থাকিলে ফ্রান্সের সমূহ ক্ষতি। ইটালি Jugo Slavonic ঐক্য বন্ধনের ভয়ে ভীত, সে জার্ম্মনির সহায়তা করিতে প্রস্তুত। এদিকে ফ্রান্সের সহিত ইটালীর মতের মিল নাই। ফ্রান্স ইচ্ছা

করেন Jugo slav শক্তিসম্পন্ন হউক্ তাহা হইলেই ভবিষ্যতে জার্ম্মনদের জব্দ রাখিবার পক্ষে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিবে।

ইটালি Jugo Slavএর পরম শত্রু। এড্রিয়াটিকে উহাই তাহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী; গ্রীস্ এবং ইটালির সহিত মিলনপথে একমাত্র বাধা।

মোট কথা এই, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংলণ্ড এবং ইটালি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। ইঁহারা পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, জার্ম্মানীর অর্থদণ্ড কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন, পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে রুসিয়াকে এবং Jugo-slavএর বিরুদ্ধে ইটালিকে সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন, জার্ম্মানি এবং অষ্ট্রীয়া মিলিত হইয়া জার্ম্মানিই যাহাতে এই যুক্ত রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতে পারে তাহারও চেষ্টা করিতেছেন, কেননা ইহা হইলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের খুব উন্নতি হইবে। তাই বলিতেছি, যুদ্ধের পর এই যে শান্তিস্থাপন লইয়া মহা গোলমাল চলিতেছে, ইহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই দুই জাতির স্বার্থসিদ্ধি লইয়া। ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিশারদ মেনার্ড কেন্‌স্ সাহেব একটি চমৎকার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ড ছাড়া সকলেই শত্রুপক্ষের নিকট হইতে যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা কমাইয়া দিন্, আমেরিকা যে টাকা মিত্র-শক্তিবর্গকে ধার দিয়াছিলেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করুন, তাঁহারাও পরস্পরের নিকট যে টাকা ধার লইয়াছেন তাহার সম্বন্ধে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন এবং জার্ম্মানির অর্থদণ্ড কমাইয়া দিবেন। এইসকল হইয়া চুকিলে পর আমেরিকার নিকট ঋণভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা আবার দুই হস্ত প্রসারিত করিবেন।

পরের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাদের দিয়া যুদ্ধের খরচের টাকা শোধ করাইতে এবং জার্ম্মানিকে পায়ের উপর দাঁড় করাইতে যে সকল ইংরাজ ধুরন্ধর ইচ্ছা করেন কেন্‌স্ সাহেব তাঁহাদেরই অন্যতম। আমেরিকাকে এখন সাবধান হইতে হইবে। ইউরোপের আর্থিক না হোক্ একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শীঘ্র হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

লইয়া আমেরিকার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। একের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কাইয়া দিয়া মজা দেখিবার ইচ্ছাও আমেরিকার নাই। কিন্তু পোলাণ্ড আমেরিকার অনেক কালের বন্ধু, উহাকে সে ত্যাগ করিতে পারিবে না।

যুদ্ধের সময়, বিশেষত যুদ্ধের পর আমেরিকার উদ্দেশ্যের সহিত মিত্রশক্তিদের উদ্দেশ্যের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু এখন সকলেই আপন-আপন স্বার্থ লইয়া বিব্রত, কাজেই আমেরিকাকে এখন সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

রুসিয়ার অবস্থা কি? একথা ঠিক যে রুসিয়ার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলে ইউরোপ এবং আমেরিকা উভয়েই তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে। এখন Lenin এবং Trotzky রুসিয়ার হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। তাহারা এখন সকল বাধা অতিক্রম করিয়াছে। রুসিয়াকে জয় করা যাইবে না এবং বলশেভিকগণকেও সেখান হইতে দূর করা হইবে না। এখন, হয় রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, নয় সন্ধি করিতে হইবে,—ইহার মধ্যে কোনো মধ্যপথ নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত সন্ধি করা যায় না। রুসিয়ার অন্তর্গত Pole, Lithunian, Lett, Finn স্বাধীনতার জন্য প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। এখন আর সে প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া উহাদিগকে রুসিয়ার অধীনে রাখিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। ইংলণ্ড চান্ পোলাণ্ডের একটা টুক্‌রা পোলস্‌দের দান করিয়া বাকি সমস্ত রুসিয়ার অধীনে থাকে—ইটালিও ইহার সমর্থন করেন। অন্য দিকে রুসিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে এবং সেই সঙ্গে পোলাণ্ডকেও স্বাধীন করিতে ফ্রান্সের একান্ত ইচ্ছা রহিয়াছে। ইটালির ইচ্ছা স্লাভ জাতিদের মধ্যে বিরোধ বাধে, তাহা হইলেই সে এড্রিয়াটিকে নিষ্কণ্টক হইবে। Pan-Slavism যদি গা-মোড়া দিয়া ওঠে তবে তাহার সর্ব্বনাশ। জার্ম্মানিরও পোলাণ্ডের প্রতি নজর আছে। রুসিয়া যেমন আপন সীমাসংলগ্ন পোলাণ্ডের অংশ দখল করিবার জন্য উৎসুক, জার্ম্মানিও তদ্রূপ। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে পোলাণ্ডের লোক সংখ্যা ২৫,০০০,০০০; তাহাকে কাহারও অধীনে রাখা নিতান্ত অন্যায় হইবে।

রুসিয়া এখন বল্‌শেভিকের উন্মত্ত অরাজকতা ত্যাগ করিয়া সংযত এবং শক্তি-

শালী হইয়া উঠিতেছে। সে নেপোলিয়নের ন্যায় দিগ্বিজয়ে বাহির হইলে, একমাত্র পোলাণ্ড ও রুমেনিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারে। এ অবস্থায় পোলাণ্ড আপনাকে সুরক্ষিত না করিলে সে বাঁচিবে না।

তুর্কির অবস্থা কি তাহা আমাদের জানিতে বাকি নাই। অল্পদিন হইল তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

এড্রিয়াটিক লইয়া এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের মীমাংসায় শুধু স্লাভদের নয় গ্রীক্‌দেরও স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। উত্তর এড্রিয়াটিক হইতে স্লাভদের এবং উত্তর Epirus হইতে গ্রীকদের তাড়াইবার অভিপ্রায় ইটালির আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ জাতি মধ্যস্থ থাকিয়া ইহার সুবিচার করিবে? ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স উভয়ই ইটালির সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক। এস্থলে আমেরিকাকেই এই বন্দবস্তের ভার লইতে হয়। সেইজন্য ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকাকে আবার অবতীর্ণ হইতে হইবে! সে না নামিলে ইংলণ্ড কিছুই করিতে পারিবে না। ইংলণ্ড ও আমেরিকা মিলিয়া কাজ করিলেই অচিরে একটা ব্যবস্থা হইতে পারে।

এদিকে জার্ম্মানিতে গৃহবিবাদ সুরু হইয়াছে। জার্ম্মানি এখন যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবুও তাহার সেনাদল আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, কেননা তাহাদের বিশ্বাস তাহারাই আবার জর্ম্মানিকে বাঁচাইতে পারিবে, তাহার উপনিবেশগুলি পুনর্ব্বার জয় করিতে পারিবে; এক কথায় ১৯১৪ সালে জার্ম্মানির যে অবস্থা ছিল তাহা আবার ফিরাইয়া আনিতে পারিবে—কেবলমাত্র তলোয়ারের জোরে, ইহাই তাহাদের মনে স্থান পাইয়াছে। এখন কেবল ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড মিলিত হইয়া জার্ম্মানিকে চোখ রাঙাইয়া এই চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। ফ্রান্সের সৈন্যবল আছে, ইংলণ্ডের অর্থ আছে। এই দুই প্রবলশক্তির ভ্রূকুটিকটাক্ষে জার্ম্মানি যে ভীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দি.

বৈচিত্র্য

কেহ উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু এই প্রত্যুপকার উপকারীর সব সময়ে প্রিয় না হইতে পারে। যতদূর সম্ভব কেহ কাহারো প্রাণপণ সাহায্য করে, তারপর নিজে কোনো অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইয়া তাহার সহায়তার দাবী করিয়া বলে, "আমি কতদিন তোমার কত আপদ্-বিপদে সাহায্য করিয়াছি, কত দুঃখ-কষ্ট হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, আজ তুমি আমার জন্য ইহা করিবে না!" উপকৃত ব্যক্তি ভাবে, 'সত্যই ত আমি তাহার নিকট কত উপকার পাইয়াছি, অসৎ হইলেও কিরূপে আমি ইহার প্রত্যুপকার না করিয়া থাকিতে পারি?' এই ভাবিয়া সে তাহার অসৎ কার্য্যেও সহায় হয়। কিন্তু সে ভাবিতে পারে না, ঐরূপ করায় সে উপকারীর প্রত্যুপকার না করিয়া বরং অপকারই করিয়া থাকে। যাহা অসৎ-অকল্যাণ তাহাতেই সাহায্য করিয়া যে নিজের উপকারীকে বস্তুত অকল্যাণেই লইয়া যায়, এবং এইরূপে অকল্যাণই করিয়া প্রাপ্ত উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই করিয়া বসে—যদিও তাহাদের উভয়েরই মনে সন্তোষ থাকে যে, উপকারের প্রত্যুপকার করা হইয়াছে। উপকৃত যদি উপকারীর এইরূপ কার্য্যে সাহায্য না করিয়া বরং যথাশক্তি বাধা প্রদান করেন, তবেই, তাঁহার যথার্থ প্রত্যুপকার করা হয়—যদিও উপকারী তখন তাহা বুঝিতে না পারেন বা তাহা তাঁহার ভাল না লাগে। যাহা প্রিয় তাহাই শ্রেয় নহে। প্রিয় সকলেই দেখিতে পায়, কিন্তু শ্রেয়ের দ্রষ্টা দুর্লভ। শ্রেয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে, প্রিয় যদি ইহাতে দূরে যায় যাউক।

*

* *

প্রিয়ের আসক্তিতে মানুষ নিজের শত্রুকে বাড়াইয়া তোলে। সে যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত হইয়া বাস করে শক্তি থাকিলে সে তাহাদিগকে

বশীভূত করিবার চেষ্টা করে ; ভাল হউক মন্দ হউক নিজে যাহা করে বা ভাবে তাহাতে অন্য সকলেরই সম্মতির দাবী করে; কাহারও স্বতন্ত্রতা বা ব্যক্তিত্ব সে সহ্য করিতে পারে না; সকলকেই নিজের মুঠির মধ্যে আনিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে। সে চাহে কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না, নিজে সে নিরুদ্বেগে যাহা ইচ্ছা করিয়া যাইবে। এইরূপে সকলের ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য অপহরণ করিয়া সে যে নিজের কত অনিষ্ট করে তাহা তাহার বুদ্ধিতে আসে না। স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে বা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত থাকিলে এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তাহাকে কত সময় কত দিকে রক্ষা করিতে পারে, একথা সে ভাবিতেই পারে না ; বর্ত্তমান প্রিয় দেখিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া থাকে। ফলে ইহাই দাঁড়ায় যে, যাঁহারা তাহার বস্তুত আত্মীয়-স্বজন ছিলেন তাঁহারা তাহার অন্যায় অকার্য্যের সময়ে কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়া কার্য্যত শত্রু হইয়া উঠেন।

*
* *

মানুষ সংসারে যাহার মধ্যে আছে বা যাহা লইয়া আছে তাহাতে তাহার সন্তোষ নাই, সে ইহাতে তৃপ্ত নহে। যাহা কিছু আমাদের এখানে উপভোগ্য আছে, সে বিচার করিয়া দেখিয়াছে তাহার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যায় না, বা তাহা দ্বারা একবারে সমস্ত দুঃখের উচ্ছেদ হয় না। তাই সে এমন একটা স্থান বা অবস্থা খোঁজে যেখানে দুঃখের কোনো সম্বন্ধ থাকে না, বা নিত্য পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে মুক্তি। ইহাই মানবের সাধ্য, আর ইহার সাধন হইতেছে ধর্ম্ম। সাধ্য এক হইলেও সাধন হইয়া উঠিয়াছে নানা। ইহাদের কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা অথবা সবটাই সত্য বা সবটাই মিথ্যা তাহা এখানে আলোচ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মগুলির লক্ষ্য যে পূর্ব্বোক্ত সাধ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই ; মুক্তিলাভই ধর্ম্মসাধনার চরম উদ্দেশ্য। মুক্তিলাভ অন্তরের ধর্ম্ম, বাহিরের নহে ; তবে বাহির না থাকিলে যখন

অন্তর হয় না, বা অন্তর না থাকিলে বাহির হয় না, তখন তাহাদের পরস্পরের ভাল-মন্দে পরস্পরের ভাল-মন্দ হইয়া থাকে।

সাধ্য এক হইলেও সাধনের ভেদে লোকের মধ্যে ভেদ ছিল। সাধ্য যে স্থানটিতে ছিল ক্রমে তাহাকে সাধনই অধিকার করিয়া চলিল, অর্থাৎ যাহা মূলত ছিল সাধন, তাহাই হইল সাধ্য। ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল, মানুষ অন্তর ছাড়িয়া বাহিরেই ঝুঁকিয়া পড়িল বেশী। প্রথমত তাহারা ছিল এক, ইহাতে হইয়া গেল অত্যন্ত নানা। অনর্থও চারিদিকে হইয়া উঠিল নানা। অনৈক্যের অনর্থ দেখিয়া তাহার প্রাণ দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল, হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল। প্রতীকার ভাবিতে গিয়া সে দেখিল একের দিকে না যাইতে পারিলে ঐ অনর্থ যাইবে না। এক হওয়া যায় কিসে?

সে আবার ভাবিল ধর্ম্মই সকলকে এক করিবে। কিন্তু ইতিহাস দেখাইল অতীতে কখনো ইহা হয় নাই; ধর্ম্মতত্ত্ব বলিল, ইহা হইতে পারে না। সে ইহা গ্রাহ্য করিল না, এটা ছাড়িয়া ওটা আনিয়া, কিছু বাদ দিয়া কিছু যোগ করিয়া সে আর একটা নূতন ধর্ম্ম খাড়া কবিল। দেখা গেল এটাও পূর্ব্বগুলিরই মত একটা সম্প্রদায়মাত্রকে গড়িয়া তুলিল সকলে এক হইল না—যদিও সেই নূতন ধর্ম্মের গড়নকারী বা দর্শক বা উদ্ভাবক বিশ্বের কল্যাণেরই জন্য, তাহা করিয়াছিলেন। গোড়ায় ভুল হইয়াছিল—ধর্ম্ম অন্তরের মুক্তির জন্য, বাহিরে সকলের সঙ্গে ব্যবহার বা মিলিবার জন্য নহে—এই কথাটাকে ভাবা হয় নি। জগতে এ পর্য্যন্ত কোনো ধর্ম্ম হয় নি, হই'তে পারেও না, যাহাকে সকলেই গ্রহণ করিবে, বা যাহা দ্বারা সকলে মিলিতে পারিবে; ইহা অসম্ভব। ব্যবহারে মিলিবার জন্য ব্যবহারধর্ম্ম চাই, মোক্ষের জন্য মোক্ষধর্ম্ম চাই। একের দ্বারা উভয়ই হয় এমন একটা কিছু থাকিলে বা হইলে খুবই ভাল, কিন্তু ইহা কোথায়?

* * *

কেহ থাকে গৃহে কেহ বা থাকে বনে। বনীর কথায় আমাদের এখানে

কাজ নাই; গৃহীর কথা বলিব। গৃহী একা থাকিতে পারে না, তাহাকে দশ জনের সঙ্গে থাকিতে হয়। এই দশ জনই ঠিক তার মনের মত হয় না, হইতেও পারে না; নানা বিষয়ে নানা রকমের ভেদ থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো এমন কোনো মত বা বিশ্বাস বা ধারণা বা ধর্ম্ম থাকিতে পারে যাহা সত্য-সত্যই অসত্য, অথবা বস্তুতঃ সত্য হইলেও ঐ গৃহী অসত্য বলিয়া মনে করে; অপর কথায়, সত্য-অসত্য যাহাই হউক ঐ গৃহী ভালবাসে না। সে বলে, 'আমি উহা কেমন করিয়া সহ্য করিব, অসত্যকে কি সহ্য করা যায়!' ক্ষমতা থাকিলে সে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করে, না থাকিলেও সে চেষ্টা না করিয়া প্রায়ই নিরস্ত হয় না, যদিও সে তাহার মনের মত ফল পায় না। তাহার অসহিষ্ণুতায় বিরোধ বাড়িয়া উঠে, শান্তি দূরে যায়, অশান্তি ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে। কিন্তু তথাপি সে যাহাকে অসত্য ঘোষণা করে, তাহা সম্পূর্ণ যায় না। তাহার অভিমত সত্যের পাছে-পাছে ঐ অসত্যটাও আশে-পাশে এখানে-ওখানে মানিয়া থাকে। এপর্য্যন্ত ত ইহার ধ্বংস হইল না, কখনো সম্পূর্ণভাবে হইবে বলিয়াও মনে হয় না। অপর দিকে অন্য ব্যক্তি মনে করে সে-ই সত্য ধরিয়া আছে, আর অপরেরা অসত্য অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সেও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে এবং এইরূপে পরস্পরের বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়া সকলেরই অনর্থ সৃষ্টি করে। এ অসহিষ্ণুতায় লাভ কি? যাহা অসত্য তাহা কিছুতেই অনুসরণীয় নহে, তাহা নিশ্চয়ই অসহনীয়, কিন্তু যে অসত্যকে সত্য ভাবিয়া চলিতেছে তাহাকে অসহ্য মনে করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া চলিলে তাহাতে অনর্থ ভিন্ন কোনো লাভের সম্ভাবনা নাই, সে ইহাতে অন্যের অপেক্ষা বরং নিজেরই অনর্থ করে বেশী। গৃহী হওয়া তাহার কাজ নহে; বনী হওয়াই তাহার কর্ত্তব্য। অসত্য অসহ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু অসত্যসেবী অসহ্য ইহা বলিতে পারি না। অসত্যসেবী করুণার পাত্র, দ্বেষের নহে; আর দ্বেষ জয় না করিলে অমৃতের আশা নাই—তা কেহ যতই না কেন লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করুন।

* * *

কাহারো কোনো কিছু দান গ্রহণ করিলে গ্রহীতার মন দাতার দিকে অন্যায় রূপে ঝুঁকিয়া যায়, দাতা কিছু অন্যায় বলিলে বা করিলে গ্রহীতা তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে বা প্রতিবাদ করিতে পারে না; কেবল সায় দিয়া চলে, নিজের ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য একেবারে হারাইয়া ফেলে। এরূপ গ্রহীতা কখনো আদর্শ গ্রহীতা বা দানপাত্র নহে। বেদপন্থীদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে, দান গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়। দান লইলেও যাহার তেজস্বিতা নষ্ট না হয়, যে পূর্ব্বের ন্যায় সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকিতে পারে, দাতার প্রতি কোনো প্রকারে অনুচিত পক্ষপাত না করে,—এক কথায় যে ব্যক্তি গৃহীত দানকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করিতে পারে, এবং যাহাকে দান করিয়া দাতা নিজেকেই অনুগৃহীত বলিয়া মনে করেন, কোনো প্রকারে গ্রহীতাকে নহে,—সেই গ্রহীতাই গ্রহীতা, আর তাহাকে দত্ত দানই দান, অন্য গ্রহীতা ঘুষখোর আর অন্য দানও ঘুস ভিন্ন কিছু নহে।

*

* *

কেহ যদি সম্প্রদায়গুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতে পারে ত খুব ভাল হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত কাহাকেও এরূপ করিতে দেখা গেল না, আর দেখিবারও কোনো সম্ভাবনা নাই। সম্প্রদায়ভেদ বরাবরই থাকিবে, এবং তজ্জন্যই ইহাকে অস্বীকার করা চলে না এবং মানিয়াই লইতে হইবে। মানিয়া লইয়াই সম্প্রদায়-গুলিকে এরূপভাবে পরিচালনা করিতে হইবে যেন তাহাদের দ্বারা এমন একটা স্থানে পৌছিতে পারা যায় যেখানে সকলেই একত্র মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করে। যখন মূলত একই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া সম্প্রদায়গুলি কেবল বিভিন্ন সাধন মাত্র লইয়া চলিয়াছে, তখন সেরূপ স্থানে পড়া কোনরূপ অস্বাভাবিক নহে।

*

* *

বেদপন্থী, জিনপন্থী, বুদ্ধপন্থী, ঈশ্বরপন্থী, অনীশ্বরপন্থী, ইত্যাদি বিবিধ সম্প্রদায়

আছে। অন্তের কাছে যা হউক, নিজের-নিজের কাছে ইহারা সকলেই উত্তম, ইহারা সকলেই নিজ-নিজ ধর্ম্ম মত বিশ্বাস অনুসারে নিজ-নিজ বালকের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করে; ইহা অতি স্বাভাবিক। বস্তুত ঈশ্বরপন্থীর পুত্র অনীশ্বরপন্থীর অনুকূল স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে গেলে শেষে তাহার যেরূপ হইবার সম্ভাবনা তাহাতে ঐ ঈশ্বরপন্থীর সন্তোষ লাভের কারণ থাকে না; পুত্র তাহার অনীশ্বরপন্থী হইয়া উঠে,—সে যে চায় পুত্রটি ঈশ্বরপন্থী হইবে। তাই ঐ বালককে ঈশ্বরপন্থীরই অনুকূল স্থানে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। কোনো হিন্দুস্কুলে মুসলমান বালকের অন্যান্য বিষয় শিখিবার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু খাঁটি মুসলমান হইতে হইলে যাহা তাহার আবশ্যক তাহা সে সেখানে পায় না। যাহা লইয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি তাহা বর্জ্জন করিলে একত্র সকলেরই সম্পূর্ণ শিক্ষা হইতে পারে, এরূপ শিক্ষা পাওয়ারও আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ইহাতেও কি সম্প্রদায়ের ধ্বংস হইবে? বরং মনে হয় এইরূপে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা আর একটা নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবে। ঈশ্বরপন্থী ও অনীশ্বরপন্থী উভয়ের ঐক্যের জন্য, হয় ঈশ্বরপন্থীকে অনীশ্বরপন্থী, অথবা অনীশ্বরপন্থীকে ঈশ্বরপন্থী হইতে হইবে; অথবা ঈশ্বর-অনীশ্বর উভয়ই বর্জ্জন করিয়া উহাদিগকে কোনো একটা মধ্যপথ কিংবা কোনো একটি সম্পূর্ণ পৃথক পথ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও সম্প্রদায় না কমিয়া বরং বাড়িয়া উঠিবে। যাহাই কেন হউক না, যদি খাঁটি হিন্দু, খাঁটি মুসলমান, খাঁটি বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাদের জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে এরূপ উদার ভিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যাহাতে কোনোরূপ গোঁড়ামি প্রশ্রয় না পায়, বা দ্বেষের দ্বারা চিত্ত কলুষিত হইয়া না পড়ে। কাজটা খুব শক্ত, তথাপি করিতে হইবে অন্য উপায় যে নাই।

*
* *

রাজপুত্র যখন রাজা হয় বা যতদিন তাহার রাজা হইবার সম্ভাবনা থাকে,

ততদিন সকলেই তাহাকে আপনা-আপনিই মানিয়া থাকে; রাজপুত্র বলিয়া বেড়ায় না—'ওহে তোমরা সকলে আমাকে মান।' কিন্তু রাজপুত্র যদি রাজা না হয় রাজা হইবার সম্ভাবনা তাহার না থাকে, তবে তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করে না, অথবা দুই চার দশ দিন করিলেও বরাবর করে না—যদিও তাহার রাজার বংশে জন্ম। বংশের গৌরব কয় দিন থাকে?

ব্রাহ্মণের পুত্র যতদিন সত্য-সত্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, বা হইবার তাহার সম্ভাবনা ছিল, ততদিন কাহাকেও বলিয়া দিবার আবশ্যকতা হয়নি যে, তাহাকে সম্মান করিতে হইবে; গুণের কাছে লোকের মাথা আপনিই নুইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন যথার্থ ব্রাহ্মণ না হইয়া রসুয়েগিরি করিতে লাগিল, যোগ্যতার অভাবে প্রভুর স্থান হারাইয়া ভৃত্যের আসনে আসিয়া বসিল, তখনো যদি সে পূর্ব্বের সম্মানের দাবী করে, তবে তাহা আদায় হইতে পারে না, তা যতই না কেন সে চীৎকার করুক। লোকে পূজা করে বস্তুত গুণের, বংশের নহে। মুক্তাকেই সকলে আদর করে, ঝিনুককে নহে। লোকে যখন মুক্তাকে অবজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া দিয়া ঝিনুকের আদর করে, তখন তাহার যে দুর্গতি হয়, গুণকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল বংশকে মান দিলে সেই দুর্গতিই হয়। যে সমাজ গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বংশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার যদি দুর্গতি না হয় তবে কাহার হইবে?

***

মানুষ বড় তার্কিক। তর্ক করিতে করিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে; এমন রোক্ চাপিয়া যায় যে, সে নিজেই কি বলে না বলে তাহাতে তাহার জ্ঞানই থাকে না। সে তর্কের খাতিরে এমন সব কথা বলে, যা সে নিজেও বিশ্বাস করে না বা স্বীকার করে না। অথবা এমনো কথা বলে, যাহা কেবল তাহার প্রতিবাদীরই সম্বন্ধে দোষের, কিন্তু তাহার নিজের সম্বন্ধে গুণের জন্য হইয়া থাকে। তর্ক করিয়া কেউ কি কোনো দিন পরাভব মানে? তুমি যতই না কেন যুক্তির দ্বারা

তাহাকে নিরস্ত কর, সত্যকে বুঝাইয়া দাও, সে হারিয়াও এবং হয়ত হার মানিয়াও তাহা স্বীকার করিবে না। তাহার উদ্দেশ্য থাকে, কেবল তর্কই করা অথবা যেরূপে হউক নিজেরই কথাটা অন্যকে মানান।

*

* *

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয়, এজন্য তাঁহারা সত্য সত্যই দয়ার পাত্র। মুটে-মজুরের যে শক্তি-সামর্থ্য আছে, ইঁহাদের তাহাও নাই। আজকাল উপযুক্ত মজুরী দিলেও মুটে-মজুর পাওয়া শক্ত, কিন্তু অনুপযুক্ত বেতন দিলেও পণ্ডিত-মাষ্টারের অভাব হয় না। অনেক মুটে-মজুর অনেক পণ্ডিত-মাষ্টার অপেক্ষা বেশী রোজকার করে। তাহারা মনিবকে সময়-অসময়ে দু-চারটা কড়া কথাও শুনাইয়া দিয়া থাকে, কিন্তু বেচারী পণ্ডিত-মাষ্টারগণকেই অনেক সময়ে তাহা শুনিয়া নীরবে হজম করিয়া ফেলিতে হয়। বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে শিক্ষকেরা সভা-সমিতি করিয়া নিজেদের দুঃখ-বেদনা জানাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এ জানানতে কলমের জোর থাকিতে পারে, অন্য জোর নাই—যে জোরে মুটে-মজুরেরা মনিবকে কথা শুনাইতে বাধ্য করে। জোর নাই বলিয়াই সে কথার মূল্য খুব কমই আছে। তাঁহারা বেতন বাড়াইবার কথা আর তার সঙ্গে সঙ্গে Provident fund ও Life Insuranceএর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের এই সব কথা অযৌক্তিক মনে হয় না; কিন্তু যাহা যৌক্তিক তাহাই যে মনিবেরা সব সময়ে করেন, তাহা ত নহে। যে সমস্ত মনিব সত্য-সত্যই দয়ালু ও বিবেচক তাঁহারা যদি নিজের কার্য্যের দ্বারা পথ খুলিয়া দিতে আরম্ভ করেন, তবে গতানুগতিক লোক তাহা অনুকরণ করিবে আশা করা যায়। কিন্তু ইঁহাদের যে ঘুম ভাঙ্গে না ইহাই ভাবনার বিষয়।

*

* *

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ
"শান্তিনিকেতন"
পত্রিকা বিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে না বিস্মৃত হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadananda Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop.

সূচীপত্র

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩২৭ সাল

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩২৭ সাল

বৌদ্ধদর্শন

আত্মতত্ত্ব

অনুরাধসুত্ত

[আজ আমরা এখানে অ নু রা ধ সু ত্তে র (সংযুত্তনিকায়, ২২.৮৬) অনুবাদ দিতেছি। গত সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭, পৃ. ৭০—৭৬) য ম ক-সা রি পু ত্র-স ং বা দে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার অনেক কথা ইহাতেও আছে। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে ঐ সব কথা সারিপুত্রের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, আর এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব তাহা বলিয়াছেন। উভয়ের সাধারণ কথা কয়টি এই—(১) রূপাদি (অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) তথাগত (জীব) নহে, (২) রূপাদিতে তথাগত নহে, (৩) রূপাদি হইতে অন্যত্র তথাগত নহে, এবং (৪) রূপাদিহীনও তথাগত নহে।

অ নু রা ধ সু ত্তে বিশেষ ভাবে দেখিবার বিষয় এই যে, তথাগত বা জীব সম্বন্ধে চারিটি পক্ষ আছে—(১) জীব মরণের পর থাকে, (২) জীব মরণের পর থাকে না, (৩) জীব মরণের পর থাকেও এবং থাকেও না, এবং (৪) জীব মরণের পর থাকে ইহাও না, আর থাকে না ইহাও না। অনুরাধ ভিক্ষু বলিয়াছিলেন যে, এই চারিটি মতের কোনটিই বুদ্ধের সম্মত নহে, এই সব মত হইতে তাঁহার মত অন্য। কিন্তু বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, ইহাও বলা যুক্তিযুক্ত নহে যে, এই সমস্ত মত হইতে তাঁহার মত ভিন্ন। কেননা, যদি অন্য কোন মত থাকে তবে তাহা কি বলিতে হইবে, কিন্তু বস্তুত বুদ্ধদেব তাহা কিছু বলেন নি। সে সম্বন্ধে তিনি কোনো ব্যাখ্যাই করেন নি, প্রশ্ন করিলেও উত্তর দেন নি (পরবর্ত্তী সংখ্যায় ইহা আমরা দেখিতে পাইব)। তাই তিনি সুত্তটির শেষে বলিতেছেন, (জীব মরণের পর থাকে, কি থাকে না, ইত্যাদি আমি কিছুই বলি নি) কেবল দুঃখ ও দুঃখের নিরোধ কি তাহাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এখনো তাহাই বলিতেছি।

অনুরাধ যখন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিব্রাজকগণের প্রশ্ন ও উত্তর তাঁহাকে জানাইলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, অনুরাধের চিত্তে আত্মবাদের মোহ আছে, তাই তিনি "রূপ নিত্য বা অনিত্য" ইত্যাদি প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বারা তাঁহার ঐ আত্মবাদ-দৃষ্টি অপনয়ন করিয়াছেন। আত্মবাদ-দৃষ্টি অপনয়ন করিয়া,—আত্মা বা সত্ত্ব বা জীব বা তথাগত বলিয়া ধরিবার কিছুই নাই, ইহা প্রতিপাদন করিয়া,—বুদ্ধদেব অনুরাধ ভিক্ষুকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, 'যখন এই জন্মেই তুমি তথাগতকে উপলব্ধি করিতে পার না, তখন, আমি তাহাকে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারের অন্য এক প্রকারে বুঝাইয়া থাকি—এই কথা বলা কি তোমার যুক্তিযুক্ত হইয়াছে?']

আমি এইরূপ শুনিয়াছিলাম—

'এক সময়ে ভগবান্ বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় বিহার করিতেছিলেন। সেই সময় মাননীয় অনুরাধও ভগবানের অবিদূরে আরণ্যক কুটীতে বিহার করিতেছিলেন।

অনন্তর অন্যতীর্থিক (অন্যসম্প্রদায়গত) বহুসংখ্যক পরিব্রাজক মাননীয় অনুরাধের নিকট আগমন করেন, এবং তাঁহার সহিত পরস্পরে যথোচিত আদর-সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন করিয়া এক দিকে উপবেশন করেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া মাননীয় অনুরাধকে বলিলেন—

"বন্ধু অনুরাধ, সেই যে উত্তমপুরুষ পরমপরুষ পরমলাভলাভী তথাগত, তিনি তথাগতকে (অর্থাৎ জীবকে) জানাইতে গিয়া কি এই চারি প্রকারের কোন প্রকারে জানাইয়া থাকেন—

১। তথাগত মরণের পর থাকে, অথবা

২। তথাগত মরণের পর থাকে না, অথবা

৩। তথাগত মরণের পর থাকেও এবং থাকেও না, অথবা

৪। তথাগত মরণের পর থাকে ইহাও নহে, আর মরণের পর থাকে না ইহাও নহে?"

এইরূপ উক্ত হইলে অনুরাধ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণকে এই বলিলেন—"বন্ধুগণ, উত্তমপুরুষ পরমপুরুষ পরমলাভলাভী তথাগত তথাগতকে জানাইতে গিয়া এই চারি প্রকারেই অন্য প্রকারে জানাইয়া থাকেন।"

এইরূপ উক্ত হইলে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ অনুরাধের সম্বন্ধে বলিলেন যে, "এই ভিক্ষু নবীন, ইনি অল্পদিন হইল প্রবজ্যা লইয়া থাকিবেন, অথবা স্থবির হইলেও মূঢ় ও অপণ্ডিত!"

তাঁহারা তাহাকে এইরূপে বিষাদযুক্ত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে মাননীয় অনুরাধের মনে হইল 'অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ যদি ইহার পরে আমাকে প্রশ্ন করেন,* তাহা হইলে কিরূপ উত্তর প্রদান করিলে তাঁহাদের নিকট আমার ভগবানের কথা ঠিক বলা হইবে, ভগবানকেও মিথ্যাদোষ দেওয়া হইবে না, এবং আমার কোনো সহধর্ম্মচারীও তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া নিন্দনীয় হইবেন না?'

*অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার হইতে অন্য প্রকারটি কি, ইহা প্রশ্ন করেন।

অনন্তর তিনি ভগবানের নিকট গমন করিয়া...একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত সমস্তই আমূল নিবেদন করিলেন।

ভগবান্ বলিলেন—“অনুরাধ, তুমি কি মনে কর, রূপ নিত্য বা অনিত্য?”

“ভগবন্, অনিত্য।”

“যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ বা সুখ?”

“ভগবন্, দুঃখ।”

“যাহা অনিত্য, দুঃখ, ও যাহা বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কি এইরূপে দেখা যুক্তিযুক্ত যে, ‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি’, ‘ইহা আমার আত্মা?”

“নিশ্চয়ই না ভগবন্।”

“বেদনা..., সংজ্ঞা..., সংস্কার..., বিজ্ঞান নিত্য বা অনিত্য?”

“ভগবন্, অনিত্য।”

“যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ বা সুখ?”

“ভগবন্, দুঃখ।”

“যাহা অনিত্য, দুঃখ, ও যাহা বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কি এইরূপে দেখা যুক্তিযুক্ত যে, ‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি’, ‘ইহা আমার আত্মা’?”

“নিশ্চয়ই না ভগবন্।”

“অতএব অনুরাধ, যে-কোনো রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান অতীত অনাগত, বা বর্ত্তমান; আধ্যাত্মিক (শরীরস্থ) বা বাহ্য; স্থূল বা সূক্ষ্ম; নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট; দূরে বা নিকটে; তৎ সমস্তকেই ‘ইহা আমার নহে’, ‘ইহা আমি নহি’, ‘ইহা আমার আত্মা নহে,’ ইহাই যথাযথভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞার দ্বারা দেখা উচিত।

“হে অনুরাধ, এইরূপ দেখিয়া শ্রুতবান্ আর্য্য শ্রাবক রূপে, বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে, ও বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া বিরাগ অনুভব করে, বিরাগের দ্বারা বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে ‘বিমুক্ত’ এই জ্ঞান তাহার উৎপন্ন হয়। তখন সে জানে জন্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, ব্রহ্মচর্য্যবাস সমাপ্ত হইল, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইল, আর কিছু এইরূপের (সংসারভাবের অথবা ক্লেশক্ষয়ের) জন্য নাই।

"অতএব হে অনুরাধ, তুমি কি মনে করিতেছ? (১) রূপ তথাগত (জীব), ইহাই কি তুমি দেখিতেছ?"

"নিশ্চয়ই নয় ভগবন্।"

"বেদনা···, সংজ্ঞা···, সংস্কার···, বেদনা তথাগত, ইহাই কি তুমি দেখিতেছ?"

"নিশ্চয়ই না ভগবন্।"

"তবে তুমি অনুরাধ, কি মনে করিতেছে? (২) রূপে তথাগত, ইহাই কি তুমি দেখিতেছ?"

"নিশ্চয়ই নয় ভগবন্।"

"বেদনায়···, সংজ্ঞায়···, সংস্কারে···, বিজ্ঞানে তথাগত, ইহাই কি তুমি দেখিতেছ?"

"না ভগবন্।"

(৩) "রূপ হইতে অন্যত্র তথাগত, ইহাই কি তুমি দেখিতেছ?"

"নিশ্চয়ই না ভগবন্।"

"বেদনা···, সংজ্ঞা···, সংস্কার···, বিজ্ঞান হইতে অন্যত্র তথাগত, ইহাই কি তুমি দেখিতেছ?"

"নিশ্চয়ই না ভগবন্।"

"তাহা হইলে হে অনুরাধ, তুমি কি মনে কর? (৪) এই সেই তথাগত রূপ-হীন বেদনাহীন সংজ্ঞাহীন সংস্কারহীন ও বিজ্ঞানহীন?"

"নিশ্চয়ই না ভগবন্।"

"হে অনুরাধ, এই জন্মেই ত তুমি যখন সত্যরূপে তথ্যরূপে তথাগতকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না, তখন কি তোমার প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত যে, 'হে বন্ধুগণ, উত্তমপুরুষ পরমপুরুষ পরমলাভলাভী তথাগত তথাগতকে জানাইতে গিয়া এই চারিপ্রকার হইতে অন্য প্রকারে জানাইয়া থাকেন—

১। তথাগত মরণের পর থাকে, অথবা

২। তথাগত মরণের পর থাকে না, অথবা

৩। তথাগত মরণের পর থাকেও এবং থাকেও না, অথবা

৪। তথাগত মরণের থাকে ইহাও নহে, আর মরণের পর থাকে না ইহাও নহে ?”

“না ভগবন্।”

“সাধু সাধু অনুরাধ! হে অনুরাধ, পূর্ব্বেও আমি দুঃখ ও দুঃখের নিরোধকেই জানাইয়াছি এবং এখনও তাহাই জানাইতেছি।”

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

সামীপ্যবোধ

দূর ও নিকট এই দুইটি পদার্থ আপেক্ষিক। যদি কেহ বলে যে, এই গ্রামটি দূর, অথবা এই গ্রামটি নিকট, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বক্তা যে স্থানে আছেন তাহারই সম্বন্ধে ঐ গ্রামটির দূরত্ব বা নিকটত্ব বলা হইতেছে। কিন্তু বিচার করিলে বুঝা যায় মূলত বক্তার অধিষ্ঠিত স্থান অপেক্ষা বরং স্বয়ং বক্তাকেই ধরিয়া দূরত্ব বা নিকটত্ব প্রকাশ করা হইয়া থাকে; গ্রামটি দূর বা নিকট বলিলে বক্তার দূর বা নিকট বুঝা যায়। দূরত্ব নিকটত্বের বিপরীত এবং নিজের প্রকাশের জন্য সর্ব্বতোভাবে নিকটত্বের উপর নির্ভর করে।

আমরা দেখিলাম যাহাকে আশ্রয় করিয়া বা ধরিয়া নিকটত্বের ও দূরত্বের বোধ হয় তাহা স্বয়ং বক্তা ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু বক্তার মুখ, চোখ, নাক, কান, ইত্যাদি বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তিনি কোন্‌টিকে নিজ বা ‘আমি’ বলিয়া মান করেন ? যেটিকে ঐরূপ মনে করেন তাহাই ধরিয়া তিনি অপর বস্তুর নিকটত্ব বা দূরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। মানুষ যদি কাহারো প্রশ্নের

উত্তরে ভাষা ও অভিনয় উভয়েরই দ্বারা নিজকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে তবে সে 'এই আমি' এই বলিয়া ঠিক নিজের বক্ষস্থলেই করতল স্থাপন করে, মাথা বা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাহা করে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, বক্তা প্রধানত নিজের বক্ষস্থলেরই সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাহাকেই 'আমি' বলিয়া ধরেন, এবং এই বক্ষস্থলকেই ধরিয়া তিনি স্থান বা বস্তু-বিশেষকে নিকট বা দূর বলেন। তাই কতকগুলি ভাষায় দেখিতে পাই যে, বক্ষস্থলের নিকটবর্ত্তী প্রধান-প্রধান অঙ্গগুলি নৈকট্য বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। নিম্নে প্রদর্শিত উদাহরণগুলির দ্বারা ইহা বুঝা যাইবে।

বৈদিক সংস্কৃতে 'বক্ষস্থল' অর্থে এবং লৌকিক সংস্কৃতে 'অঙ্ক' অর্থে ক্রো ড় শব্দ প্রচলিত আছে। প্রাকৃতপ্রভাবে ইহা হইতে হিন্দী, পঞ্জাবী, ও বাঙলা-প্রভৃতিতে কো ল। এই শব্দটি বাঙলায় 'অঙ্ক' অর্থে চলে; তা ছাড়া কোনো কোনো অঞ্চলে (যেমন মালদহে) 'নিকট' বা 'অতিনিকট' অর্থেও গ্রাম্য ভাষায় ইহা প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'নদীটা গাঁয়ের কো লে ই আছে।' ইহার আক্ষরিক অর্থ 'নদীটি গ্রামের ক্রোড়ে বা অঙ্কেই আছে', ভাবার্থ 'নদীটি গ্রামের অ তি নি ক টে আছে।' পঞ্জাবীতে, এবং আমার মনে হয় আরো কয়েকটি প্রদোশিক ভাষায়, এই শব্দটি 'অতিনৈকট্য' বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

প র্শু শব্দ (অবেস্তা পে রে স্যু, Lat. *falx*. Gr. *phalkes*) বৈদিক সংস্কৃতে 'পার্শ্বাস্থি' ('a rib') বুঝায়, আর ঐ শব্দ হইতেই উৎপন্ন (নিরুক্ত, ৪. ৩. ২.) পা র্শ্ব শব্দ 'পঞ্জরপ্রদেশ' বা দেহের মধ্যভাগের দুই ধারকে বুঝায়। কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্কৃতে এই পা র্শ্ব শব্দের আর একটি নূতন অর্থ হইয়াছে, ইহা 'নিকট' অর্থে প্রযুক্ত হয়।[১] যেমন, 'অস্তি বন-পা র্শ্বে কশ্চিৎ পুরুষঃ,' ইহার আক্ষরিক অর্থ 'বনের পা র্শ্বা স্থি তে একটি লোক আছে;' ভাবার্থ 'বনের ধারে অর্থাৎ অতিনিকটে একটি লোক আছে।' ইহার পালি ও প্রাকৃত রূপ প স্‌ স, এবং

১। "পা র্শ্ব মন্তিকে কক্ষাধোভাগে...," অমরকোষের টীকায় ভানুজী দীক্ষিত "হৈম" বলিয়া ইহা ধরিয়াছেন, কিন্তু অভিধানচিন্তামণিতে (কলিকাতা) ইহা দেখা গেল না।

ইহা এই দুই ভাষাতেই 'অতিনিকট' অর্থে প্রযুক্ত হয়। আবার প াং স হইতে উৎপন্ন নিম্নলিখিত প্রাদেশিক শব্দগুলিও এই অর্থে প্রচলিত আছে। যথা, বাঙলা পা শ, সিংহলী প স, হিন্দী ও মরাঠী পা শ, গুজরাটী পাসু অথবা পা সে, ইত্যাদি। বাঙলায় 'গাঁয়ের পাশে' ইহার অর্থ 'গাঁয়ের অতিনিকটে।' অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ।

ক ণ্ঠ শব্দ সংস্কৃতে মূলত 'গলা'কে বুঝায়, কিন্তু ইহা ক্রমশ পরবর্তী সংস্কৃতে 'নিকট' অর্থও ধারণ করিয়াছে।[২] উ প ক ণ্ঠ শব্দ সংস্কৃতে সুপ্রসিদ্ধ, ন গ রো প-ক ণ্ঠ শব্দে 'নগরের নিকট' বুঝায়। মরাঠী ও গুজরাটী কাঁ ঠ সংস্কৃতের ক ণ্ঠ হইতেই হইয়াছে, এবং ঐ দুই ভাষাতেই তাহা 'ধার' বা 'নিকট' অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন গুজরাটীতে 'সমুদ্র কাঁ ঠা নী ভাষা,' ইহার অর্থ 'সমুদ্রের নিকটের অর্থাৎ সমুদ্রের ধারের ভাষা'; মরাঠীতে 'ত্যা ওটাচ্যা কাঁ ঠীঁ,' 'সেই ক্ষুদ্রনদীর নিকটে, অর্থাৎ ধা রে।'

সংস্কৃতে প ঞ্জ র শব্দের একটি মূল অর্থ হইতেছে 'পার্শ্বাস্থি,' কিন্তু ইহা হইতেই হিন্দী-প্রভৃতিতে উৎপন্ন পাং জ র অথবা পাঁ জ র (অথবা পাং জ রা, পাঁ জ রা) কেবল 'পার্শ্ব' বা 'পার্শ্বাস্থিপ্রদেশ' নহে, 'নিকট' অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাই যদি কোনো গাছ গাঁয়ের অতিনিকটে থাকে, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে হিন্দীতে বলা যাইতে পারে 'গাঁবক। পাঁ জ রা মেঁ এক পেড় হৈ,' অথবা বাঙলায় 'গাঁয়ের পাঁ জ রা য় (অথবা পাঁ জ রে) একটা গাছ আছে।'

বাহুর সঞ্চালনে সর্ব্বদা ঘষা যায় বলিয়া (ক ষ্ ধাতু হইতে, "কষতের্বা"—নিরুক্ত,

২। "স মী প-জল-শব্দেষু ত্রিষু ক ণ্ঠঃ বিদুর্বুধাঃ"—শাশ্বত, পুনা, ১৯১৮, শ্লো, ৪৮৯; "ক ণ্ঠো গলে স ন্নি ধা নে…," ভানুজীদীক্ষিত-কৃত অমরকোষের টীকায় ধৃত বিশ্বপ্রকাশ। বিশ্বপ্রকাশের কাশী-(চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর) সংস্করণে (১৯১১, পৃ, ৪১, শ্লোক, ৩) "স ন্নি ধা নে" স্থলে "সং বি ধা নে" পাঠ আছে, কিন্ত পূর্ব্বোক্ত ভানুজীদীক্ষিত-ধৃত পাঠানুসারে "স ন্নি ধা নে" পাঠই শুদ্ধ।

২. ২. ১২) 'বগল' অর্থে সংস্কৃতে ক ক্ষ শব্দের প্রয়োগ হয় হয়। ইহার আর একটি অর্থ 'পার্শ্ব' (শব্দকল্পদ্রুমে ক ক্ষ শব্দ দ্রষ্টব্য)। ক ক্ষ হইতে পালি ও প্রাকৃতে ক কৃ থ ও ক চ্ছ। যদিও ক চ্ছ শব্দটি প্রাকৃত তথাপি ইহা অবাধে সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে, যেমন, ন দী ক চ্ছ, 'নদীর ধারের জায়গা' 'তীর।' মনে হয় স্রোতের বেগে বা জলের আঘাতে নদীসমুদ্রপ্রভৃতির তটদেশ সর্ব্বদা ঘষা যায় বলিয়াই তাহার নাম ক চ্ছ (তুলনীয় নিরুক্ত, ৪. ১৮. ২)। অবেস্তাতেও এই শব্দটি (অর্থাৎ ক ক্ষ) ক য্ আকারে 'তট' অর্থে প্রযুক্ত হয়। ক চ্ছ হইতে বাঙলায় কা ছ, এবং ইহার একটি অর্থ হইতেছে 'নিকট'; যেমন 'গ্রামের কাছে,' অর্থাৎ 'গ্রামের নিকটে'।

'কক্ষ' অর্থে প্রচলিত আমাদের ব গ ল শব্দ ফারসী ব ঘ ল হইতে। আমি জানি না ফারসীতে কোনো স্থানে এই শব্দটি 'নিকট' অর্থে প্রযুক্ত হয় কি না, কিন্তু বাঙলা, হিন্দী, ও মরাঠীতে ব গ ল শব্দ 'নিকট' অর্থেও চলে, যেমন 'ইহার ব গ লে ই আছে,' অর্থাৎ 'ইহার অতিনিকটেই বা পাশে আছে।'

সংস্কৃত হ স্ত শব্দের অর্থ 'হাত,' কিন্তু ইহা (হ স্ত ক) হইতে প্রাকৃতপ্রভাবে উৎপন্ন হা তা শব্দ হিন্দী, বাঙলা প্রভৃতিতে 'সন্নিকৃষ্ট স্থান' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, 'বাড়ীর হা তা,' অর্থাৎ 'বাড়ীর অতি নিকটস্থ স্থান।' তুলনীয়— ইংরাজীতে 'নিকট' অর্থে প্রযুক্ত 'at hand.'

পূর্ব্বের উদাহরণে ইহাও লক্ষিত হইবে যে, পার্শ্বাস্থির নিকটতম অঙ্গবাচক শব্দগুলির দ্বারা 'পার্শ্ব' 'পাশ' বা 'ধারেরও' ভাব প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা আর একটি শব্দ উল্লেখ করিতে পারি। সংস্কৃত বা হু, অবেস্তা ও ফারসীতে বা জু। ফারসী হইতে এই বা জু[৩] হিন্দী, মরাঠী ও গুজরাটী-প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়াছে এবং সাধারণত 'পাশ' বা 'ধার' অর্থে চলিতেছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

৩। আমাদের বা জু নামে প্রসিদ্ধ অলঙ্কারের এই নাম হওয়ার ইহাই কারণ যে, ইহাকে বা জু অর্থাৎ বাহুতে ধারণ করা হয়, যেমন কণ্ঠে ধারণ করা যায় বলিয়া মালার নাম ক ণ্ঠী।

পারসীকপ্রসঙ্গ

যমের আখ্যায়িকা

বেন্দীদাদ্, দ্বিতীয় ফর্গর্দ

[অবেস্তার আলোচ্য এই অংশটিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথম (১—২০) অংশে অহুর মজ্দা বী ব ঙ্ হ ন যি ম কে অর্থাৎ বৈবস্বত যমকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁহার ধর্ম্মের গ্রহীতা ও প্রচারক হন, যম ইহা অস্বীকার করায় অহুর মজ্দা নিজের সৃষ্টিসমূহকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাকে বলেন, যমও তাহা স্বীকার করিয়া সেইরূপ করেন।

দ্বিতীয় অংশে (২১—৪৩) হিমপ্রলয়ের বিবরণ। বেদপন্থী ও খ্রীষ্টপন্থীদের ধর্ম্মগ্রন্থে[১] যে মহাজলপ্লাবনের কথা আছে, অহুরপন্থীদের হিমপ্রলয় তাহারই ইরানীয় রূপ। জলপ্লাবনে জল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নৌকার প্রয়োজন হয়, আর হিমপ্রলয়ে হিম হইতে রক্ষার জন্য মাটির নীচে একটা আশ্রয়ের (ব র) প্রয়োজন হইয়াছিল।

নিম্নের বিবরণটি মূল অবেস্তা হইতে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে।]

১। জরথুশ্ত্র অহুর মজ্দাকে প্রশ্ন করিলেন—'হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধিপ্রদ, হে ভূতময় জগতের বিধাতা, হে দেব[২] অহুর মজ্দা, হে পবিত্র (ঋতাবন্),

---

১। Genesis VI—VIII; শতপথব্রাহ্মণ, ১.৮.৩; মহাভারত, বন ১৮৭; মৎস্যপুরাণ, ১.১; ভাগবত, ৮.২৪।

২। "মইন্যু," সং. ম ন্যু। বেদপন্থীর ভাষায় এতাদৃশ স্থলে 'দেব' শব্দ দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশ

আমি জরথুশ্ত্র আমা হইতে অন্য সে কোন্ ব্যক্তি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে প্রথম যাহার সহিত আপনি আলাপ করিয়াছিলেন? আস্থর[৩] জরথুশ্ত্রীয়ধর্ম্ম কাহাকে আপনি উপদেশ করিয়াছিলেন?"

২। ইহাতে অহুর মজ্দা বলিলেন—"হে পবিত্র জরথুশ্ত্র, শ্রীল (সুন্দর) বৈবস্বত যমের সহিত;[৪] তুমি জরথুশ্ত্র, তোমা হইতে অন্য মর্ত্ত্যগণের মধ্যে প্রথম ইহার সহিত আমি আলাপ করিয়াছিলাম।

৩। "জরথুশ্ত্র আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'হে শ্রীল বৈবস্বত যম, আমার ধর্ম্মের স্মর্ত্তা ও ভর্ত্তা[৫] হও।' যম ইহাতে আমাকে প্রত্যুত্তর করিল 'আমি ত ধর্ম্মের ধাতা নহি, আমি ত ইহার স্মর্ত্তা ও ভর্ত্তা নহি।'

৪। "জরথুশ্ত্র, আমি ইহাতে তাহাকে বলিলাম—'হে যম, যদি তুমি আমার ধর্ম্মের স্মর্ত্তা ও ভর্ত্তা না হও, তাহা হইলে তুমি আমার সৃষ্টিসমূহকে বাড়াইয়া লইয়া চল, তুমি আমার সৃষ্টিসমূহকে বর্দ্ধিত কর; তুমি আমার সৃষ্টিসমূহের ভর্ত্তা[৬] ও পর্য্যবেক্ষক[৭] হও।'

৫। "হে জরথুশ্ত্র, যম ইহা স্বীকার করিয়া কহিল—'আমি আপনার সৃষ্টিসমূহকে বর্দ্ধিত করিব, আমি আপনার সৃষ্টিসমূহের ত্রাতা, ভর্ত্তা ও পর্য্যবেক্ষক

করা যাইতে পারে। অবেস্তার ভাষায় কিন্তু 'দেব' (দএব) শব্দের অর্থ 'দৈত্য,' ইহা মনে রাখিতে হইবে।

৩। অবেস্তার অহুর (সং. অসুর) শব্দের অর্থ 'প্রাণপ্রদ'। অহুর, অথবা অহুর মজদা অবেস্তায় পরমেশ্বর-অর্থে প্রযুক্ত হয়। অতএব আসুর বলিতে এখানে 'ঈশ্বরীয়' অর্থ বুঝিতে হইবে।

৪। "যিম (=যম) স্রীর (=শ্রীর=শ্রীল) বীবঙ্হন (=বিবস্বৎ-পুত্র)।"

৫। "মেরেতো (=স্মৃতঃ) বেরেত চ (=ভৃতশ্চ)।"

৬। "হরেতা"=হর্ত্তা (=ভর্ত্তা), অবেস্তায় 'হর্' ধাতু 'রক্ষণে,' 'পোষণে'।

৭। "অইব্যাখ্শত-চ," আক্ষরিক সং. অভ্যক্ষিতা চ (অভি+অক্ষ্ ধাতু, তুল:— অধ্যক্ষ শব্দে অক্ষ)। আক্ষরিক অর্থ ধরিয়া এখানে অধ্যক্ষ অনুবাদ করা চলিতে পারে।

হইব। আমার রাজ্যে শীত বাত হইবে না, উষ্ণ[৮] বাত হইবে না, ব্যাধি হইবে না, মরক হইবে না।'

৭। [৯] "আমি তাহাকে দুইটি উপকরণ প্রদান করিলাম, একটি হিরণ্ময় শর,[১০] আর একখানি হিরণ্যশোভিত ছুরিকা।"[১১]

৮। "অনন্তর যমের রাজ্যে তিন শত হিম (ঋতু) অতীত হইয়াছিল। ইহার এই পৃথিবী পশুসমূহে, বৃষসমূহে,[১২] মর্ত্ত্যসমূহে কুকুরসমূহে, পক্ষিসমূহে, এবং উজ্জ্বল (অথবা রক্ত) ও জ্বলন্ত অগ্নিসমূহে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; সেখানে পশুসমূহ, বৃষসমূহ, ও মর্ত্ত্যসমূহ (আর) স্থান পাই নি।

৯। "আমি যমকে জানাইলাম—'হে শ্রীল বৈবস্বত যম, এই পৃথিবী পশুসমূহে, বৃষসমূহে, মর্ত্ত্যসমূহে, কুকুরসমূহে পক্ষিসমূহে, এবং উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অগ্নিসমূহে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; সেখানে পশুসমূহ, বৃষসমূহ, ও মর্ত্ত্যসমূহ (আর) স্থান পাইতেছে না।'

১০। "যম ইহাতে দক্ষিণে[১৩] সূর্য্যের পথে আলোকের দিকে অগ্রসর হইল। (অনন্তর) সে এই বলিয়া এই পৃথিবীকে হিরণ্ময় শর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিল ও হিরণ্যশোভিত ছুরিকা দ্বারা ছিদ্র করিয়াছিল:—

'হে স্পে ন্ত আ র্ম ই তি,[১৪] প্রীত হইয়া পশুসমূহ, বৃষসমূহ, ও মর্ত্ত্যসমূহের ধারণের জন্য সম্মুখে আগমন কর ও বিস্তৃত হও!'

৮। "গরেম," সং. ঘ র্ম্ম, ফারসী গ র্ ম্, 'গরম'।

৯। § ৬ মূলের অন্তর্গত নহে।

১০। "সুফ্রা"; Darmesteter অর্থ করিয়াছেন seal.

১১। "অশ্ত্রা," সং অ স্ত্রা, Reichelt অর্থ করিয়াছেন 'scourge,' কশা। এই উভয়ই উপকরণ সম্রাটের চিহ্ন।

১২। "স্ত ও র," সংস্কৃত স্থূ র, ফারসী স্তু র, লাটিন Taurus, গ্রীক Tauros, ইংরাজী Steer

১৩। নরক উত্তর দিকে।

১৪। স্পে ন্ত = বৃদ্ধিপ্রদ, অভ্যুদয়কর; আ র্ম ই তি = পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

১১। "যম এই পৃথিবীকে পূর্ব্বে ইহা যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা এক-তৃতীয়াংশগুণ বৃহত্তর করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল; এবং সে যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল সেইরূপ পশুসমূহ, বৃষসমূহ, ও মনুষ্যসমূহ নিজের ইচ্ছামত সেখানে গৃহ করিয়াছিল।

১২। "(এইরূপে) যমের রাজ্যে ছয় শত হিম (ঋতু) অতীত হইয়াছিল, এবং ইহার এই পৃথিবী পশুসমূহে, বৃষসমূহে, মনুষ্যসমূহে, কুক্কুরসমূহে, পক্ষিসমূহে, এবং উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অগ্নিসমূহে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; এবং পশুসমূহ, বৃষসমূহ, ও মনুষ্যসমূহ (আর) ইহাতে স্থান পায় নি।

১৩। "আমি যমকে জানাইলাম—'হে শ্রীল বৈবস্বত যম, এই পৃথিবী পশু-সমূহে, বৃষসমূহে, মনুষ্যসমূহে, কুক্কুরসমূহে, পক্ষিসমূহে, এবং উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অগ্নিসমূহে পূর্ণ হইয়াছে; পশুসমূহ, বৃষসমূহ, ও মনুষ্যসমূহ আর ইহাতে স্থান পাইতেছে না।

১৪। "যম ইহাতে দক্ষিণে সূর্য্যের পথে আলোকের দিকে অগ্রসর হইল। (অনন্তর) সে এই বলিয়া পৃথিবীকে হিরণ্ময় শর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিল ও হিরণ্য-শোভিত ছুরিকা দ্বারা ছিদ্র করিয়াছিল :—

'হে স্পে ন্ত আ র্ম ই তি, প্রীত হইয়া পশু সকল, বৃষ সকল ও মনুষ্য সকলের ধারণের জন্য সম্মুখে আগমন কর ও বিস্তৃত হও!'

১৫। "যম এই পৃথিবীকে পূর্ব্বে ইহা যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা দুই-তৃতীয়াংশগুণ বৃহত্তর করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল; এবং সে যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল সেইরূপ পশু সকল, বৃষ সকল, ও মনুষ্য সকল নিজের ইচ্ছামত সেখানে গৃহ করিয়াছিল।

১৬। "(এইরূপে) যমের রাজ্যে নয় শত হিম (ঋতু) অতীত হইয়াছিল, এবং ইহার এই পৃথিবী পশু-, বৃষ-, মনুষ্য-, কুক্কুর-, ও পক্ষি-সমূহে, এবং উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অগ্নিসমূহে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পশু-, বৃষ-, ও অগ্নি-সমূহ আর ইহাতে স্থান পায় নি।

১৭। "আমি যমকে জানাইলাম—'হে শ্রীল বৈবস্বত যম, এই পৃথিবী পশু-, বৃষ-, মনুষ্য-, কুক্কুর-, ও পক্ষি-সমূহে এবং উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অগ্নিসমূহে পূর্ণ হইয়াছে; পশু-, বৃষ-, ও মনুষ্য-সমূহ আর ইহাতে স্থান পাইতেছে না।'

১৮। "যম ইহাতে দক্ষিণে সূর্য্যের পথে আলোকের দিকে অগ্রসর হইল। (অনন্তর) এই বলিয়া সে পৃথিবীকে হিরণ্ময় শর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিল ও হিরণ্যশোভিত ছুরিকা দ্বারা ছিদ্র করিয়াছিল :—

'হে স্পেন্ত আর্মইতি, প্রীত হইয়া পশু-, বৃষ-, ও মনুষ্য-সমূহের ধারণের জন্য সম্মুখে আগমন কর ও বিস্তৃত হও!'

১৯। "যম এই পৃথিবীকে তিন-তৃতীয়াংশগুণ বৃহত্তর করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল, এবং সে যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল সেইরূপ পশু-, বৃষ-, ও মনুষ্য-সমূহ নিজের ইচ্ছামত সেখানে গৃহ করিয়াছিল।"

২১।[১৫] ধাতা অহুর মজ্দা বঙ্হুই দাইত্যা[১৬] (নদীর) নিকট বিশ্রুত অইর্যন বএজে[১৭] দিব্য যজত[১৮]-গণের একত্র একটি সম্মেলন করিয়াছিলেন।

সু-গণ (অর্থাৎ মনুষ্যগণপতি) রাজা যম বঙ্হুই-দাইত্যের নিকটে বিশ্রুত অইর্যন-বএজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মর্ত্ত্যদের একত্র একটি সম্মেলন করিয়াছিলেন।

১৫। § ২০ টীকার অংশ।

১৬। পরবর্ত্তী ১৭শ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭। অইর্যনবএজ (আর্য্যবীজ) অথবা ইরানবেজ জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম্মের অতি পবিত্র স্থান। ইরানীয় আর্য্যগণের ইহাই আদিম স্থান বলিয়া মনে হয়। ইহা কোন্ স্থানে তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। জানা যায় কাস্পীয়ান হ্রদের পশ্চিমে পারস্যের উত্তর অংশই এই স্থান হইবে। এই অঞ্চলেরই সুবৃহৎ কিজেল উজেন (Kizel Uzen)-নামক নদীকে বঙ্হুই-দাইত্য মনে করা যায়।

১৮। "যজত,"=সং যজত, 'যাগ বা পূজার যোগ্য;' যজনীয় দেবতাগণের সাধারণ নাম 'যজত'।

বঙহুই-দাইত্যোর নিকট বিশ্রুত অইর্যন-বএজে সেই সম্মেলনে ধাত্তা অহুর মজ্‌দা দিব্য যজতগণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। সেখানে সু-গণ রাজা যম সর্ব্বোৎকৃষ্ট মর্ত্ত্যগণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন।

২১। অহুর মজদা যমকে বলিলেন—"হে শ্রীল বৈবস্বত যম, এই ভূতময় পাপ পৃথিবীর উপর হিম আগমন করিবে। এই হিম অতিগুরুতর বিনাশক হইবে; ভূতময় পাপ পৃথিবীর উপর হিম আগমন করিবে, ইহাতে বৃহত্তম পর্ব্বতসকল হইতে প্রথমে অ রে দ্বী র[১৯] ন্যায় গভীর বরফ[২০] পতিত হইবে।

২২। "হে যম, ইহাতে জীবজন্তুগণের[২১] (কেবল) তিনভাগ (বিপদ্ হইতে) অপগত হইবে, যথা (১) যাহা অনধ্যুষিত (বর্ত্ত্যী) ভয়ঙ্করতম স্থানসমূহে বাস করে, (২) যাহা গিরি সকলের চূড়ায় বাস করে, এবং (৩) যাহা গম্ভীর কন্দরসকলে সুনির্ম্মিত গৃহসকলে বাস করে।

২৩। "হিমের পূর্ব্বে এই দেশ ঘাস উৎপাদন করিয়াছিল, বরফ গলিবার পর জল তাহাকে প্রথমে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য হইবে। হে যম, এই ভূতময় জগতে তখন ইহা আশ্চর্য্যজনক দেখাইবে, যখন এখানে একটি মেয পশুর পদ (-চিহ্ন) দেখা যাইবে।

২৪। "অতএব চারিদিকে চ রে তু-[২২] প্রমাণ দীর্ঘ একটি

১৯। পৌরাণিক নদী, সমস্ত জলের অধিদেবতা। টীকায় উক্ত হইয়াছে, যেখানে এই বরফ খুব কমও পড়িবে সেখানেও তাহা ১বিতস্তি ২ অঙ্গুলি অর্থাৎ মোট ১৪ অঙ্গুলি গভীর হইবে।

২০। "বফ্র," ফারসী ব র্ ফ্।

২১। "গেউশ্," অবেস্তার গ অ ও (সং. গো) শব্দ সমস্ত জীবজন্তুকেই বুঝায়, ইহা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,(১) যাহারা জলে থাকে (উ পা প), (২) যাহারা মাটির নীচে থাকে (উ প স্ম), (৩) যাহারা উড়িয়া বেড়ায় (ফ্রে প্তে বে জা ত), (৪) যাহারা খোলা স্থানে থাকে (র ব শ্চ র স্তু), ও (৫) যাহারা ঘাস খাইয়া চরে (চ ঙ্ র ঙ্ হ ক)।

২২। চ রে তু শব্দের আক্ষরিক অর্থ চরিবার বা দৌড়াইবার স্থান। ইহা হইতে ঘোড়দৌড়ের স্থান বুঝাইতে ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহার পরিমাণ দুই হা থ্র। হাথ্র—দুই ফুটের এক-এক পদক্ষেপের এক সহস্র পদক্ষেপ।

ব র ২৩ নির্ম্মাণ কর, এবং তাহাতে একত্র পশু-, বৃষ-, মনুষ্য-, কুক্কুর-, ও পক্ষি সমূহের, এবং উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অগ্নিসমূহের বীজকে২৪ উপস্থাপিত কর। তুমি নরগণের বসতির জন্য চারিদিকে চরেতু-প্রমাণ দীর্ঘ একটি ব র নির্ম্মাণ কর,—এরূপ ব'র, যাহা চতুর্দ্দিকে চরেতু-প্রমাণ দীর্ঘ ও যাহা গোসকলের (অর্থাৎ সমস্ত জীবজন্তুর) গোষ্ঠ হয়।

২৫। "তুমি তাহাতে হাথ্র-পরিমাণ বৃহৎ পথে (বা স্থানে) জল প্রবাহিত কর। তুমি তাহাতে ক্ষেত্রসমূহ অবস্থাপিত কর (যাহাতে) সর্ব্বদা হিরণ্যবর্ণ ও অক্ষয় (খাদ্য) খাওয়া যায়। তুমি তাহাতে গৃহসকল অবস্থাপিত কর, যাহাতে উৎকৃষ্ট স্তম্ভযুক্ত,২৫ সুরক্ষিত২৬ ও পরিবেষ্টিত২৭ ঘর২৮ থাকে।

২৬। "তুমি সেখানে সমস্ত নর ও নারীর বীজ (আদর্শ) অবস্থাপিত কর, যে সমস্ত বীজ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি তাহাতে সমস্ত জীবজন্তুর সর্ব্বপ্রকার বীজ অবস্থাপিত করিবে, যে সমস্ত (বীজ) পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২৭। "তুমি তাহাতে সমস্ত বৃক্ষের বীজ অবস্থাপিত করিবে, যে সমস্ত (বৃক্ষ) পৃথিবীতে বৃহত্তম ও সুগন্ধিতম। তুমি তাহাতে সমস্ত খাদ্যের বীজ উপস্থাপিত করিবে, যে সমস্ত খাদ্য ভোজ্যতম ও সুগন্ধিতম। তুমি সেই সমস্তকে মিথুনভূত

২৩। "ত ও থ্ ম ন্," সং. তো ক্ম ন্, ফা. তু থ্ ম্; অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির আদর্শ (specimen) যাহা হইতে আবার ঐ সকল জীব বাড়িতে পারে।

২৪। সুগুপ্ত আবৃত স্থান, অবে. বর্ সং. বৃ ধাতু 'আবরণ করা'।

২৫। "ফ্রস্কেম্ব," সং. প্র স্ক ম্ভ; স্ক ম্ভ (বৈদিক শব্দ) হইতে প্রাকৃতে থ ম্ভ (স্ত ম্ভ হইতে নহে), এবং ইহা হইতেই (থ ম্ব অ) বাঙলায় খা ম্বা।

২৬। "ফ্রবার," সং. প্র বা র, (বৃ ধাতু)।

২৭। "প ই রি বার," সং প রি বা র।

২৮। "কত" (কন্ ধাতু)—সং. খাত (খ ন্ 'খনন')। দখ্মে অর্থাৎ Tower of Silance-এ লইয়া যাইবার পূর্ব্বে শবকে অস্থায়িভাবে যে স্থানে রাখা হয় তাহার না ক ত। 'গৃহ', 'গৃহের কুঠরী' বা 'বসতি স্থান' অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ আছে।

(অর্থাৎ জোড়া-জোড়া) করিয়া অক্ষয় করিয়া রাখিবে—যতদিন এই সমস্ত নর (ঐ) বরের মধ্যে থাকে।

২৯। "ইহাতে কুব্জ২৯ থাকিবে না, এমন কেহ থাকিবে না যাহার বুকের দিকে কুব্জাকার মাংসপিণ্ড আছে,৩০ পুংস্ত্বহীন ব্যক্তি থাকিবে না, মত্ততা থাকিবে না, দরিদ্রতা থাকিবে না, বঞ্চনা থাকিবে না, নীচতা থাকিবে না, অসাধুতা বা (কুটিলতা) থাকিবে না, বিকৃত দন্ত৩১ থাকিবে না যাহা সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া যায় সেই কুষ্ঠ থাকিবে না, এবং অন্য যে সকল (বৈকল্যরূপ) চিহ্নকে অঙ্‌্রমইন্যু মর্ত্ত্যগণে স্থাপন করেন সেই সমস্তেরো কোনটি থাকিবে না।৩২

৩০। "ঐ স্থানের প্রথম৩৩ (অর্থাৎ বৃহত্তম) অংশে তুমি নয়টি পৃথু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ (পথ) করিবে, মধ্যম অংশে ছয়টি ও নীচতম। অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম (অংশে তিনটি) প্রথম অংশের পৃথু (পথে) তুমি নর ও নারীর এক সহস্র বীজ উপস্থাপিত কর, মধ্যম অংশের পৃথু (পথে) ছয়শত ও নীচতম অংশের পৃথু (পথে) তিন শত। তুমি ঐ সমস্ত (পথকে) তোমার হিরণ্ময় শর দ্বারা মার্জ্জন কর (চিহ্নিত কর), ও ঐ বরে (অভ্যন্তরে) স্বপ্রকাশ একটি দ্বার ও একটি বাতায়ন কর।"

৩১। অনন্তর যম মনে করিলেন 'আমি কিরূপে ব র করিব যাহা (করিবার জন্য) অহুর মজ্‌দা আমাকে বলিয়াছেন?'

অহুর মজ্‌দা যমকে বলিলেন "হে শ্রীল বৈবস্বত যম, তুমি পার্ষ্ণি (গোড়ালি)

২৯, ৩০। "ফ্‌ ক ব," "অ প ক ব;" Darmesteter যথাক্রমে অর্থ দিয়াছেন humpbacked এবং bulged forward; কিন্তু Reichelt যথাক্রমে বলিয়াছেন having a hump on the chest এবং humbpacked.

৩১। অথবা 'বিকৃতদন্ত ব্যক্তি থাকিবে না'।

৩২। এই সমস্ত অঙ্গবৈকল্য যে পাপের চিহ্ন তাহা বেদপন্থীদেরও মত, শাতাতপোক্ত কর্ম্মবিপাকে ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৩৩। "ফ্রতেম," সং. প্র থ ম শব্দ যে, বস্তুত প্র ত ম হইতে হইয়াছে তাহা অবেস্তার এই ফ্র তে ম শব্দ দ্বারা অতিসুস্পষ্টভাবে ধরিতে পারা যায়। Bopp সাহেব প্রথম ইহা লক্ষ্য করেন।

দ্বয় দ্বারা এই পৃথিবীকে মর্দ্দন করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা উল্‌টাইয়া দাও যেমন এখন মানুষে (কুম্ভকার) মাথা মাটিকে করিয়া থাকে।”

৩২। অনন্তর যম সেইরূপই করিয়াছিলেন যেমন অহুর মজ্‌দা ইচ্ছা করিয়াছিলেন :—তিনি পাঞ্চিদ্বয় দ্বারা এই পৃথিবীকে মর্দ্দন করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা উল্‌টাইয়া দিয়াছিলেন যেমন এখন মানুষে মাথা মাটিকে করিয়া থাকে।

৩৩। যম চারিদিকে চরেতু-প্রমাণ দীর্ঘ একটি বর নির্ম্মাণ করিলেন, তাহাতে পশু-, বৃষ-, মনুষ্য-, কুকুর-, ও পক্ষি-সমূহের এবং উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অগ্নিসমূহের বীজকে উপস্থাপিত করিলেন। তিনি নরগণের বসতির জন্য চতুর্দ্দিকে চরেতু-প্রমাণ দীর্ঘ একটি বর নির্ম্মাণ করিলেন,—এরূপ বর যাহা গোসমূহের (অর্থাৎ সমস্ত জীবজন্তুর) গোষ্ঠস্বরূপ এবং চতুর্দ্দিকে চরেতু-প্রমাণ দীর্ঘ।

৩৪। তিনি তাহাতে হাথ্র-পরিমাণ স্থানে জল প্রবাহিত করিলেন। তিনি তাহাতে এরূপ ক্ষেত্রসকল অবস্থাপিত করিলেন যাহাতে সর্ব্বদা হিরণ্যবর্ণ ও সর্ব্বদা অক্ষয় (খাদ্য) খাওয়া যায়, তিনি তাহাতে এরূপ গৃহসকল অবস্থাপিত করিলেন যাহাতে উৎকৃষ্ট স্তম্ভযুক্ত সুরক্ষিত ও পরিবেষ্টিত ঘর ছিল।

৩৫। তিনি তাহাতে নর-নারীর পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীজ অবস্থাপিত করিলেন, সমস্ত জীবজন্তুর সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রকার বীজ অবস্থাপিত করিলেন।

৩৬। তিনি তাহাতে পৃথিবীতে বৃহত্তম ও সুগন্ধিতম বৃক্ষসকলের বীজ উপস্থাপিত করিলেন, ভোজ্যতম ও সুগন্ধিতম সমস্ত খাদ্যের বীজ উপস্থাপিত করিলেন। যতদিন এই নরসমূহ বরে থাকে ততদিনের জন্য তিনি সেই সমস্তকে মিথুন-ভূত (জোড়া-জোড়া) করিয়া রাখিয়াছিলেন।

৩৭। তাহাতে কুব্জ ছিল না, এমন কেহ ছিল না, যাহার বুকের দিকে কুব্জাকার মাংসপিণ্ড, তাহাতে পুংস্ত্বহীন ব্যক্তি ছিল না, মত্ততা ছিল না, দরিদ্রতা ছিল না, বঞ্চনা ছিল না, নীচতা ছিল না, অসাধুতা ছিল না, বিকৃত দন্ত ছিল না, যাহা সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া যায় সেই কুষ্ঠ ছিল না এবং অন্য যে সকল

(বৈকল্যরূপ) চিহ্নকে অঙ্‌রমইন্যু মর্ত্যগণে স্থাপিত করে সেই সকলেরও কোনটি ছিল না।

৩৮। ঐ স্থানের প্রথম অংশে তিনি নয়টি পৃথু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ (পথ) করিলেন, মধ্যম অংশে ছয়টি ও নীচতম অংশে তিনটি। তিনি প্রথম অংশের পৃথু (পথে) নর ও নারীর একসহস্র বীজ উপস্থাপিত করিলেন, মধ্যম অংশের পৃথু (পথে) ছয় শত ও নীচতম অংশের পৃথু (পথে) তিন শত। তিনি ঐ সমস্তকে নিজের হিরণ্ময় শর দ্বারা মার্জ্জিত (চিহ্নিত) করিলেন, এবং ঐ বরে অভ্যন্তরে স্বপ্রকাশ একটি দ্বার ও বাতায়ন করিলেন।

৩৯। "হে ভূতময় জগতের বিধাতা, হে পবিত্র, সেই সমস্ত কোন্ আলোক হে পবিত্র অহুর মজ্‌দা, যে সমস্ত এই বরে এইরূপ আলোক প্রদান করিতেছে? যে সমস্তকে যম প্রস্তুত করিয়াছেন?"

৪০। অহুর মজ্‌দা উত্তর করিলেন—'অকৃত্রিম ও কৃত্রিম[৩৪] আলোক।[৩৫] সেখানে একই বার সূর্য্য, চন্দ্র, ও তারার উদয় ও অস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।[৩৬]

৪১। তাহারা[৩৭] দিনকে বৎসর[৩৮] বলিয়া মনে করেন।[৩৯] (সেখানে) চল্লিশ বৎসরে দুইটি নর হইতে দুইটি মিথুনভূত নর জাত হয়,—একটি স্ত্রী ও একটি

৩৪। "খ ধা ত," "স্তি ধা ত," আক্ষরিক অর্থ 'স্বকৃত' ও 'সৃষ্টিকৃত'।

৩৫। সমস্ত অনন্ত (অকৃত্রিম) আলোক উপর হইতে ও কৃত্রিম আলোক নীচে হইতে প্রকাশ পায়।

৩৬। Darmesteter অনুবাদ করিয়াছেন "The only thing missed there is the sight of the stars, the moon, and the sun,' কিন্তু ইহা মূলের সহিত মিলে না—"হকেরেৎ-চ ইরিখতহে সদয়চ বএনইতে স্তারশ্চ মাউঙ্‌হ হ্বরেচ।" মূলেরও পাঠ ব্যাকরণ-সঙ্গত মনে হয় না।

৩৭। 'তাহারা' বরস্থিত লোকেরা?

৩৮। "যারে," Cf. Ger. *Jahr*, Eng. *year.*

৩৯। যেহেতু সেখানে সূর্য্যের দৈনিক আবর্ত্তন নাই—Darmesteter.

পুরুষ। এই সর্ব্বপ্রকার পশু সম্বন্ধেও (ইহা) এইরূপ। সেই সমস্ত নরই শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করে যাহারা এই বরে থাকে—যে বরকে যম করিয়াছেন।

৪২। "হে ভূতময় জগতের বিধাতা, হে পবিত্র, এই বরে—যাহাকে যম প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে মজ্‌দা-যজ্ঞীয় ধর্ম্মকে কে আনয়ন করিয়াছিলেন?"

অহুর মজ্‌দা বলিলেন—হে স্পিতম[৪০] জরথুশ্‌ত্র, পক্ষী ক র্শি প্তু।[৪১]

৪৩। "হে ভূতময় জগতের বিধাতা, হে পবিত্র, কে ইহাদের প্রভু ও অধিপতি?"

অহুর মজ্‌দা ইহাতে উত্তর করিলেন—"হে জরথুশ্‌ত্র, উ র্ ত ৎ ন র[৪২] ও তুমি জরথুশ্‌ত্র।"

৪৪। "হে ভূতময় জগতের বিধাতা, হে পবিত্র, কে ইহাদের প্রভু ও অধিপতি? অহুর মজ্‌দা ইহাতে উত্তর করিলেন—হে জরথুশ্‌ত্র, উ র্ ত ৎ-ন র ও তুমি জরথুশ্‌ত্র।"[৪৩]

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

৪০। স্পি ত ম অথবা স্পি তা ম জরথুশ্‌ত্রের এক পূর্ব্ব পুরুষের নাম, বংশসূচক উপাধি-রূপে ইহা তাঁহার নামের সহিত প্রযুক্ত হয়। স্পি ত ম জরথুশ্‌ত্র, কিংবা স্পি ত ম, অথবা কেবল স্পি ত ম শব্দও জরথুশ্‌ত্রকে বুঝাইতে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

৪১। "ক র্শি প্তু পক্ষী স্বর্গে বাস করে। পৃথিবীতে থাকিলে সে পক্ষিগণের রাজা হইত যম-নির্ম্মিত বরে সে ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিল এবং পক্ষিগণের ভাষায় অবেস্তা উচ্চারণ করিয়াছিল।—বুন্দহিশ। টীকাকার বলেন, ইহা চ খ্রা বা ক্ অর্থাৎ আমাদের সুপ্রসিদ্ধ চ ক্র বা ক।

৪২। জরথুশ্‌ত্রের প্রথম স্ত্রীর পুত্র ই স ৎ বা স্ত্র, দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র হ্ব রে চি থ্র, ও উ র্ব-ত ৎ ন্ র। ইঁহারা তিন জন বেদপন্থীদের ভাষায় যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের অধিপতি হইয়াছিলেন। বৈশ্য বা কৃষকগণের অধিপতি উ ব ত ৎ ন র যম-নির্ম্মিত বরের অধিপতি হইয়াছিলেন। কারণ এব বর মাটির নীচে ছিল, শস্যাদির ন্যায় তাহার রক্ষণাবেক্ষণ বৈশ্যাধিপতিই ভাল করিতে পারে।

৪৩। ইহা পাঠের পর অ যে ম বো হু (গত বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পাঠ করিতে হয়।

বিলাতযাত্রীর পত্র

৩

জাহাজে বড় বেশি ভিড়। ডাঙার হাটে বাজারে যে ভিড় হয় সে চলতি ভিড়—নদীতে জোয়ারে জলের মত—কিন্তু এই ভিড় বদ্ধ ভিড়। আমরা যেন কোন্ এক দৈত্যের মুঠোর মধ্যে চাপা রয়েচি কোনো ফাঁকি দিয়ে বেরবার জো নেই। আমরা আছি তার ডান হাতের মুঠোয়, আমরা হলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। কিন্তু যারা পড়েচে বাম হাতের ভাগে তাদের সংখ্যা বেশি, চাপ বেশি, স্থান কম। ঐ দিককার ডেকের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় যেন ঐ অংশে জাহাজের হাঁপানির ব্যামো, যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠ্‌তে পারচে না। আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারী যুগ। রেলগাড়ি বল, ষ্টীমার বল, হোটেল বল, ইস্কুল বল, আর পাগলা গারদ বল সমস্তই পিণ্ডপাকানো প্রকাণ্ড ব্যাপার। কিন্তু সমষ্টি এবং ব্যষ্টির যোগেই বিশ্বজগৎ। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়, তাতে সমষ্টির যথার্থ উৎকর্ষ হয় না। এতে শক্তির অভাব প্রকাশ পায়। এখনকার সভ্যতা বলচে বহুকে দলন করে যে পিণ্ড হয় সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পুরা ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু এই রকম সরকারী ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কি সাম্রাজ্যে কি সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠ্‌চে। এই অন্যায় এবং দুঃখকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই মানুষ

নানা উক্তিতে অনুষ্ঠানে ও শাসনে রাষ্ট্রপূজা ও সমাজপূজাকে একটা ধর্ম্ম করে তুলেচে। সেই ধর্ম্ম যারা মানচে এবং দুঃখ সহ্য করচে মানুষ তাদেরই সাধু সম্বোধন করে পুরস্কৃত করচে, যারা মানচে না তাদের বল্‌চে বিদ্রোহী, তাদের দিচ্চে নির্ব্বাসন কিম্বা প্রাণদণ্ড। এমনি করে প্রভুত নরবলির উপরে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন একদিন আস্‌চে যখন বলির মানুষ মেলা সহজ হবে না; যখন ব্যষ্টি আপন পূরা মূল্য দাবী করবে। আজ কর্ম্মিকের দল ধনিকের শাসন অমান্য করচে; তাতে ক্রুদ্ধ সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিদেবতা তাদের প্রতি চোখ রাঙাতে ত্রুটি করচে না, এবং রাষ্ট্রধর্ম্মেরও দোহাই দিচ্চে; বল্‌চে, তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে নেশনের ক্ষতি হবে, অন্য নেশন বাণিজ্যবিস্তারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কর্ম্মিক সে দোহাই আজ মান্‌তে চাচ্চে না; বল্‌চে, আমার প্রতি অন্যায় করতে দেবনা, আমার যা পূরা মূল্য তা আমাকে দিতেই হবে। য়ুরোপে রাষ্ট্রধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলির মানুষকে যূপকাষ্ঠে টেনে নিয়ে আসে, এই ধর্ম্মের দোহাই শুনে কর্ম্মিকেরা ধনদেবতার রথযাত্রায় রথ টান্‌তে টান্‌তে তার চাকার তলায় পড়ে পড়ে মরে, সৈনিকেরা শক্তিদেবতার কণ্ঠহার রচনার জন্যে আপন ছিন্নমুণ্ড উৎসর্গ করে পুণ্যলাভ হল কল্পনা করে। আর আমাদের দেশে সমাজধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমরা এতকাল নরবলি দাবী করে এসেচি;—শূদ্রকে বলে এসেচি অগৌরবে তুমি সম্মত হও কেন না সমষ্টিদেবতার সেই আদেশ অতএব এই তোমার ধর্ম্ম; নারীকে বলে এসেচি কারাবেষ্টনে তুমি সম্মত হও তাহলেই সমষ্টিদেবতার কাছে তুমি বরলাভ করবে, তোমার ধর্ম্ম রক্ষা হবে। কিন্তু সমষ্টি-দেবতা সর্ব্বকালের দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মানুষকে খর্ব্ব করবার অন্যায় এবং দুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠচে, এমনি করে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করচে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের ভিত্তি টলে উঠ্‌বে—হিসাব তলব হবে, তখন বহুকালের ঋণ পরিশোধের পালায় ব্যষ্টির কাছে সমষ্টিকে একদিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ব্যষ্টির পূর্ণতা অপহরণ

করে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই করে সে পূর্ণতা মায়ামাত্র, সে কখনই টিঁক্‌তে পারে না। আজ আমরা তাকে ধর্ম্মের আবরণ দিয়েচি কিন্তু এমন কত বলিরক্ত-লোলুপ ধর্ম্ম কিছুকালের জন্য জননী বসুন্ধরাকে পীড়িত এবং অশুচি করে আজ অন্তর্দ্ধান করেচে।

এই কথা কয়দিন আমাকে বিশেষ করে বেদনা দিচ্চে, তার কারণ বলি। আমাদের যাত্রার আরম্ভে জাহাজ অল্প কিছু মন্থরগমনে চল্‌চে বলে যাত্রীরা দুঃখ বোধ করছিল। মন্থরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এঞ্জিনের জঠরানলে কয়লা জোগান দেবার ভার যাদের সেই হতভাগ্য "ষ্টোকার" দল (Stoker) নূতন ব্রতী, তারা পূরা দমে কাজ করতে পেরে উঠ্‌চে না। শোনা গেছে বোম্বাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্ম্মঘট করবার কথা ছিল। সেই তারিখের আগে কোনোক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে অতিরিক্ত মজুরীর প্রলোভন দিয়ে ষ্টোকারদের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। একজন ষ্টোকার হাতায় কয়লা নিয়ে দারুণ শ্রান্তি ও অসহ্য উত্তাপে এঞ্জিনের সামনে পড়ে মরে গেল। কিন্তু জাহাজ ধর্ম্মঘটের আগেই ঘাটে পৌচেছিল, খনি-কারদের বলি না দিলে খনি থেকে কয়লা ওঠে না, ষ্টোকারদের বলি না দিলে জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে খেয়াঘাটে পৌছয় না—এই জন্যে এদের সম্বন্ধে দুঃখ বোধ করা অনাবশ্যক ;—সভ্যতার মধ্যে যে একটা সমষ্টিগত ধন ও প্রয়োজন আছে তারই কথাটা এদের সকল দুঃখের উপর মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। সবই মানি, কিন্তু এও মান্‌তে হবে যে, যত সুবিধা যত সুখই হোক্ না, তাকে সভ্যতা বল আর যাই বল না কেন, দুঃখ এবং অন্যায়ের হিসাব কিছুতেই চাপা পড়বে না। বলির মানুষরা আপাতত মরে কিন্তু পরে তারাই বলিদাতাকে মারে। এই কথা নিশ্চয় জেনো, গ্রীস রোম ইজিপ্ট তার বলিদের হাতেই মরেচে আর ভারতবর্ষও তার বলিদের হাতেই বহুকাল থেকে মরচে। ইতিহাসে এনিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম হতে পারে না —আমাদের শাস্ত্রে বলে ধর্ম্ম হত হয়েই নিহত করে—কিন্তু সেই ধর্ম্ম নিষ্ঠুর সমষ্টিদেবতার ধর্ম্ম নয়, সেই ধর্ম্ম শাশ্বত দেবতার ধর্ম্ম। ১৯মে, ১৯২০।

৪

এডেন পার হয়ে রোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলেচি। এদিকে গরম হাওয়ার আকাশ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার আকাশে প্রবেশ করচি। নানা নামের নানা দেশে মানুষ পৃথিবীকে ভাগ করেচে, কিন্তু আসল ভাগ হচ্চে ঠাণ্ডা দেশ আর গরম দেশ। এই ভাগ অনুসারে পৃথিবীর জলস্রোত পৃথিবীর বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে আকাশে মেঘবৃষ্টি ও ধরণীতে ফলশস্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করচে। এই ঠাণ্ডাগরমেই মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্য এমন বহুধা হয়ে উঠেচে। ইতিহাসের নানা ধারা পৃথিবীর এক দিক থেকে আরেক দিকে প্রবাহিত হচ্চে এবং পরস্পর আহত প্রতিহত হয়ে ঐতিহাসিক উনপঞ্চাশ পবনের রুদ্র নৃত্য রচনা করে চলেচে, সেও এই ঠাণ্ডাগরমের বিপরীত শক্তির ক্রিয়া। ঠাণ্ডাগরমের এই স্বাভাবিক বিরোধ এবং বৈচিত্র্য মিটবে না। আমরা গরম দেশের লোক একভাবে চিন্তা করব কাজ করব, ওরা ঠাণ্ডা দেশের লোক আরেক ভাবে। আমাদের জিনিষ ওদের হাটে এবং ওদের জিনিষ আমাদের হাটে চালাচালি করতে পারব, কিন্তু ওদের ফল আমাদের ডালে আর আমাদের ফল ওদের ডালে ফলবে এ কোনো-দিনই ঘটবে না। ওরা যে শক্তি জগতে চালাচ্চে সে ঠাণ্ডা হাওয়ার শক্তি—সে শক্তি জাপানের পক্ষে সহজ, কেননা জাপান আছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে, আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কোনো বিশেষ শক্তি ক্ষণকালের জন্যে চালনা করতে সকল মানুষই পারে কিন্তু উপযুক্ত হাওয়ার আনুকূল্য না পেলে সে শক্তিকে নিরন্তর রক্ষা করা এবং তাকে নিয়ত বিকশিত করে তোলা অসম্ভব। দেবতার অনবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতায় ক্রমে শৈথিল্য এবং ক্লান্তি এসে পড়বে এবং ক্রমে বিকৃতি ঘটতে থাকবে। জাহাজে করে পৃথিবীর একভাগ থেকে আরেক ভাগে চলবার সময় এই কথাটা বোঝা খুব সহজ হয়। সৃষ্টিক্রিয়ার উত্তাপের বৈচিত্র্যই শক্তিবৈচিত্র্য,

সে কথাটা ভারতসমুদ্র থেকে মধ্যধরণী সাগরের দিকে আসবার সময় নিজের সমস্ত শরীরমন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। আমার একথা শুনে তোমরা হয় ত বলবে, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার কাছে নিশ্চেষ্ট-ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে? আমরা কি ইচ্ছাশক্তির জোরে তার উপরে উঠতে পারিনে?" এ কথার উত্তর হচ্চে নিশ্চেষ্ট হতে হবে এমন কথা বলা চল্‌বে না, কিন্তু চেষ্টাকে বিশেষত্ব দেওয়া চাই। বাহ্যপ্রকৃতি ও মানসপ্রকৃতির যোগেই মানুষের সমস্ত সভ্যতা তৈরি হয়েচে, এই বাহ্যপ্রকৃতিকে মানুষ কিছু পরিমাণে বদলও করতে পারে কিন্তু সে বদল খুচরো বদল, মোটা বদল হবার জো নেই। তাহলে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাজটা কি? তার কাজ হচ্চে এই, যেটা পাওয়া গেছে সেটাকেই পূর্ণ উদ্যমে সফল করে তোলা, জড়তার দ্বারা সেটাকে নিরর্থক না করা। অবস্থার যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনি সফলতারও বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছাশক্তি সেই বৈচিত্র্যকে দোহন করে নিতে পারে কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন অবস্থাগত সফলতাকে একমাত্র পরমার্থ বলে লুব্ধভাবে কামনা করা শক্তি-হীনের কাজ। উপনিষদে বলেচেন, যিনি এক তিনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি তাঁর বহুধা শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিহিত অর্থ দান করেচেন। সেই নিহিত অর্থ নিজের ক্ষেত্রেই আছে; নিজের শক্তির দ্বারা সেই নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্ঘাটিত করতে পেরেচে সেই জাতিই সার্থক হয়েচে। কারণ, যে জাতি নিজের অর্থ পেয়েচে বিনিময়ের দ্বারা পরের অর্থকেও সেই জাতি নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে। নিজের নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্ঘাটিত করে না, সেই জাতি ধার করে, ভিক্ষা করে' চুরি করে' পরের অর্থ কামনা করে, কিন্তু এই পন্থায় কোনো জাতি ধনী হতে পারে না, কেন না, এই পথে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে জাতও যায় পেটও ভরে না। ইতি ২৪শে মে, ১৯২০।

৫

দুই মহাদেশের মাঝখান দিয়ে চলেচি। বামে ইজিপ্ট, দক্ষিণে আরব। দুই

তীরেই জনহীন তৃণহীন ধূসরবর্ণ পাহাড় যেন দুই ঈর্ষাপরায়ণ দৈত্যভ্রাতার মত পরস্পরের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করচে, আর যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে তারা উভয়েই জন্ম নিয়েচে সেই সমুদ্র যেন দিতি মাতার দুই হননোন্মুখ ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে অশ্রুপরিপূর্ণ অনুনয়ের দ্বারা দুই পক্ষকে তফাৎ করে রেখেচে।

বামের তীর শব্দহীন নিস্তব্ধ, দক্ষিণের তীরও তাই। কিন্তু এই দুই তীরের ভূরঙ্গমঞ্চে মানব ইতিহাসের যে নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে, আমি মনে মনে তারই কথা চিন্তা করে দেখ্‌চি। ইজিপ্টে যে মানব সভ্যতা বিকাশ পেয়েছিল সে বহুদিনের এবং সে বহু সম্পদশালী। তার কত চিত্র, কত অনুষ্ঠান, কত মন্দির। আর আরবে যে জাগরণ হঠাৎ দেখা দিয়াছিল তার কত উদ্যম, কত উদ্যোগ, কত শক্তি। কিন্তু দুই বিপরীত তীরে মানবচিত্তে এই দুই উদ্বোধন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। ইজিপ্ট আপনার বিপুল আয়োজনের মধ্যেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর আরব আপন দুর্দ্দমনীয় বেগে দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুই সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ ছিল দুই দেশের ভৌগোলিক পার্থক্যের মধ্যে। নীল নদীর জলধারায় পরিপুষ্ট ইজিপ্ট ফলে শস্যে পরিপূর্ণ; অভাবের কঠিন তাড়নায় সেখানকার মানুষকে নিরন্তর আঘাত করে নি। স্তন্যরসহীন আরব-মরুভূমির সন্তানেরা নিজে অস্থির হয়েছিল এবং পৃথিবীর সকলকে অস্থির করেছিল।

বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র যেমন দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঋষি ছিলেন তেমনি ইজিপ্ট এবং আরব দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর দেশ। পৃথিবীর সকল দেশের লোককেই দুই মোটা ভাগে বিভক্ত করে' বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বসিষ্ঠ বাস করেন, আর বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন। বসিষ্ঠ ধেনুপালন করেন আর বিশ্বামিত্র ধেনুহরণ করেন। বসিষ্ঠ রামচন্দ্রের কানে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের হাতে অস্ত্র দেন। বসিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী গৃহের পুরোহিত, আর বিশ্বামিত্র দুর্গম বনপথের নেতা।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষ এবং চীন বসিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত; আর য়ুরোপ

বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল। এই দুই ঋষি কি কোনো দিন প্রেমে মিলবেন? আর যদি না মিলতে পারেন তা হলে পৃথিবীতে কি কোনো কালে বিরোধের অবসান হবে? যদি এমন আশা কর যে, দুইয়ের মধ্যে এক ঋষি যেদিন মারা যাবেন সেইদিনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা দেবে, তবে সে আশা সফল হবে না, কেননা জগতে বসিষ্ঠও অমর বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস একদিন এই দুই ঋষিই এক যজ্ঞের ভার নেবেন, মন্ত্র এবং অস্ত্র, অমৃত এবং উপকরণ একত্রে মিলিত হবে, সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা আর নিববে না। এশিয়া এবং য়ুরোপ যদি কোনো দিন সত্যে মিলতে পারে তা হলেই মানুষের সাধনা সিদ্ধ হবে— নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপস্যা বারংবার কলুষিত হতে থাকবে।

২৪শে মে, ১৯২০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বারনির্ণয়

The Teacher's Aid নামক পত্রিকায় "দুহাজার বছরের পাঁজী" শীর্ষক প্রবন্ধে কোন্ বছরের কোন্ তারিখে কি বার ছিল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য একটি নিয়ম বাহির হইয়াছে। এই নিয়মের মধ্যে একটি দোষ এই যে, প্রত্যেক শতাব্দীর জন্য কোন একটা সাধারণ নিয়ম নাই। আবার ইহাও একটি অসুবিধা এই যে, ঐ নিয়মটি ব্যবহার করিতে হইলে দুইটি তালিকা সম্মুখে রাখিতে হয়। বারনির্ণয়ের ঐ নিয়ম অপেক্ষা আর একটি সহজ নিয়ম এই প্রবন্ধে আমরা প্রকাশিত করিব।

মনে করা যাক্ আমরা ১৮০৫ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে কি বার ছিল জানিতে চাই।

নিয়ম—(ক) বৎসরের সংখ্যা = ১৮০৫

(খ) ঐ তারিখের মধ্যে যতগুলি 'লিপ ইয়ার' আছে তাহার সংখ্যা = ৪৫১

(গ) ১লা জানুয়ারী হইতে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত যতদিন হইবে তাহার সংখ্যা = ২৯৪

(ঘ) যতগুলি শতাব্দী ঐ তারিখের মধ্যে আছে তাহার সংখ্যা হইতে প্রত্যেক ৪০০ বৎসরের জন্য ১ দিন করিয়া বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকিবে তাহার সংখ্যা = ১৪, কারণ ১৮০৫ সালের মধ্যে ১৮টি শতাব্দী আছে এবং ইহার মধ্যে ৪০০ বৎসর ৪বার আছে, এইজন্য ১৮ হইতে ৪ বাদ দিলে ১৪ থাকে।

এইবার ক, খ, গএর যোগফল হইতে ঘ বিয়োগ করিতে হইবে। যাহা বাকী থাকিবে তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগশেষ যদি কিছুই না থাকে তাহা হইলে আলোচ্য দিনটি শনিবার। ১ বাকী থাকিলে রবিবার ইত্যাদি; অর্থাৎ

শনিবার হইলে—০
রবিবার—১
সোমবার—২
মঙ্গলবার—৩
বুধবার—৪
বৃহস্পতি—৫
শুক্রবার—৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—যদি তারিখে বছরটি লিপইয়ার হয় তাহা হইলে ফেব্রুয়ারী মাসটি ২৯ দিনের পরিবর্ত্তে ২৮ দিন ধরিতে হইবে।

এইরূপে আমরা এখন ১৮০৫ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে কি বার ছিল তাহা অতি সহজেই বাহির করিতে পারিব যথা—

১৮০৫, ৪৫১, ২৯৪ এর যোগফল হইতেছে ২৫৫০ এবং এই যোগফল হইতে ১৪ বিয়োগ করিলে ২৫৩৬ বাকী থাকে। এই রাশিটিকে ৭ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ ২ থাকে অতএব ঐ দিনটি সোমবার।

এইরূপে যে কোন তারিখে বার নির্ণয় করা যাইতে পারে।

এই কথা মনে রাখিতে হইবে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পরের দিন অর্থাৎ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখকে ১৪ই সেপ্টেম্বর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। এইজন্য ২রা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে সকল তারিখের গণনায় ১১ যোগ করিয়া লইতে হইবে। তার পর ৭ দিয়া ভাগ দিতে হইবে।

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

পঞ্চপল্লব

ছাত্রতন্ত্র বিদ্যালয়

The Junior Republic by William R. George.

আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে আজ উইলিয়াম জর্জ্জের নাম সুপরিচিত। সুধীপ্রবর জর্জ্জের Frevile সহরে স্থাপিত বিদ্যালয়টির নামও আজ অনেকেই জানেন। বিদ্যালয়টির নাম The Junior Republic।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য যেমন Republic অর্থাৎ সাধারণ বা গণ-তন্ত্র, জর্জ্জের এই বিদ্যালয়ও সেইরূপ। ছাত্রেরা নিজেই পরিচালনা করে বলিয়া ইহার নাম রাখা হইয়াছে The Junior Republic। বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যবস্থা ছোট আয়তনে ঠিক

একটা বড় শহরেরই মত। ছাত্রেরা সেই শহরের Citizen অর্থাৎ বাসিন্দা। তাহারা ইহার সভাপতি, বিচারক, পুলিশ, ধনাধ্যক্ষ, ইত্যাদি সমস্তই। ছাত্রদের Town Meeting-নামক মাসিক সভায় যে নিয়ম একবার ঠিক হয়, তাহা একেবারে পাকা হইয়া যায়। এই বালকতন্ত্র বিদ্যালয়টির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দিতেছি।

জর্জ্জ সামান্য দরিদ্র পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পড়াশুনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল না; ব্যবসায় বাণিজ্য ও সৈনিক-বৃত্তির দিকেই তাঁহার মনের ঝোঁক ছিল। সৈনিকের কাজ লইয়া তিনি সহরে বাস করিতে আরম্ভ করেন, এবং তখন হইতে সহরের দরিদ্র ও হীনজাতীয় বালকদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পান।

আমেরিকার কোন কোন সদাশয় ধনী সহরের গরীব বালকদিগকে লইয়া বসন্ত কালের ছুটীতে সহর হইতে গ্রামে বেড়াইতে যান। এই ভাবটা হঠাৎ জর্জ্জের মনে যেই ভাল লাগিল অমনি তিনি একদিন একদল দরিদ্র বালকবালিকাকে সহর হইতে লইয়া কিছু দূরে Frevile-নামক এক গ্রামে যান। ভবিষ্যতের Republic-এর এই প্রথম সূত্রপাত।

পরের বছরেও এই রকম দুইটি দল লইয়া জর্জ্জ ছুটীটা কাটাইলেন। স্থানীয় পত্রিকায় Frevile-এর এই সদনুষ্ঠানটির প্রশংসা হইতে লাগিল, এবং সাহায্য ও সহানুভূতিও চারিদিক হইতে পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু এমন সময়ে জর্জ্জের মনে হঠাৎ একটা খটকা বাধিয়া গেল। সকলেই 'ভাল ভাল' বলিয়া প্রশংসা করে, কিন্তু জর্জ্জের মনে হইল যে, এই অনুষ্ঠানে ছেলেদের ভাল না হইয়া বরং ক্ষতি হইতেছে।

জর্জ্জ ছেলেদের কাপড়চোপড় এবং আরো নানারকম জিনিষ পত্র দিতেন; ক্রমশ ছেলেদের মনে ইহাতে একটা ভিক্ষুকের ভাব দৃঢ় হইতে লাগিল। এক-জন-না-একজন বালক আসিয়া প্রত্যহই তাঁহাকে বলিত, "মিষ্টার জর্জ্জ, যখন বাড়ী যাব, আমরা জামা-কাপড় পাব ত? গত বারের ছুটীতে যে লোকটি

আমাদের বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আপনার থেকে আমাদের ভাল কাপড়-চোপড় দিয়েছিলেন।"

এই রকম প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ছেলেরা কতকগুলি পুঁথির শ্লোক শিখিলেও তাহাদের চরিত্র হইতে আত্মসম্মানবোধ একেবারে লোপ পাইতেছিল। এই ভাবনা যখন জর্জ্জকে পাইয়া বসিল, তখন একদিন অন্যদিনের মতই কয়েকটি ছেলে আসিয়া জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের জামা-কাপড় দেবেন ত?" অন্যদিন জর্জ্জ এই প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজ তিনি বলিলেন, "তোমরা এখানে বিনা পয়সায় খাওয়া-দাওয়া, এমন খোলা হাওয়া পাচ্চ, তার উপরে এই সব ভদ্রলোকেরা কেন শুধু শুধু তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য কাপড় চোপড় দেবেন?" এই কথায় ছেলে মেয়েদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, "মিষ্টার জর্জ্জ, তা হ'লে আমরা এখানে কি করতে এসেছি?" যে সন্দেহে জর্জ্জের মন পীড়িত হইতেছিল, সেই সন্দেহ অমূলক নয়, জর্জ্জ তাহা বুঝিতে পারিলেন। নূতন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় তিনি লাগিয়া গেলেন। পরের বছরেও ছুটীতে জর্জ্জ আর একদল ছেলে লইয়া Frevileএ আসিলেন। এবার তাঁহার নিয়ম হইল —"পরিশ্রম না করিয়া কেহ কিছু পাইবে না।" ছেলেরা পরিশ্রম করিতে একেবারে নারাজ, কিন্তু জর্জ্জ তাহাদের হাস্য-উপহাসে লাঞ্ছিত হইয়াও আপনার মূল মত ছাড়িলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া এবং বাধ্য হইয়া ছেলেরা কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

জর্জ্জ ছেলেদের চালনার জন্য কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ছেলেরা সুবিধা পাইলেই দুষ্টামি করিয়া সেই নিয়মগুলি ভাঙিত। কিন্তু ছেলেদের সেইসব স্বোপার্জ্জিত জিনিষ-পত্র নষ্ট ও চুরি হইত বলিয়া তাহারা প্রায়ই আসিয়া জর্জ্জকে এই সব জিনিষপত্রের রক্ষাসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিতে অনুরোধ করিত। জর্জ্জ তাহাদের অনুরোধে কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেরা এই নিজেদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী খুব শ্রদ্ধা ও

আগ্রহের সঙ্গে পালন করিত। এই ঘটনাটিই জর্জের মনে সর্বপ্রথমে Republic-এর মৃদু আভাস জাগাইয়া দিয়াছিল।

জর্জের স্কুলের এইসব ছেলেরা 'কথামালার' গোপালের মত সুবোধ বালক ছিল না। তাহাদের জ্বালায় পাড়ার লোকের আতা ও আঙুর ফলের গাছ হঠাৎ একদিন একেবারে ফলহীন হইয়া যাইত। তাহারা উত্যক্ত হইয়া এমন কি শেষে জর্জের কাছ থেকে ফলের দাম আদায় করিতে লাগিল। জর্জ দিনের পর দিন কত শাস্তি দিতে লাগিলেন, প্রহারের দরুন তাহাদের চুরি করিয়া-করিয়া খাওয়া কিছুদিনের মত বন্ধ থাকিত, কিন্তু হঠাৎ আবার একদিন চুরির খবর আসিয়া তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিত। প্রত্যহ শাস্তি পাইতে-পাইতে চুরি করায় যে, বিশেষ কোন অন্যায় হইয়াছে এমন ভাব ত দূরের কথা বরং তাহাতে যেন একটা স্বাভাবিক অবস্থা ও ভাব তাহাদের মুখের মধ্যে দেখিয়া হঠাৎ একদিন জর্জের চৈতন্যোদয় হইল। জর্জ ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া ইহাদের মনে দায়িত্ববোধ জন্মানো যাইতে পারে। তখন হঠাৎ তাঁহার মনে একটা নূতন ভাব আসিল। তিনি অপরাধী ছাত্রদের বিচারের জন্য তাহাদেরই সহপাঠী বন্ধুগণকে বিচারক করিয়া দিলেন। অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহাদিগকে দণ্ডস্বরূপ যে কাজ করিতে হইত তাহার তদন্ত করিবার ভারও তাহাদের ঐ সহপাঠীদেরই উপর দিলেন। এই আত্মসম্মান-প্রথায় ধীরে-ধীরে চুরির অপরাধ অনেক কমিয়া যাইতে লাগিল।

পরের বৎসর ১০ই জুলাই জর্জ আবার নিউ ইয়র্ক হইতে একদল ছেলে লইয়া Frevile-এ উপস্থিত হইলেন। এই ১০ই জুলাই তারিখে Republic-এর গোড়াপত্তন, ও এই তারিখেই এখন প্রতিবৎসর Frevile এ উৎসব হয়। এবার জর্জের মাথায় যে সব নূতন রকমের কল্পনা ঘুরিতেছিল, সেই গুলি তিনি কাজে লাগাইলেন। ছেলেরা আসিয়া দেখিল একটা দালানের একটা ঘরের সামনে লেখা আছে 'আদালত,' আর একটা ঘরে 'ব্যাঙ্ক,' কিছুদূরে একটা অন্ধকার ঘরের সামনে লেখা আছে 'জেল'। প্রথম-প্রথম ছাত্রেরা জর্জকেই

Republic-এর সভাপতি ও বয়স্ক ছাত্রদিগকে অন্যান্য কাজ করিতে বলিলেন এবং ছাত্রদিগকেই Republic-এর সমস্ত নিয়ম করিতে হইল। Republic-এর মধ্যেই ছুতারের কাজ, পোষাক তৈরীর কাজ, রান্না ও অন্যান্য কাজেরও জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ হইল।

আগের বার জর্জ ছেলেদিগকে স্বোপার্জিত অর্থে পোষাক কিনিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, এবার তিনি আরও একটু অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, "প্রত্যেককে উপার্জন করিয়া আহারের উপায় করিতে হইবে।" তিনি নিজের হাতে বিশেষ করিয়া ঐখানকার জন্য মুদ্রা প্রস্তুত করাইলেন, এবং নিয়ম করিলেন, যে পরিশ্রম করিয়া অধিক মুদ্রা উপার্জন করিবে, সে তাহা খাদ্য অধিক কিনিতে পারিবে। কেহই ভিক্ষুকতার প্রশ্রয় পাইবে না।

ছেলেরা উপার্জন করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয়ও করিতে লাগিল, তাহার জন্য ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা হইল, ছেলেরাই তাহার পরিচালক।

ছেলেদের মধ্যে যাহাতে কোন অশান্তি বা উপদ্রব না ঘটে এই জন্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদেরই মধ্য হইতে বাছিয়া একদল ছেলেকে পুলিশ করা হইল।

জর্জের বলার পর ছেলেদের মধ্যে অনেকেই খুব উৎসাহের সঙ্গে আহার্য্যের উপায়ের জন্য কাজে লাগিয়া গেল, কিন্তু কয়েকটি কুঁড়ে ছেলে সকলের গলগ্রহ হইয়া কিছুকাল কাজ না করিয়া বেশ আরামে কাটাইতেছিল। কর্ম্মী বালকেরা ইহা বেশীদিন সহ্য না করিয়া তাহাদের 'Town Hall' অর্থাৎ সভাগৃহে গিয়া 'Pauper Bill' অর্থাৎ 'ভিক্ষোপজীবিকা-প্রতিরোধক' আইন প্রবর্ত্তন করিল। এই নিয়ম হবার পর ইচ্ছা করিয়া আর কোনো কর্ম্মক্ষম বালক নিষ্কর্ম্মার মত পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইল না।

ছেলেরা চাষের কাজ, ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, বা ফুলবাগান প্রভৃতির কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল। যে যেমন কাজ করে সে তেমন পয়সা পায়। তা ছাড়া ছেলেদের মধ্যে কেহ বা ব্যাঙ্কের কর্ত্তা, কেহ বা ব্যবসাদার, কেহ বা উকিল, কেহ বা রাজকর্ম্মচারীর কাজ করিত। সকালে ৮টা হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজের

সময়। দুপুর বেলা খাওয়া হইলে একটু বিশ্রামের পর অতিরিক্ত কাজ করিয়া অতিরিক্ত উপার্জ্জনও করিতে পারা যাইত। সন্ধ্যা ৬টায় খাওয়ার পর কোন দিন গান, কোন দিন অভিনয়, কোন দিন বা উপাসনা হইত। অপরাহ্নে বসিত আদালত।

এই রকম করিয়া সকলদিক্ হইতে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাইয়া ছাত্রদের মনে আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হইতে লাগিল। অপরাধী কিছুদিন জেলে থাকিয়া সমবয়সী বন্ধুদের কাছে লাঞ্ছনা পাইয়া মনে মনে ভাল হইবার দৃঢ় সংকল্প করিতে শিখিল।

এবারেও ছুটী প্রায় ফুরাইয়া আসিল, কিন্তু জর্জ্জের মনে এবার এই Republicটিকে চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা হইল। ছেলেদের অনেকেই চলিয়া গেল, বাকী রহিল মোটে পাঁচটি। এই পাঁচটিই হইল Republicএর সহায়। তাহারা সেই দুর্দ্দিনে কত দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করিয়াও সেখানে ছিল তাহা বলা যায় না। প্রায় আড়াই মাইল, তিন মাইল হাঁটিয়া প্রত্যহ তাহারা গ্রামের স্কুলে পড়িতে যাইত। তাহাদের শোওয়ার ঘরের ছাদ ভাল ছিল না, বৃষ্টিতে রাত্রে সমস্ত ভিজিয়া যাইত। ভোর বেলায় উঠিয়া তাহারা বলিত, "রাত্রে শুইয়া শুইয়া ছাদের ফাঁকদিয়া আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িয়াছি।" তাহাদের প্রাত্যহিক খাবার ছিল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আলু আর বিলাতি বেগুন। কিন্তু সুখের বিষয় এত অসুবিধা সত্ত্বেও এই পাঁচটি ছাত্র জর্জ্জকে ছাড়ে নাই।

ক্রমে ক্রমে ছাত্র-সংখ্যা বাড়িয়া কুড়িটি হইল। সে বৎসরও বসন্তের ছুটির সময় নিউইয়র্ক হইতে প্রায় ১৬০ জন ছেলে আসিল। এই শুধু ছুটির সময়কার ছাত্রদের চেয়ে স্থায়ী ছাত্রদের ক্ষমতা অনেক বেশী।

এই সময়ে জর্জ্জের বিবাহ হওয়াতে Republicএর মধ্যে একটি নূতন জীবন দেখা দিল। এতদিন স্থায়ী ছাত্রী একটিও ছিলনা, এবার হইতে বালিকাদেরও Republicএ লওয়া হইতে লাগিল। মেয়েদের বাদ দিয়া Republic হইতেই

পারেনা। ছেলে ও মেয়েদের এক বিদ্যালয়ে রাখাতে সাময়িক ত্রুটি ও অন্যায় সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্য পালন করিতে শেখে।

ছুটির সময় যে সাময়িক ছাত্রদল আসে তাহাদের সঙ্গে স্থায়ী ছাত্রদের ঠিক বনিবনাও হইত না। প্রায়ই দুইদল ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি ও বিষম ঝগড়াঝাঁটি করিত। স্থায়ী ছাত্র-সংখ্যা ৫০ হইলে স্থির হইল যে, পর বৎসর হইতে আর সাময়িক ছাত্র লওয়া হইবে না।

Republicএর খ্যাতি ক্রমশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সাহায্যও আসিতে লাগিল। প্রথমে ছেলেরা পড়িবার জন্য Republicএর বাহিরে গ্রামের স্কুলে যাইত, পরে Republicএর মধ্যেই স্কুল স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল গরীব ছেলে ছাড়া আর কাহাকেও Republicএ লওয়া হইবে না। ক্রমশ বড়লোকেরাও নিজেদের ছেলেদের Republicএ রাখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় তাহাদিগকেও লওয়া হইতে লাগিল।

এই রকম করিয়া ধীরে ধীরে জর্জ্জের The Junior Republic আজ অনেকের নিকটে পরিচিত হইয়াছে। ছেলেদের শ্রদ্ধা করিয়া ও তাহাদের হাতে অধিকার দিয়াই জর্জ্জ তাহাদের চিত্ত জয় করিয়াছেন। জর্জ্জ ক্রমশ Republicএর President বা সভাপতির পদও নিজে ছাড়িয়া দিয়া একটি ছেলেকেই সভাপতি করিয়া দিয়াছেন। সভাপতি, বিচারক, পুলিশ, ধনাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সমস্ত পদেরই অধিকারী ছেলেরা। জর্জ্জ ছেলেদের যে কতটা স্বাধীনতা দেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত নীচে দিতেছি।

একবার Republicএর কয়েকটি অপরাধী ছেলে বন্দী অবস্থায় একটা জায়গায় বসিয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের খানিকটা দূরে জেলের একজন কর্ম্ম-চারীও রহিয়াছে। গল্পপ্রসঙ্গে একজন বন্দী বলিল, "ভাই, তোমাদের এ জায়গাটা ভাল না, এখানে চুরুট খাওয়া যায় না। এরা যেমন সিগারেটের বিল পাস করে' চুরুট খাওয়া উঠিয়ে দিয়েছে, এসো না, আমরাও সবাই মিলে Town

Meetingএ গিয়ে সেই বিলের প্রতিবাদ করে আর একটা বিল পাস্ করি।"

ছেলেটির কথায় অন্যান্য বন্দীদেরও উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত ছেলেটি বলিল, "কিন্তু ভাই, মিষ্টার জর্জ্জ হয়ত আমাদের সিগারেট খাওয়ার বিল পাস করতে বাধা দেবেন।"

জেলের কর্ম্মচারীটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "দেখ, তোমাদের কারো চেয়ে আমার সিগারেট খাওয়ার নেশা কম নেই, কিন্তু তোমরা দেখ্‌ছি মিষ্টার জর্জ্জকে চেন না। তিনি ছেলেদের সিগারেট খাওয়ার খুব বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি বেশ জানি যে, আমরা যদি ছেলেরা মিলে ভোট দিয়ে সিগারেট খাবার বিল পাস করাতে পারি, তাহ'লে তিনি কখনও বাধা দেবেন না, কেবল একটু দুঃখ প্রকাশ করবেন। কিন্তু আসল মুস্কিল কোথায় জান? বিল পাশ হওয়ার আগে ঐ যে আমাদের সভাপতির স্বাক্ষর চাই, সে কিন্তু স্বাক্ষর করার মত ছেলেই না। অবশ্য তার স্বাক্ষর ছাড়াও চলে যদি আমরা ছেলেদের তিন ভাগের দুই ভাগ ভোট পাই, কিন্তু ধনাধ্যক্ষ, বিচারক, ও সম্পাদক হয়ে যে সব ছেলে আছে, তাদের প্রায় সব ছেলেই মেনে চলে, তোমরা ত তাদের কাছেও ঘেঁসতে পারবে না, আর অত ভোটও পাবে না।"

এই উদাহরণ হইতে জর্জ্জের মনের উদারতা বুঝা যায়। তিনি ছেলেদের ঘাড়ে জুলুম করিয়া কোন নিয়ম চাপাইতে চান না, তাহার দরুন ছেলেরা ভুল করিতে পারে, কিন্তু তাহারা ঠেকিয়া শিখিবে।

স্বাধীনতা যে মাঝে মাঝে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয় তাহা জানিয়াও ছেলেদের স্বাধীনতা হইতে জর্জ্জ বঞ্চিত করেন নাই। উচ্ছৃঙ্খলতার অসুবিধা দেখিয়া ছেলেরা কি ভাবে ঠেকিয়া শেখে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

Republicএ একসময় ছেলেদের প্রধান কাজ ছিল চাষের কাজ। শস্য কাটাইবার সময় ছেলেদের সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইত। ছেলেদের মধ্যে একটি ছেলে অন্য কোন কাজে সুবিধা করিতে না

পারিয়া অবশেষে ছেলেদের মধ্যে বিদ্রোহপ্রচার করিতে লাগিল। সে বলিল, "ভাই, আমরা দিনে আট ঘণ্টার বেশী কাজ করব কেন? শস্য নষ্ট হ'লে আমাদের কি আসে যায়? আমরা যদি আট ঘণ্টার বেশী কাজ না করি তাহা হইলে বিকাল ৪টার সময় আমাদের কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত আমরা খেলা করতে পারি।"

এই বালকনেতার কথায় সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

সকল ছাত্র নেতাকে সঙ্গে করিয়া সভাগৃহে মহোৎসাহে সেইদিন প্রাতেই একত্রিত হইল।

সকলেরই মুখে 'আটঘণ্টা আইন কি ফতে' 'Three cheers for eight hours law!' ভোট লওয়ার সময় সকল ছাত্রই 'হ্যাঁ' বলিয়া আইন সমর্থন করিল, কেহ 'না' বলিয়া আইন প্রতিবাদ করিতে চায় কি না সভাপতি জানিতে চাহিলে একটি মাত্র ছাত্র খুব জোরের সঙ্গেই বলিল 'না'। কিন্তু অন্যান্য সকল-ছাত্রের সমর্থনসূচক 'হ্যাঁ' বলায় তাহার 'না' কোথায় মিলাইয়া গেল, সভায় তাহার বিরুদ্ধে হাস্য-উপহাস চলিতে লাগিল। সভাপতির স্বাক্ষর লইয়া 'আটঘণ্টা আইন' Repulic এ প্রবর্ত্তিত হইল।

এদিকে Republicএর মেয়েরাও এই আইনে উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহারা সকলের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভোর ৬টা হইতে কাজ আরম্ভ করে। তাহাদের আট ঘণ্টা বেলা দুইটার সময় শেষ হইলে তাহারা কিছু খাদ্য-সামগ্রী লইয়া সেইদিনই ভ্রমণে বাহির হইল।

সন্ধ্যার সময় ছেলেরা-খেলার পর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল, তাহারা আসিয়াই খাওয়ার ঘরে উপস্থিত, কিন্তু এ কি, সব যে অন্ধকার! ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, 'মেয়েরা কোথায়?' একজন প্রতিনিধি বলিল, 'তাহাদের আটঘণ্টা ২টার সময় শেষ হওয়াতে তারা বেড়াতে গিয়াছে।'

ছেলেরা তখন একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল, তখন যে একমাত্র ছাত্রটি সেদিনই প্রাতে এই আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিল, সেই আবার নেতৃত্বের পদ

গ্রহণ করিয়া সভাগৃহে সভা আহ্বান করিয়া সেই আইনটি রদ করিল—এবং একটি নূতন আইন প্রবর্ত্তন করাইল, সেটি এই যে, কোন নূতন আইন প্রবর্ত্তনের অন্তত ৩ দিন আগে তাহার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

অবিবেচকের মত হঠাৎ যে কোন উত্তেজনায় মাতিয়া কোন একটা আইন প্রবর্ত্তন করা যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতা তাহা ছাত্রেরা হাড়ে হাড়ে বুঝিল। তাহারা সকলে উৎসাহের সঙ্গে এই নূতন আইনটি সমর্থন করিল, কেবল সেই প্রভাতের নেতাটি তখন সভার এক কোণে বসিয়া নিজের রাগ নিজেই হজম করিতেছিল, কিন্তু সেই দিন রাত্রে সকল ছাত্রকেই খালি পেটে ঘুমাইতে হইল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—০—

তুরস্কে স্ত্রীশক্তির বিকাশ

The Passing of the Turkish Haram by, Barnatfe Millar,
Asia, April 1920.

তুরস্কে স্ত্রীলোকেরা অতিপূর্ব্বে অন্তঃপুরেই আবদ্ধ ছিল, বাহিরের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ছিল না। কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বেই রাজ-অন্তঃপুরের নারীগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে রাজ্যশাসন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। রাজপুরুষগণের উপর তাঁহাদের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা এক কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে অন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন, গোপনে বিদেশী দূতদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতেন, সুন্দর-সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতেন, এবং যথেচ্ছভাবে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করিতেন।

বিলাসী নৃপতি সুলেমানের (Suleiman the Magnificent) সময় হইতে দ্বিতীয় মামুদের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই তিন শতাব্দী ধরিয়া অন্তঃপুরের নারীগণই

প্রকৃতপক্ষে রাজ্য চালাইতেন; ফলত এই তিন শতাব্দীকে 'নারীরাজত্ব' বলা হয়।

ইহা ব্যতীত তুরস্কের যে কোন পরিবারেই বর্ষীয়সী মহিলার প্রভাব সর্ব্বত্র দেখা যায়। তুরস্কবাসী পারিবারিক বিষয়ে নারীর অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত তুরস্কের অন্তঃপুরবাসিনী নারী দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যেমত্ত পুরুষের ক্রীড়াপুত্তলী ছিল। বিশ্বের গতির সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না; উচ্চতর আকাঙ্ক্ষাও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মুসলমান নারীজগতে অতৃপ্তির সাড়া পাওয়া গেল। প্রথমে মিসর জাগিয়া উঠিল; তারপর ককেশসে স্ত্রীস্বাধীনতার পতাকা-হস্তে কতিপয় দূরদর্শী বিজ্ঞব্যক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। তুরস্ক তাহার পর ধীরেধীরে অগ্রসর হইল। অতি অল্পদিনেই তুরস্কের নারীগণ আপনাদের প্রাপ্য অধিকার অনেক পরিমাণে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজ্যশাসননীতি প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার পর হইতেই নারীগণ অদম্য উৎসাহের সহিত দেশের এবং আপনাদের হিতকল্পে চিন্তা ও শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই সময় হইতে আমরা দেখিতে পাই নারীগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সকল এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পত্রিকা বাহির করিতেছেন, সভা আহ্বান করিতেছেন, ও সমিতি স্থাপন করিতেছেন। গত মহাযুদ্ধে প্রয়োজন-মত দেশের সকল প্রকার কার্য্যে তাঁহারা হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে নারীর শক্তির প্রতি দেশবাসীর আস্থা ক্রমশই বাড়িয়া যাওয়াতে নারীর অধিকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

একটী নারীসমিতি-কর্ত্তৃক চালিত 'নারীর রাজ্য' (Woman's World) নামক এক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের কয়েকটী ছত্র পাঠ করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব তুরস্কের নারীগণের মধ্যে কিরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, এবং বিশ্বের মধ্যে আপনাদের স্থান করিয়া লইতে পারিবেন এই বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন—"আমরা প্রকৃত সুখলাভ করিতে না পারিলে

তার জন্য আমরাই দায়ী। পুরুষজাতি আজ দেখিতেছে যে, দেশের কল্যাণ অধিক পরিমাণে আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। জ্ঞানের বিকাশ, চরিত্রের বিকাশ, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। 'কে আমাদের সুখী করিতে পারিবে'? ইহাই প্রশ্ন নহে, কিন্তু ইহাই প্রশ্ন 'আমরা কেমন করিয়া দেশ ও দেশবাসীর কাজে নিজেদের শক্তি বেশী করিয়া লাগাইতে পারি'?"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Djevdet Pasha নামে এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রচার করিলেন যে, নারীগণ পুরুষদের সমানই শিক্ষা পাইবেন। তিনি নিজে তাঁহার দুই কন্যাকে নানাপ্রকার ভাষা শিক্ষা দিলেন, সাহিত্য, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ও গণিতে তাঁহারা পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

সেই বৎসর হইতেই তুরস্কের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলে ক্রমশ অনেকগুলি নারীবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। নারীদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে ছয় বৎসর লাগিবে ইহাই স্থির হইল; তন্মধ্যে তিন বৎসর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ও শেষ তিন বৎসর উচ্চতর শিক্ষার জন্য। এখন একটী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্প শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় আছে।

রাজকীয় 'অটোম্যান' বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নারীগণের জন্য বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের বিভাগ খুলিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসা বিভাগে সরকার বাহাদুর নারীগণকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং কতিপয় নারী তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার অনুমতি এখনো নারীদিগের হাতে দিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি ইউরোপীয় সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয় 'হালিডে হানুম' (Halideh Hanonum) নামে এক নারীকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করিবার জন্য সরকার হইতে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নারীবিদ্যালয়গুলির জন্য শিক্ষয়িত্রীর এরূপ প্রয়োজন হইয়াছে যে, পুরুষের অপেক্ষা নারীগণ দ্বিগুণ বেতনে কর্ম্মে প্রবেশ করেন। ১৯১৪ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় একশত নারী শিক্ষার জন্য জার্ম্মানি ও অষ্ট্রীয়ায় প্রেরিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে কোনও তুরকরমণী ইউরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতে পারিতেন না, আজকাল নারীগণ স্বদেশ হইতেই আপনাদের সাজসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বেশে অবাধে ইউরোপ যাত্রা করেন।

তুরকে বহুবিবাহ এখনো আইনত অন্যায় নহে। পূর্ব্বে যাহার অন্তঃপুর যত বেশী স্ত্রীতে পূর্ণ থাকিত, ততই তাহার ধনের পরিচয় পাওয়া যাইত। ক্রমশ নানা কারণে এই রীতির প্রচলন কমিয়া আসিতেছে। তুরকের পূর্ব্বের সেই অতুল ঐশ্বর্য্যও নাই। পূর্ব্বের ঐরূপ বৃহৎ অন্তঃপুর পালন করাও অধুনা অসম্ভব। ইহা ব্যতীত পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বহুবিবাহকে সমাজে লজ্জাকর বলিয়া মনে করা হয়। শিক্ষিত উচ্চপদস্থ কোনও তুর্কীর একের অধিক স্ত্রী নাই। বস্তুত তাঁহারা মনে করেন, বহু স্ত্রী থাকা সকল দিক্ দিয়াই অসুবিধা জনক। শেষ দশ বৎসরের মধ্যে একবিবাহের আদর্শ সম্পূর্ণরূপেই তুরকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

এখনও অতি অল্পসংখ্যক রক্ষণশীল ব্যক্তি আপনাদের পরিবারের মধ্যে অন্তঃপুর-প্রথা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলেও প্রায় সর্ব্বত্রই নারীগণকে অবাধে রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখা যায়। পুরুষ ও নারীর মিলিত সভায় নারীগণ স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

স্বাধীনতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীগণ পূর্ব্বের অন্তঃপুরের বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া বহির্গমনোচিত বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবরোধ-প্রথা উঠিয়া যাওয়ার সহিত অন্তঃপুরোচিত মুখাবরণও অন্তর্হিত হইতেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীগণ ক্রমশই আপনাদের স্থান করিয়া লইতেছেন। নব্যদলের আন্দোলনের ফলে ১৯০৯ সালে নূতন রাজ্যশাসননীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তখন নারীগণ নানা দিক দিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। হালিডে হানুমের নাম আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অপর কয়েকজনের নামও উল্লেখযোগ্য। Achmed Emin Bey, Gulistan Hanoman, Emineh

Hanoum প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদপ্রাপ্ত নারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

নারীগণ একণে মিলিতভাবে দেশের কার্য্যের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেন তাহা আমরা দুই একটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পারি।

বলকান্ যুদ্ধের সময় যখন হাজার-হাজার দেশীয় সৈন্য আহত হইয়া প্রতিদিন দেশে ফিরিয়া আসিতেছিল তখন এইরূপ লোকক্ষয় সহিতে না পারিয়া নারীগণ সভা করিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে আর অধিক সৈন্য যাহাতে প্রেরিত না হয় তাহার জন্য বারংবার আদেশ পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আবেদন একেবারে অগ্রাহ্য হইল না। গত যুদ্ধের সময় সৈন্যদলের আহার্য্য যথেষ্ট না হওয়াতে নারীগণ, ইহাদের আহার্য্য বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করিয়া কিছুপরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন।

গত যুদ্ধের সময় হইতে অন্যান্য স্থানের ন্যায় তুরস্কের রমণীগণও নানা প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আহত সৈন্যদিগের সেবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হইয়াছেন; সেবা সমিতির সভ্য হইয়া নানা স্থানে সৈন্যদিগের সেবার্থে যাইয়া তাহাদিগের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। ডাকবিভাগে, রেলওয়ে-বিভাগে, এমন কি বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগেও নারীর কর্ম্মপটু হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় হাসপাতাল চালান, যুদ্ধক্ষেত্রে আহার্য্য ও বস্ত্র প্রেরণ, প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ, এই সকল কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত তাঁহারা সম্পন্ন করিয়াছেন।

একণে নারীগণ মুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন; কোনওক্রমেই আর তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারা যাইবে না। জ্ঞানে ও কর্ম্মে মণ্ডিত নারী পুরুষের যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

শ্রীসুধাময়ী দেবী

বিশ্ববৃত্তান্ত

যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের লোকে নূতন করিয়া বুঝিতে পারিল যে, শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সুদূর পরাহত। ঘোর যুদ্ধের সময়ে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি হার্বাট ফিশার শিক্ষা-সংস্কারের বিল পাশ করান। সেই হইতে শিক্ষার উন্নতির জন্য দেশের চিন্তাশীল লোকেরা মন বিশেষ দিয়াছেন।

শিক্ষাবিষয়ক নূতন আইনানুসারে লণ্ডন শিক্ষাপ্রচারে পথপ্রদর্শক হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চস্কুল-শিক্ষার পরেও যাহাতে সাধারণ ছাত্র অধ্যয়নে রত থাকে, তজ্জন্য বহু স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই সব স্কুলকে Continuation School বলে। London Country Council অনুমান করিতেছেন যে, আগামী দশ বৎসরে Continuation School এ পাঁচ লক্ষ ছাত্র হইবে। আপাতত ২২টি স্কুলে ৩৬০ জন করিয়া ছাত্র এক-এক সময়ে পড়িবে। এই সকল ছাত্রকে সাধারণ ছাত্রের ন্যায় সপ্তাহে ছয় দিন পাঁচ ঘণ্টা করিয়া পড়িতে হইবে না, সপ্তাহে চার-চার ঘণ্টা করিয়া পড়িবে। ইহাতে প্রত্যেক স্কুলে পাঁচ দল করিয়া ছাত্র পড়িবে; অর্থাৎ একএক স্কুলে ১৮০০ ছাত্র হইবে,—কিন্তু কোনো সময়ে ৩৬০ এর অধিক একসঙ্গে বিদ্যালয়ে থাকিবে না। এই সব বিদ্যালয় বড়-বড় কলকারখানার কাছে করা হইবে। কলকারখানা ছাড়া ছোট দোকানে ও বাড়ীতে বালক ভৃত্যের অভাব নাই। ইহাদিগকেও কি উপায়ে বিদ্যালয়ে আনা যায় তাহার কথাও কর্তৃপক্ষ ভাবিতেছেন; বাড়ী-বাড়ী গিয়া সকলকে বুঝাইয়া এই বালক-বালিকা-দিগকে উদ্ধার করিবার কথা হইতেছে। মানুষের যে সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে সে পৃথিবীতে চলাফেরা করিতে পারে না, পৃথিবীকে বুঝিতে পারে না, সেইরূপ

জ্ঞান শিক্ষাই এখানে দেওয়া হইবে। শারীরিক ব্যায়াম ও মেয়েদের গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম ও ছেলেদের হাতের কাজ শিখানো ইহার আর একটী প্রধান অঙ্গ। বিদ্যালয়গুলিকে মুক্ত আকাশের তলে স্থাপন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে।

বিদেশের অনেক স্থানে একই বিদ্যালয়ে অনেক দল ছাত্র পড়ানোর প্রথা আছে। একটি স্কুলবাড়ী তৈয়ারী করিতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা নিতান্ত সামান্য নহে, অথচ ১৫ ঘণ্টা কাজের সময়ের মধ্যে গড়ে ৫ ঘণ্টার বেশী কোনো বাড়ী ব্যবহৃত হয় না। আর্থিক দিক্ হইতে ইহা একটা প্রকাণ্ড অপব্যয়। আমাদের মত দরিদ্র দেশে একই বাড়ীতে তিনবার করিয়া পড়ানো চলিতে পারে; সকালে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত, দুপুরে সাধারণ পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য ১০টা হইতে ৫টা, পুনরায় ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত স্কুল হওয়া উচিত। অবশ্য ইহার অসুবিধা অনেক; কিন্তু আমাদের চেয়ে অধিক ধনী জাতিরা যদি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তখন বর্ত্তমানে আমাদের এ বিষয়ে সূক্ষ্মবিচার না করিলেও চলে।

বিলাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯১৫-১৬ সালে বিদ্যার্থীর সংখ্যা ৫৩,২০,৩২৪ ছিল। ১৯১৭-১৮ সালে দেখা যায় প্রায় ১ লক্ষ ৪১ হাজার ছাত্র কমিয়াছে। ইহার দুইটী কারণ; প্রথম বিলাতে জন্মের হার কমিতেছে; দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্য সবই বিগড়াইয়া গিয়াছিল। ছাত্র-পিছু ব্যয় ৬৪ পাউণ্ড ৫ শিলিং হইতে ৭৯ পাউণ্ড ১০ শিলিং হইয়াছে। লণ্ডনের এই ব্যয় ৯০ পাঃ ৭ শিঃ হইতে ১০৮ পাঃ ১ শিঃ হইয়াছে। বেরীর বিখ্যাত বিদ্যালয়ে ১৯১৭-১৮ সালে প্রত্যেক শিশুর জন্য ব্যয় হইয়াছিল ১৩৫ পাঃ ৯ শিঃ। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যয় সমানভাবে করা হয় না। যে সব জায়গায় ৫০ পাউণ্ডের মত খরচ, সেগুলির খুবই নিন্দা হয়।

Oxfordএ প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে, সে ফিজিক্স্‌ই

লউক আর গণিতই লউক, গ্রীক ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উপাধি লইতে হইত। নূতন প্রস্তাবানুসারে উক্ত বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের গ্রীক আর পড়িতে হইবে না। এই লইয়া বিলাতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের দেশেও ম্যাট্রিকুলেশন হইতে সংস্কৃতকে অবশ্যপঠনীয় বিষয় হইতে বাদ দিবার কথা উঠিয়াছে।

১৯১৭ সালে সম্রাট জর্জ লণ্ডনে প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যাপনার জন্য এক কলেজ স্থাপন করেন। প্রথম বৎসরে এই বিদ্যালয়ে ১২৫ জন ছাত্র হয়। গত বৎসরে ছাত্রসংখ্যা ৩৮২ জন ছিল। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ্যায় খুবই পিছাইয়া ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০ ছাত্র প্রাচ্যভাষার সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতেছিল। যুদ্ধান্তে লণ্ডনের এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে ছাত্রদের ও কর্তৃপক্ষের উৎসাহ খুব বাড়িয়াছে। প্রাচ্যভাষা যে কেবল জ্ঞানালোচনার জন্যই লোকে শিখিতেছে তাহা নহে; রেলি, জর্ডিন-ম্যাথিসন্ প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাহাদের কর্ম্মচারীদিগকে এই বিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাদি শিখাইয়া এদেশে পাঠান। এই বিদ্যালয়ে প্রায় প্রতিদিন ৭০টী ক্লাসে ৪০টী ভাষা শিখানো হইয়া থাকে।

দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা হেতু ইংলণ্ডে সকলশ্রেণীর কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবীদের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। শিক্ষকদেরও বেতন বাড়িয়াছে, কিন্তু জিনিসপত্রের উচ্চদরের অনুপাতে তাহা নিতান্ত সামান্য। শিক্ষকশ্রেণী দরিদ্র; কিন্তু সেই দারিদ্র্যের সীমা আছে। কয়েক স্থানে শিক্ষকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিলাতে এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন হইতেছে। Timesএর Educational Supplementএ প্রায়ই এবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষাসচিব মিঃ ফিশার কোনো সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া শিক্ষকদের দ্বারা অপদস্থ হইয়াছিলেন; সভায় এমনি গোলযোগ হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার প্রবন্ধ

পড়িতেই পারেন নাই। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সেখানে এক-একটি কমিটী বসিয়াছে। আশাকরা যায় শীঘ্রই তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের, বিশেষ ত বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষদের ?

জাপানের বিরুদ্ধে একদল আমেরিকাবাসী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ; তাহারা জাপানীদের সম্বন্ধে নানা কুকথা ও মিথ্যা প্রবাদ দেশময় রাষ্ট্র করিয়া বর্ণবিদ্বেষের বিষ ছাড়াইতেছে। আমেরিকার পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবাসীদের মন কেবল জাপানীদেরই বিরুদ্ধে নহে, সমগ্র প্রাচ্য জাতিরই বিরুদ্ধে উগ্যত হইয়া উঠিয়াছে। কানাডা দেশেও এই বিষ প্রবেশ করিয়াছে। আজকাল এমন হইয়াছে যে, কোনো এশিয়াবাসীর পক্ষে মার্কিন দেশের পশ্চিম রাজ্যগুলিতে হোটেলে স্থান পাওয়া দুষ্কর, নাপিত এশিয়াবাসীর ক্ষৌরকার্য্য করিতে রাজি হয় না, হোটেলে চাকরে খাদ্য সরবরাহ করে না, বাড়ীওয়ালা তাহাকে বাড়ী ভাড়া দিতে পর্য্যন্ত চাহে না। এছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা ও অসুবিধাকে প্রতিদিন এশিয়াবাসীদের পথে আইন করিয়া-করিয়া উপস্থিত করা হইতেছে। কিছুদিন হইল মার্কিন রাজ্যের Constitutionএর অন্তর্গত বিদেশীদের Citizen বা নাগরিক হইবার অধিকার বিষয়ে এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে ; ইহার দ্বারা এশিয়াবাসীদের সন্তানাদি মার্কিন রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইবে না। ইঁহারাই পৃথিবীর সম্মুখে নিজেকে সভ্য ও স্বাধীনতাপ্রিয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন না !

চীনের শাসনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা বলা সুকঠিন। উত্তর-দক্ষিণের বিবাদ এখনো মিটে নাই। বাহিরের ও ভিতরে লোকেদের চাপে উভয় দলই একত্র হইয়া চীনের ইতিহাস পুনর্গঠন করিবেন। পাশ্চাত্য জাতিরা মাঝে মাঝে

চীনকে চোখরাঙানী দিয়া শান্ত হইতে বলিতেছে। সকলেরই ভয় হইতেছে বিদেশ হইতে বোধ হয় পুনরায় ধাক্কা খাইয়া চীনের বুদ্ধি খুলিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উত্তরের ও দক্ষিণের যুদ্ধপ্রিয় নেতারা কেহই নিজ-নিজ স্বার্থ ছাড়িতে পরিতেছেন না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবার আশা সুদূর পরাভূত। এমন কি উত্তর চীনেই নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড নিত্য ব্যাপার। দক্ষিণেও দলাদলিতে নিজের মধ্যে সদ্ভাব নাই। চীনের উভয় শাসনবিভাগ দেশের মধ্যে অশান্তি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, অচিরেই অনর্থপাত ঘটিবে, কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

জাপান মনে করে, চীনের উন্নতি-অবনতির সহিত তাহার ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্ভর করিতেছে। একথা সত্য, আজ যদি চীনের অন্তর্বিপ্লব শান্ত না হয় তবে বাহিরের শক্তিসমূহ আসিয়া শক্তি স্থাপন করিবেই। চীনে য়ুরোপীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে জাপানের সর্ব্বনাশ। সেই জন্য জাপান চীনের বিষয়ে মনোযোগ না দেখাইয়া থাকিতে পারে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা ইংরাজ ও বুয়র। উভয় শ্রেণীর মধ্যেই একদল লোক দক্ষিণ আফ্রিকাকে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক থাকিবার বিরুদ্ধে লোকের মনোভাব কিছুকাল হইতে খুবই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। বুয়র যুবক মাত্রেই এই ছাড়াছাড়ির পক্ষপাতী। প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে পিতা-পুত্রে মাতা-কন্যার মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। যুদ্ধের সময়ে আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া বাজার হইতে অনেক কম দরে ইংলণ্ডে জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়াছিল ; এই সব জিনিসের মধ্যে পশমই প্রধান। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়ীরা নিজেদের লাভ ছাড়িয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু ইয়র্কের তাঁতীরা খুবই মোটা লাভ করিয়া ধনী হইয়া পড়িয়াছে। আফ্রিকার রেণ্ড-সোনার

খনির সোনার ও সরবরাহ ততদিন পর্য্যন্ত লণ্ডনের Bank ও বিলাতের গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ফল-মূল ননী-মাখন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এদেশে খুবই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, য়ুরোপে তাহাই চালান হইয়া বাঁধা দরে বিক্রীত হইয়াছিল, অথচ দেশে অসম্ভব দাম দিয়া লোককে প্রতিদিনের খাদ্য-সামগ্রী লইতে হইয়াছে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অভিযোগ জমিয়া উঠিয়াছে, এবং শ্রমজীবীর দল ন্যাশনালিস্‌টদের সহিত মিলিত হইয়া শাসনসংস্কার করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছে।

আজকাল সকলেই জানেন যে, রোগের জীবাণু জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেহে নানা ব্যাধির সৃষ্টি করে। জীবাণু সাধারণত বাতাসে এবং মক্ষিকার সাহায্যে স্থানান্তরিত হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ আফ্রিকার "টিসি টিসি" জাতীয় এক শ্রেণীর মাছি এক প্রকার ভীষণ রোগের জীবাণু ছড়াইতে সুরু করিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে গরু মহিষ ঘোড়া ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে এই রোগটি দৃষ্ট হয়, তারপর উহা ক্রমশ মানুষের মধ্যেও সংক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইংরাজীতে এই রোগকে বলা হয় Sleeping Sickness, আমরা তাই ইহাকে "ঘুমেধরা রোগ" বলিলে বোধ করি বিশেষ অন্যায় হইবে না। এই মাছির দল কেমন করিয়া কোথা হইতে ঘুমেধরা রোগের জীবাণু সংগ্রহ করে কীটতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। টিসি-টিসি মাছি, বাহুড়, প্রভৃতির রক্ত শোষণ করে এমনও শোনা গেছে, কিন্তু সেই রক্তেই যে ঐ জীবাণু আছে এমন কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকার বনে এই মাছির বাস। লোকালয়েও ইহাদের যাতায়াত আছে। এই বিষয়ে কৃতী অনুসন্ধাতা ডাক্তার জে.জে. সিমসন (Dr. J. J. Simpson) বলেন, বনে দারুণ অগ্নিকাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও এই মাছিগুলিকে ধ্বংস করা সহজ নয়। কারণ ইহারা বনে আগুন লাগিবামাত্র তাহা ছাড়িয়া সটান দুই মাইল দূরে উড়িয়া পলায়, এই জাতীয় একটী মাছিকে একে বারে চার

মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া পালাইতে দেখা গিয়াছিল। তবে সাধারণত ইহারা দুই মাইলের বেশী উড়িতে পারে না। বনের অগ্নিকাণ্ড শেষ হইয়া গেলে ইহারা পুনরায় বনে ফিরিয়া আসে। এছাড়া ইহাদের পুত্তলী (pupa) লতাপাতার আবর্জ্জনার মধ্যে মাটির নীচে সঞ্চিত থাকে বলিয়া অতবড় আগুণের তাপেও মরে না, ঐ সকল পুত্তলী হইতে ঠিক সময় মাছি বাহির হইয়া বনে ভিড় করে। এই মাছির অত্যাচার আফ্রিকায় খুব বেশী। কি উপায়ে ইহাদিগকে বিনাশ করা যায় তাহা এখনও ঠিক নির্ণয় করা যায় নাই, তবে মাকড়সা, বোলতা, ও কাঁচপোকা প্রভৃতি পতঙ্গ ইহাদিগকে ক্ষুধার সময় গ্রাস করে। মাকড়সা বোলতা ইত্যাদির উপকারিতার আপিতত এই একটা নজির পাওয়া যাইতেছে।

সু.

বৈচিত্র্য

কোনো কোনো লোকের শুচিবায় থাকে। তাহারা নিজকে ছাড়া আর কোথাও কিছু শুচি দেখিতে পায় না। এদিকে ওদিকে, এখানে সেখানে যা কিছু দেখে সবই তাহাদের নিকট অশুচি। প্রতিপদেই তাহাদের আশঙ্কা হয়, এই বুঝি বা এটা ছোঁয়া গেল, এই বুঝি বা ইহার স্পর্শে অশুচি অপবিত্র হইতে হইল। এইরূপ করিয়া তাহারা নিজে ত শান্তি পায়-ই না, যাহাদের সঙ্গে বাস করে তাহাদিগকেও শান্তিতে থাকিতে দেয় না, সকলকেই অস্থির করিয়া তোলে।

ঠিক এই রকমই কতকগুলি লোকের ধর্ম্মবায় থাকে। নিজের ধর্ম্ম ছাড়া জগতে আর কোথাও তাহারা ধর্ম্ম দেখিতে পায় না, যাহা দেখে সবই তাহাদের নিকটে অধর্ম্ম মনে হয়। নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই তাহারা অধার্ম্মিক মনে

করে। তাহারা কাহাকেও সহিতে পারে না। ইহাতে অন্যের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হউক বা না-ই হউক, অধর্ম্মাতঙ্কে অসহিষ্ণু হইয়া তাহারা যে শুচিবেয়েদের মত নিজেরই শান্তি নষ্ট করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

* * *

পাচক পাক করে। পাক করিতে তাহাকে অনেক কষ্ট সহিতে হয়, অনেক বাধা-বিঘ্নও অতিক্রম করিতে হয়; সাবধানও কম থাকিতে হয় না, পাছে নুন-ঝাল একটু কম বা একটু বেশী হইয়া যায়, পাছে একটু বেশী জ্বালে পুড়িয়া যায়, এই রকমের ভাবনায় তাহাকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হয়। সে পাক শেষ করিয়া পরিবেষণ করিয়া দেয়, অনেকে আহার করিতে বসেন। তারপর এটা চাখিয়া ওটা চাখিয়া কেহ-কেহ সমালোচনা করেন এ জিনিসটা এমন হইয়াছে, ও জিনিসটা তেমন হইয়াছে, সেটার তা হয় নি, ওটার ঐ হয় নি, ইত্যাদি। এই সব সমালোচকদের মধ্যে এমন লোক থাকেন যাঁহাদিগকে পাককার্য্যের ভারটা দিলে হয় ত পাকটাই হইবে না, পাক করিয়া লোকজনকে সন্তুষ্ট করা ত দূরের কথা। অথবা যদি পাকপ্রণালীর উপদেশটা মাত্র চাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাও দিবার সামর্থ্য তাঁহাদের থাকে না। ঠিক এইরূপই একদল লোক আছেন তাঁহারা কোনো কার্য্যের নানারূপ খুঁটিনাটী দোষত্রুটি ধরিতেই খুব মজবুত, কিন্তু যদি ঐ কর্য্যের ভার দেওয়া যায় তবে তাহা ত নিজে করিতেই পারেন না, তিনি কি করিতে চাহেন অথবা তিনি সেই কার্য্যের কর্ত্তা হইলে ঠিক কিরূপ কি করিতেন জিজ্ঞাসা করিলেও তাহা বলিতে পারেন না।

* *

সত্য-সত্যই একটা কিছু ভাল কাজ করিবার জন্য অনেকের মনে ইচ্ছা হয়। তাই সেই ইচ্ছাটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যতদূর সাধ্য প্রাণপণে কেহ-কেহ যত্ন-চেষ্টা উদ্যোগ-আয়োজন করেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য যে সাধু, এবং

প্রয়াসও যে, সত্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ কাহারো হয় না। কিন্তু তথাপি দেখা যায় বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেলেও উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয় না। অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষার দ্বারা যে সব নিয়ম-বিধানে কাজ হইল না দেখা গেল তাহাদের স্থানে নূতন নিয়মও বিধান করা হইল, নূতন-নূতন উদ্যোগও চলিতে লাগিল, কিন্তু লক্ষ্য স্থল আর পাওয়া যায় না। এইরূপ নিষ্ফলতার ইহাই একটি কারণ হইতে পারে যে, সাধারণ বা স্থূল ভাবে একটা লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও বিশেষভাবে বা স্পষ্টরূপে সেটি কি তাহা যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের সম্মুখে যথাযথ-ভাবে ভাসে না, অথবা অন্য কেহও তাঁহাদের চোখের সাম্‌নে ঐরূপে তাহা ধরিয়া দিতে পারেন না। যাইতে হইবে তাঁহারা যাইতেছেন, কিন্তু ঠিক কোথায় যাইতে হইবে তা তাঁহারা নিজেও স্পষ্ট বুঝেন না, অথবা যদি কেহ তাঁহা-দিকে যাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়া থাকেন তবে হয় ত তিনিও তাহা জানেন না, কিংবা জানিলেও তিনি তাঁহাদিগকে ঠিক করিয়া তাহা বলিয়া দিতে পারেন না। তাই কেবল এদিকে ওদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়ানই সার হয়, গম্য স্থলে পৌঁছা যায় না; কিন্তু লোকে দেখিতে পায় ইঁহারা খুব চলিতেছেন। ছবিটা প্রথমে চিত্রকরের চিত্তে পরিষ্কার-ভাবে ফুটিয়া না উঠিলে সে কি তাহা আঁকিতে পারে?

*
* *

বিশ্বকোষ বাহির করিয়া ধর্ম্মের অর্থ বুঝিবার জন্য চেঁচামিচি করিয়া চুলচেরা বিচার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যাহা দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয়, এবং এইরূপেই পরম মঙ্গল পাওয়া যায় তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের জ্যোতি যাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায় তিনিই ধার্ম্মিক, এবং তিনিই নমস্য, তা তিনি যে জাতই হউন না, জাতিবাদের দৌড় ততদূর যাইতে পারে না। ঐ ধর্ম্মই আমাদের নমস্য কোনো বিশেষ মাংসাস্থিপিণ্ড নহে। সেই ধর্ম্ম জ্যোতি কাহার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে

বা না পাইতেছে তাহা কাহাকেও নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয় না, কেননা সূর্য্য উঠিয়াছে কিনা তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না।

*
* *

ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিলেই বা ব্রাহ্মণের বেশভূষা ধারণ করিলেই বা তাহার আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি অনুসরণ করিলেই কেহ সত্য ব্রাহ্মণ হয় না। তেমনি খ্রীষ্টান বা মুসলমানের বংশে জন্মিলেই বা তাহাদের বেশভূষাদি লইলেই সত্য খ্রীষ্টান বা সত্য মুসলমান হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টান, মুসলমানের বংশে না জন্মিলেও এবং তাহাদের ঐ সব বাহ্য আচরণাদি না করিলেও কেবল তাহাদের সত্যকে গ্রহণ করিতে পারিলেই অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, অখ্রীষ্টানও খ্রীষ্টান, অমুসলমানও মুসলমান হইতে পারে। যে ইহা দেখে না সে সত্যকে দেখে না, সে দেখে কেবল বাহিরের মাংসপিণ্ডকে ; সে মন্দির দেখিয়াই ভুলিয়া যায়, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দেখিতে পায় না।

* *

মানুষের মা নু ষ নামের গোড়া খুঁজিতে গেলে জানা যায় যে, মনন বা চিন্তা করার সঙ্গে বিশেষ যোগ থাকাতেই তাহার ঐ নামটি হইয়াছে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষে নিজের সেই গুণটি অত্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে; সে চিন্তা করে না, ভাবিয়া দেখে না। যা একটা চলিয়া আসিতেছে এখন তাহার ভাল-মন্দ ফলাফল সে ভাবিয়া দেখে না, অথবা কেমন করিয়া এখন কি করা যাইতে পারে, কিসের এখন প্রয়োজন, তাহাও সে চিন্তা করে না। অভাব-অসুবিধা চারিদিকে আক্রমণ করিতেছে, তথাপি সে ভাবিবে না। তাই তাহাকে কত কষ্টই ভুগিতে হয়। সামাজিক ও অন্যান্য কত প্রশ্নই উঠিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া দিতেছে, একটু ভাবিয়া তলাইয়া দেখিলে সহজেই অনেক সমাধান হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইবে না। তাই কোনো

একটা কথা উঠিলেই চারিদিকে হৈহৈ চৈচৈ শব্দ উঠিয়া থাকে 'গেল গেল!' 'সর্ব্বনাশ হইল!'

***

মানুষকে দশের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়াই থাকিতে হয়। কাহারো সঙ্গে কোনোরূপে না মিলিয়া থাকিতে পারেন এমন লোক দুই চার জন দেখা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কথা এখানে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। মানুষ লোকের সঙ্গে যত মিলিতে পারে ততই মঙ্গল; তাহার দ্বেষ ততই কমিয়া যায়, হৃদয় তাহার ততই নির্ম্মল হয়। পরস্পরকে জানিবার বুঝিবার ইহাতেই সুবিধা হয়, এবং এইরূপে পরস্পরের সম্বন্ধে অজ্ঞান বা বিরুদ্ধ জ্ঞান বা অন্যথা জ্ঞান নষ্ট হওয়ায় হৃদয়ে একটা নির্ম্মল আনন্দের অনুভূতি হয়। যদি কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে তবেই তিনি ইহা বুঝিয়াছেন।

কিন্তু মানুষের অন্য মানুষের সঙ্গে মিলিবার বাধার ইয়ত্তা নাই। দুই জনের মধ্যে দেহে, চিত্তে, ও অন্যান্য নানাবিষয়ে এত ভেদ, এত দ্বৈধ রহিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে উভয়ের মিলনের সম্ভাবনাও আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি কোনো একটা বা দুইটা বিষয়ে মিল থাকে ত দেখা যাইবে আর-আর অনেক বিষয়ে বিষম অমিল রহিয়াছে। লঘুচিত্ত মানুষ, বড়-বড় অমিলের কথা দূরে, যদি কোনো ছোট-খাটও অমিল থাকে, তবে তাহাকেই যা তা করিয়া ফেনাইয়া তুলিয়া এত বড় প্রকাণ্ড করিয়া তুলে, এবং তাহার নিকটে নিজেকে এমনি করিয়া হারাইয়া ফেলে যে, মিলনের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না; তাহাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হউক বা না-ই হউক, সে নিজেই অমিলের তুষানলে পুড়িয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

ভেদ যখন সত্য-সত্যই থাকে তখন তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, তাহাকে চাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু তথাপি মিলিতেই হইবে। কাহারো সহিত কোনো বিষয়ে অমিল থাকি[illegible] এমনো কোনো কোনো বিষয় থাকে

যেখানে উভয়ের মধ্যে কোন মিল আছে, যাহাতে উভয়েরই একই মত হয়। এই মিলের অংশটাই লইয়া মিলিতে হইবে। যে অংশে অমিল থাকুক তাহা পড়িয়া; তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক বা বাদানুবাদ করিয়া কোনো লাভ নাই অথচ ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী। তাই অমিলের বিষয়টা লইয়া কোনো কথা-বার্ত্তা বা আলোচনা না করাই উচিত। হইাতে একবারে উদাসীন বা মধ্যস্থ হইয়া থাকিতে হইবে; অমিলের অংশে যেমন আমাদের অনুরাগ আসে না, তেমনি, লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন কেবল সেই জন্যই কাহারো প্রতি দ্বেষও উৎপন্ন না হয়। এইরূপে শেষ ফলে দেখা যাইবে, মিলনের প্রভাবে আস্তে-আস্তে অমিলও অনেক কমিয়া আসিবে। ইহাই যদি না হয় তাহা হইলে মানুষের শান্তির আশা কোথায়? অমিলেরই সঙ্গে যে তাহার দেখা-সাক্ষাৎ বেশী।

*
* *

কোনো একটা কথা শুনিলে অনেক সময়েই লোকে কেবল তাহারই দোষ-গুণ বিচার করিয়া গ্রহণ বা বর্জ্জন করে না; ঐ কথাটি কে কহিয়াছেন, এবং তাঁহার গুণাগুণ কিরূপ কি, ইহা দেখিয়া-শুনিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করা হয় তাহা শুনা যাইবে বা অগ্রাহ্য করা হইবে। কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ, কোনো কথার গুরুত্ব বা লঘুত্ব বক্তার গুরুত্ব বা লঘুত্বের উপর নির্ভর করে। যাঁহাদের নিজে কিছু ভাবিয়া দেখিবার সামর্থ্য নাই, বা নিজে ভাবিয়া দেখেন না, তাঁহারা এইরূপই বলেন। কোনো বড় লোকের নাম শুনিলে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কথাটা মানিয়া লন, আবার অপর দিকে কাহারো নামমাত্র শুনিয়াই তাঁহার কথাটাকে অবজ্ঞা করিয়া বসেন। কিন্তু যাঁহাদের ভাবিবার শক্তি আছে, তাঁহারা বক্তার নামমাত্রেই সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হইয়া কথাটাকেই বিচার করিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ করেন। যাঁহারা বড় বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহারাও অনেক সময়ে অনেক অবজ্ঞেয় কথা বলেন, আবার যাঁহাদের ভাগ্যে কোনো প্রতিষ্ঠার লাভ

হয় নি, তাঁহারাও অনেকে অনেক সময়ে অনেক উপাদেয় কথা বলিয়া থাকেন।

*
* *

মানুষের মন যখন কোনো দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে তখন তাহা ঝুঁকিতে-ঝুঁকিতে কতদূর যে গিয়া ঠেকিবে অনেক সময়ে তাহা বুঝা যায় না। যে কাহাকেও বাড়াইয়া-বাড়াইয়া বড় করিয়া তুলিতে-তুলিতে এতদূরে উঠাইয়া ফেলে যে, নিজেও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মানুষের যে সমস্ত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা বা অক্ষমতা আছে, সে কখনো তাহার অতীত হইতে পারে না, একথাটা সে ভুলিয়া যায়। তাই সে কাহাকেও এমনো আসনে লইয়া গিয়া বসায় যাহার সে কোনো রূপেই যোগ্য নহে। আবার সেই আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও এমন সব কথা বলেন, যাহা বলিবার যোগ্যতা তাঁহার মোটেই নাই, অথচ নিজেকে সর্ব্ব বিষয়েই যোগ্যতম বলিয়া মনে করেন। অপূজ্যের পূজার দোষ উভয় দিকেই।

*
* *

গাঁয়ে হোক শহরে হোক মানুষ ঘর-বাড়ী বাঁধে। তার মধ্যে একটা কোণে একটা ছোট-খাট ঘরে সে বিশেষরূপে নিজের জন্য একটু জায়গা করে। সেখানে সে নিজের সঙ্গে সময়ে-অসময়ে যখন ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা মেলা-মেশা করে নিজেকে যেমন ভাল লাগে তেমনি সে নিজের জিনিস-পত্র সেখানে সংগ্রহ করে, তেমনি করিয়াই তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে। বাহিরের কেহ তাহাকে সেখানে সে বিষয়ে কিছু বলিতে যায় না, যাওয়াও উচিত নহে, কিছু বলিতেও পারে না, বলিলেও তাহা অগ্রাহ্য। নিজে যেমন খুসী তেমনি সে সেখানে চলিয়া থাকে।

কিন্তু তাহাকে আরো একটা জায়গা করিতে হয়। তাহার একটা বৈঠক-খানার প্রয়োজন হয়। তার আশে-পাশে দূরে-নিকটে যে সব আত্মীয়-স্বজন

বা বন্ধু-বান্ধব থাকেন তাঁহাদিগকে বা অতিথি-অভ্যাগতগণকে সে সেখানে ডাকিয়া বসাইয়া কথা-বার্ত্তা আলাপ-পরিচয় আমোদ-আহ্লাদ করে। এই স্থানে সে সকলের সঙ্গে মিশে। তাই সে এখানে এমন কিছু বলে না, এমন কিছু করে না যাহাতে তাহার সঙ্গে মিলনের বাধা উপস্থিত হয়।

অপর দিকে অন্যেরও এইরূপ দুইটি জায়গা থাকে, একটা খাস নিজের জন্য আর একটা সাধারণের জন্য। এখন পরস্পরে যদি মর্য্যাদা বা সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরস্পরের খাস কামরার মধ্যে গিয়া এটা ওটা বলিয়া বা করিয়া উপদ্রব করে, তবে তাহা কাহারো মঙ্গলের জন্য হয় না। এখানেও যদি কাহাকেও স্বাধীনতা দেওয়া না যায় তবে মানুষ বাঁচে কিসে?

নিজের স্বতন্ত্র ঘরে ঢুকিয়া কে কি ভাবিতেছে বা করিতেছে তাহা লইয়া খুঁটি-নাটি করিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হয় না। বস্তুতও এরূপ করিবার কাহারো অধিকারও নাই। যদি কাহারো কাহাকেও পরাধীন রাখাই পৌরুষ বলিয়া মনে হয়, তবে তিনি দেহকেই পরাধীন রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, মনের স্বাধীনতা যেন কেহ অপহরণের চেষ্টা না করেন, তাহা করা যায় না, এবং তাহা কল্যাণেরও কারণ নহে।

বিশ্বের সহিত এইরূপেই আমাদিগকে মিলিতে হইবে।

*

* *

আশ্রমসংবাদ

গত ২১শে ফাল্গুন, ১৩২৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপুরওয়ালা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ও অধ্যপক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর কতকগুলি ছাত্রের সহিত অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক শহীদুল্লাহ সাহেব "ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি নানাযুক্তি-প্রদর্শনে বাঙ্‌লা ভাষারই অনুকূলে নিজ মত প্রকাশ করেন। প্রবন্ধপাঠের পর ডাক্তার তারাপুরওয়ালা হিন্দীভাষার সপক্ষে হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। ইংরাজী জগতের সাধারণ ভাষা হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে জনসাধারণের ভাষা হিন্দী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই কথারই তিনি সমর্থন করেন। পরদিবসে ডাক্তার তারাপুরওয়ালা পারসীকগণের "শবসৎকার" সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং অধ্যাপক শহীদুল্লাহ "ভাষাতত্ত্ব" সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। উভয় বক্তৃতাতেই অনেক সারগর্ভ আলোচনা ছিল।

গত ১২ই চৈত্র হইতে ১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশের জন্য আশ্রম বন্ধ ছিল। এবৎসর পূজার ছুটি কেবল এক সপ্তাহ মাত্র দেওয়া হইবে স্থির করিয়া গ্রীষ্মের ছুটি তিন মাস দেওয়া হইয়াছে। ছুটির আরম্ভেই গুরুদেব বোম্বাই যাত্রা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশি তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। মিঃ এণ্ড্রুজ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। গুরুদেব ২০শে বৈশাখ বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন, এবং দুইদিন আশ্রমে থাকিয়া ২৯শে বৈশাখ বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী গুরুদেবের সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহারা নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌছিয়াছেন খবর পাওয়া গিয়াছে।

১২ই আষাঢ় আশ্রমের সকল বিভাগেরই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্বভারতীতে এখন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ইংরাজী, জার্ম্মান্, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অবিলম্বে হিন্দী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাত্র উপস্থিত হইলে গুজরাটী, মরাঠী ও সিংহলী ভাষা পড়ান হইবে। গুরুকুলের স্নাতক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূদেব বিদ্যালঙ্কার সেখান হইতে কয়েক মাস আশ্রমে বাস করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইনি বিশ্বভারতীতে কোনো কোনো

বিষয় অধ্যয়ন করিবেন ও হিন্দী শিক্ষা দিবেন। তা'ছাড়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া গুজরাট হইতে দুইটি যুবক এখানকার শিক্ষাদান প্রণালী দেখিবার জন্য আশ্রমে আসিয়াছেন, ইঁহারা বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নও করিবেন। ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত পারসী মিঃ মরিস্ আশ্রমে আসিয়াছেন। ইনি বিশ্বভারতীর ছাত্রগণকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবেন। জর্ম্মান ও গুজরাটি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীযুক্ত নরসিং ভাই ঈশ্বরভাই পাটেল মহাশয় আশ্রমে আসিয়াছেন। বিশ্বভারতীতে দুই একটি করিয়া নূতন ছাত্র আসিতেছেন। সম্প্রতি সুরাটবাসী একটি ছাত্র বিশ্বভারতীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। তা'ছাড়া চিত্রকলা এবং সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি ছাত্রী বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে আসিতেছেন। শ্রীমান্ অনাদিকুমার দস্তিদার এবার আশ্রম হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি এখন বিশ্বভারতীতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। ছুটির পরে অনেকগুলি গুজরাটি ছাত্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাঁদের আহারের স্থান ইত্যাদির নূতন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

এবারে আশ্রমের বারো জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল। সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশ্রমের পুরাতন ছাত্রদেরও পরীক্ষার ফল খুব ভালই হইয়াছে। শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শিশুকাল হইতে প্রবেশিকাবর্গ পর্য্যন্ত আশ্রমেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আই. এ. পরীক্ষায় জিতেন্দ্র চতুর্থ স্থান এবং আই, এস-সি পরীক্ষায় ব্রজেন্দ্র দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আশ্রমের পুরাতন ছাত্র শ্রীমান্ শ্যামকান্ত সারদেশাই এবং সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় বি.এস-সি পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

আশ্রমের সমবায় ভাণ্ডারের কাজ পূর্ব্ববৎ উৎসাহের সহিত চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় ভাণ্ডারের প্রধান পরিচালকের পদে নির্ব্বাচিত লইয়াছেন।

ছুটির কয়েক মাসে আশ্রমের পুস্তকালয়ে অনেক নূতন পুস্তক আসিয়াছে। এখন সমস্ত পুস্তক-সংখ্যা দশ হাজারের অধিক।

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥৹ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা।৹ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
পত্রিকাবিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadananda Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop.

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা — শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল

দ্রষ্টব্য

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল

বৌদ্ধদর্শন

আত্মতত্ত্ব

পোট্‌ঠপাদসুত্ত

[গত আষাঢ় সংখ্যায় আমরা দেখিয়াছি, অনুরাধ ভিক্ষু অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণকে বলিয়াছিলেন যে, 'মরণের পর তথাগত থাকে,' 'মরণের পর তথাগত থাকে না,' ইত্যাদি চারিটি মত হইতে বুদ্ধদেবের মত ভিন্ন ; কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধদেব অনুরাধকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ বলাও ঠিক হয় নাই। আজ আমাদের পো ট্‌ ঠ পা দ সু ত্তে (দীঘনিকায়, ৯) আলোচ্য ঐ কথাটি আরো পরিষ্কার হইবে। এই সুত্রটি আত্মতত্ত্বের বহু কথায় পরিপূর্ণ; নিম্নে আমরা ইহার শেষ কিয়দংশ (দীঘ. ৯. ২১—৫৬) অনুবাদ করিয়া দিতেছি। প্রো ষ্ঠ পা দ (পো ট্‌ ঠ পা দ) নামে এক পরিব্রাজক বুদ্ধদেবের নিকট সং জ্ঞা নি রো ধ - সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি তাঁহাকে উত্তর দিতে গিয়া যে আলোচনা করেন তাহাই ইহাতে রহিয়াছে। যোগদর্শনের ভাষায় সংজ্ঞানিরোধকে অ স ম্প্র জ্ঞা ত স মা ধি বলিতে পারা যায়।

এই অবস্থায় কোনোরূপ সংজ্ঞা থাকে না, সমস্ত সংজ্ঞারই নিরোধ হয়। সংজ্ঞা বলিতে বস্তুর আকারমাত্রকে গ্রহণ করা বুঝায়। সংজ্ঞা হইলে তাহার পর জ্ঞান হইয়া থাকে, সংজ্ঞার দ্বারা গৃহীত বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায়। প্রোষ্ঠপাদ আত্মবাদ-দৃষ্টিতে মুগ্ধ ছিলেন, সংজ্ঞানিরোধের আলোচনা করিতে করিতে-করিতে তিনি তাহাতে সুখ না পাইয়া বুদ্ধদেবকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইতেই আমরা এখানে আরম্ভ করিলাম।

এস্থানে তাঁহার প্রথম প্রশ্ন হইতেছে যে, 'সংজ্ঞাই আত্মা, অথবা সংজ্ঞা ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন?' বুদ্ধদেব দেখাইয়া দিলেন যে, প্রোষ্ঠপাদেরই মতে সংজ্ঞা ও আত্মাকে পরস্পর ভিন্ন বলিতে হয়। প্রোষ্ঠপাদ আত্মাকে প্রথমে (১) স্থূল, তাহার পর (২) মনোময়, এবং তদনন্তর (৩) সংজ্ঞাময় বলিয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধদেব দেখান যে, আত্মাকে এই তিন রকমের যে-কোনো-রকম স্বীকার করিলেই ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সংজ্ঞা ও আত্মার পরস্পর ভেদ আছে। প্রোষ্ঠপাদ আত্মবাদে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, তিনি পৃথক আত্মা দেখিতে না পাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ প্রশ্নের (অর্থাৎ 'সংজ্ঞাই আত্মা, অথবা তাহারা দুইটি পরস্পর ভিন্ন?') উত্তরটা তাঁহার পক্ষে বুঝা সম্ভব কি না। বুদ্ধদেব বলিলেন যে, তিনি যেরূপ মতবাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, তাহাতে ইহা সম্ভব নয়। তাই তিনি ঐ কথা ছাড়িয়া প্রকারান্তরে 'লোক শাশ্বত বা অশাশ্বত' ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা আসল তথ্যটি জানিতে চেষ্টা করেন। বুদ্ধদেব ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তৎসম্বন্ধে তিনি কোনো মত প্রকাশ করেন নি; যাহার দ্বারা বস্তুত কোনো প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় তিনি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রকাশিত সেই তত্ত্ব হইতেছে দুঃখাদি চারিটি আর্য্য সত্য। অনন্তর পুনর্ব্বার আত্মার কথা উঠে। কেহ-কেহ বলেন 'মৃত্যুর পর আত্মা অরোগ ও একান্ত সুখী হয়, আত্মা কোনো সুখাবহ লোকে উৎপন্ন হয়;' বুদ্ধদেব দেখাইলেন, ইহার কোনো প্রমাণ নাই, ইহা কেহ দেখে নি। অনন্তর আবার স্থূল, মনোময়, ও সংজ্ঞাময় এই ত্রিবিধ আত্মাকে উল্লেখ করিয়া, বুদ্ধদেব বলিলেন যে, তিনি ঐ ত্রিবিধ আত্মবুদ্ধিরই পরিত্যাগের জন্য ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া থাকেন। শেষে তিনি দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, ইত্যাদির দৃষ্টান্তে জানাইয়াছেন যে, দুগ্ধ, দধি, নবনীত প্রভৃতি যেমন বস্তুত এক-একটি নাম, বা সংজ্ঞা, বা লোকব্যবহার ভিন্ন কিছুই নহে, সেইরূপ আত্মা স্থূল, বা মনোময়, বা সংজ্ঞাময়, ইহা একটি-একটি লোকব্যবহারমাত্র, নাম-মাত্র, সঙ্কেতমাত্র, বস্তুত ওরূপ কিছুই নাই। কথাটি দাঁড়াইতেছে এই যে. যেমন দুগ্ধ-দধি-নবনীতাদির মধ্যে বিভিন্ন-বিভিন্ন অবস্থার আধারস্বরূপ কিছু একটা পৃথক বা স্বতন্ত্র

বস্তু নাই, অথচ ঐ পরিবর্ত্তমান অবস্থাগুলিকেই দুগ্ধ-দধি-নবনীতাদি নামে ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ স্থূল দেহ, বা মন, বা সংজ্ঞা, এই সমস্ত গুলির মধ্যে আত্মা বলিয়া কিছু নাই; 'আত্মা' ইহা কেবল একটা নামমাত্র, সঙ্কেতমাত্র, লোকব্যবহারমাত্র।

এস্থলে তাঁহার প্রথম প্রশ্ন হইতেছে 'সংজ্ঞাই আত্মা, অথবা সংজ্ঞা ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন?' বুদ্ধদেব তাঁহারই মত মানিয়া লইয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহারই (প্রোষ্ঠপাদেরই) মতে সংজ্ঞাকে আত্মা বলিতে পারা যায় না—।]

২১। "ভগবন্, সংজ্ঞাই কি পুরুষের আত্মা? অথবা সংজ্ঞা অন্য, আত্মা অন্য?"

"আচ্ছা, প্রোষ্ঠপাদ, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া জান?"

"আমি ত আত্মাকে স্থূল, রূপবান্, চতুর্মহাভূতজাত, ও অন্নকবলভোজী বলিয়া জানি।"

"প্রোষ্ঠপাদ, যদি তোমার আত্মা এইরূপ হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞা অন্য আর আত্মা অন্য হইবে। প্রোষ্ঠপাদ, ইহাতেও (বক্ষ্যমাণ যুক্তিতেও) তুমি জানিবে যে, সংজ্ঞা অন্য, আর আত্মা অন্য। তাহাই হউক, প্রোষ্ঠপাদ, আত্মা স্থূল, রূপবান্, চতুর্মহাভূতজাত ও অন্নকবলভোজী; কিন্তু তাহা হইলেও, এই মানুষের কতকগুলি সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, আবার কতকগুলি নিরুদ্ধ হয়। অতএব এরূপেও জানিবে, সংজ্ঞা অন্য, আর আত্মা অন্য।"

২২। "ভগবন্, আমি আত্মাকে মনোময়, সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত ও অহীনেন্দ্রিয় বলিয়া জানি।"

"প্রোষ্ঠপাদ, যদি তোমার আত্মা এইরূপ হয়, তাহা হইলেও, সংজ্ঞা অন্য, আর আত্মা অন্য হইবে। ইহাতেও (বক্ষ্যমাণ যুক্তিতেও) তুমি জানিবে যে, সংজ্ঞা অন্য আর আত্মা অন্য। তাহাই হউক, প্রোষ্ঠপাদ, আত্মা মনোময় সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত ও অহীনেন্দ্রিয়; কিন্তু তাহা হইলেও এই পুরুষের কতকগুলি সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি নিরুদ্ধ হয়। অতএব এরূপেও জানিবে সংজ্ঞা অন্য, আর আত্মা অন্য।"

২৩। "ভগবন্, আমি আত্মাকে অরূপ ও সংজ্ঞাময় বলিয়া জানি।"

"তাহা হইলেও, প্রোষ্ঠপাদ, সংজ্ঞা অন্য, আর আত্মা অন্য। হউক, প্রোষ্ঠপাদ, আত্মা অরূপ ও সংজ্ঞাময়, কিন্তু তাহা হইলেও এই পুরুষের কতকগুলি সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি নিরুদ্ধ হয়। অতএব এরূপেও জানিবে, সংজ্ঞা অন্য, আর আত্মা অন্য।"

২৪। "ভগবন্, আমি কি ইহা জানিতে পারি (অর্থাৎ ইহা জানিবার শক্তি কি আমার আছে) যে, সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা, অথবা সংজ্ঞা অন্য, আর আত্মা অন্য?"

"প্রোষ্ঠপাদ, তোমার পক্ষে ইহা জানা শক্ত; তোমার মত অন্য, যুক্তি অন্য, রুচি অন্য, তোমার আগ্রহ অন্যত্র, এবং তোমার আচার্য্যতাও অন্যত্র (অর্থাৎ তুমি অন্য রকম উপদেশ দিয়া থাক, অথবা অন্য রকম উপদেশ পাইয়াছ)।"

২৫। "আচ্ছা, ভগবন্, ইহা যদি আমার পক্ষে জানা শক্ত হয়, তাহা হইলে বলুন 'লোক শাশ্বত' [১] ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা?"

"প্রোষ্ঠপাদ, আমি ইহা প্রকাশ করি নি যে, 'লোক শাশ্বত' ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা।"

"তাহা হইলে কি 'লোক অশাশ্বত' ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা?"

"প্রোষ্ঠপাদ, ইহাও আমি প্রকাশ করি নি।"

"ভগবন্, 'লোকের অন্ত[২] আছে' ইহাই কি সত্য, আর অন্যমত মিথ্যা?"

"ইহা আমি প্রকাশ করি নি প্রোষ্ঠপাদ।"

"তবে কি 'লোক অনন্ত' ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা?"

"প্রোষ্ঠপাদ, ইহাও আমি প্রকাশ করি নি।"

১। বুদ্ধঘোষ সুমঙ্গলবিলাসিনীতে বলিয়াছেন, এখানে 'লোক' শব্দে আত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

২। পর্য্যন্ত, সীমা।

২৬। "ভগবন্, 'যে জীব সেই শরীর' ইহাই কি সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা ?"

"আমি ইহা প্রকাশ করি নি।"

"তবে কি 'জীব অন্য, শরীর অন্য' ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা ?"

"ইহাও আমি প্রকাশ করি নি প্রোষ্ঠপাদ।"

২৭। "ভগবন্, 'তথাগত[৩] মরণের পর থাকে' ইহাই কি সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা ?"

"প্রোষ্ঠপাদ, ইহা আমি প্রকাশ করি নি।"

"তবে কি, ভগবন্, 'তথাগত মরণের পর থাকে না' ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা ?"

"ইহাও আমি প্রকাশ করি নি।"

"ভগবন্, তবে কি, 'তথাগত মরণের পর থাকে এবং থাকেও না' ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা ?"

"ইহা আমি প্রকাশ করি নি।"

"তবে কি, ভগবন্, 'তথাগত মরণের পর থাকে ইহাও না, আর থাকে না ইহাও না' ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ্যা ?"

"ইহাও আমি প্রকাশ করি নি প্রোষ্ঠপাদ।"

"কেন ইহা আপনি প্রকাশ করেন নি ?"

২৮। "কেননা, প্রোষ্ঠপাদ, ইহাতে কোনো প্রয়োজনের[৪] সিদ্ধ হয় না, কোনো ধর্ম্মের[৫] সিদ্ধি হয় না, ইহাতে প্রথম ব্রহ্মচর্য্যের[৬] সিদ্ধি হয় না; ইহা নির্ব্বেদের

৩। জীব, যে জীব যথার্থ সত্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। ইহলোক বা পর লোকের প্রয়োজন।

৫। স্রোত-আপত্তি প্রভৃতি নয়টি লোকোত্তর ধর্ম্ম।

৬। শীল, চিত্ত, ও প্রজ্ঞা এই তিন বিষয়ের শিক্ষার মধ্যে প্রথম শীল-বিষয়ক শিক্ষাকে আদি ব্রহ্মচার্য্য বলা হয়।

জন্য নহে, বৈরাগ্যের জন্য নহে, নিরোধের[৭] জন্য নহে, উপশমের[৮] জন্য নহে, অভিজ্ঞার[৯] জন্য নহে, সম্বোধের[১০] জন্য নহে, এবং নির্ব্বাণের জন্য নহে, এই নিমিত্ত আমি তাহা প্রকাশ করি নি।"

২৯। "ভগবন্, আপনি তবে কি প্রকাশ করিয়াছেন?"

"প্রোষ্ঠপাদ, 'ইহা দুঃখ,' 'ইহা দুঃখের কারণ,' 'ইহা দুঃখের নিরোধ,' এবং 'ইহা দুঃখের নিরোধের পথ,'—ইহাই আমি প্রকাশ করিয়াছি।"

"কি জন্য আপনি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন?"

"কেননা, ইহাতে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়, ধর্ম্মসিদ্ধি হয়, ইহাতে প্রথম ব্রহ্মচর্য্য-সিদ্ধি হয়; এবং ইহা নির্ব্বেদের জন্য, বৈরাগ্যের জন্য, নিরোধের উপশমের জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, সম্বোধের জন্য এবং নির্ব্বাণের জন্য।"[১১]

"হে ভগবন্, ইহা এইরূপ! হে সুগত, ইহা এইরূপ! এখন আপনার যে কার্য্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করেন আপনি করিতে পারেন।"

ভগবান্ আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

৩১। অনন্তর, ভগবান্ চলিয়া যাইবার ঠিক পরেই পরিব্রাজকেরা[১২] পরিব্রাজক প্রোষ্ঠপাদকে চারিদিকে বাক্যকশা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন—"শ্রমণ গৌতম যা বলেন প্রোষ্ঠপাদ তাহাই এইরূপে অভিনন্দন করেন—'হে ভগবন্, ইহা

৭। সংসারচক্রের নিরোধ।

৮। সংসারচক্রের উপশম।

৯। যে জ্ঞানের দ্বারা সংসারচক্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার নাম অ ভি জ্ঞা।

১০। যে জ্ঞানের দ্বারা সংসারচক্রকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম স ম্বো ধ।

১১। এই বিষয়টি মজ্ঝিমনিকায়ের চূ ল মা লু ঙ্ক সু ত্তে (৬৩, P T S. Vol. I. pp. 426-432) সবিশেষ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ঐ, পৃ. ৪৮৪; মিলিন্দ, ৪.২.৪; অঙ্গুত্তর, P T S. Part V. pp 193-194, 196 198.

১২। এই সমস্ত পরিব্রাজক প্রোষ্ঠপাদের সহিত সেখানে ছিলেন। পরিব্রাজকপরিষদের মধ্যেই তাঁহার সহিত বুদ্ধদেবের এইরূপ আলাপ হইতেছিল।

এইরূপ ! হে সুগত ইহা এইরূপ !' আমরা ত শ্রমণ গৌতমের উপদিষ্ট এমন কোনো বিষয় জানি না, যাহা তিনি নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন, যথা, 'লোক শাশ্বত,' বা 'লোক অশাশ্বত ;' 'লোকের অন্ত আছে,' বা 'লোকের অন্ত নাই ;' 'সেই জীব সেই শরীর,' অথবা 'জীব অন্য শরীর অন্য ;' 'তথাগত মরণের থাকে,' বা 'তথাগত মরণের পর থাকে না,' অথবা 'তথাগত মরণের থাকে আবার থাকেও না,' কিংবা 'তথাগত মরণের পর থাকে ইহাও না, আর থাকে না ইহাও না' ।"

পরিব্রাজক প্রোষ্ঠপাদ সেই সমস্ত পরিব্রাজককে বলিলেন—"ওহে শ্রমণ গৌতম এই সমস্ত বিষয়ের কোনটিকে একান্ত নিশ্চিতরূপে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া আমিও জানি না ; কিন্তু তাহা হইলেও শ্রমণ গৌতম স্বাভাবিক, সত্য, ও যথাযথ পথ জানাইয়াছেন,—যে পথ ধর্ম্মে স্থিত, এবং যাহা ধর্ম্মের নিয়ামক। অতএব শ্রমণ গৌতম যখন ঐরূপ পথ জানান তখন আমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে তাঁহার সদুক্তিকে সদুক্তি বলিয়া অনুমোদন না করিবে ?"

৩২। অনন্তর দুই-তিন দিন পরে হস্তিসারিপুত্র চি ত্ত (অথবা চি ত্র) ও পরিব্রাজক প্রোষ্ঠপাদ ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া হস্তিসারিপুত্র চিত্ত এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন, আর প্রোষ্ঠপাদও ভগবানের সহিত আনন্দে পরস্পর সাদরসম্ভাষণাদি করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। অনন্তর প্রোষ্ঠপাদ পরিব্রাজকগণের সহিত নিজের ঐ সমস্ত কথাবার্ত্তার বিষয় উল্লেখ করিলে ভগবান্ বলিলেন—

৩৩। "প্রোষ্ঠপাদ, সেই পরিব্রাজকেরা অন্ধ, তাহাদের চক্ষু নাই ; তাহাদের মধ্যে তোমারই চক্ষু আছে। প্রোষ্ঠপাদ, আমি ঐকান্তিক (অর্থাৎ যাহার একান্তভাবে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় হয় এরূপ) বলিয়াও কতকগুলি বিষয় উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি, আর অনৈকান্তিক (অর্থাৎ যাহার একান্তভাবে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় হয় না এরূপ) বলিয়াও কতকগুলি বিষয় উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি। 'লোক শাশ্বত,' 'লোক অশাশ্বত', 'লোকের অন্ত আছে', 'লোকের অন্ত নাই' ইত্যাদি (পূর্ব্বোক্ত দশটিকে) অনৈকান্তিক বলিয়া আমি

উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি। কেন আমি এইগুলিকে অনৈকান্তিক বলিয়া উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি? কেননা, ইহাদের দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না, ধর্ম্মসিদ্ধি হয় না, প্রথম ব্রহ্মচর্য্যের সিদ্ধি হয় না; ইহারা নির্ব্বেদের জন্য নহে, বৈরাগ্যের জন্য নহে, নিরোধের জন্য নহে, উপশমের জন্য নহে, অভিজ্ঞার জন্য নহে, সম্বোধের জন্য নহে, নির্ব্বাণের জন্য নহে।

"প্রোষ্ঠপাদ, কোন্ বিষয়গুলিকে ঐকান্তিক বলিয়া আমি উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি? 'ইহা দুঃখ,' 'ইহা দুঃখের কারণ,' 'ইহা দুঃখের নিরোধ,' 'ইহা দুঃখনিরোধের পথ'—এই বিষয়গুলিকে আমি ঐকান্তিক বলিয়া উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি। প্রোষ্ঠপাদ, কেন আমি এই বিষয়গুলিকে ঐকান্তিক বলিয়া উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি? কেননা, ইহাদের দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, ধর্ম্মসিদ্ধি হয়, প্রথম ব্রহ্মচর্য্যের সিদ্ধি হয়; ইহারা নির্ব্বেদের জন্য, বৈরাগ্যের জন্য, নিরোধের জন্য, উপশমের জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, সম্বোধের জন্য ও নির্ব্বাণের জন্য।

৩৪। "প্রোষ্টপাদ, কতকগুলি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি (মত) এইরূপ—'মরণের পর আত্মা অরোগ ও একান্তসুখী হয়।' আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলি 'মহাশয়গণ, সত্যই কি আপনারা এইরূপ বলেন, এবং এইরূপ আপনাদের মত যে, 'মরণের পর আত্মা অরোগ ও একান্ত সুখী হয়?' তাঁহারা পৃষ্ট হইয়া উত্তর করেন 'হাঁ'। আমি তাঁহাদিগকে বলি 'হে মহাশয়গণ, আপনারা লোককে একান্ত সুখী বলিয়া জানেন কি, দেখিতেছেন কি?' এই প্রশ্ন করিলে তাঁহারা বলেন 'না'। আমি তাঁহাদিগকে বলি, 'মহাশয়গণ, আপনারা কি এক রাত্রি বা এক দিন অথবা অর্দ্ধেক রাত্রি, বা অর্দ্ধেক দিনেরও জন্য আত্মাকে একান্ত সুখী বলিয়া জানেন?' তাঁহারা বলেন 'না'। আমি আবার তাঁহাদিগকে বলি 'আচ্ছা, মহাশয়গণ, একান্ত-সুখ লোককে সাক্ষাৎ করিবার এই পথ, এই পদ্ধতি, ইহা কি আপনারা জানেন?' তাঁহারা বলেন 'না'। আমি বলি 'মহাশয়গণ, সেই যে দেবতাগণ একান্ত-

সুখ লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা যখন আলাপ করেন তখন কি আপনারা তাঁহাদের এইরূপ আলাপ শুনিতে পান যে, 'ওহে মহাশয়গণ, আপনারা একান্তসুখ লোককে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভালভাবে চলুন, সরলভাবে চলুন, আমরাও এইরূপে চলিয়া একান্তসুখ লোকে উৎপন্ন হইয়াছি!' তাঁহারা উত্তর করেন 'না'। অতএব, প্রোষ্ঠপাদ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে, সেই শ্রমণ- ও ব্রাহ্মণ-গণের উক্তি কি নিষ্ফল ১৩ হয় না?"

৩৫। "যেমন, প্রোষ্ঠপাদ, যদি কোনো ব্যক্তি এইরূপ বলে—'এই জনপদের মধ্যে যে রমণীটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি তাহাকে ইচ্ছা করি, আমি তাহাকে কামনা করি'; আর অন্য ব্যক্তিরা যদি তাহাকে এইরূপ বলে—'ওহে, তুমি যে, ঐ জনপদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণীটিকে ইচ্ছা করিতেছ, কামনা করিতেছ, তাহাকে কি তুমি জান, সে ব্রাহ্মণী, না ক্ষত্রিয়া, না বৈশ্যা, না শূদ্রা? সে যদি ইহাতে বলে 'না,' তাহা হইলে, ঐ সমস্ত লোকেরা তাহাকে আবার বলিতে পারে 'ওহে, তুমি যে ঐ জনপদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণীটিকে ইচ্ছা করিতেছ, কামনা করিতেছ, তুমি কি জান তাহার এই নাম, বা এই গোত্র? সে দীর্ঘ, না হ্রস্ব, না মধ্যম? সে কৃষ্ণা, না শ্যামা, না মিশ্রিতবর্ণা? সে অমুক গ্রামে, বা বণিগ্‌গ্রামে, বা অমুক নগরে থাকে?' সে যদি ইহাতে বলে 'না,' তাহা হইলে তাহারা তাহাকে বলিবে—'ওহে, যাহাকে তুমি জান না দেখ না, তাহাকেই ইচ্ছা করিতেছ, তাহাকেই কামনা করিতেছ?' ইহা বলিলে সে যদি বলে 'হাঁ,' তাহা হইলে তাহার উক্তি কি নিষ্ফল হয় না?

"সত্যই ভগবন্; এইরূপ হইলে ঐ ব্যক্তির কথা নিষ্ফল হয়।"

৩৬। "প্রোষ্ঠপাদ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ বলেন, ও যাঁহাদের

১৩। "অপ্পাটিহীরকতং," বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (সুমঙ্গলবিলাসিনী, সিংহল)—"অপ্পটিহীরকতং পটিহরণবিরহিতং, অনীয্যাণিকন্তি বুত্তং হোতি।" ইহার অর্থ হয়, যাহা (ফল) উপস্থাপিত করে না, অফলোপধায়ক; ইহাই ভাবার্থ ধরিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে নিষ্ফল।

এরূপ মত যে, মরণের পর আত্মা অরোগ ও একান্তসুখী হয় তাঁহাদের উক্তি এইরূপ।

৩৭। "যেমন, প্রোষ্ঠপাদ, যদি কোনো ব্যক্তি চতুষ্পথে কোনো প্রাসাদে আরোহণ করিবার জন্য একটি সিঁড়ি প্রস্তুত করে, আর তাহাকে যদি কতকগুলি ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে 'ওহে, তুমি যে প্রাসাদে আরোহণ করিবার জন্য এই সিঁড়ি করিতেছে তুমি কি জান সেই প্রাসাদটি পূর্ব্বদিকে, না পশ্চিমদিকে, না উত্তরদিকে না দক্ষিণদিকে? এবং তাহা উচ্চঃ বা নীচ, বা মধ্যম?' সে যদি ইহাতে বলে 'না,' তাহা হইলে ঐ সমস্ত ব্যক্তি তাহাকে বলিবে 'ওহে, যে প্রাসাদটিকে তুমি জান না, দেখ না, তাহাতেই আরোহণের জন্য তুমি সিঁড়ি করিতেছ?' সে যদি ইহাতে বলে 'হাঁ,' তাহা হইলে, প্রোষ্ঠপাদ, তুমি কি মনে কর? সেই ব্যক্তির কথাটা কি নিষ্ফল হয় না?"

"সত্যই ভগবন্; এইরূপ হইলে তাহার কথা নিষ্ফল হয়।"

৩৮। "এইরূপই প্রোষ্ঠপাদ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ বলেন, তাঁহাদের এইরূপ মত যে, 'মরণের পর আত্মা অরোগ ও একান্তসুখী হয়', ...তাঁহাদের কথা কি নিষ্ফল নহে?"

"সত্যই ভগবন্; তাঁহাদের কথা নিষ্ফল।"

৩৯। "প্রোষ্ঠপাদ, (লোকে) আত্মাকে তিন রকমে গ্রহণ করিয়া (অর্থাৎ বুঝিয়া) থাকে; স্থূল, মনোময়, ও অরূপ। স্থূল হইতেছে রূপবান্, চতুর্মহাভূত-জাত ও অন্নকবাভোজী; মনোময় হইতেছে রূপবান্ সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত ও অহীনেন্দ্রিয়, আর অরূপ হইতেছে সংজ্ঞাময়।[১৪]

---

[১৪]। শরীর তিন রকম, আর লোকে এই তিন রকমের শরীরকেই 'ইহা আমি' বা 'ইহা আমার আত্মা' এই বলিয়া আত্মা মনে করে। প্রথম, স্থূল ভৌতিক শরীর প্রসিদ্ধ, বৌদ্ধ-শাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় কামলোকে যে শরীর উৎপন্ন হয় তাহা স্থূল। আর ধ্যান-মননের দ্বারা যে ধ্যানময় শরীর তাহা মনোময়। মনোময় শব্দের অর্থ 'মনন বা ধ্যান হইতে জাত' (সুমঙ্গলবিলাসিনী, ব্রহ্মজাল, দীঘ. ১.৩.১২)। বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষায় রূপলোকে যে

৪০—৪২। "হে প্রোষ্ঠপাদ, আমি এই ত্রিবিধ আত্মগ্রহণেরই ত্যাগের জন্য ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া থাকি যে, যদি তোমরা যথাযথভাবে চল তাহা হইলে, যে সকল বিষয় অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া থাকে[১৫], তৎসমুদয় অপগত হইবে; যে সমস্ত বিষয়ের দ্বারা শুদ্ধি হয়, তৎসমুদয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; এবং প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতাকে এই জন্মেই নিজে সবিশেষ জানিয়া ও লাভ করিয়া বিহরণ করিবে। প্রোষ্ঠপাদ, তোমার মনে হইতে পারে যে, এই সমস্তই হইবে, কিন্তু ঐ বিহরণ দুঃখকর। কিন্তু, প্রোষ্ঠপাদ, তুমি এরূপ ভাবে দেখিও না। তখন প্রমোদ থাকে, প্রীতি থাকে, শান্তি থাকে, স্মৃতি থাকে, ও সচেতনতা থাকে, সে বিহরণ সুখকর হয়।

৪৩—৪৫। "প্রোষ্ঠপাদ, অন্যে আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, 'মহাশয়গণ, সেই স্থূল, মনোময়, ও অরূপ আত্মার গ্রহণ কি, যাহার পরিত্যাগের জন্য আপনারা ঐরূপ ভাবে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া থাকেন'? ঐরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা তাঁহাদিগকে উত্তর দিব 'এই ত মহাশয়গণ, আপনারা সেই স্থূল, মনোময় ও অরূপ আত্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারই ত্যাগের জন্য আমরা ঐরূপ ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছি।

"অতএব, প্রোষ্ঠপাদ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে এই কথা কি সফল নয়?

"সত্যই ভগবন্; এইরূপ হইলে এই কথা সফল।"

৪৬। "যেমন, প্রোষ্ঠপাদ, যদি কোনো ব্যক্তি প্রাসাদে আরোহণ করিবার

শরীর উৎপন্ন হয় তাহা মনোময়, এই মনোময় শরীরেও রূপ থাকে, রূপ-শব্দের রূপ-স্কন্ধ। ইহার পর রূপ-ধ্যান ছাড়িয়া দিয়া অরূপ ধ্যানের ফলে যে সংজ্ঞাময় শরীর তাহা অরূপ। এখানে রূপের অর্থাৎ রূপস্কন্ধের কোনো সম্বন্ধ থাকে না, কেবল নামের (চিত্তের) সম্বন্ধ থাকে, তাই ইহা অরূপ শরীর। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাবায় অরূপ লোকের শরীর। কারণ এ অবস্থায় অরূপকেই অবলম্বন করিয়া ধ্যান করা হয়।

১৫। বুদ্ধঘোষ বলেন দ্বাদশ অকুশল চিত্ত।

জন্য তাহারই নীচে একটা সিঁড়ি করে, আর যদি কতকগুলি লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'ওহে, যে প্রাসাদে আরোহণ করিবার জন্য তুমি সিঁড়ি করিতেছ, তুমি কি জান তাহা পূর্ব্বদিকে, না পশ্চিমদিকে, না উত্তর দিকে, না দক্ষিণ দিকে? তাহা উচ্চ কি নীচ কি মধ্যম?' তাহা হইলে সে যদি বলে 'ওহে, এই ত সেই প্রাসাদ ইহাতেই আরোহণ করিবার জন্য ইহারই নীচে আমি সিঁড়ি করিতেছি,' তবে কি তাহার সেই উক্তি সফল হয়?

"সত্যই ভগবন্, এইরূপ হইলে তাহার উক্তি সফলং

৪৭। "হে প্রোষ্ঠপাদ, ঠিক এইরূপই; অন্যেরা যদি আমাকে ঐ ত্রিবিধ আত্ম-গ্রহণের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তবে আমি এইরূপ উত্তর দিয়া থাকি।"

৩৮। এইরূপ উক্ত হইলে হস্তিসারিপুত্র চিত্ত ভগবানকে বলিলেন—"হে ভগবন্, স্থূল, মনোময়, ও অপরূপ, এই ত্রিবিধ আত্মগ্রহণের মধ্যে যদি কখনো কাহারো একরূপ আত্মগ্রহণ থাকে তবে তখন তাহার নিকট তাহাই সত্য এবং অপর দুইপ্রকার আত্মগ্রহণ মিথ্যা?"

৪৯। হে চিত্ত, যখন একরূপ আত্মগ্রহণ থাকে, তখন অপর দুইরূপ আত্ম-গ্রহণ গণ্য হয় না যেমন, যখন স্থূল আত্মগ্রহণ থাকে তখন তাহা মনোময় ও অরূপ বলিয়া কথিত হয় না। ভাল, চিত্ত, লোকেরা যদি তোমাকে প্রশ্ন করে 'তুমি কি অতীত কালে ছিলে অথবা ছিলে না?' 'ভবিষ্যতে তুমি থাকিবে, অথবা থাকিবে না?' 'এবং এখন তুমি আছ কি না?' তাহা হইলে তুমি কি উত্তর দিবে?"

"আমি উত্তর দিব, 'অতীতে আমি ছিলাম, আমি যে ছিলাম না তাহা নহে;' 'ভবিষ্যতে আমি হইব, হইব না ইহা নহে;' এবং 'আমি এখন আছি, আমি যে এখন নহি ইহা নহে। এইরূপই আমি উত্তর দিব।"

৫০। "চিত্ত, তাহারা যদি আবার তোমাকে প্রশ্ন করে 'তোমার যে অতীত আত্মগ্রহণ তাহাই সত্য, এবং ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আত্মগ্রহণ মিথ্যা?' অথবা তোমার ভবিষ্যৎ আত্মগ্রহণ সত্য, অতীত ও বর্ত্তমান আত্মগ্রহণ মিথ্যা? অথবা

এখন যে বর্ত্তমান আত্মগ্রহণ তাহাই সত্য, আর অতীত ও ভবিষ্যৎ আত্মগ্রহণ মিথ্যা ?'—তবে, এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তুমি কি উত্তর প্রদান করিবে ?"

"আমি তাহা হইলে এইরূপ উত্তর প্রদান করিব, 'আমার যে অতীত আত্ম-গ্রহণ হইয়াছিল তাহাই সে সময় সত্য ছিল, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আত্মগ্রহণ তখন মিথ্যা। অপর দুইটিরও সম্বন্ধে এইরূপ।"

৫১। "এইরূপই, হে চিত্ত, স্থূল, মনোময়, ও অরূপ, এই ত্রিবিধ আত্মগ্রহণের মধ্যে যখন যেটি থাকে তাহাই তখন সেই নামে কথিত হয়, অপর দুই নামে কথিত হয় না।

৫২। "যেমন, হে চিত্ত, গাভীর দুগ্ধ হয়, দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, এবং ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (?)। যখন দুধ থাকে তখন তাহাকে দধি বলা হয় না, অথবা নবনীত, ঘৃত, বা ঘৃতমণ্ডও বলা হয় না, তখন তাহাকে দুধই বলা হয়। দধি-প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ ; যখন সেটি থাকে তখন তাহাকে সেই নামেই উল্লেখ করা হয়, অন্য নামে নহে।

৫৩। "এইরূপই, হে চিত্ত, যখন যেরূপ আত্ম-গ্রহণ থাকে, তখন তাহাকে সেইরূপই বলা হইয়া থাকে, অপর দুই নামে বলা হয় না। কেননা, হে চিত্ত, এগুলি কেবল লোকেদের করা সংজ্ঞা, বাক্‌প্রয়োগ, ব্যবহার, একটা জানাইবার বা প্রকাশ করার শব্দ, নাম। তথাগত (তত্ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এই সমস্তের দ্বারা ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি (তজ্জন্য তৃষ্ণাদি দ্বারা) আক্রান্ত হন না।

৫৪। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক প্রোষ্ঠপাদ ভগবানকে বলিলেন—

"অতি রমণীয়! ভগবন্, অতি রমণীয়! যেমন কেহ অধোমুখ পদার্থকে উন্মুখ করিয়া দেয় প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত করিয়া দেয়, মূঢ়কে পথ বলিয়া দেয়, অথবা যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা রূপ দেখিবে এই মনে করিয়া অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে, সেইরূপই, হে ভগবন্, আপনি বহুপ্রকারে ধর্ম্ম (তত্ত্ব) প্রকাশ করিয়াছেন। এই আমি ভগবান্‌কে, ধর্ম্মকে, ও ভিক্ষু-সংঘকে শরণ করিতেছি। আপনি আজ হইতে আমাকে আপনার উপাসক

বলিয়া অবধারণ করুন। আমি আমার জীবন পর্য্যন্ত আপনার শরণাগত হইলাম।"

৫৫। হস্তিসার পুত্র চিত্তও ঠিক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি কহিয়া নিজের সম্বন্ধে বলিলেন "এই আমি ভগবান্‌কে, ধর্ম্মকে, ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে শরণ করিতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

৫৬। হস্তিসারিপুত্র চিত্ত ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। উপসম্পদা গ্রহণের অচিরেই তিনি একাকী, দূরস্থিত, অপ্রমত্ত, উৎসাহী, ও প্রণিহিতচিত্ত হইয়া অনতিবিলম্বেই, যাহার জন্য কুলপুত্রগণ গৃহ হইতে একবার গৃহহীনতা অবলম্বন করিয়া প্রব্রাজিত হন, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শেষ ব্রহ্মচর্য্যকে অর্থাৎ (প্রজ্ঞাকে) এই জন্মেই সবিশেষ জানিয়া, সাক্ষাৎ করিয়া, ও লাভ করিয়া এইরূপে বিহরণ করিতে লাগিলেন 'জন্মের ক্ষয় হইল' ব্রহ্মচর্য্য-বাস সম্পন্ন হইল, কর্ত্তব্য কৃত হইল, আর কিছু ইহার (সংসার বা ক্লেশক্ষয়ের) জন্য নাই!' এইরূপে হস্তিসারিপুত্র চিত্ত অর্হদ্‌গণের অন্যতম হইয়াছিলেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

শিল্পের ছন্দ

যেমন মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী, খুড়ী-জ্যাঠাই, ও এইরূপ অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা দ্বারা সংসার মধুর হয়ে থাকে, তেমনি বস্তুজগতেও তরু-লতা, পর্ব্বত-প্রান্তর, জল-স্থল, ইত্যাদি সব জায়গায় ঐরূপ একটা মিলের ভাব আছে বলেই আমাদের চোখে ইহা এত সুন্দর এত মধুর লাগে। এই সম্বন্ধ বা মিল বুঝতে পারে বলেই মানুষ বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ জীব হয়েচে। আদিম

যুগে মানুষের মন যখন ভাবের উচ্ছ্বাসের বেগধারণ করে থাকতে পারলে না তখনই ত সে ছন্দে কথা ক'য়ে উঠল—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্……..।" অমনি মিশরের বারিলের-গায়ে চিত্র আঁকা সুরু হ'ল রেখা ও রঙের মিলনে।

পাহাড়ের গায়ে প্রান্তরে, আদিম মানুষ যখন কুঁড়ে ঘরগুলি বাঁধলে তখন নৈসর্গিক দৃশ্যের সঙ্গে রেখায় রেখায় এমনি মিলে গেল যে, সে রকম মিল আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও কোন ইঞ্জিনিয়ার আজও গড়ে তুলতে পারলে না। এখনকার কালে এই ছন্দ আর মিলের রচনা করেন একমাত্র কবি ও শিল্পী। ভাস্কর ভাস্কর্য্যে, চিত্রকর তাঁর চিত্রে, ক্রমাগত রেখা ও রঙের ছন্দের দ্বারা বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের এমন মিলন ঘটিয়ে দিয়ে থাকেন যে, মানুষ ছবি বা ভাস্কর্য্যটি দেখলেই আনন্দে বলে ওঠে "ভারি চমৎকার"! রেখার ও রঙের সামঞ্জস্যের যে রহস্যে চিত্র চমৎকার হয়ে ওঠে, সেটি একমাত্র চিত্রকরেরাই বুঝতে পারেন। ভাষা, তাল ও সুরের দ্বারা কবির কাব্যের ছন্দ সহজে ধরা যায়, কিন্তু চিত্রকলায় বস্তু-সংস্থাপনের (Composition) ভিতর যে একটা ছাঁদ আছে সেটা প্রকৃতির হুবহু নকল নয়, প্রকৃতিরই বুকের রহস্যের ভিতরকার একটা মিল থেকে টেনে বার করা জিনিষ, তাই একথা সহজে বোঝা বা বোঝান শক্ত। আমরা সেটিকে জ্যামিতির উপায়ে যদি বোঝাতে যাই তাহলে সেটি নীরস এবং ভোঁতা হয়ে পড়বে।

আসলে ছন্দটা সহজ গতি ছাড়া আর কিছু নয়। কোন প্রান্তরের মাঝে নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা ক্রমাগত যাতায়াত করে' যে একটা আঁকা বাঁকা পায়ের দাগে পথ তৈরী করে সেটি সকলেরি ভারি সুন্দর লাগে। সব মানুষের চলায় তৈরি হয়ে মিলে উঠেচে বলেই তার মধ্যে একটা ছন্দ আছে, তারি জন্যে সেটি এত সুন্দর। এ রকম পথ সহরের পাকা শড়কের মত ঋজু রেখায় প্রান্তরটিকে বিদীর্ণ করে বিরাজ করে না, তা প্রান্তরের স্বাভাবিক উঁচু-নীচুকে বজায় রেখে তার সঙ্গে খাপ খেয়ে একটি সহজ অনায়াস গতিতে তৈরি হয়ে ওঠে।

সমকোণী চতুর্ভুজ আকারের "সাইন বোর্ডে" যদি কেহ হেলানো অক্ষরে নাম লেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, হেলান অক্ষরটি ঠিক চতুষ্কোণের ঋজু ভাবের মাঝে এমন বেমানান হয়ে বেঁকে বসেচে যে, তার প্রতি অবাধ্য শিশুর মতই রাগ ধরে। তখন ইচ্ছা করে, তাকে চতুষ্কোণের মাঝে ঘাড় ধরে সোজাসুজি বসিয়ে দিয়ে মানান সই করে তুলি। তেমনি একটি বরফির ধরণের তক্তায় যদি আবার সোজা সোজা ছাপার অক্ষরের মত কিছু লেখা যায়, তাহলে তখন সেটাকে যতক্ষণ সেই বরফি-আকারের তক্তায় বাহুরেখার মাঝে তারই মত বেঁকিয়ে বসানো না যায়, ততক্ষণ আর তার নিস্তার নেই। সাইন বোর্ডটির আকার চতুষ্কোণ বা বরফি যেমনই হোক, তার বাহুরেখার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না লিখলে কখনই লেখাটি শোভন হয়ে উঠে না। এটা সহজেই পরীক্ষা করা যেতে পারে। ছন্দ রক্ষা না করার কুশ্রীতার এটা একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ নয় কি? ছন্দ রক্ষার জন্যে এই অনায়াস বেগ বা সহজ গতি সকল মানুষের মনের মধ্যে আছে তবে সেটিকে শিল্পকলায় গেঁথে তোলে এমন লোকই অল্প। দেখা যায় সহরে যেখানে অসংখ্য লোকের বাস সেখানেও প্রতিদিনের মানুষের চলা-ফেরার ভিতরও এই স্বাভাবিক মিল ফুটে ওঠে। এমন কি যখন দেখি সহরে হয়ত একটা দ্রুতগামী মোটর গাড়ীর সম্মুখে একটি লোক রাস্তা পার হতে গিয়ে এসে পড়ে, তখন সহজ গতির টানে সে চাপা পড়বার ভয়ে কিছুতেই পেছু হটে যেতে পারে না, সে ছিটকে এগিয়েই পড়ে। এই এগিয়ে পড়াই হচ্চে প্রকৃতির সঙ্গে মিল রাখা এবং সহজ গতি।

নদীর উপর দিয়ে যখন বকের বা হাঁসের সার ওড়ে, তখন তারা নদীর জলের ও চরের আঁকা বাঁকা গতির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে একটা ছন্দ বজায় রেখে নানান ভঙ্গীতে সারে সারে উড়ে চলে। কতকগুলি গাছ যখন একত্রে জন্মায় তখন দেখতে পাই গাছগুলির ডাল-পালা, গুঁড়ি প্রভৃতি সব জিনিষের ভিতরই এমন একটা পরস্পর মিল আছে, যেটা তাদের আপনাদের সহজ গতিতে তৈরি হয়ে উঠেছে। গাছেরা তাপ ও আলোর অনুকূলে ডালপালা

প্রসারণ করে, হয়ত উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ এই রকম কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ দেখাবেন ; কিন্তু কবি বা শিল্পীর চোখে এই ছন্দ, সৃষ্টির ছন্দেরই একটি রূপ ছাড়া আর কিছু বলেই মনে হয় না।

চিত্রকলায় বাহ্যরেখার (out line) দ্বারাই প্রধানত ছন্দের বিচার করা হয়। কিন্তু এই বাহ্যরেখা ঋজুরেখা (straight line) নয়, কুটিলরেখা (curve line)। কুটিলরেখাকে রূপরেখা বলা যেতে পারে। রেখার ছাঁদ বিধাতার সৃষ্টির ভিতর এইরূপ কুটিল রেখাতেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানুষের যত কিছু স্থূল রচনায় —কল-কারখানা, চৌকাট-জাল্‌না, কোঠা-ভিটা প্রভৃতিতে কেবল ঋজুরেখা দেখা যায়,—কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিতে সবই রূপরেখা। জীব-জন্তু স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি জগতের সমস্ত পদার্থের গড়ন খুঁটিনাটি ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে,প্রত্যেক পদার্থই এই রূপরেখায় প্রাণময় হয়ে আছে।

মানুষের দেহের প্রত্যেক অঙ্গ অপর অঙ্গের সঙ্গে মিলে আছে বলেই তা এত সুন্দর। ডান হাত বাঁ হাতের সঙ্গে, ডান পা বাঁ পায়ের সঙ্গে, একপাশের মুখ আর একপাশের মুখের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আছে ; যদি হঠাৎ কোথাও অমিল ঘটে তাহলে সেটাকে রোগ বল্‌তে হয়, সেখানে সৌন্দর্য্য থাকে না।

আমরা যদি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারতুম তাহলে দেখান যেত যে, জীবজগৎ এবং বস্তুজগৎ সবই রেখাগত সামঞ্জস্য রাখবার দিকেই চল্‌চে।

জাপানী চিত্রকরেরা দুটি অর্দ্ধ বৃত্তাকার রেখা পরস্পর বিপরীত দিকে যোজনা করে' গাছের স্বভাবিক গতি বা ভঙ্গীর রূপটি দেখিয়ে থাকেন। আমরাও ঠিক ঐ একই উপায়ে দুটি অর্দ্ধ বৃত্তাকার রেখার ভঙ্গীর সাহায্যে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের চিত্র এঁকে দেখাতে পারি।

যেখানে শিল্পী আকাশের মত বিপুল শূন্যের গভীরতাকে আঁকবার চেষ্টা করেচেন, সেখানেও তাঁকে এই রূপরেখার বাঁকা লাইনে আঁকতে হয়েচে। ঋজু রেখায় নভোমণ্ডলের শূন্যতা কিছুতেই দেখানো যেতে পারে না। শিল্পীরা যখন গাছপালার সঙ্গে মানুষ বা জীবজন্তু আঁকেন তখন গাছপালার বাহ্যরেখার

সঙ্গে মিল রেখেই তাঁদের সেগুলিকে আঁকতে হয়। যেখানে এই সদ্ভাবের অভাব, সেইখানেই বিরোধ, সেইখানেই ছন্দপতন অবশ্যম্ভাবী। বিধাতার সৃষ্টির ভিতর যদি এই বাঁকা রূপরেখাটি না থাকতো তাহলে সব জিনিষই ঋজুরেখা ধারণ করে জ্যামিতিক বিভীষিকা দেখাতো। তখন সৃষ্টির ভিতর এত বৈচিত্র্য কিছুতেই থাকতে পারতো না।

আধুনিক শিল্পে বিশেষত স্থাপত্যে কখনো কখনো ঋজুরেখার বাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু যেখানে ইহার খুব বাড়বাড়ি হয়েচে, সেখানেই মানুষ সেই অসামঞ্জস্যকে চাপা দেবার জন্যে গাছপালায় ঋজুরেখাকে ঢেকে শোভন করে তোলবার চেষ্টা করেচে। ইউরোপীয় স্থাপত্যে এই কারণেই "আইভি-লতা" প্রভৃতির এত বাহুল্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের স্থাপত্যে 'আইভি-লতা' নেই সত্য, কিন্তু লতাপাতার আলঙ্কারিক কারুকার্য্য আছে, এতেই স্থাপত্যের স্থূলভাব ঢাকা পড়েচে।

আমাদের দেশের বিগ্রহমাত্রকেই নানান ভঙ্গীতে ভাঙা হয়েচে। অনন্ত নীল নিরাকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রাধার (প্রকৃতির) পাশে ত্রিভঙ্গ করে দেখানো হয়েচে। এটাতেও কি ছন্দের বা রূপরেখার কথারই সার পাওয়া যায় না? ভারতের প্রাচীন চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যে লীলাললিত রেখাভঙ্গীই বিশেষ একটা অলঙ্কারিক ভাব দিয়েচে।

চিত্রকলা এইরূপ যখন সহজ গতিতে অনায়াসে ফুটে ওঠে তখন সেটিকে ক্যামেরা বা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে যেমন ভাবেই বাড়ানো বা কমানো যাক না কেন, তার সৌন্দর্য্যের আর ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় না। এটি হ'ল তার একটি পরখ। ছোট কিম্বা বড় হওয়াটা ছবির বিশেষ দোষ বা গুণ নয়—ছবিটির রেখা ও রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য সহজভাবে বজায় আছে কিনা সেইটেই দেখবার বিষয়। শিল্পীর তুলিকার টান অজ্ঞাতসারে এই সম্বন্ধকে বজায় রেখে চলে, তাঁর সে জন্যে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

ছবির মধ্যে দুটো জিনিস তার ছন্দের সহায়তা করে—একটি ব্যবধান (Space) অপরটি বস্তু (Object)। এই দুইটিই ছবির বাঁধন। একটি ছোট ছবিতে যে

ব্যবধানের মধ্যে বস্তুসংস্থাপন করা হয়, ঠিক সেই হিসাবে ব্যবধান রেখে বস্তু সংস্থাপন করলে ছবিটি দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ হলেও তার ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। যে সব ছবিতে ব্যাবধানটা বস্তু অপেক্ষা বেশী রাখা হয়, সেগুলি বড় করে আঁকা হোক, বা না হোক, তাদের ভিতরে দূরত্বের ভাব বেশী থাকে। এই জন্যেই সেগুলিকে বড় ছবি বলা যেতে পারে। আবার যদি কোনও বড় আকারে আঁকা ছবিতে ব্যবধান কম রেখে বস্তুর ভাগটা বেশী করে দেখান হয়, সেখানে ছবির প্রসার বা দূরত্বের ভাব কমে যায়; তখন তাকে ছোট ছবির কোটায় ফেলতে হয়।

চিত্রে ছন্দ বা সহজ গতির যেমন প্রয়োজন, তাতে রঙের সামঞ্জস্যও ঠিক সেইরূপই দরকার। গীতিকাব্য যেমন সুরসংযোজনায় বিশেষ রূপ পায়, ছবিও তেমনি রঙের মিলনে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। গাছের শোভা যেমন ফুল, রূপের শোভা যেমন চুল, ছবিতে রঙেরও ঠিক সেই রকম সার্থকতা আছে। কোন রঙটি কোন রঙের সঙ্গে মেলে, কোন রঙটি কোন রঙের বিরোধী, এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয় শিল্পীরা সহজেই বুঝতে পারেন। শিল্পকলায় এবং কাব্যে ছন্দই প্রাণ। এটা না থাকলে কোনোটাই গড়ে উঠ্‌তে পারে না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এই সহজ গতিটিকে প্রতিপদে খর্ব্ব করা হচ্ছে, সেই জন্যেই সব দিকে এত বিরোধ। তাই কাব্য কলা এখনকার দিনের শিক্ষিতদের কাছে ছেলে খেলা।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

পারসীকপ্রসঙ্গ

বিবাহ

পারসীকসমাজে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ১৫ বৎসরের কম বয়সে বালক বা বালিকার বিবাহ হয় না। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে হিন্দুদিগের ন্যায় অতিবাল্য-বিবাহ

প্রবেশ করে। বাগ্‌দান ত কখনো-কখনো বর-কন্যার জন্মের পূর্ব্বেই হইয়া থাকে। ক্রমশ এই আচার আবার পরিত্যক্ত হইয়াছে ও হইতেছে।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে জ্যোতিষীর মতামত আবশ্যক হয়; তিনি গ্রহনক্ষত্র দেখিয়া অনুকূল মত প্রকাশ করিলে সম্বন্ধটি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। পরে বর-কন্যার পিতা-মাতার অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে পরস্পরের সম্মতি হইলে তাহা স্থির করা হয়। বর ও কন্যার পিতা যথাক্রমে কন্যা ও বরকে এক-একটি নূতন পোষাক পাঠাইয়া দিলেই সেই সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়।

পারসীদেরও সমাজে কোনো-কোনো দিন শুভাবহ বলিয়া গণ্য করা হয়; আবার বিশেষ-বিশেষ দিন বিশেষ-বিশেষ কার্য্যের জন্য অনুকূল ইহাও মনে করা হয়। তবে প্রধানত দুইপক্ষেরই যে দিনে সুবিধা সেইরূপই কোনো একটি দিন বিবাহের জন্য স্থির করা হইয়া থাকে।

হিন্দুদের ন্যায় ইঁহাদেরও বিবাহ রাত্রে হয়, প্রধানত সন্ধ্যার সময়। বর ধুম-ধাম ও জাঁক-জমক করিয়া কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বরযাত্রীদের মধ্যে বর-পক্ষের পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও থাকেন। ইঁহারা কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে বর ও কন্যাকে একখানা গালিচার উপর চেয়ারে মুখামুখি ভাবে বসাইয়া তাহাদের মাঝখানে একখানা কাপড় পর্দার মত করিয়া ধরা হয়, যাহাতে তাহারা পরস্পরকে দেখিতে না পায়। এই অবস্থায় পর্দার নীচে বর ও কন্যা পরস্পরের দক্ষিণ করতল ধারণ করে, আর একখানা কাপড়ে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া তাহার দুইপ্রান্তকে একত্র দুইটি গ্রন্থি দ্বারা বন্ধন করা হয়। এই অবস্থায় একজন পুরোহিত একখানি অপাকান নরম সুতা লইয়া বর-কন্যাকে সাতবার বেষ্টন করেন। ইহা করিবার সময় তিনি অ হু ন ব ই র্য নামে সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র[১] আবৃত্তি করেন। ঐ সুতাখানিতে পূর্ব্বোক্তরূপে সাত পাক বেষ্টন করা শেষ হইলে তিনি তাহা দ্বারা বর-কন্যার পরস্পর-ধৃত হাত দুইখানিকেও সাতবার বেষ্টন করেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্ববর্ণিত কাপড়খানার গ্রন্থিদ্বয়কেও সাতবার

১। বারান্তরে ইহা পাঠকগণের নিকট ইহা প্রকাশিত হইবে।

ঐ সুতা দিয়া বেষ্টন করেন। ইহার পর ধাতুপাত্রস্থিত অগ্নিতে ধূপ জ্বালান হয়। ইহার পূর্বেই সেই পর্দাখানা ফেলিয়া দেওয়া হয়, আর তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই বর ও কন্যা পরস্পরের প্রতি, কে কাহার উপর প্রথম ছড়াইতে পারে এই ভাবে তাড়াতাড়ি কিছু চাউল ছড়াইয়া দেয়। এই সময়ে তাহাদের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট স্ত্রীলোকেরা করতলধ্বনি ও পুরুষেরা জয়ধ্বনি করিয়া থাকেন। চাউল ছড়াইবার পরেই বর-কন্যা পাশা-পাশি বসে, আর দুইজন দ স্তূ র অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত আ শী র্বা দ করেন, নিম্নে ইহা লিখিত হইতেছে ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত পর্দ্দাধারণ-প্রভৃতির উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লই।

পারসীকেরা বলেন,২ ঐ যে পর্দ্দা ধরা আর পরে তাহা ফেলিয়া দেওয়া, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটা না হইয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত বর-কন্যা পৃথক্ ছিল, কিন্তু তাহার পর আর তাহারা তেমন নহে। তাহারা যে প্রথমে মুখামুখি ভাবে ও তাহার পর পাশাপাশি ভাবে বসিয়াছিল, তাহাও ঐ ভাবটাকেই প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের পরস্পরের হস্তধারণ ও সূত্র দ্বারা তাহার বন্ধন এই সূচনা করিতেছে যে, তাহারা এখন সম্মিলিত ও এক। অপাকান নরম সুতায় সাতবার ঐরূপ বেষ্টন করার উদ্দেশ্য এই যে, যদিও অপাকান নরম সুতা সহজে ছিঁড়িয়া যায়, তথাপি তাহাকে যদি সাতফের করিয়া পাকান যায় তবে তাহা ছিঁড়ে না, এইরূপই ঐ বর ও কন্যার প্রেম ও প্রীতি এরূপ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক যেন তাহা ভগ্ন হইয়া না যায়। সপ্ত সংখ্যাকে পারসীরা শুভাবহ মনে করেন, এই জন্য সাতবার বেষ্টনের কথা বলা হইয়াছে। বর-কন্যার পরস্পরের প্রতি যে, ঐরূপ ভাবে তাড়াতাড়ি চাউল ছড়ান, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পারসীকেরা মনে করেন, তাহাদের মধ্যে যে প্রথমে চাউল ছড়ায় সে অন্যের প্রতি অধিকতর ভালবাসা দেখাইতে পারে। চাউল ছড়াইবার সময় সকলেই, বিশেষত স্ত্রীলোকেরা বর-কন্যার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

অনন্তর দ স্তূ র আশীর্ব্বাদ করেন—

২। D. F. Karaka: History of Parsis, Vol I. P. 180.

১। সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা প্রভু তোমাদিগকে প্রভূত পুত্র-সন্ততি, বিপুল ঐশ্বর্য্য, মানসিক প্রীতি, শরীর-স্থিতি, ও একশত পঞ্চাশ বৎসর পর্যান্ত জীবন প্রদান করুন।

এই সময়ে বরপক্ষের একজন প্রতিনিধি (পুরোহিত) বরের নিকট, আর কন্যাপক্ষের একজন প্রতিনিধি কন্যার নিকট উপবেশন করেন। পুরোহিতেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বিবাহে উভয়পক্ষের সম্মতি আছে কি না। প্রথমে বরপক্ষের প্রতিনিধিকে প্রশ্ন করা হয়—

২—৫। শুভ ইরান দেশের অধিপতি সসন্ বংশের[৩] সম্রাট্ ইয়জ্‌দ-জর্দের[৪] অমুক বৎসরে, অমুক মাসে, অমুক দিনে, অমুক স্থানে উত্তম ব্যক্তিগণের সম্মেলনে মজ্‌দয়স্ত্রীয় ধর্ম্ম ও আচার অনুসারে দুই সহস্র বিশুদ্ধ রজত-মুদ্রা ("দেরম") ও নিশাপুরের[৫] দুই দীনার সুবর্ণ দিয়া আপনি এই কুমারীকে (অথবা বিধবা হইলে, এই নারীকে) এই বরের জন্য গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন ত?

বরপক্ষের প্রতিনিধি উত্তর করেন—

হাঁ; আমি সম্মত আছি।

৬—৭। কন্যাপক্ষের প্রতিনিধিকে প্রশ্ন করা হয়—

আপনি নিজের পরিবারের মধ্যে আলোচনা করিয়া ও পরস্পর একমত হইয়া অমুক কন্যাকে সত্য হৃদয়ে তিনবার উল্লেখ করিয়া নিজের পুণ্য বৃদ্ধির জন্য অমুকের (বরের) নিকট যাবজ্জীবনের নিমিত্ত প্রদান করিবার কথা দিয়াছেন কি?

তিনি উত্তর করেন—

হাঁ; দিয়াছি।

৮—৯। দস্তুর বর-কন্যাকে প্রশ্ন করেন—

৩। Sasanian or Sassanian Dynasty.

৪। এই নামের ৩ জন সম্রাট্ ছিলেন, সম্ভবত শেষ সম্রাট্‌কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৫। পারস্যে ম শ হ দ অথবা ম শে দ নগরের পশ্চিমে।

তোমরা যাবজ্জীবন সত্য চিত্তে এই অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত আছ ত?

তাহারা উত্তর করে—

হাঁ; আমরা সম্মত আছি।

১০। দস্তূর বলেন—

উভয়েরই কল্যাণবৃদ্ধি হউক।

উভয়েরই কল্যাণবৃদ্ধি হউক।

উভয়েরই কল্যাণবৃদ্ধি হউক।

১১। অনন্তর উভয় পক্ষের মো বে দ (পুরোহিত) আশীর্ব্বাদ করেন—

হোর্মজদের ৫ উপকারক নামে

তুমি সর্ব্বদা শ্রীমান্ হও।

সিদ্ধিমান্ হও।

বুদ্ধিমান্ হও।

বিজয়বান্ হও।

পুণ্য শিক্ষার শ্রোতা হও।

১২। যাহা সুচিন্তা মনের দ্বারা তাহা চিন্তা কর।

যাহা সুভাষিত বাক্যের দ্বারা তাহা বল।

যাহা সুকৃত কর্ম্মের দ্বারা তাহা কর।

যাহা দুশ্চিন্তা তাহা নিঃশেষে বিনাশ কর।

যাহা দুরুক্ত তাহা দলিত কর।

যাহা দুষ্কৃত তাহা দগ্ধ কর।

১৩। পুণ্যকে স্তব কর।

দৈত্যগণকে বিনাশ কর।

মজদযজ্ঞীয় ধর্ম্মকে বল।

১৪। সম্পূর্ণ চিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

৫। অ হু র ম জ দা শব্দ পহ্লবীতে এই আকার ধারণ করিয়াছে।

সদাচারের দ্বারা লক্ষ্মীকে উপার্জ্জন কর।

১৫। গুরুজনের নিকট সত্যবাদী হও।

তাঁহাদের আদেশকারী হও।

উপকারকের নিকট বিনীত, মধুর, ও প্রসন্নদৃষ্টি হও।

১৬। খলতা করিও না।

ক্রোধ করিও না।

লজ্জায় পাপ করিও না।

লোভ করিও না।

অতিশয় চিন্তা করিও না।

ঈর্ষ্যা করিও না।

গর্ব্ব করিও না।

অপমান বহন করিও না।

কামকে বহন করিও না।

কাহারো নিকট হইতে হঠাৎ লক্ষ্মীকে হরণ করিও না।

কেবল বরকে বলা হয়—

অন্যের স্ত্রীকে কামনা করিও না।

নিজের বিশুদ্ধ ব্যবসায় হইতে যাহা হয় তাহাতেই চল, এবং উত্তম ব্যক্তিগণকে তাহার ভাগ প্রদান কর।

১৮। বরকন্যা উভয়কেই বলা হয়—

মৎসরী লোকের সহিত স্পর্দ্ধা করিও না।

লোভীর সহিত সমভাগী হইও না।

খলের সহিত সংসর্গ করিও না।

কুকীর্ত্তি লোকের দ্বারা বংশের কোনো উন্নতি করিও না।

দুর্ব্বুদ্ধি লোকের সঙ্গে এক কার্য্য করিও না।

১৯। ন্যায়ানুসারে শত্রুসমূহের সহিত যুদ্ধ কর।

মিত্রগণের প্রীতির জন্য তাঁহাদের সহিত বিচরণ কর।

নিন্দিত লোকের সহিত বাদানুবাদ করিও না।

সম্মেলনের সম্মুখে শুদ্ধভাষী হইবে।

রাজাদের নিকট প্রমাণবাদী হইবে।

পিতার নাম-কীর্ত্তক হও।

মাতাকে পীড়া দিও না।

নিজের শরীরকে সত্য দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ধারণ করিবে।

২০। ক ঈ খু স্রো ঈ র [৬] ন্যায় বজ্রদেহ হও।

কা ঈ উ সে র [৬] ন্যায় জ্ঞানবান্ হও।

সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান্ হও।

চন্দ্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হও।

জরথুশ্‌ত্রের ন্যায় কীর্ত্তিমান্ হও।

রু স্ত মে র ন্যায় বলবান্ হও।

ভূমির ন্যায় ফলপ্রদ হও।

আত্মার সহিত শরীর যেমন সু-সম্বদ্ধ, সেই রূপ মিত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের সহিত সুস্নেহযুক্ত হও।

২১। সর্ব্বদা ধর্ম্মশীল হও।

অহুর মজদাকে স্বামী বলিয়া মনে কর।

জরথুশ্‌ত্রকে গুরু বলিয়া গ্রহণ কর।

অঙ্‌রমইন্যু ও দৈত্যগণকে দমন কর।

২২। ক।[৭] হো র্ম জ. দ দান প্রদান করুন।

৬। প্রসিদ্ধ রাজা।

৭। পারসীকগণের শাস্ত্রানুসারে মাসের ত্রিশ দিনের (ফারসী সী রো জা হ্, সী=ত্রিশ, রো জা হ্ =দিনসমূহ) ত্রিশটি অধিদেবতা আছেন। এখানে যথাক্রমে তাঁহাদেরই উল্লেখে আশীর্ব্বাদ

খ। ব হ্ম ন সচ্চিন্তা প্রদান করুন,

গ। অ দি বে হ স্ত উত্তম বাক্য,

ঘ। শ হ্রে ব র উত্তম কার্য্য,

ঙ। স পে ন্দা র ম দ সম্পূর্ণ মন (বিচার),

চ। খো র দা দ মধুরত্ব,

ছ। মু র দা দ (অ মে র দা দ) সফলতা,

জ—ঝ। আ দ র তেজোবৃদ্ধি,

ঞ। অ র্‌ দ্বী সু র (আ বা ন) শুচিতা,

ট। খো র শে দ প্রভোবোন্নতি,

ঠ। মা হ্‌ ধন-জীবন-বৃদ্ধি,

ড। তী র উদারতা প্রবৃত্তি,

ঢ। গো শ সংযম,

ণ—ত। মে হ র (মি হি র) ন্যায়,

করা হইতেছে। অবেস্তার সী রো জা হ্‌ নামক অংশে এই সমস্ত দেবতার স্তুতি আছে। এই স্তুতিগুলিকেও সী রো জা হ্‌ বলে।

(খ—ছ)। অহুর মজদার অনুচর প্রধান দূত। অবেস্তায় ইহাদের নাম যথাক্রমে বো হু-ম ন, অ ষ ব হি শ্‌ ত, খ্‌ শ থ্র ব ই র্‌, স্পে স্ত অ র্ম ই তি, হ উ র্ব তা ৎ, অ মে রে তা ৎ।

(জ—ঝ) অ গ্নি। দ ই প আ দ র, ও আ দ র উভয়কেই এখানে একত্র রাখা হইয়াছে। আ দ র, অবে আ ত র, ফারসী আ ত শ্‌, তুল=সং হু তা শ।

(ঞ)। স্বর্গীয় নদীর।

(ট)। অবে. হ্ব রে খ্‌ শ এ ত, সূর্য্য।

(ঠ)। তুল:—সং. মা স্‌, চন্দ্র।

(ড)। অবে. তি শ্‌ র্ত্র্য, তারা, বৃষ্টির অধিদেবতা।

(ণ—ত)। দ ই প মি হি র ও মি হি র একত্র ধরা হইয়াছে। মিহির=সূর্য্য।

থ। শ্রো শ আদেশ পালন,

দ। র শ্ন সত্য,

ধ। ফ্র ব র্দি ন বলবৃদ্ধি,

ন। ব হ্রা ম জয়লাভ,

প। রা ম আনন্দ,

ফ। বা দ (গ ব দ) শীঘ্রগতি,

ব-ভ। দী ন জ্ঞানসমুন্নতি,

ম। অ র্দ ধনসমৃদ্ধি,

য। অ স্তা দ্ গুণগ্রাহিতা,

র। আ স মা ন উদ্যোগ,

ল। জে ম্যা দ স্থির স্থিতি,

শ। ম হ্র স্পা ন্দ শুভদৃষ্টি, ও

ষ। অ নে রা ন্ শরীরের কান্তি প্রদান করুন।

(থ)। শ্রদ্ধা।

(দ)। সত্য।

(ধ)। অগ্নি।

(ন)। বিজয়ের অধিদেবতা।

(প)। বায়ুর অধিদেবতা।

(ফ)। বায়ু দেবতা।

(ব—ভ)। দ ই প দী ম ও দী ম উভয়কে একত্র ধরা হইয়াছে।

(ম)। অবে অ ষি ব ঙু হী, সৌভাগ্য ও ধনের অধিদেবতা।

(য)। অবে অ র্শ তা ত্, সত্য ও ন্যায়ের অধিদেবতা।

(র)। আকাশ।

(ল)। অবে, জে ম্, ফা জ মি ন, পৃথিবী।

(শ)। অবে. ম ন্ থ্ স্পে ন্ত, অহুর মজদার পবিত্র বাক্য (মন্ত্র)।

(ষ)। এ নামটি ফারসী, অবে অ ন ঘ্র, সং. অ ন গ্র. অনাদি অনন্ত অসীম স্থান বা আলোক।

অনন্তর যস্নের দুইটি মন্ত্রের দ্বারা আশীর্ব্বাদ করা হয় :—

২৩। হে কল্যাণ, কল্যাণ হইতে কল্যাণতর তোমার হউক যাহার জন্য নিজে তুমি যোগ্য হইয়াছ। তুমি সেই পুরস্কারের যোগ্য হও, হোতা যাহার যোগ্য হইয়াছেন,—যে হোতা যাহা সুচিন্তা তাহাই প্রায় চিন্তা করেন, যাহা সুভাষিত তাহাই বলেন এবং যাহা সুকৃত তাহাই করেন।[৮]

২৪—২৫। কল্যাণ হইতেও কল্যাণতর তোমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। পাপ হইতে পাপতর (অথবা দুঃখ হইতে দুঃখতর) তোমাদিগকে যেন প্রাপ্ত না হয়।

আমাকেও যেন পাপ হইতে পাপতর না হয়।[৯]

ইহার পরে আবার বলা হয় :—

২৬। হে কল্যাণ, কল্যাণ হইতে কল্যাণতর তোমার হউক।

তোমার আত্মীয়েরা যে পুরস্কারের যোগ্য তুমি তাহার যোগ্য হও।

তুমি সৎচিন্তা, সৎবাক্য, ও সৎকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের সহিত সেই পুরস্কার লাভ কর।

২৭। তোমরা শ্রেষ্ঠ পবিত্রাকে প্রাপ্ত হও।
হীনতর পাপকে তোমরা যেন প্রাপ্ত না হও।

২৮। আমরাও যেন হীনতর পাপকে প্রাপ্ত না হই।

২৯। এইরূপ হউক।

৩০। প্রার্থনীয় অর্য্যমা[১০] জরথুশ্‌ত্রের নর-নারীগণের প্রমোদের জন্য আগমন করুন, ধর্ম্ম যাহাতে অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারে। আমি সত্যের অভিলষণীয় ফলের[১১] জন্য প্রার্থনা করি, অহুর মজদা তাহা প্রদান করুন।[১২]

৮,৯। যস্ন, ৫৯, ৩০-৩১। ভাদ্র সংখ্যায় পা র সী ক প্র স ঙ্গ দেখুন।

১০। সুখশান্তির অধিদেবতা।

১১। অথবা 'পবিত্রতার'।

১২। ইহাও যস্নের (৫৪,১) মন্ত্র। ভাদ্র সংখ্যায় পা র সী ক প্র স ঙ্গ দেখুন।

ইহার পর একবার অ ষে ম্ বো হূ (বৈশাখ, ১৩২৭, পৃ.২) স্বস্তি-বাচন পাঠ করিয়া আবার নিম্নলিখিত আশীর্ব্বাদ করা হয়ঃ—

৩১। ইহার শুদ্ধি ও শ্রী হউক।

স্বাস্থ্য হউক।

শরীরের পুষ্টি হউক।

শরীরের বিজয় হউক।

অতি উজ্জ্বল ধন হউক।

স্বাভাবিক শীল-সম্পন্ন পুত্র হউক।

দীর্ঘ দীর্ঘতর জীবন হউক।

ধার্ম্মিকগণের সমুজ্জ্বল ও বিশ্ব উদ্ভাসক জীবন ইহার হউক।[১০]

এইরূপ হউক।

৩৩। পূর্ব্বে যেমন অহুর মজদার নামে তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে আশীর্ব্বাদ করা হইত আমিও সেইরূপ তোমার সম্মুখে অমুক স্থানে (যেখানে বিবাহ হয়) তাহা করিতেছি।

৩৪। ক ঈ খু স্রো ঈ র[১১] ন্যায় তোমরা ভাগ্যবান হও।

মি হিরে র * ন্যায় দয়াশীল হও।

জ রী রে র ন্যায় শত্রুর জেতা হও।

সী য়া ব ক্ ষে র ন্যায় সুদৃষ্টি হও।

বে জ নে র ন্যায় প্রভাযুক্ত হও।

শা হ গু শ্ তা স্ পে র ন্যায় পবিত্র হও।

ন রী মা নে র পুত্র সা মে র ন্যায় বলবান্ হও।

১০। ইহাও যস্নের (৬৮,১১) মন্ত্রের ভাব গ্রহণ করিয়া বলা হইয়া থাকে। ভাদ্রের পা র সী ক প্র স ঙ্গ দেখুন।

১১। এই সমস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ ইরানের প্রসিদ্ধ রাজা বা রাজপুত্র অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, এবং কেহ কেহ বা বিশেষ-বিশেষ যজনীয় দেবতা। দেবতার নামগুলিতে (*) চিহ্ন দেওয়া হইল।

ক্র স্ ত মে র ন্যায় যুদ্ধকলায় পটু হও।

অ স্ প ন্দি য়া রে র ন্যায় ভল্লক্ষেপণ-কলায় পটু হও।

জা মা স্ পে র ন্যায় ধর্ম্মের সাহায্যকারী হও।

মুক্তাত্মাদের ন্যায় প্রভাযুক্ত হও।

অ র্দা ঈ ফ্র ব র্দে র * ন্যায় সমুন্নত হও।

তি শ্ ত রে র * ন্যায় দানশীল হও।

বৃষ্টির ন্যায় সরস হও।

খু র শে দে র * ন্যায় সর্ব্বদর্শী হও।

জ র থু শ্ ত্রে র ন্যায় পুণ্যশালী হও।

জ র্ব নে র (কালের) ন্যায় দীর্ঘায়ু হও।

স্পে দ র্ ম দে র * ভূমির ন্যায় ফলবান্ হও।

নাব্য[১২] নদীসমূহের ন্যায় বহুজনের সহিত সম্বদ্ধ হও।

শীত[১৩] ঋতুর ন্যায় বহুসংগ্রহকারী হও।

বসন্ত ঋতুর ন্যায় প্রমুদিত হও।

কস্তূরীর ন্যায় সুগন্ধ যুক্ত হও।

স্বর্ণের ন্যায় প্রখ্যাত হও।

স্বর্ণমুদ্রার (দানক) ন্যায় সকলের জ্ঞাত হও।

স্বকীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে হোর্মজদের ন্যায় উত্তম কার্য্য কর।

৩৫। এই সমস্ত আশীর্ব্বাদ তোমাদের সফল হউক। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, অগ্নি, এবং মদ্য, কস্তূরী, চামেলী, জুঁই ও গোলাপ ফুলের সৌরভ তোমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হউক।

৩৬। অমুক বর ও অমুক কন্যার সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু হউক। অ স্প র ম[১৪] ও অ ম্ব র[১৫] যেমন সুরভি ও সুন্দর তোমরাও সেইরূপ সুখী ও প্রফুল্ল হও।

১২। যে নদীতে নৌকা চলিতে পারে তাহা নাব্য।

১৩। নে র্যো স ঙ্গ বলেন 'শরৎ'। ১৪, ১৫। ?

তোমাদের পুত্র সন্তান হউক, যে ইরানকে রক্ষা করিতে পারে, নাম রক্ষা করিতে পারে, এবং শত্রুকে সংহার করিতে পারে। বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

৩৭। শান্তি।[১৬]

শ্রীবি[illegible]শখর ভট্টাচার্য্য।

কোড়াজাতি

আশ্রমের চারিপাশের গ্রামে কোড়া নামে এক আদিম জাতি বাস করে। মাটি-কাটার কাজে আশ্রমে তারা প্রায়-ই আসে। গোয়ালপাড়ার (আশ্রম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে) কাছে সামাইদ নামে ছোট একটি পল্লী, তালতোড়, কোপাই নদীর ধারে খেজুরডাঙ্গা, কোপাই ষ্টেশনের কাছে কন্দরপুর, বোলপুরের নিকটবর্ত্তী মুলুক, ও বিনুর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। কোপাইয়ের ধারের সামাইদ গাঁয়ে ১৪ ঘর কোড়ার বসতি।

কোড়া একটা Tribal নাম কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। ইহারা আপনাদিগকে কুর্ম্মী কোঁড়া বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের বিশ্বাস যে মাটি কোড়ে বা খোঁড়ে বলিয়া ইহাদের নাম কোড়া। ইহাই এদের জাত-ব্যবসায়। পুকুর প্রতিষ্ঠা ইহারা না খুঁড়িলে হইতে পারে না; কিন্তু এখন আরও অনেক জাতে এই কাজ করিতেছে বলিয়া ইহাদের দুঃখ। রিস্‌লী সাহেব বলেন ইহারা এককালে ছোটনাগপুর অঞ্চলে চাষ-বাস করিত, পরে কোনো কারণে ইহারা সে কাজ হইতে সরিয়া গিয়া মাটি কাটা কাজে লাগে।

১৬। এই প্রবন্ধটি প্রধানত এই সকল পুস্তকের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে—নের্যোসঙ্ঘ-কৃত অবেস্তার সংস্কৃত অনুবাদ (খুর্দ-অবস্তার্থ, পৃ.৪৩-৪৭); আশীর্ব্বাদ (মুল পাজন্দ, গুজরাটী, সংস্কৃত ও ইংরাজী অনুবাদ), জামাশজী হোরমস্‌জী অরজানী, বোম্বাই; D.F.Karka: History of Parsis Vol. I.

ইহাদের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে বাঙলাদেশের আদিম অধিবাসীদের ন্যায়। সাঁওতাল, ডোম, হাড়ি, কাহার, কুর্মীদের দেহের উপাদানে ইহাদের ও দেহ গঠিত, তবে বাঙলাদেশে বাস করিয়া ও বাঙালী হইবার চেষ্টার ফলে চেহারার মধ্যে বাঙালীর "অলস দেহ ক্লান্তগতি গৃহের প্রতিটান" গোছ চেহারা হইয়াছে। মেয়েদের দেখিলে মনে হয় বুনোদের সহিত সাদৃশ্য আছে। তাহারা সাঁওতালী ছাঁচে আদৌ গড়া নয়, সাঁওতালী মেয়েদের হাস্যোজ্জ্বল, সুস্থ-সবল, নির্ভীক চেহারা ইহাদের মধ্যে দুর্লভ।

কোড়াদের ভাষা বাঙলা নহে; অথচ তাদের ছেলে মেয়ে সকলেই বাঙলা বলে ও বোঝে। এদের ভাষার যে নমুনা সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সঙ্গে সাঁওতালী খুব মেলে। কেবল যে ভাষায় শব্দের দ্বারা এই মিল দেখা যায় তা নয়, ব্যাকরণও অনেকটা মেলে। অথচ বাংলা ভাষার অনেক কথা তাদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভাষা সম্বন্ধে এ পত্রিকায় ভবিষ্যতের কোনো এক সংখ্যায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে। ভাষা হইতে মনে হয় ইহারা Mundari Race-এর অন্তর্গত সাঁওতালদেরই একটা শাখা।

কোড়াদের নাম বাঙালীদেরই মত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি পুরুষ ও স্ত্রীর নাম দিতেছি :—

পুরুষের নাম	স্ত্রীলোকের নাম
বাগিলি, ক্ষেতু	সান্ধপুরী, জলদা
যোগিন্দ, বিষণ	ফুলমণি, গরবী
অটল, ধরম	নির্ম্মল

উল্লিখিত নামগুলির মধ্যে সান্ধপুরী ও বাগিলি নামটা অদ্ভুদ রকমের। তবে বাগাল নাম সচরাচর দেখা যায়— গোয়ালদের মধ্যেও এ নাম আছে। সাঁওতালদের মধ্যে লদ্‌কা, সোগ্‌লা, প্রভৃতি আদিম নামের প্রচলন এখন পর্য্যন্ত অধিক; তবে গণেশ, রামা প্রভৃতি নামও দেখা যায়। কোড়াদের মধ্যে আদিম নাম পাওয়া যায় নাই।

রিস্‌লী সাহেব বলেন, কোড়াদের আদিম বাসস্থান ছোটনাগপুরে; এখানকার কোড়াদের মধ্যে কাহারও কাহারও স্মরণ হয় যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জামতাড়ার নিকটস্থ লোনা নামক এক স্থান হইতে আসিয়াছিল। জামতাড়ায় এখনো ইহাদেরই বাস অধিক।

আদিম বা Animist দের মধ্যে আমাদের ন্যায় গোত্র আছে। ইংরাজীতে ইহাকে Totem বলে। যাহাদের যাহা Totem তাহাদের তাহা মারিতে, আহার করিতে, বা ভাঙ্গিতে নাই। রিস্‌লী সাহেব তাঁহার বইএ (The People of India, p. 96) কোড়াদের যে কয়টি গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দিতেছি।

নাম	Totem
কাশ্যপ	কচ্ছপ
সৌলা	সালমাছ
কাসিবক	বক
হাঁসদ	বুনোহাস
বুত্‌কু	শূয়র
সান্‌পু	বৃষ

আমরা এখানকার স্থানীয় কোড়াদের নিকট হইতে যে গুলি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা এই :—(১) কাউরী, (২) সামাড় বা সাছঁ, (৩) হরস্ব, (৪) শূক্‌রী, (৫) হ্যাম্‌ডোম্ বা মেরোম্, (৬) তাম্‌গাড়ী, (৭) কাহু। এই সব গোত্রের বা 'গত্তর'-এর আবার বাঙলা সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের গোত্র আছে শুনিয়া অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিলে বলিল 'গত্তর' না থাকিলে চলিবে কেন? তাদের মধ্যে এগুলির বাঙলা সংস্করণ চালাইবার ইচ্ছা প্রবল। কেন না 'গত্তর' জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ প্রভৃতির নামই উল্লেখ করে এবং এগুলির কোড়া প্রতিশব্দ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সামাড় গোত্রের বাঙলা শাণ্ডিল্য ও হরস্ব গোত্রের কাশ্যপ, শূক্‌রীকে স্বগোত্র বা স্বগত্তর করিবা চেষ্টা দেখা যায়।

হ্যামডোম্‌দের সুপারী খাওয়া নিষেধ, সেইটা তাহাদের Totem। অপরদের সুপারী সম্বন্ধে কোনো নিষেধ নাই, অন্য কিছু সম্বন্ধে আছে কিনা তাহা এখনও বলিতে পারি না। সগোত্রে বিবাহ ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ।

বিবাহ সম্বন্ধে ইহাদের রীতিনীতি অনেকটা সাধারণ নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের সঙ্গে মেলে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে রিস্‌লী সাহেব বাঙ্‌লাদেশের Cast & Tribes সম্বন্ধে আলোচনা কালে লিখিয়াছেন যে, কোড়াদের মধ্যে বিবাহ অধিক বয়সে হয়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে নীতির আদর্শ খুব উচ্চ নয় এবং বিবাহাদি সময়ে ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রথা নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে বীরভূমের কোড়াদের মধ্যে মেয়ের বিবাহের বয়স কমিয়া ৮।১০এ দাঁড়াইয়াছে, এমন কি ৪।৫ বছরের বালিকা বধূর অভাব নাই। পুরুষদের বিবাহ সাধারণত ২০ বৎসর বয়সে হয়। অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া, অখাদ্য না খাওয়া, পঙক্তি বিচার করা ও বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম্মে ব্রাহ্মণ-নিয়োজন ইহাদের কৌলীন্যের মাপ কাঠি হইতেছে। বীরভূমের কোড়াদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে বয়স কমাইবার রীতি দেখা দিয়াছে। দিন-দেখা ও লগ্ন-মানার সূত্রপাত হইয়াছে। বিবাহের জন্য তাহারা ব্রাহ্মণদের কাছ হইতে দিন ক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লয়; কিন্তু তাঁহারা পঞ্জিকানুসারে দিন লগ্ন ঠিক করেন কিনা তাহা সঠিক বলিতে পারি না। তবে ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করিবার প্রথা এদেশে দেখা দিয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে রিস্‌লী সাহেব ইহা লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে মাঘ ও ফাল্গুন মাসেই বিবাহ প্রসিদ্ধ; অন্যান্য মাসে নিষিদ্ধ। ইহার কারণ তাহারা এই বলে যে, ধান কাটার পর পয়সা হয় সেই পয়সা দিয়ে মদ কিনিতে পারা যায় ও তাহাতেই বিবাহ সম্ভব। সেইজন্য মাঘ-ফাল্গুন এই দুইমাসে হাতে যখন পয়সা থাকে তখন নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের মরসুম পড়িয়া যায়। ইহা হইতেছে কোড়া ও মুসাহারদের নিজেদের ব্যাখ্যা।

ছোট বেলায় বিবাহ হয় বলিয়া বরের বড় ভাই বা মা কনে দেখিতে যায়। ইহাদিগকে কন্যার জন্য ১৫৲।২০৲ টাকা দিতে হয়। পাঁচ গ্রামের কোড়া পুরুষ ও স্ত্রী মিলিত হয়ে মদ, মাংস ও ভাত খাওয়া বিবাহের প্রধান অঙ্গ হইতেছে। বর-

যাত্রীরা যখন কনের বাড়ীতে উপস্থিত হয় তার পূর্ব্ব হইতেই কন্যাপক্ষের স্ত্রীপুরুষে বাড় হইয়া নাচিতে থাকে। বিবাহের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান নাই, দুইচারি জন মুরুব্বি একত্র হয়ে মেয়েকে ছেলের কাছে দেওয়া হলো এইটা দেখে। ইহাদের বিবাহে কোনো মন্ত্র বা পূজা নাই ; ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরও কোনো প্রয়োজন হয় না। বর শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কন্যার ভাই একথানা থালা লইয়া উপস্থিত হয় ও বরের পা ধোয়াইয়া তাহাকে ঘরে তুলিয়া লয়। এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

নাগার্জ্জুনের ঈশ্বরখণ্ডন

তিব্বতীয় গ্রন্থমালার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত পংক্তি কয়টি পাওয়া যায়। তিব্বতী-ভাষায় ইহার অনুবাদও আছে। * শেষ পঙ্‌ক্তিতে লিখিত আছে মূলের রচয়িতা নাগার্জ্জুন। নিম্নে আমরা মূল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

মূল

ঈশ্বরকর্তৃত্বনিরাকৃতি-বিষ্ণোরেককর্তৃত্বনিরাকরণং নাম।

গুরোঃ পদাম্বুজং নত্বা বজ্রসত্ত্বং চ ভক্তিতঃ।

স্বশিষ্যপ্রতিবোধার্থং কৃপয়া লিখ্যতে ময়া ॥

অস্তি পুনরীশ্বরঃ কর্ত্তা, স এব বিচার্য্যতাম্।

যঃ করোতি স কর্ত্তা। যঃ ক্রিয়াং করোতি স কর্তৃসংজ্ঞো ভবতি।

---

* মূল সংস্কৃত ও তিব্বতীয় অনুবাদ উভয়ই F. W. Thomas সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন (J. R. A. S. 1903, p. 345)।

অত্র চ বয়ং ব্রূমঃ। কিমসৌ সিদ্ধং করোতি অসিদ্ধং বা। অত্র সিদ্ধং তাবৎ ন করোতি। সাধনাভাবাৎ। যথা সিদ্ধে পুদ্গলে পুনঃ কারণত্বং কর্তৃত্বং নাস্তি প্রাগেব সিদ্ধত্বাৎ।

অথাসিদ্ধং করোতি চেৎ। বালুকাতৈলমসিদ্ধম্। কূর্ম্মলোমাদিকমসিদ্ধম্। এতদেব করোতু। পুনরত্র কর্তৃত্বং ন শক্নোতি। কুতঃ। অসিদ্ধত্বভাবাৎ। এবমসৌ।

অথ সিদ্ধাসিদ্ধং করোতি। তদপি ন ঘটতে। পরস্পরবিরোধাৎ। যঃ সিদ্ধঃ স সিদ্ধ এব, যোঽসিদ্ধঃ স এবাসিদ্ধঃ। এবং তদনয়োঃ পরস্পরবিরোধঃ স্যাদেব। যথা চালোকান্ধকারযোর্জীবনমরণযোরিব। অথ যত্রালোকা বিদ্যতে তত্রান্ধকারো নাস্তি। যত্রান্ধকারস্তত্রালোকো নাস্ত্যেব। যো হি জীবতি স জীবত্যেব, যো মৃতো মৃত এব সঃ। অতএব সিদ্ধাসিদ্ধযোরেকত্রাভাবাৎ ঈশ্বরস্য কর্তৃত্বং নাস্ত্যেবেতি মতম্।

কিং চ অপরমপি দূষণং স্যাৎ। কিং স্বয়মুৎপন্ন পরান্ করোতি, অনুৎপন্নো বা। অনুৎপন্ন চ স্বয়ং তাবদপরান্ কর্তুং ন শক্নোতি। কুতঃ। স্বয়মেবানুৎপন্নরূপত্বাৎ। যথানুৎপন্নস্য বন্ধ্যাতনয়স্য কুদ্দাল-পাতনাদি-ক্রিয়া ন প্রবর্ত্ততে। তথেশ্বরস্যাপি।

অথ চ স্বয়মুৎপন্ন পরান্ করোতি। তদা কস্মাদুৎপন্নঃ। কিং স্বতঃ কিং পরতঃ। উভয়তো বা। অত্র স্বতস্তাবন্ নোৎপন্ন স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। ন হি খরতরকরপালধারা স্বমাত্মানং ছেত্তুং সমর্থা ভবতি। ন হি সুশিক্ষিতোপি নটবটুঃ স্বকীয়ং স্কন্ধমারুহ্য নর্ত্তিতুং শক্নোতি। কিং চ স্বয়মেব জন্যঃ স্বয়মেব জনক ইতি। ইত্যেবং দৃষ্টমিষ্টং বা। স্বয়মেব পিতা স্বয়মেব পুত্র ইতি। নৈব বাদো লোকপ্রসিদ্ধঃ।

অথ ভবতু পরতঃ। এব মপি ন ঘটতে। যাবতেশ্বরস্য ব্যতিরেকেণ পরস্যাভাবাৎ। অথ পারম্পর্য্যাদ্ ভবতু। এবং চ পরতোপ্যনবস্থাপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অনাদিরূপত্বাৎ। স্বতো যস্যাদেরভাবস্তস্যাবসানস্য দূষণমভাব

এব। বীজস্যাভাবে অঙ্কুরদণ্ডশাখাপত্রপুষ্পফলাদীনামভাবো ভবিতি। কুতঃ। বীজস্যাভাবাৎ।

নোভয়তঃ। উভয়দোষদুষ্টত্বাৎ। তস্মাদসিদ্ধঃ কর্ত্তা। ইতীশ্বরকর্তৃত্ব-নিরাকৃতির্বিষ্ণোরেককর্তৃত্বনিরাকরণং সমাপ্তমিতি।

কৃতিরিয়মাচার্য্যশ্রীনাগার্জ্জুনপাদানামিতি।

অনুবাদ

ঈশ্বরের কর্তৃত্বের ও বিষ্ণুর একমাত্র কর্তৃত্বের নিরাকরণ।

গুরুর পদাম্বুজ ও বজ্রসত্ত্বকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সুশিষ্যগণের প্রবোধের জন্য দয়া করিয়া আমি ইহা লিখিতেছি।

আচ্ছা, ঈশ্বর আছেন এবং তিনি কর্ত্তা, ইঁহাকে বিচার করা হউক।

যে করে সে কর্ত্তা, যে ক্রিয়া করে তাহার "কর্ত্তা" এই সংজ্ঞা হয়। এখানে আমরা বলি, উনি (কর্ত্তা) সিদ্ধ বস্তু করেন, না অসিদ্ধ বস্তু করেন?

সিদ্ধ বস্তু তিনি করিতে পারেন না, কেননা সাধন নাই; যেমন কোনো সিদ্ধ (পূর্ব্বোৎপন্ন) জীবের (বা স্থূল পদার্থের)[১] আবার উৎপত্তির কোনো কারণ বা কর্ত্তা থাকে না, কেনন্যা তাহা যে পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ থাকে।

আর যদি কর্ত্তা অসিদ্ধই বস্তু করেন?

বালুকার তৈল, কূর্ম্মের লোম, ইহারা অসিদ্ধ; ইহাকেই তিনি করুন! কিন্তু এখানে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কেননা ঐ সকল পদার্থ যে অসিদ্ধ। ঈশ্বরেরও সম্বন্ধে এইরূপ।

আর যদি কর্ত্তা এমন বস্তু করেন যাহা সিদ্ধাসিদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ উভয়ই?

১। "পুদ্গল," এই শব্দ 'জীব' অর্থেও প্রযুক্ত হয় তা ছাড়া জৈন শাস্ত্রে রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শ-যুক্ত দ্রব্যকেও পুদ্গল বলা হয়। ইহা দুই প্রকার, পরমাণু ও স্কন্ধ। স্কন্ধ শব্দের অর্থ সমূহ, রাশি, পুঞ্জ। এখানে পরমাণুপুঞ্জরূপ স্কন্ধ অর্থাৎ স্থূল পদার্থ বুঝাইতে এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়, জীব অর্থও ধরিতে পারা যায়।

ইহাও হইতে পারে না, কেননা, ইহাতে পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে ; যাহা সিদ্ধ তাহা সিদ্ধই, আর যাহা অসিদ্ধ তাহা অসিদ্ধই। এইরকমে সিদ্ধ ও অসিদ্ধের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকিবেই ; আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, জীবন আর মরণের ন্যায় ; যেথানে আলোক থাকে সেথানে অন্ধকার থাকে না ; আর যেথানে অন্ধকার থাকে সেথানে আলোক থাকে না। যে জীবিত সে জীবিতই থাকে, আর যে মৃত সে মৃতই। অতএব সিদ্ধ-অসিদ্ধ একত্র থাকিতে পারে না বলিয়া ঈশ্বর তাহার কর্ত্তা হইতে পারেন না ইহাই মনে হয়।

অন্য দোষও হইতে পারে। কর্ত্তা নিজে উৎপন্ন হইয়া অন্যকে (উৎপাদন) করেন, না অনুৎপন্ন হইয়া? নিজে অনুৎপন্ন থাকিয়া ত অন্যকে (উৎপাদন) করিতে পারেন না, কেননা তিনি যে নিজেই অনুৎপন্ন থাকিলেন। যেমন অনুৎপন্ন বন্ধ্যাপুত্রের কোদাল চালান প্রভৃতি কোনো কাজ হয় না। ঈশ্বরেরও সম্বন্ধে এইরূপ।

আর যদি তিনি (কর্ত্তা) নিজে উৎপন্ন হইয়া অন্যকে করেন?

তবে তিনি কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? নিজ হইতে, অন্য হইতে, অথবা (নিজ ও অন্য এই) উভয়ই হইতে? এথানে নিজে তিনি নিজ হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন না, কেননা নিজেতে নিজের ক্রিয়ার বিরোধ হয়, যেমন খরতর কৃপাণ ধারা নিজেই নিজেকে ছেদন করিত পারে না, সুশিক্ষিত হইলেও নটশিশু নিজের ঘাড়ে চাপিয়া নাচিতে পারে না। আরো, নিজেই জনক আর নিজেই জন্য! ইহা কেহ দেথিয়াছে, না কাহারো অভিমত হয়? নিজে পিতা আর নিজেই পুত্র! এ কথা ত লোকে প্রসিদ্ধ নাই।

আচ্ছা, কর্ত্তা অন্য হইতেই উৎপন্ন হউন।

এরূপেও ইহা ঘটে না। কেননা, (যে ঈশ্বর স্বীকার করে তাহার মতে) ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহ নাই।

আর যদি পরম্পরাক্রমে ইহা হয়, (অর্থাৎ ঈশ্বরের অতিরিক্ত একজন কেহ ঈশ্বরকে করিয়াছে, ঈশ্বর অন্য সকলকে করিয়াছেন এইরূপ হয়, এবং "এই-

রূপেই বলা যায় যে, ঈশ্বর অন্য হইতে হইয়াছেন), তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হয়,—(যে ঈশ্বরকে করিয়াছেন তাঁহাকে কে করিল, তাঁহাকেও অন্য কেহ করিয়া থাকিলে তাঁহার কর্ত্তাকে কে করিল, এইরূপে কোথাও বিশ্রাম করিতে পারা যায় না), কেননা এ ব্যাপার অনাদি ইহার আদি নাই। আরো একটা এই দোষ যে, যাহার বস্তুত আদি নাই, তাহার শেষ ফলও থাকে না।[২] বীজের অভাবে অঙ্কুর, দণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ও ফল প্রভৃতির অভাব হয়। কেননা বীজেরই যে অভাব।

উভয় (অর্থাৎ নিজ ও অন্য) হইতে তিনি উৎপন্ন হন, ইহাও বলিতে পারা যায় না, কেননা নিজ হইতে ও অন্য হইতে উৎপত্তি হইলে যে দোষ হয়, এ পক্ষেও সে দোষ হইয়া থাকে। অতএব কর্ত্তা অসিদ্ধ (অপ্রমাণ)।

ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের ও বিষ্ণুর একমাত্র কর্ত্তৃত্বের নিরাকরণ সমাপ্ত।

ইহা আচার্য্য শ্রী নাগার্জ্জুনপাদের করা।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

২। "সতো যস্যাদেরভাবস্তস্যাবসানস্য দূষণমভাব এব" এ পঙ্‌ক্তিটি আমার নিকট সুস্পষ্ট নহে। মনে হয় এখানে ইহাই বলা হইতেছে যে, আদি একটা কিছু না থাকিলে তাহার শেষ ফল বা পরিণাম থাকিতে পারে না, যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুরাদি থাকিতে পারে না।

মালবকোশ

(মালকৌঁস)

ইহার আসল নাম মা ল ব কো শ। মা ল কোঁ স ইহার অপভ্রংশ। ওকারটা সানুনাসিক হইয়াছে, আর সংস্কৃত 'শ' হিন্দীতে 'স' হয়, যেমন 'যশোদা' হিন্দীতে 'যসোদা'।

এই রাগের উৎপত্তিস্থান মালব দেশ। ইহাতে ঋষভ ও পঞ্চম ছাড়া পাঁচটি মাত্র স্বর থাকে, অতএব ইহা ওড়ব-জাতীব রাগ।

এই রাগের জীবন অর্থাৎ প্রধান স্বব মধ্যম। মধ্যম না থাকিলে ইহার স্বরূপ স্পষ্ট বোঝা যায় না।

এই রাগে মধ্যম বাদী স্বর, রে পা বিবাদী, ধা অনুবাদী, গ ও নি বিসংবাদী। যে রাগে যে স্বর বেশী ব্যবহৃত হয় তাহাকে সঙ্গীত শাস্ত্রে বা দী বলে। যে স্বর একেবারে বর্জ্জিত হয়, তাহা বি বা দী অর্থাৎ শক্র, যে স্বর বাদী অপেক্ষা কম ব্যবহৃত হয় তাহাকে সং বা দী বলা হয়। যথা—

"মিথঃ সংবাদিনৌ তৌ স্তঃ সপৌ স্যাতাং পসৌ তথা।
ন বাদী ন চ সংবাদী ন বিবাদ্যপি যঃ স্বরঃ।
সোঽনুবাদীতি বিজ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা বিচক্ষণৈঃ॥
রক্তিবিচ্ছেদহেতুত্বং যস্মিন্ রাগে তু যস্য তু।
তদ্রাগস্থস্বরৈস্তস্য বিবাদিত্বং ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
তস্যামাত্যস্তু সংবাদী বাদিনো রাজসংজ্ঞিনঃ।
ভৃত্যাতুল্যানুবাদী স্যাদ্ বিবাদী শত্রুবদ্ ভবেৎ॥

সঙ্গীতপারিজাত, শ্লোক ৮১—৮৪।

'সা পা এবং পা সা পরস্পর কখনো বিরোধী হয় না। যে স্বর বাদীও নহে কিংবা বিবাদীও নহে তাহাকে বলে অনুবাদী, বিচক্ষণেরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিদ্বারা এইরূপ স্থির করিয়াছেন। যে রাগে যে স্বর প্রধান রাগস্বরকে নাশ করে সেই রাগের সেই স্বর বিবাদী হয় ইহা ধ্রুব সত্য। 'যে রাগের যে রাজবৎ প্রধান স্বরকে অন্য স্বর মন্ত্রীর ন্যায় অনুসরণ করে তাহা সংবাদী। অনুবাদী স্বর ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ এবং বিবাদী স্বর শত্রুবৎ।'

মালকোঁস রাত্রি ১২ ঘটিকার পর গীত হয়। প্রায় সমস্ত উ ত্ত র রাগ অর্থাৎ রাত্রি ১২টার পর যে সকল রাগ গান করা হয় সেগুলি মধ্যম-প্রধান। যথা—

হিন্দোল—সা, গা, হ্মা, ধা, নি।

পরজ—সা, ঋ, গা, মা হ্মা, পা, দা, নি।

সোহিনী—সা, ঋ, গা, মা, পা, দা, নি।

ললিত—সা, ঋ, গা, মা, হ্মা, দা, নি।

শঙ্করাভরণ—সা, রে, গা, মা, হ্মা, পা ধা, নি।

যে সকল রাগে অদ্ভুত বীর বা করুণ মিশ্রিত গাম্ভীর্য্য থাকে, বা যে সকল রাগ ভয়ানক রস-প্রধান তাহাদের মধ্যে মধ্যমের প্রাধান্য থাকে। যথা—

"তীব্রো বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে হাস্যে তীব্রতরঃ স্বরঃ।
তীব্রতরোঽপি শৃঙ্গারে রসে মধ্যম ঈরিতঃ॥
তীব্রতমশ্চ শৃঙ্গারে মৃদুলো হাস্যকে রসে।"

সঙ্গীতপারিজাত, শ্লোক ৯৫—৯৬।

উদাহরণ যথা—

II মা । মা মা। মজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা মা। -সা -। I জ্ঞা মা
আ ০ য় ন ক হে গ য় ০ ০ আ জ

দা দা। দা -মা। না -দা। -মা । II
হু ন আ ০ য়ে ০ ০ ০

বাংলা গীত হইতেও এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করা যায়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত দুইটি গান ইহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে। রাগিণী পরজ।

II দা না না। র্সা -না। র্সা -ঋা -া I র্সা না দা।
গ ভী র র ০ জ নী ০ না মি ল

পা -ক্ষা। পা -দা -া I পা -ক্ষা গা। গা -ক্ষা। দা পা
হৃ ০ দ য়ে ০ আ র কো লা ০ হ ল

-ক্ষা I গা -া -া। -ঋা -া। সা -া -া I সা সা মা।
০ না ০ ০ ০ ০ হ ০ ০ র হি র

মা -া। মা মা -া II
হি ০ ০ ০ ০

(২) আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে রাগ মালকোঁস্।

মা II সা ণা ঋা। সা -ণ্া। দ্া ণ্া I সা সা মা।
আ ন ০ ন্দ ধা ০ রা ০ ব হি ছে

মা মা। মা -া II
ভু ব নে ০

উদ্ধৃত হিন্দী ও বাংলা গান হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উক্ত রাগগুলি সমস্তই মধ্যম প্রধান এবং ইহাতে করুণরসমিশ্রিত গাম্ভীর্য্যের প্রাধান্য রহিয়াছে।

শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী

একটা পুরাণ গীত

আমাদের দেশের পূর্ব্বকালের কবিদিগের গানের ধাঁচা এবং পরবর্ত্তি-কালের কবিদিগের গানের ধাঁচার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই বিষয়টিতে আমাদের দেশের সহৃদয় পাঠকদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিবার জন্য আমি একটি সেকালের বিরহ-সঙ্গীতের নমুনা দেখাইব।

নিধুর টপ্পা শুনিলে পূর্ব্বতন শতাব্দীর বৈঠকখানার বাবুদিগের মুখে লাল গড়াইত এটা ঠিক, কিন্তু তাহা শুনিলে যে-সকল ভাবুক ব্যক্তিরা প্রকৃতির অকৃত্রিম-রস-মাধুর্য্যের কাঙাল তাঁহাদের গায়ে জ্বর আসে। কবি রামপ্রসাদ আপিসের খাতায় কবিতার আঁচড় কাটিতেন, তাহা তাঁহাকে শোভা পাইয়া-ছিল এইজন্য, যেহেতু তাঁহার হৃদয়ের উৎস ভক্তিরসের অক্ষয় ভাণ্ডার ছিল। কিন্তু তাঁহার দেখা-দেখি নিধু বাবু আপনার কবিত্বের গৌরব-মাহাত্ম্য বলবৎ করিবার জন্য আপিসের হিসাবের খাতায় টপ্পা লিখিতেন। আসলে নকলে যে কি প্রভেদ তাহা যদি তিনি বুঝিতেন তাহা হইলে অমন ধারা একটা বেসুরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি আপনার হস্তকে কলঙ্কিত করিতে লজ্জা বোধ করি-তেন সন্দেহ নাই।

যে বিরহ-গীতের নমুনা দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছি তাহা এই :—

সুধীর ধারা বহিছে এই, ঘোরতর রজনী,
এ সময়ে প্রাণনাথ রে কোথায় গুণমণি,
ঘন গরজে ঘন শুনি।

ময়ূর ময়ূরী হরষিত হেরি চাতক চাতকিনী ॥
কদম্ব কেতকী চম্পক যূতি সেঁউতি শেফালিকে,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জনমায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে ॥
বিদ্যুৎ খদ্যোৎজ্যোতি দিবামত চমকে দিনমণি।
এ সময়ে প্রাণনাথ রে কোথায় গুণমণি ॥

কি চমৎকার ঐকতানিক রসমাধুর্য্য! কবিতা যাহাকে বলে! এরূপ কবিতার জুড়ি মেলা ভার। ইহার মধ্যে ঐকতানিক সৌসামঞ্জস্য প্রতি ছত্রের গায়ে মাথানো রহিয়াছে কি যে চমৎকার, এরূপ আমি আর কোথাও দেখি নাই। ইংরাজি lyricএ তো নহেই—কোনো কবিতা পুস্তকে কোনোস্থানেই দেখি নাই।

প্রথম ঐকতানিক সৌসামঞ্জস্য—"সুধীর ধারার" সঙ্গে "ঘোরতর রজনী"র প্রশান্ত মাধুর্য্যের কি চমৎকার মিল! ধারার সঙ্গে সুধীর কথা সচরাচর কবিরা ব্যবহার করেন না, কিন্তু এ জায়গাটিতে উহা কেমন চমৎকার খাপ খাইয়াছে, যাঁহার একটু রসবোধ আছে তাঁহার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

দ্বিতীয় সৌসামঞ্জস্য—"এ সময়ে প্রাণনাথ রে কোথায় গুণমণি" এই কথাটির অব্যবহিত পরেই "ঘন গরজে ঘন শুনি" এই দুইটি চরণ পরস্পরের ভাবের পোষকতা করিতেছে কিরূপ চমৎকার! শেষোক্ত চরণটি পূর্ব্বোক্ত চরণের বিরহ-বেদনায় কিরূপ আহুতি দিতেছে চমৎকার, শুনিবামাত্র তাহা ভাবুক লোকের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া যায়!

তৃতীয় সৌসামঞ্জস্য—"ময়ূর ময়ূরী হরষিত হেরি চাতক চাতকিনী" এই বর্ষা-প্রণয়ী পক্ষী-যুগলকে জোড়ে জোড়ে মিলানোতে বিরহ-বেদনাকে কিরূপ ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, ইহাও ভাবুক লোকের বুঝিয়া দেখিবার বিষয়।

কদম্ব কেতকী চম্পক যূতি সেঁউতি শেফালিকে,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জনমায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে ॥
বিদ্যুৎ খদ্যোৎজ্যোতি দিবামত চমকে দিনমণি।

এই তিনটি চরণে বিরহকে একেবারে শ্রোতার চক্ষের সম্মুখে দীপ্যমান করিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে।

গীতটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌসামঞ্জস্য এ যাহা আমি ভাগ ভাগ করিয়া দেখাইলাম ইহা গীতটির ভাব বুঝিবার পক্ষে কাজে লাগিতে পারে যদিচ, কিন্তু রসাস্বাদনের পক্ষে উহার বিশেষ কোনো ফলদায়কতা নাই। প্রকৃত কথা এই যে, রচয়িতার মন হইতে একটিমাত্র বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস টাট্‌কা-টাট্‌কি উদ্বেলিত হইয়া ঐ গীতটির আকারে পরিণত হইয়াছে; আর উপরের প্রদর্শিত সৌসামঞ্জস্য-গুলি সেই একটিমাত্র দীর্ঘনিশ্বাসের তিন চারিটি দমক বই আর কিছুই নহে। ইহারই নাম কবিতা! এই গানটির যদি সুর-বসাইতে হয় তবে তাহার জন্য একটি নূতন রাগিণী এবং নূতন তাল সৃষ্টি করা আবশ্যক। যথা :--

রাগিণী—বিরহ।

তাল—বর্ষারাত্রি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মানুষের আয়ু

বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে চিকিৎসা-শাস্ত্রকে দাঁড় করাইয়া রোগ-নিবারণের যে কত চেষ্টা দেশবিদেশে চলিতেছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি। জীবাণুর সহিত নানা রোগের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হওয়ায় রোগের মূলে ঘা পড়িতেছে এবং যে সকল রোগ পূর্ব্বে অনারোগ্য বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, তাহা এখন জীবাণুমূলক চিকিৎসায় সহজে আরোগ্য হইয়া যাইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে লোকে যে রকম পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিত এখন তাহা করিতেছে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার যে কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে তাহার সংখ্যাই হয় না। ইহাতে বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি অনেক মহামারীর প্রকোপ কমিয়াছে। ক্ষত-রোগে পূর্ব্বে সকল দেশেই হাজার হাজার লোক মরিত, আধুনিক শস্ত্র-চিকিৎসার গুণে এবং ক্ষত নির্বিষ করার নূতন উপায়ে এই রোগের মৃত্যু অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমেরিকা বা য়ুরোপের কোনো বড় সহরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যত লোক মরিত, তাহার সহিত এখনকার মৃত্যু-সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যাইবে মৃত্যুর হার কমার দিকেই চলিয়াছে। এ সকলি সত্য। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্র মানুষের আয়ুর পরিমাণ বাড়াইতে পারিল কিনা জানিবার জন্য কাগজপত্র খুঁজিলে বড়ই নিরাশ হইতে হয়। দেখা যায় এখনকার উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যনীতি মানুষের পরমায়ু বাড়াইতে পারে নাই। অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশ মানুষই যেমন সত্তর আশী বা নব্বুই বৎসরের মধ্যে মরিত, এখন তাহারা ঠিক সেই রকম বয়সেই মরিতেছে। এত চেষ্টা

সত্ত্বেও মানুষ কেন দেড়শত বা দুইশত বৎসর বাঁচিতেছে না, সে সম্বন্ধে সম্প্রতি কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাহারি আলোচনা করিব।

মোটামুটি বলিতে গেলে, জন্ম এবং মৃত্যুকে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। কোনো আকস্মিক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন যখন স্থায়িভাবে প্রাণীর শ্বাস রোধ করিয়া দেয়, তখনি মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কোন্ সূত্রে এই পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা বলা যায় না। কখনো বাহিরের আঘাত, কখনো পীড়া বা বিষ ইহার সূত্রপাত করিয়া দেয়। কাজেই বলিতে হয়, প্রাণীর স্বাভাবিক মৃত্যু নাই,—সকল মৃত্যুই আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে উৎপন্ন হয়। কয়েক জন বৈজ্ঞানিক এই কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং সকল রকম আঘাত ও পীড়ার বিষ হইতে বাঁচাইয়া প্রাণীকে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ বা অপর বড় প্রাণী লইয়া এই পরীক্ষা করা চলে নাই। ইহাদের পাকাশয় ও অন্ত্র সর্ব্বদাই নানা পীড়ার জীবাণুতে পূর্ণ থাকে —কাজেই খুব সাবধানে রাখিলেও এই সকল প্রাণীদের শরীর কখনই রোগবিষ হইতে মুক্ত হয় না। রুসিয়ার বৈজ্ঞানিক বগ্ডানাও (Bugdanow) মাছি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। জীবাণুর অগম্য স্থান নাই। মাছিরা যে ডিম প্রসব করে তাহাতেও অসংখ্য জীবাণু আশ্রয় লয়; তাহারা যে খাদ্য খায় তাহাতেও অসংখ্য জীবাণু বাস করে। বাগ্ডানাও সাহেব এই সব দেখিয়া মাছির সদ্যপ্রসূত ডিমগুলিকে প্রথমে ক্লোরাইড্ অব মারকারি নামক বিষে ডুবাইয়া জীবাণু-বর্জ্জিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে অনেক ডিমই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শেষে যে দুই চারিটি ডিম ভাল ছিল, সেগুলি হইতে মাছি জন্মিলে তিনি মাছিগুলিকে জীবাণুবর্জ্জিত খাদ্য দিয়া পালন করিয়াছিলেন। মাছিদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত চলে। অল্প দিনের মধ্যেই সেই দুই চারিটি মাছি সন্তানসন্ততি লইয়া প্রকাণ্ড এক ঝাঁক মাছি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাতে বাহিরের আঘাত অপঘাত গায়ে না লাগে বা বাহিরের জীবাণু আসিয়া গায়ে আশ্রয়

না লয়, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু মাছিরা অমর হইল না,—যথাসময়ে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে তাহারা গণ্ডায় গণ্ডায় মরিতে লাগিল। বাগ্‌ডানাও সাহেবের দেখাদেখি ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় অনেক বৈজ্ঞানিক ঠিক্ ঐ প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল স্থানে ঠিক একই ফল দেখা গিয়াছিল।

এই অকৃতকার্য্যতায় পরীক্ষকগণ নিরুদ্যম হন নাই। তাঁহারা বুঝিলেন, যে সকল রাসায়নিক পরিবর্ত্তন প্রাণিদেহে জীবনীশক্তির সৃষ্টি করে তাহাই শরীরে নানা বিষ পদার্থ উৎপন্ন করিয়া প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। রাসায়নিক কার্য্যকে সংযত রাখা কঠিন নয়,—তাপপ্রয়োগে এই কার্য্য দ্রুত চলে এবং ঠাণ্ডা দিলে তাহা মন্দীভূত হয়। পরীক্ষকগণ ভাবিলেন, যদি কোনো উপায়ে প্রাণীদের দেহ শীতল রাখিয়া শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়াকে সংযত করা যায়, তাহা হইলে সম্ভবত প্রাণীরা দীর্ঘজীবী হইবে।

পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ডাক্তার লয়েব এবং নরথ্রপ্ জীবাণুবর্জ্জিত মাছি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মানুষ এবং অপর উন্নত প্রাণীদের দেহের উষ্ণতার এক-একটা সীমা আছে; খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডায় রাখিয়া এই উষ্ণতার পরিবর্ত্তন করা যায় না; কিন্তু পতঙ্গদের দৈহিক উষ্ণতার সে প্রকার কোনো সীমা নাই। বাহিরের তাপ অনুসারে ইহারা দেহের উষ্ণতা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত করে এবং তাহাতে কোনো অসুস্থতা বোধ করে না। কাজেই মাছি লইয়া পরীক্ষা করায় পরীক্ষকগণের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। উষ্ণতা কমাইয়া দেওয়ায় প্রথমে কতক মাছি মরিয়া গেল। শেষে সেন্টিগ্রেডের কুড়ি ডিগ্রি উত্তাপ কমাইলে যেগুলি বাঁচিয়া রহিল পরীক্ষকগণ তাহাদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে রাখিয়া সাবধানে পালন করিতে লাগিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গেল তাহাতে তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। পরীক্ষকগণ দেখিলেন, যে সকল মাছি জন্মের এক মাসের মধ্যে মারা যাইত, তাহারাই ঠাণ্ডায় থাকিয়া নয় মাস পর্য্যন্ত বাঁচিতে লাগিল। কিন্তু এই পরীক্ষা মানুষের উপর করা হইল না।

মানুষের জটিল দেহযন্ত্র বেশি ঠাণ্ডা পাইলেই বিকল হইয়া যায়। তাই দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য মানুষের শরীরে স্বভাবতই একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা থাকে। ইহা কোনো কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘকাল কমাইয়া রাখিলে মৃত্যু হয়। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষকগণ বলিতেছেন, মানুষের দেহের উষ্ণতা যদি কোনো ক্রমে কুড়ি ডিগ্রি পরিমাণে কমাইয়া রাখার উপায় থাকিত, তবে এখন যে সব মানুষ ষাট বা সত্তর বৎসরে মরিতেছে, তাহাদিগকে দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে,—এই উপায়ে কোনো কালে যে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহার সম্ভাবনা আজও দেখা যাইতেছে না।

মানুষ বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া কখন যৌবনে পা দেয় এবং তার পরে কি করিয়া কবে যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পতঙ্গ ও উভচর প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করিলে, বাল্য এবং যৌবনের সীমারেখা সুস্পষ্ট চেনা যায়। ভেকেরা ডিম হইতে বাহির হইয়াই ভেকের আকার পায় না; ব্যাঙাচির আকারে তাহারা কয়েক সপ্তাহে জলে সাঁতার দেয়। ইহাই ভেকের শৈশব কাল। তার পরে যখন তাহাদের লেজ লোপ পাইয়া যায়, পা গজাইতে থাকে এবং গায়ের চামড়া ও মুখ রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, সেই সময়টা তাহাদের যৌবনের আরম্ভ কাল। মানুষের যৌবনের কাল বাড়াইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘজীবী করা যায় কিনা জানিবার জন্য Gudernatch নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক কিছু দিন ধরিয়া ভেকের শারীরিক পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। ইহাতে এসম্বন্ধে অনেক নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। বড় প্রাণীদের কণ্ঠনালীর কাছে একটি বিশেষ মাংসপিণ্ড আছে, ইহাকে ইংরাজিতে Thyroid gland বলে। ইহা হইতে যে রস উৎপন্ন হয়; তাহা প্রাণিদেহে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কাজ করে। শীতকালে তিন চারি সপ্তাহের পূর্ব্বে ব্যাঙাচি কখনই ব্যাঙের মূর্ত্তি পায় না। পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকটি খুব ছোটো ব্যাঙাচিকে অপর প্রাণীর Thyroid Gland খাওয়াইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বড়ই

অদ্ভুত। Thyrod Gland খাইয়া অপুষ্টাঙ্গ ছোটো ছোটো ব্যাঙাচি এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাঙের মূর্ত্তি পাইয়াছিল। পরীক্ষক বুঝিয়াছিলেন, প্রাণীদের Thyroid Glandই তাহাদের যৌবনের বিকাশ করে এবং শেষে যখন তাহা দুর্ব্বল হইয়া যায় তখন বার্দ্ধক্য দেখা দেয়। কয়েকগুলি ব্যাঙাচির দেহের Thyroid Gland সাবধানে কাটিয়া ফেলিয়া এলেন্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতেও আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছিল; ব্যাঙাচিগুলির মধ্যে একটিও যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা আজীবন লেজযুক্ত ব্যাঙাচিই থাকিয়া গিয়াছিল।

এই পরীক্ষা মানুষের উপরে চলিয়াছে কিনা জানি না। দেহের Thyroid Gland কাটিয়া মানুষকে অজীবন শিশু করিয়া রাখা হয় ত সম্ভব নহে। সম্ভব হইলে ইহাতে মানুষ্যের দুঃখই বাড়িয়া যাইবে, আয়ু বাড়িবে না। কাজেই বলিতে হইতেছে, মানুষ্যের আয়ু বাড়াইবার জন্য এ পর্য্যন্ত যত চেষ্টা হইয়াছে তাহার কোনোটিই সার্থক হয় নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পঞ্চপল্লব

শিক্ষার আদর্শ

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধার জন্যই মানুষ একদিন সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এবং তাহাই ক্রমে সম্প্রদায় রাজ্য বা সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সমাজ, বা রাজ্য যখন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অতিরিক্ত মাত্রায় অধিকার বিস্তার করে, তখন পৃথিবীর অধিকাংশ দুর্ব্বল মানুষই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইয়া বসে। তথাপি এখনও মাঝে মাঝে এমন লোকও দেখা যায় যাঁহাদের প্রাণ সমাজ ও রাজ্যতন্ত্রের যন্ত্রে পিষিয়া যায় নাই ; ইঁহারা এখনও মানুষকে আত্মার মুক্তির জন্য সচেষ্ট করিয়া তোলেন।

ইংলণ্ডের ভাবুকপ্রবর Bertrand Russell এই শ্রেণীর একজন লোক। তিনি ইউরোপের মহাযুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যেও মানুষের আত্মার সব দিক হইতেই যে স্বাধীনতা-লাভের অধিকার আছে, এই কথা প্রচার করিয়াছেন। তা ছাড়া রাষ্ট্রক্ষেত্র, ধর্ম্মমন্দির, ধনিসভা এবং সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে আধুনিক সভ্য মানুষ যে, স্বাধীনতা হারাইতেছে, তাহার কথা তিনি Principles of Social Reconstruction নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য রসেলের এই সকল কথা সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং ইহার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হইতেছে। যাহা হউক তিনি এই গ্রন্থে শিক্ষাসম্বন্ধে যে কথা প্রচার করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম দিতেছি।

চরিত্র এবং মতামত গঠনের কার্য্যে শিক্ষাই প্রধান সহায়। শিক্ষার্থী

নিজের মত নিজেই যাহাতে গড়িয়া লইতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। স্বাধীনভাবে বালকের চিত্তবৃত্তি যাহাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে এবং কোন কিছু আসিয়া যেন ইহাতে বাধার সৃষ্টি না করে তাহার প্রতি শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে। তাঁহাকে একেবারে দূরে থাকিলে চলিবে না, ছাত্রের উপর তাঁহার একটু কর্ত্তৃত্বের অধিকার থাকিবেই। কিন্তু সেই কর্ত্তৃত্ব তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। পৃথিবীর বর্ত্তমান শিক্ষামন্দিরে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অভাব দেখা যাইতেছে। আজকাল যেমন সৈনিকবিভাগ, ব্যবসায়সম্প্রদায়, বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের যন্ত্র নির্ম্মমভাবে চলে আধুনিক শিক্ষার যন্ত্রগুলি ঠিক সেই রকমেই চলিতেছে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের কোন সাড়া-শব্দ নাই। সরকারি দপ্তর হইতে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য নিয়ম কানুন জারি হয়, তার পরে বড় বড় ক্লাশ গড়া হয়, বাঁধা দস্তরে পাঠ্যসূচি প্রস্তুত হয়, এবং সব ছেলেকে এক ছাঁচে ঢালাই করার জন্য মাষ্টারদের প্রাণপণ চেষ্টা চলে। এ সমস্তই হয়, কেবল হয় না ছাত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখানো। শিশুকে শ্রদ্ধা করিতে হইলে কল্পনাশক্তি এবং আন্তরিক সহানুভূতির বিশেষ প্রয়োজন। শিশু অসহায়, বাহির হইতে দেখিতে গেলে নির্বোধ, শিক্ষক তাহার চেয়ে অনেক জ্ঞানী, এবং অনেক বড়। অত্যাচারী রাজার মত শ্রদ্ধাহীন শিক্ষক শিশুর এই বাহিরের দৈন্য দেখিয়া তাহাকে সহজেই অবহেলা করিতে পারেন, নিজের হাতে শিশুকে গড়িয়া তুলিবেন এই অহঙ্কার তাঁহার মনে উদয় হইতেও পারে; কিন্তু শিক্ষক প্রায়ই শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসেন।

যে শিক্ষক ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তিনি মানুষ গড়িবার গর্ব্ব পোষণ করেন না। তিনি ছাত্রের নিকটে নিজের গৌরব প্রকাশ না করিয়া সঙ্কোচ অনুভব করেন। প্রকাশ্যে ছাত্রের যে অসহায়ভাব দেখা যায় তাহা তাঁহাকে গুরুতর দায়িত্বের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ছাত্রের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে ভবিষ্যৎ

উন্নতির যে সম্ভাবনা সুপ্ত রহিয়াছে, যিনি প্রকৃত শিক্ষক, তিনি সর্ব্বদা তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিতে চেষ্টা করেন। ছাত্রকে কোন্ ছাঁচে ঢালাই করিয়া দিলে দেশের বা বিশেষ ধর্ম্মসমাজের মনোমত হয়, তাহার বিচার করিয়া শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দিবেন না। সর্ব্বদাই ছাত্রের অন্তর-প্রকৃতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্রকে তাঁহার নিজের ছাঁচে গড়েন, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন, এই ধারণা কথাবার্ত্তায় ও আচারব্যবহারে ছাত্রেরা তাঁহার কাছ হইতেই লাভ করে। তা ছাড়া বিশেষ জাতির অথবা ধর্ম্ম বা সমাজের কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপরেও অনেক স্থলে শিক্ষার লক্ষ্য স্থাপিত হয়। ইহাতে আপাতত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও শিক্ষার ফল স্থায়ী হয় না। ছাত্রের মনে যাহাতে অন্ধ দেশাভিমান এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের প্রতি অবজ্ঞার ভাব জাগিয়া উঠে, এমন ভাবে অনেক দেশে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধেও তাহাই দেখা যায়। ধর্ম্মসম্বন্ধে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার যে মতামত, ছাত্রেরা ভেড়ার পালের মত সেই মতই নিজস্ব করিয়া লয়। ইহার ফলে ছাত্রেরা জীবনের পরম ধন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু অন্বেষণ না করিয়া, পরের মুখে ঝাল খাইয়া কৃতার্থ মনে করে। এ অবস্থায় তাহারা ভুল করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে।

সম্মুখে কোনো বিশেষ মত বা বিশ্বাস আদর্শ স্বরূপে দাঁড় করাইলে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষণের প্রবৃত্তি থাকে না। প্রত্যেক মতের স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তি সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদের মনে প্রথমে সংশয় জাগানো কর্ত্তব্য এবং পরে তাহাদের দ্বারাই সেই সংশয়ের মীমাংসা করানো প্রয়োজন। কোন বিশেষ ধর্ম্মের বা উদ্দেশ্যের সাধন শিক্ষার লক্ষ্য নয়, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সত্য-অন্বেষণের ইচ্ছা উদ্রেক করা। স্বাধীনচিন্তায় বাধা দিয়া কোনো মনগড়া শিক্ষাদানের যে সুবিধা নাই তাহা নহে। ইহাতে অন্য রাজ্য, সমাজ বা সম্প্রদায়ের উপরে ছাত্রদের মনের বিরুদ্ধ ভাব যথেচ্ছ চালনা করা যায় বটে, কিন্তু ইহা কখনই স্থায়ী হয় না।

স্বাধীনচিন্তা করিতে না পারিলে মানুষের মনের বল কমিয়া যায়। জগতে চিন্তাশক্তি অন্য সকল শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের তুলনায় অধিককাল ব্যাপিয়া মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। স্বাধীন চিন্তার অবকাশ না দিয়া শিক্ষক ছাত্রকে এমন কঠিন নিয়ম-কানুনের মধ্যে আবদ্ধ করেন যে, ছাত্র হাঁপাইয়া উঠে। নিয়ম-কানুনের (Disciplineএ) দিকে শিক্ষকেরা সাধারণত এত নজর দেন যে, ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই তাঁহারা বলেন ছাত্রদের ক্লাসে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। শিক্ষাজগতে বিখ্যাত মনস্বিনী Madam Montessori কার্য্যত দেখাইয়াছেন যে, বিনা Discipline-এ ছেলেদের মনোযোগ ভাল করিয়াই আকর্ষণ করা যায়। তবে উন্মত্ত বিকলাঙ্গ ও অপরাধী ছেলেদের জন্য খানিকটা Disciplineএর প্রয়োজন হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া খুব বড় বড় ক্লাস পরিচালনা করিতে শিক্ষক মহাশয় বাধ্য হইয়া অনেক সময় Disciplineএর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আপাতত আর্থিক সুবিধার জন্য অনেক সময় শিক্ষককে স্কুলে অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হয়, কিন্তু ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়েরই পরম ক্ষতি হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত শিক্ষকের মেজাজ এমন রূক্ষ এবং যন্ত্রের মত প্রাণহীন ও শুষ্ক হইয়া উঠে যে, ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে এক প্রকার অস্বাভাবিক ভীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যাঁহারা শিক্ষকতা করেন নাই, তাঁহারা ভালো করিয়া পড়াইতে কতটা শক্তির ব্যয় হয় তাহা বুঝিবেন না। তাঁহারা ব্যাঙ্কের কেরানীর মত শিক্ষককে যতটা বেশী পারেন খাটাইয়া লন কেবল আর্থিক সুবিধার জন্য।

শিক্ষক যেটুকু বেশ মনের আনন্দে স্ফূর্ত্তিতে কাজ করিতে পারেন ততটা কাজ তাঁহাকে দিলে ক্লাশে, শিক্ষকের রূক্ষ মুখ ও হাতে বেত না দেখিয়া, শিক্ষা জিনিসটা যে নিজেরই উপকারের জন্য তাহা ছাত্র বুঝিতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকসংখ্যা না বাড়াইলে ইহা সম্ভব হয় না,—কাজেই অর্থের প্রয়োজন

হয়। কিন্তু সত্যিকার শিক্ষা বাহিরের Discipline-এ ভালো হয় না। Discipline জিনিষটা দরকারী কিন্তু সেটা বাহির হইতে না চাপাইয়া ছাত্রের অন্তরে জাগাইতে হইবে। তাহার জন্য এমন শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে আনন্দ পান এবং যাঁহাদের অবসর আছে। কিন্তু সে রকম শিক্ষাগুরু কোথায়? পরীক্ষায় ডিগ্রি-গ্রহণ প্রভৃতিই যে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার প্রধান উপায়, ইহাই সাধারণত শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। ইহাতে ছাত্রেরা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া যায়।

শিক্ষক যাহা বলেন তাহাই ঠিক, এই রকম নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করিলে ছাত্রের মনে শিক্ষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ হয় না। এই অবস্থায় তাহারা নিজেরা চিন্তা করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং ইহার ফলে তাহারা বড় হইয়া সকল কাজেই নেতার প্রয়োজন অনুভব করে এবং নির্ব্বিচারে প্রাচীন প্রথা ও মতামতের আনুগত্য স্বীকার করে।

যাহা এখন আমাদের নিকটে অর্থহীন এমন অনেক বস্তু ও বিষয় পৃথিবী জুড়িয়া রহিয়াছে। একবার চোখ মেলিলেই দেখা যায় যে, সমস্ত জগৎ আশ্চর্য্য রহস্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিবার মত সাহস ছাত্রদের নাই। শিক্ষার কাজই মানুষের মনে এই দুঃসাহস জাগাইয়া তোলা।

কেহ কেহ বলিবেন, মনের এই সাহস খুব অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। এ কথার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। কিন্তু শিশুদের মনে বড়দের চেয়ে এই দুঃসাহসের শক্তি অধিক পরিমাণেই থাকে। বিকৃত শিক্ষার ফলে তাহারা ক্রমে সেই শক্তি হারাইয়া গতানুগতিক পথে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করে। তাই মানুষ যত বড় হয়, ততই বিজ্ঞ হইয়া নূতন ভাব গ্রহণ করিতে এবং নিজে কিছু চিন্তা করিতে ভয় পায়, তখন ধর্ম্মমন্দির, সমাজ ও রাষ্ট্রদেবতার আদেশই তাহার শিরোধার্য্য হয়।

আসল কথা এই, চিন্তা করিবার ভয়টা আমদের দূর করিতে হইবে।

এই ভয়ের প্রধান কারণ, পাছে চিন্তাশক্তির প্রয়োগে বহু প্রাচীন বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয় এবং পাছে যে সকল অনুষ্ঠানের উপর ভর করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি সেগুলি দেশের বা সমাজের অকল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া, আমরা যে মিথ্যা গর্ব্বে এতদিন স্ফীত হইতেছি পাছে তাহা হঠাৎ বুদ্বুদের মত অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এই ভয়ও আছে। প্রজারা যদি নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, তবে রাজারাজড়াদের উপায় কি? যুবক-যুবতীরা পরস্পারের সম্বন্ধে যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করে তবে নীতিশাস্ত্র দাঁড়ায় কোথায়? সৈনিকরা যদি যুদ্ধের সম্বন্ধে নিজেরা চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, তবে যুদ্ধক্ষেত্রের দশা হইবে কি? দরকার নেই স্বাধীন চিন্তায়, ফিরিয়া চল আবার সেই পুরাতনের শীতল ছায়ায়, নচেৎ ধনৈশ্বর্য্য, নীতিশাস্ত্র, ও যুদ্ধক্ষেত্রের সমূহ সঙ্কট। এই রকম ভয় লইয়াই ধর্ম্মমন্দির, স্কুল এবং বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা তাঁহাদের কাজ চালাইয়া থাকেন।

কিন্তু ভয়ে ভয়ে যে কাজ সুরু করা যায়, তাহার ভিতর প্রাণশক্তি টিঁকিতে পারে না। জগতে আশাই সৃজনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে—ভীতি নয়। কোন মহতী আশার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত নয় বলিয়াই বর্ত্তমান কালের শিক্ষা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে অক্ষম। তরুণদের শিক্ষার ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহারা সৃজনের পরিবর্ত্তে প্রাচীনের রক্ষণেই বেশী ব্যস্ত। কিন্তু প্রাচীন মৃত তথ্যগুলি মগজে পূর্ণ করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, মানুষের মধ্যে সৃজনশক্তিকে জাগাইয়া তোলাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য।

সুধীপ্রবর রসেলের ন্যায় আমাদের দেশের সমাজে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, ও শিক্ষাপরিষদে আজকাল কোন কোন মনস্বী আশার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু অল্পবিশ্বাসী আমরা তাহাকে 'ভাবুকতা' 'কবিত্ব' বলিয়া উপহাস করি। আমরা বলিয়া থাকি, ভাবের দিক হইতে এসব কথা শোনায় ভাল, কিন্তু কাজের বেলায় অসম্ভব।

রসেল সে সম্বন্ধেও অন্য এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন হইতে মানুষের একদিনেই মুক্তি হইবে না। কিন্তু এই মুক্তির সাধনাই যে সত্য, তাহা দেশের অন্তত কয়েকজনও যদি মনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তবে একদিন না একদিন সমস্ত দেশ তাহা স্বীকার করিবেই।

ধর্ম্মের উদারতা প্রথম একদিন মুষ্টিমেয় নির্ভীক দার্শনিকগণের কল্পনালোকেই বিহার করিত। সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ পৃথিবীতে একসময় খুব অল্প কয়েকজন লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীদের মনুষ্যত্বের অধিকার যে পুরুষেরই সমান, একথা শেলি, স্টুয়ার্ট মিল ও মেরি উল্‌স্টোনক্রাফ্‌টের মত খুব অল্প কয়েকজন অকেজো ভাবুক লোকই প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায় জগতের বড় বড় পরিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি ভাবুক লোকের একাকিত্ব ও চিন্তাশীলতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রথম মুসলমান গণতন্ত্র

রুশ সম্রাজ্যের ধ্বংস অনেক জাতির কল্যাণের কারণ হইয়াছে। অনেক জাতি এই বিপুল সম্রাজ্যের চাপে পীড়িত হইতেছিল। তারপর সে যখন আপনার পাপের ফলে আপনি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল তখন এশিয়ার অনেক জাতি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মধ্য-এশিয়ার তুর্কীস্থান ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। ১৯১৭ সালে এইখানে প্রথম মুসলমান সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। দেশটি সমগ্র জার্মানী, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী ও ইতালীর মত বৃহৎ, অর্দ্ধেক রুশিয়ার অপেক্ষাও বৃহত্তর। তুর্কী-

স্থান এককালে সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল, পরে তাহা সরিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার চিহ্ন কাস্পিয়ান সাগর ও আরল হ্রদে এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রদেশের জনসংখ্যা অনুমান এক কোটী, স্থানানুপাতে জনসংখ্যা খুবই কম। এই মধ্য-এশিয়াতে এককালে আর্য্যদের বাস ছিল। তারপুর তুর্কী ও মোগল জাতি এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতের মোগল সম্রাট্দের পূর্বপুরুষের রাজ্য ও বাসস্থান এইখানেই ছিল। এখানকার যাবতীয় অধিবাসী ক্রমে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। বর্ত্তমানে তুর্কীস্থানের শতকরা ৯৫ জনেরও বেশী লোক সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এখানকার শতকরা ১৮ জন লোক "সর্ত্ত্"। ইহাদের উৎপত্তি কোথায় তাহা বলা যায় না! তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রাচীন হিন্দুদের বণিকদিগকে "সর্ত্ত্" বলা হইত। এখন তুর্কীস্থানের বাণিজ্য সর্ত্ত্দের হাতে। দুপয়সা হাতে হইলে ইহারা হয় ব্যবসায় করিয়া ধনী হয়, না হয় বাজারে চা খাইয়া বা জুয়া খেলিয়া তাহা নষ্ট করে। কাজকর্ম্মের পর বাজারে জড় হইয়া দেশবিদেশের বণিকের নিকট হইতে পৃথিবীর খবর লইতে তাহাদের উৎসাহ খুব। রুশেরা প্রথম যখন ঐদেশে যায় তখন ইহাদের সাধুতা দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়াছিল। তাহারা কখনো তাহাদের গৃহে তালাচাবি দিত না, কিন্তু পাশ্চত্য সভ্যতার বিস্তারের সহিত তাহাদের এসব গুণ দূর হইতেছে।

ইরানীদের বংশধরদের 'তাজিক' বলে; তাহারা সর্ত্ত্দের অপেক্ষা শিক্ষিত। 'উজ্বেগ' নামে আর একটি জাতি এখানে খুব শক্তিশালী। ইহারা বেশ বুদ্ধিমান্ এবং সর্ত্ত্ ও তাজিক উভয় হইতে সকল দিকেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু 'খিরগীজ'গণ তুর্কীস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ জাতি। ইহারা জাতিতে তুর্কী-মোঙ্গলীয়। ইহাদের কিয়দংশ হুনদের আক্রমণকালে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া গৃহী হইয়া বাস করিতেছে; অপরাংশ এখনো যাযাবর হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খিরগীজ মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ, ইহারা

উদার হৃদয়, অতিথিবৎসল, ভাবুক এবং খেলায় ও শিকারে খুব তৎপর।

রুশ-আক্রমণের পূর্ব্বেকার খিরগীজদের এক রাণী ছিলেন। তাঁহার নাম কুরবন্ জান-দট্‌ঠা। তাঁহার ভয়ে দেশবিদেশেও লোক ত্রস্ত থাকিত। খোকন্দের বাদসাও তাঁহার সহায়তা-লাভের চেষ্টা করিতেন। পামীরের খিরগীজগণ রাণীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, আফগানিস্থানের আমীরও তাঁহার সহিত শক্রতা করিতে সাহস পাইতেন না, এবং খসগড়ের খাঁ তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালে রুশেরা মধ্য-এশিয়ায় আক্রমণ করিয়া রাণীকে পরাভূত করে, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া রুশ শাসন-কর্ত্তা তাঁহার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হরণ করেন নাই। রাণী রুশের অধীনে শান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত সমস্তই ভাল ভাবে চলিল। কিন্তু ঐ বৎসরে এক নূতন শাসনকর্ত্তা আসিয়া অত্যাচার সুরু করিলেন। ফেরগণায় রাণীর পুত্রেরা খুব জনপ্রিয় ছিলেন বলিয়া এই নূতন শাসনকর্ত্তা ঈর্ষ্যানলে পুড়িতে লাগিলেন, এবং সীমান্তে এক রুশ প্রহরী নিহত হওয়ার অছিলায় কুমারগণকে বন্দী করিলেন। বড় কুমারের ফাঁসি হইল, আর অন্যান্যদের সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসনে প্রেরণ করা হইল। তুর্কীস্থানের বড় বড় মুসলমানগণ কুমারদের পক্ষ লইয়া দরবার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

তুর্কীস্থানে রুশশাসন ও দেশীয় প্রথানুসারে শাসন পাশাপাশি চলিতেছিল। বহু প্রাচীনকালে খাঁদিগের শাসনকালেও প্রজাদের প্রতিনিধি-সমিতি গঠিত হইত। রুশ শাসনের সময়ে দেশীয় প্রতিনিধিগণ রুশ সরকারের অধীনস্থ হইলেন, ও নিজ নিজ প্রদেশের শাসনের জন্য দায়ী হইলেন। এই দুই গভর্ণমেণ্টের ফল আদৌ ভাল হইল না। নির্ব্বাচনের সময়ে সকল প্রকার অবিচার ও ঘুঁস চলিতে লাগিল। কিন্তু সভ্য নির্ব্বাচন করিলেই হইত না,—নির্ব্বাচিত সভ্যকে নামঞ্জুর করিবার অধিকার স্থানীয় রুশ-শাসন কর্ত্তার ছিল, সুতরাং সেখানেও ঘুঁস চলিত। এদিকে রুশ-ঔপনিবেশিকগণ তুর্কীস্থানে বাস

আরম্ভ করিল, তাহারা স্থানীয় লোকদের সহিত মিশিয়া গেল, কেবল আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারী বা লোকের সহিত মিশিতে পাইল না। রাজার নামে অরাজকতা চলিল, বিচারের আশা রহিল না। একবার একব্যক্তির সহিত প্রবন্ধলেখকের দেখা হয় সে পনের বৎসর কয়েদে আছে, সে যে অপরাধী নয় এ কথা বলিবারও সুযোগ তাহাকে দেওয়া হয় নাই।

১৯১৬ সালে য়ুরোপীয় যুদ্ধের জন্য রুশ-সরকার চারিদিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন; সুদূর তুর্কীস্থানের মরুভূমি বা পামীরের মালভূমির খিরগীজ এবং উজবেকগণও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। ইহাই বিদ্রোহাগ্নির শেষ ইন্ধন। বিদ্রোহ নির্ম্মভাবে দমন করা হইল, কি এশিয়ার মুসলমানেরা যে জাগিয়াছে তাহার চিহ্ন স্পষ্ট বুঝা গেল।

রুশের অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ তুর্কীস্থানে পৌঁছিলে লোকে খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, স্থানীয় রুশ-ঔপনিবেশিক ও মুসলমানগণ চিরদিনই এক সঙ্গে কাজ করিয়াছে। রুশ-সরকারের অত্যাচার উভয় সম্প্রদায়কে সমভাবেই বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। সকল সম্প্রদায়ের স্বস্ব রাজনৈতিক অধিকার বজায় রাখিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। কোনো ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া হয় নাই। সমগ্র দেশের শাসনের ভয়ে তাস্‌কান্তের কমিটির উপর অর্পিত ছিল। রুশীয় তুর্কীস্থানের সকল প্রদেশই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল; কেবল বোখারার আমীর এই বিদ্রোহের বিরোধী ছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, বৃটীশ সৈন্য তাঁহাকে এই সোভিয়েট-বিপ্লব দমন করিতে সাহায্য করিবে। ইতিমধ্যে আফগানিস্থানে বিপ্লব সুরু হইল এবং বৃটীশ সাহায্য পাইবার আশা দূর হইল। এদিকে তুর্কীস্থানের সৈন্য বোখারায় উপস্থিত হইয়া আমীরকে পরাভূত করিয়া সুশাসন-পদ্ধতি দান করিতে বাধ্য হইলেন।

তার পরে ১৯১৮ সালে ১৭ই মে তারিখে তাস্‌কাণ্ডে সোভিয়েটদের কংগ্রেস হইল এবং সেখানে তুর্কীস্থান স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হইল।

ইহাই পৃথিবীর প্রথম মুসলমান গণতন্ত্র।

The First Mahommedan Republic by Boris L. T. Roustom Bek—Asia, May, 1920.

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিশ্ববৃত্তান্ত

আমাদের দেশে কথা আছে যে, রাজায় রাজায় লড়াই হয় আর প্রজারা প্রাণে মারা যায়। এখন যুরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই ধর্ম্মঘট নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিবাদ মূলধন-ওয়ালা ও শ্রমজীবির মধ্যে; মাঝে পড়িয়া মারা পড়িতেছে সাধারণ লোক। শ্রমজীবীরা সর্ব্বত্রই অল্প কাজ ও বেশী মাহিনা চায়। ইহার ফলে ভারতবাসীরা বেশী মাহিনায় অল্প কাজ পাইতেছে, সুতরাং লাভের অংশ কম বলিয়া জিনিষের দর বাড়িয়া চলিতেছে। এইরূপে কুলি-মজুর ব্যাবসাদার এবং ক্রেতাদের মধ্যে ঘোর সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, মীমাংসার পথে কোনো পক্ষই যাইতেছে না। মার্কিনরাজ্য স্বাধীনতার বড় বিজয়ডঙ্কা যত জোরেই বাজাইতে থাকুন না কেন, সেখানে শ্রেণী-বিদ্বেষ ও সংঘাত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়ই কাগজে দেখা যায় আজ ছাপাখানার কম্পোজিটারেরা, কাল পুলিশেরা, ধর্ম্মঘট করিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। সাধারণ লোকে প্রায়ই এই সব ধর্ম্মঘট ভাঙাইবার জন্য নিজেরা কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া যায়। রেলগাড়ীতে কয়লা দেওয়ার কাজ, মোটর চালানো, টাইপ করিয়া তাহা ফটো প্লেটে ছাপাইয়া কাগজ বাহির করা প্রভৃতি যখন যে কাজের দরকার হইয়াছে তাহার ব্যবস্থা লোকে কষ্ট করিয়া চালাইয়া লইতেছে। কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতার জন্য মার্কিন দেশে একজন লোক 'ওভার অল্' সমাজ

স্থাপন করিয়াছে। অত্যন্ত সাদাসিধা নীলরঙের কাপড়ের এক ইজার ছাড়া তাহারা সাধারণত কিছুই ব্যবহার করিবে না। এই ইজার একেবারে বুক পর্য্যন্ত উঠে এবং তাহার ভিতরে অনেক পকেট থাকায় কাহারো কোন অসুবিধা হয় না। ক্রোড়পতি রক্‌ফেলারের পুত্র নাকি এইরূপ পোষাক পরিতে রাজি হইয়াছেন।

আমাদের দেশের কাপড়ের মহার্ঘতার কথা কাহারও অবিদিত নাই। বাহুল্য কমাইতে হইবে। নয় প্রাচীনের রিক্ততায় আনন্দ পাইতে হইবে, না হয় বর্ত্তমানের সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভের চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে তাহাতে আনন্দ আছে কি না।

আমেরিকাতে শিক্ষক-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আমেরিকা মনে করে যে, (১) সাধারণ লোকের বিদ্যা যত উচ্চ হইবে প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা ও যোগ্যতা তদনুরূপ হইবে। (২) কোনো দেশের প্রজাতন্ত্রশাসন স্থায়ী করিতে হইলে সে দেশের ইতিহাস, শাসনপদ্ধতি, ও ভাষা সম্বন্ধে বিচিত্র লোকের মনকে সজাগ করিতে হইবে। (৩) শিক্ষার গুণেই দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, দেশের প্রচুর সম্পদ্ থাকা সত্বেও শিক্ষার দোষে রুশ ও মেক্‌সিকোর অধিবাসীদের মাথা পিছু আয় অতি সামান্য। (৪) ভাল স্বাস্থের মূল্য রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে কম নয়, বর্ত্তমান কালের স্কুল সেই শিক্ষার বীজ বপন করিবে। এই বিষয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাবোর্ডের প্রতিবেদনে প্রধান চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা জাতির বড় রকমের মূলধন। এ ব্যয় না করিলে যে ক্ষতি হইবে তাহা কখনো পূরণ করা যাইবে না।

শিক্ষা জাতীয় মূলধন, ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ জাতীয় উন্নতি করিবে। আমেরিকার শতকরা ৪ জন লোক লিখিতে পড়িতে

পারে না বলিয়া তাহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া দেশময় আন্দোলন সুরু করিয়াছে। স্বাস্থ্যের দিকে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, একটি ষ্টেটের পঞ্চমাংশ বৎসরের কোন না কোন সময়ে অসুস্থ থাকে।

মার্কিনদেশের অর্দ্ধেকের উপর শিক্ষক অনভিজ্ঞ যুবক মাত্র। দুই লক্ষ পাব্‌লিক্ স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে তিন লক্ষের বয়স ২৫এর উপর; অর্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষকই কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়াই একার্য্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মোটের উপর উত্তম শিক্ষকের অভাব চারিদিকে অনুভূত হইতেছে। এই শিক্ষকের অভাবের কারণ এদেশেও যা, বিদেশেও তাই, শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত অল্প। পাড়াগাঁয়ের শিক্ষা মার্কিন দেশেও সন্তোষজনক নয়।

বর্ত্তমানে ১৮,২৭৯ সংখ্যক বিদ্যালয় শিক্ষকের অভাবে বন্ধ রহিয়াছে এবং যাহারা আছে তাহারা অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া ভিন্ন কর্ম্মে যাইতেছে। প্রায় ৪২ হাজার বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শিক্ষা ও স্বভাব আদৌ শিক্ষকতার উপযোগী নহে, এবং এই শ্রেণীর হাতে সুকুমারমতি বালকগণের শিক্ষার ভার থাকা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিদ্যালয়ে যে পাইত বৎসরে ২,৪০০ ডলার, ভিন্ন কর্ম্মে সে পাইতেছে ৫ হাজার। শিক্ষকতা ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগেই বেতন অধিক। আমাদের দেশেও অবস্থা তদনুরূপ। শিক্ষকতা করেন নাই এমন উকিল বা গ্রাজুয়েট কেরানী-কর্ম্মচারী কোথায়ও আছে কি না সন্দেহ। পোষ্টাফিসে আট বৎসর পূর্ব্বে যে সব পোষ্ট মাষ্টারের মাহিনা ছিল ১৫।২০ টাকা এখন তাহাদের বেতন ৬০।৭৫টাকা। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি হয় না; এই যুদ্ধের সময় চারিদিকে বাজার দর বাড়িয়াছে, কিন্তু কয়টি শিক্ষকের বেতন বাড়িয়াছে? অসন্তুষ্ট অভাবপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মনের ভাব ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। শিক্ষকতা করিয়া কেহ ধনী হইবেন না, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

লণ্ডনের স্কুল-শিক্ষকদের বেতন বাজারদর বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ানো হয় নাই বলিয়া তাঁহারা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, কর্তৃপক্ষ যদি এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের অভাব অভিযোগ পূরণ না করেন ত তাঁহারা বালকদিগকে উপযুক্ত-রূপে শিক্ষা দিবেন না। একজন শিক্ষক বলেন "যে লোকটি আমার দরজা ঝাড়ু দেয় সে সপ্তাহে ৬৭ শিলিং পায়; যে ব্যক্তি উনন সাফ্ করে সে গড়ে সপ্তাহে ছয় পাউণ্ড পায়, আর আমি ২৭ বৎসর চাকুরীর পর পাঁচ পাউণ্ড পনের শিলিং পাই!" আমাদের দেশেও কলিকাতায় যে শিক্ষক ১০০ টাকা পান তাঁহাব বাড়ীভারা লাগে খুব কম করিয়া ২৫।৩০ টাকা। ইনকম্ ট্যাক্স, জীবন-বীমার প্রিমিয়াম্ দিয়া যাহা থাকে তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন ও ভদ্রতা রক্ষিত হয় না; সকালে বিকালে টিউশন্ করিতে হয়। কাজেই সাধারণ মজুরের চেয়েও বেশী পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। ইঁহাদের পারিবারিক জীবনের আনন্দ এবং বিশ্রাম-সুখ আছে কি?

সাইবেরিয়া রুশের অধীন ছিল। রুশসাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও বল্‌শেভিকের উৎপাত সুরু হয়। শান্তিস্থাপনের জন্য চারিদিকের জাতিরা উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন; আমেরিকা সৈন্য পাঠাইয়াছিল। নিজের সাম্রাজ্যের কাছেই অতবড় অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া জাপানও আগুন নিবাইবার জন্য সাইবেরিয়াতে গিয়াছিল। বল্‌শেভিক্'দিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে; দেশে শান্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকার সৈন্য স্বদেশে ফিরিয়াছে, কিন্তু জাপান সহজে সে দেশ হইতে ফিরিবে না। অপরদিকে সামান্য কয়েক ঘর রুশ সেখানে বাস করিয়াই যে সেটিকে রুশরাজ্য বলিয়া দাবী করিবেন তাহাও সমীচীন নহে। জাপানের মধ্যে একদল জাপানী সৈন্যদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য লেখালিখি করিতেছেন। কিন্তু জাপানে আজকাল মিলিটারীদের প্রতিপত্তি খুব বেশী।

রুশসাম্রাজ্যের ধ্বংসে অনেকগুলি নূতন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গণতন্ত্র দেশ গঠিত হইয়াছে। আরমেনিয়ার কিয়দংশ রুশের অন্তর্গত, অপরাংশ তুর্কীর অধীন। রুশের অধীন আর্মানীয়াতে নূতন গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এ ছাড়া ককেসাস্ পর্ব্বতের অন্তর্গত জর্জিয়া প্রদেশ স্বাধীন হইয়াছে; সেখানে রুশের সোভিয়েট্-বাদের প্রভাব প্রবল। বল্‌শেভিকদের লাল নিশান ইহাদের জাতীয় নিশান হইয়াছে। কিন্তু রুশের শাসনের প্রতি তাহাদের ঘৃণা ও আতঙ্ক উভয়ই সমান। আরজাবান নামে আর একটি নূতন সাধারণ তন্ত্র এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান। কিন্তু সকল মুসলমান এক জাতির বা এক সম্প্রদায়ের নয়, অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মতভেদ বিসর্জন করিয়াছে, এবং সাম্প্রদায়িক প্রাধান্যের জন্য লোকে জিদ্ না করিয়া সমগ্র জেলা বা পরগণার কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে। আর্‌জাবানেও বল-শেভিক প্রভাব অত্যন্ত প্রবল।

———o———

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাজারদর ও মজুরী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; জিনিষের দর খুব কম করিয়া তিনগুণ বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধিতে দেশের দারিদ্র্য দূর হইল না কেন? পূর্ব্বের দুর্ভিক্ষ ও অভাব সবই রহিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসরে দেশে টাকা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে টাকা হইয়াছে ধনীর—দরিদ্রের অভাব তাহাতে দূর হয় নাই। আমেরিকাতে এ বিষয়ে শ্রমজীবি-দলের নেতারা তন্নতন্ন করিয়া গবেষণা করিয়া রাজ্যময় ঘোর আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। আমাদের দেশের সেইরূপ তথ্য জোগাড় করিবার কোনো উপায় থাকিলে দেখা যাইত যে, কয়েকটি ব্যবসায়ীর হাতে আমাদের বাজার দর উঠিতেছে নামিতেছে। যুদ্ধের পর যে ব্যক্তিরা ধনী হইয়াছে তাহাদের অধি-কাংশই অতিলাভী অর্থাৎ ন্যায্য লাভের অনেক বেশী তাহারা দেশের লোকের কাছ হইতে বা বিদেশে জিনিস চালান দিয়া লাভ করিয়াছে। আমেরিকাতে যাবতীয় সামগ্রীর উপর আয়-করের অষ্টমাংশ দিয়াছে ৬,৬৬৪ জন লোক।

দশ কোটি লোকের মধ্যে ৬,৬৬৪ জন লোক রাজ্যের আয় করের অষ্টমাংশ দিয়াছে। ১৯১৭ সালে ইহাদের মোট আয় হইয়াছিল ১৭০ কোটি ৯৩ লক্ষ ডলার! লৌহ ও কয়লার কারবারে ২০০ কোটি ডলার নিছক লাভ ছিল,—অর্থাৎ আমেরিকার অধিবাসীদের মাথা পিছু ২০ ডলার আয় হওয়া উচিত ছিল। ২,০৩০ টি কোম্পানী যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে লাভ করিয়াছে শতকরা ১০০ হারে অর্থাৎ দুইগুণ ৫৭২৪ টি কোম্পানী দুই ভাগের এক ভাগ অধিক লাভ করিয়াছে, ইত্যাদি।

যুদ্ধের সময়ে ব্যবসায়ীদের লাভ করিবার উপায়ের ও সুযোগের অন্ত ছিল না। কিন্তু যুদ্ধান্তে যুদ্ধ সরঞ্জামের উপর লাভের আশা গিয়াছে বলিয়া ব্যবসায়ীরা লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর সেই লাভের গচ্চা উসুল করিতেছেন। কিন্তু এই লাভের অতি সামান্যই দরিদ্রে পাইতেছে। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। ১৯১৪ সালে জুতার যে দাম খরিদ্দার দিত তাহার অর্দ্ধেক ছিল লাভ। জুতা তৈয়ারী করিতে যে ব্যয় পড়িত দাম ছিল তার তিনগুণ। ১৯১৭ সালে বিক্রির-দাম মজুরীদামের পাঁচগুণ হইয়াছিল। অর্থাৎ চামড়া সাফ্ হইতে জুতা তৈয়ারী শেষ পর্য্যন্ত যে মজুরী কারিগরে পাইত তাহা খরিদ্দার যে দাম দিত তাহার ষষ্ঠাংশ। সুতরাং ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মাঝখানে দোকানী ও ব্যবসায়ীরা লইত। ১৯১৭ সালে মজুরে পাইত নয় ভাগের এক ভাগ অংশ অর্থাৎ একজোড়া জুতার দাম ৯ ডলার হইলে আট ডলার যায় ব্যবসায়ীকের হাতে, অবশিষ্ট এক ডলার মাত্র শ্রমজীবীর মজুরী! আমেরিকাতে চিনির দর তিন গুণ বাড়িয়াছে, আমাদের দেশে চারি গুণ বাড়িয়াছে অর্থাৎ ৮৲।৯৲ টাকা মণ দরের চিনি ৩৫৲।৩৬৲ টাকা মণ হইয়াছে। আমেরিকাতে এই সময়ের মধ্যে মজুরদের আয় বাড়িয়াছে শতকরা ১৫ হারে। এই রূপে সমস্ত ব্যবসায়ে লাভ এমন অধিক পরিমাণে করা হইতেছে যে আমেরিকার শাসনকেন্দ্র এই সব অসদ্ লোকদিগকে মোকদ্দমায় অভিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশের জিনিষের মহার্ঘতা কিছুই কমিতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্র.

লোকমান্য টিলক

হে ভুবন-গগনের পূর্ণচন্দ্র, হে ভারত-জননীর বর পুত্র, হে মহারাষ্ট্র-কুলতিলক, সমুদ্রের গম্ভীরতার পরিমাণ আছে, কিন্তু তোমার অভাবে তোমার দেশবাসীর যে শোক বেদনা হইয়াছে, তাহার গম্ভীরতার কোনো ইয়ত্তা নাই!

হে পরম পণ্ডিত, বাগ্দেবতার শূন্য অঙ্ককে কে আর পূর্ণ করিবে!

হে বীর, হে কর্ম্মযোগী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশকে নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা প্রকাশ করিয়া কে আর জগতের নিকট ধরিয়া দিবে!

হে লোকমান্য, ভারত তোমাকে হৃদয় সিংহাসন পাতিয়া দিয়াছে, তুমি তাহাতে অধিরূঢ় হইয়াছ, এবং এইরূপেই তুমি তাহাকে ভবিষ্যতের সুখ দুঃখে ও সম্পদ-বিপদে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা পরিচালিত করিবে।

ধন্য তোমার দেশবাসিগণ, যাহারা তোমার ন্যায় একটি যথার্থ বীর-কেশরীকে লাভ করিয়াছিল। আর অধন্যও তাহারা কম নহে, যাহারা এই দুঃসময়ে তোমাকে হারাইয়া ফেলিল!

কে বলিতেছে তোমার মৃত্যু হইয়াছে? তোমার উজ্জ্বল মূর্ত্তি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে! তুমি অমর, এবং তোমার বাণীও চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

বৈচিত্র্য

লোকে এক-এক জন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা নানাদিকে নানা সৎকার্য্য করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে কোন-কোনটি কাহাকে-কাহাকেও ভাল লাগেনা, কিন্তু যে গুলি ভাল লাগে তাহাদেরও সংখ্যা কম নয়। ইহা হইলেও ঐ যেটি ভাল লাগেনা তাহাই লইয়া মানুষ এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, সেই মহাপুরুষের আর সব গুণ বা কার্য্যের কথা একবারে ভুলিয়া যায়; এরূপ মনে করে যে, তিনি যেন আর কিছুই করেন নি, যদি কিছু করিয়া থাকেন ত ঐ একমাত্র সেইটি যাহা তাহাকে ভাল লাগে নি। এই লইয়া সে দলাদলি করে; যিনি সত্য-সত্যই দলের অতীত ছিলেন তাঁহাকে সে নিজের কল্পিত দলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া একবারে উড়াইয়া দিতে বসে; এবং এইরূপে তিনি যে বস্তুত কোনো সৎকার্য্য করিয়াছেন তাহা সে মোটেই মানিতে চায় না। সে এই রকম করিয়া নিজেই মরে; তাঁহার চরিত্র আলোচনায় যে দুর্লভ উপকার পাওয়া যায়, সে ইহা হইতে নিজেই বঞ্চিত হয়। যদি কোনো কোনো এক আধটা বিষয়ে অমিল থাকে ত থাকুক না, যে সব জায়গায় মিল আছে সেই গুলিই স্বীকার করিলে যে যথেষ্ট হব।

আরো এক রকমের লোক আছেন, ইঁহারাও আর একদিকে দল বাধাইয়া ফেলেন। মহাপুরুষের নানা কার্য্যের মধ্যে যেটি তাঁহাদিগকে ভাল লাগে বা যাহার দ্বারা তাঁহাদের নিজের উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হইতে পারে, সেইটিতে তাঁহারা একমাত্র জোর দিয়া আন্দোলন-আলোচনায় তাহাকে এতদূর বড় করিয়া

তুলেন যে, তাঁহার আর-আর কাজগুলি একবারে ঢাকিয়া যায়। ইহাও বিস্ময়ের বিষয় হয় যে, যে কাজটাকে লইয়া তাঁহারা এত নাড়া-চাড়া করেন অন্য সমস্তের তুলনায় হয় ত তাহা বস্তুতই অনেক ক্ষুদ্র। বৃহৎকে ক্ষুদ্র করায় যে দোষ, ক্ষুদ্রকেও বৃহৎ করার সেই দোষ।

* * *

শুনা যায়, মহাত্মা কবীর সাহেব যখন দেহ ত্যাগ করেন তখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে গোলমাল বাধে; হিন্দুশিষ্যেরা হিন্দুদের নিয়মানুসারে, আর মুসলমান শিষ্যরা মুসলমানদের নিয়মানুসারে তাঁহাব মৃতদেহের সৎকার করিতে চাহিতেছিল। তাঁহাদের গুরু যে হিন্দুও ছিলেন না আর মুসলমানও ছিলেন না, তাহাতে কোনো সন্দেহ ছিল না; তিনি এমন একটা স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন, যাহাতে হিন্দু ভাবিয়াছিল তাঁহাকে হিন্দু, আর মুসলমান ভাবিয়াছিল মুসলমান। কিন্তু তাঁহার ঐ সব শিষ্য ঐ তত্ত্বটি বুঝিতে না পারিয়া নিজের-নিজের মতামতটা গুরুর উপরে চাপাইয়া তাঁহাকেও হিন্দু বা মুসলমান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

গুরুকে দেখিয়া যতটা ভয় না হয়, চেলাকে দেখিয়া হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এই চেলাদের গুণে শেষে এমনো দাড়ায় যে, গুরুই হইয়া গিয়াছেন চেলা, আর চেলা হইয়াছেন গুরু; চেলারই কথা হইয়া গিয়াছে গুরুর কথা, আর গুরুর কথা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে কে জানে। নমস্কার এই চেলা-চূড়ামণি-গণকে!

* * *

উপনিষদে এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে, দেবতার প্রতি যার পরা ভক্তি থাকে, আর দেবতার ন্যায় গুরুতেও যার পরা ভক্তি হয়, কথিত গম্ভীর বিষয়-সমূহ তাহারই নিকটে প্রকাশ পায়। গুরু-ভক্তির এ কথাটা কিছু অলৌকিক নহে, সহজে ইহা বুঝা যায়। গুরুর প্রতি পরা ভক্তি জ্ঞানের কারণ, ইহাতে কোনো সন্দেহ

নাই। কিন্তু এই পরা ভক্তিটি সময়ে সময়ে এমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায় যে, শিষ্যের পক্ষে তাহা জ্ঞানের জন্য না হইয়া মোহের জন্য হইয়া থাকে; সে তাহার দ্বারা সত্যকে দর্শন না করিতে পারিয়া সত্য-বোধে অসত্যকে দর্শন করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অতএব ইহাকে ভক্তি বলিতে পারা যায় না, ইহা মোহ।

*

* *

কেহ বলেন জ্ঞানে মুক্তি, কেহ বলেন কর্ম্মে মুক্তি, আবার কেহ কেহ বলেন জ্ঞান ও কর্ম্ম একত্র এই উভয়ের দ্বারা মুক্তি। দার্শনিকগণের এই সব লইয়া চুল-চেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের এখানে কোনো প্রয়োজন নাই। কাকে বলে কর্ম্ম, আর কাকেই বা বলে মুক্তি তাহা লইয়াও গভীর তর্ক-বিতর্কের এখানে কোনো দরকার নাই। সাধারণ ভাষায় ঐ সব শব্দে মোটামোটি যা বুঝায় তা আমাদের সকলেরই জানা আছে, জ্ঞান বলিতে কোনো বিষয় জানা, কর্ম্ম বলিতে কোন কাজ করা, আর মুক্তি বলিতে জীবনের সার্থকতা, বা ঐরূপ একটা কিছু যাহা পাইবার জন্য সকলেই ইচ্ছা করিয়া থাক।

খালি জ্ঞানে কি হয়? খালি কর্ম্মেই বা হয় কি? কেমন করিয়া চিত্র আঁকিতে হয় চিত্রকর তাহা বেশ জানেন, কিন্তু তিনি যদি ছবি না আঁকেন ত ঐ জানায় আর না জানায় ভেদ কি? আবার এক জন চিত্রফলকে তুলি লইয়া এদিকে সেদিকে ওদিকে দাগের পর দাগ কাটিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু ঠিক জানা নাই কেমন করিয়া দাগ কাটিতে হয়। ইঁহার ঐরূপ দাগ কাটিয়া লাভ কি? তাই জ্ঞান যেমন নিজের সফলতার জন্য কর্ম্মকে চায়, কর্ম্মও ঠিক তেমনিই নিজের সার্থকতার জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করে। আর এই উভয়ের সুসদৃশ মিলনেই মানুষ নিজের লক্ষ্য স্থলে যাইতে পারে। এই হিসাবে দার্শনিকগণের ভাষায় আমরা সমুচ্চয়-বাদী, আমরা জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় চাই, দুইই আমাদের দরকার, এই দুইয়েই আমাদের মুক্তি।

তাই আমরা ইস্কুলই করি কলেজই করি বা আশ্রমই করি, অথবা আর যে-কোনো আকারেই হউক কোনো বিদ্যালয় করি, আমাদের সর্ব্বপ্রথম এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের ও কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের যোগ থাকে। অন্যথা সময় যাইবে, শ্রম যাইবে, অর্থ যাইবে, অথচ লাভ হইবে না কিছুই।

*
* *

আমরা চাই শি ক্ষ ক, তিনি যথাবুদ্ধি যথাশক্তি যা পারেন যা বুঝেন শিক্ষা-দিয়া নিজের কাজ শোধ করেন। আমরা যদি খুব বেশী কিছু চাই তবে চাই অ ধ্যা প ক কে। তিনি গ্রন্থ-সমুদ্র আলোড়ন করিয়া যাহা পাবেন, যতদূর পারেন, ছাত্র তাহার থাকুক বা না থাকুক, যা কিছু হয় তাহাকে গিলাইয়া বা পড়াইয়া, বা পাশ করাইয়া কৃতকৃত্য হন। ছেলেরা লিখিতে শিখিল, পড়িতে শিখিল, অথবা অপর কথায়, জানিয়া বুঝিয়া যাহা কিছু লইবার তাহারা তাহা লইল, কিন্তু শিখিল না তাহা প্রয়োগ করিতে।

তাহারা শিখিয়াছে কাহাকে বলে সত্য, তাহারা প্রথমভাগ হইতে পড়িতে সুরু করিয়াছে 'সদা সত্য কথা কহিবে, মিথ্যাবলিও না,' কিন্তু আচরণে তাহা দেখিতে পাইল না। সে শক্তি তাহদের হয় নি। সে অভ্যাস তাহারা করেনি কেন? আমরা যে শি ক্ষ ক চাহিয়াছিলাম, তিনি কেবল বইয়ের পড়া শিখাইয়া গিয়াছেন, অ ধ্যা প ক চাহিয়াছিলাম তিনি অ ধ্যা প না করিয়াই খালাস হইয়াছেন। আমরা কি আ চা র্য্য চাহিয়াছি যিনি নিজে আচরণ করিয়া ছাত্রকে আ চ র ণ শিখাইতে পারেন?

*
* *

ছেলেকে পাশ মাত্র করাইতে হইলে শিক্ষক, অধ্যাপক, বা অপর যা খুসী কাহাকেও রাখিলে চলে। কিন্তু যদি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উদ্দেশ্য থাকে,

ছেলেকে চিরকাল বস্তুত ছে লে ই না রাখিয়া যদি তাহাকে যথার্থ মা নু ষে র মত মানুষ করিতে হয়, তবে আমাদের আ চা র্য্য চাই, ধ্বজাধারী আচার্য্য নহে, সত্য আচার্য্য ; একজন আচার্য্য নহে, শিখাইবার ভার যে কয়টির উপর থাকিবে সকলকেই আ চা র্য্য হইতে হইবে। ইঁহারা জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের এবং কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের যোগ কিরূপ তাহা নিজের জীবনের প্রতিদিনের আচরণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শিষ্যগণকে দেখাইয়া দিবেন। যত ব্যবস্থাই হউক না, যতদিন এ ব্যবস্থা না হয়, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। মূলের দিকে না তাকাইয়া ডাল-পালালার চিকিৎসা কইরালে কি হয়!

ইস্কুল করা এক আর আশ্রম করা আব এক। শিক্ষক অধ্যাপক, বা সোজা কথায় পণ্ডিত-মাষ্টার রাখিয়া ইস্কুল চলিতে পাবে, কেন না ইস্কুলই স্কুলই, লেখা-পড়া শিখিলে বা শিখাইলেই তাহার সার্থকতা হইয়া যায়। কিন্তু আশ্রম তাঁহাদের দ্বারা চলিতে পারে না, কারণ ইস্কুল অপেক্ষা এখানে অনেক কিছু বেশী করিবার আছে, পণ্ডিত-মাষ্টারে তাহা করিতে পারেন না। ভেক লইলেই আসল বৈরাগী হওয়া যায় না, তেমনি আশ্রমের আসনে বসিলেই পণ্ডিত-মাষ্টার আচার্য্য হইতে পারেন না। প্রাচীনেরা আমাদের শুনাইয়া থাকেন এবং তাহা অতিসত্য যে, আচার্য্যও নিজে ব্রহ্মচারী, আর ব্রহ্মচর্য্যেরই দ্বারা তিনি ব্রহ্মচারীকে পাইতে চান।

ছেলের লেখা-পড়া চাই বৈ কি, নিশ্চয়ই চাই ; কিন্তু লেখা-পড়া শিখিয়া যেমন চলা উচিত তেমন যদি না চলিয়া সে আর এক রকমে চলে তবে তার সে লেখা পড়ায় দরকার কি ? সংসারের মধ্যে নিজের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনে সে যদি যথাযথ ভাবে চলিতে পারে, তবে লেখা-পড়া না শিখিলেও বিশেষ

ক্ষতি নাই; সে পরের কোনো অপকার করে না, সমগ্র সমাজের তাহাতে প্রত্যক্ষ কোনো হানি নাই। কিন্তু লেখা-পড়া শিখিলেও সে যদি যথাযথ ভাবে না চলে, তাহা হইলে কেবল নিজেরই নহে, সমস্ত সমাজেরই জীবনকে সে কলুষিত করে। তাই লেখা-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাল চলনটাকে, অর্থাৎ উচ্চ ভাষায় যাহাকে স দা চা র বলা হয় তাহাকে আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে একটা প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অনেক স্থলে আচার-আতঙ্কে ইহাকেও দূরে এড়াইয়া রাখা হয়।

*
* *

এক দল লোক আছেন, ইঁহারা যা অনুসরণ করিয়া চলেন তাহাকে সু বি ধা মা র্গ, আর ইহাদিগকে সু বি ধা-প ন্থী বলা যাইতে পারে। বস্তুত কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ সুবিধাপন্থী এ বিচার করেন না, তাহা করিবার সুবিধা তাঁহার হয় না, তিনি যখন যাতে নিজের সুবিধা মাত্র বুঝেন তাহাই করিয়া বসেন। যাহা খাইতে ভাল তাহাই খাদ্য নহে; কিন্তু সুবিধাপন্থীর ততটা ভাবিবার সময় থাকে না, তিনি সাম্‌নে যা পান তাই খান, তাহা খাইতে ভাল লাগিলেই হইল। ইহাই হইল যাহাদের ভাল-মন্দ ঠিক করিবার মাপকাঠি তাহারা সংযমের কোনো ধার ধারে না, তাই অসংযমের যাহা পরিণাম তাহা ভোগ করিতে তাহারা বাধ্য হয়।

*
* *

ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু সব সময়ে নহে। যাহা একদিন অতিক্ষুদ্র অন্যদিন তাহাই অতিবৃহৎ হইয়া উঠে। বটের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু এক দিন তাহাই অতি বিপুল বনস্পতির আকারে দেখা দেয়।

অসত্য যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না তাহা কিছুতেই সহনীয় নহে। মনে হইতে পারে ইহা অতিক্ষুদ্র ইহাতে আর কি হইবে, কিন্তু অতিক্ষুদ্র অগ্নিকণা

অতিবিশাল নগরকেও এক নিমেষে ছাই করিয়া ফেলিতে পারে। ক্ষুদ্র অসত্যকে সহিতে সহিতে বৃহৎ অসত্যকেও সহিতে দ্বিধা হয় না। তখন যতই কেন কাহারো শিক্ষা থাকুক না, তাহা বস্তুত কোনো কল্যাণের জন্য হয় না। মিথ্যাচরণের দ্বারা ধ্বংস হইতে পারে সৃষ্টি নহে।

*

লোকে বলে পরের উপকার, পরের উপকার। কিন্তু পরের উপকার জিনিসটা কি? নিজের উপকার ও পরের উপকার ইহাদের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। আমি তাই বলি, থাক্, তোমায় পরের উপকার করিতে হইবে না, নিজের উপকার কর। সূর্য্য নিজেকেই প্রকাশ করে আর অন্যে তাহাতে প্রকাশ পায়; সূর্য্য নিজের প্রকাশ ছাড়া অন্যের প্রকাশের জন্য অন্য কিছুই করে না। সূর্য্য নিজকে প্রকাশ না করিলে কে তাহাকে জানিত কে তাহার গুণ বুঝিত, কে তাহাকে আদর করিত? গোলাপ নিজকেই ফোটায় নিজেরই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যরাশি ও সৌরভসম্ভার বাহিরে প্রকাশ করিয়া শোভা পায়, তা ছাড়া পরের মনোরঞ্জনের জন্য সে কি করে? মানুষও সেইরূপ দয়া প্রভৃতি অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণসমূহকে প্রকাশ করিয়া নিজেরই উপকার করে, তা ছাড়া পরের জন্য এক কড়াও সে বেশী কিছু করে না। কিন্তু 'পরের উপকার করিয়াছি! পরের উপকার করিয়াছি!' এই ভাবিয়া লোকের অভিমান হয় অতিদুর্জ্জয়।

* *

শত্রু ভাল নহে সত্য, কিন্তু এমনো শত্রু আছে যাহা দ্বারা বস্তুত উপকার পাওয়া যায়, যাহার সহিত শত্রুতা করিতে গেলে বহু উন্নতি হয়। ভক্তিপন্থীরা বলেন, ভগবানের সহিত শত্রুতা করিতে গিয়া হিরণ্যকশিপু ও শিশুপাল উদ্ধার পাইয়াছিলেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের সহিত শত্রুতা করিতে গিয়া প্রজাদের নিকটে

নিজেকে আদর্শ রাজা করিতে পারিয়াছিলেন। শত্রু যদি বহুগুণশালী হয় তবে নিজেকেও সেইরূপ না করিলে তাহার সহিত শত্রুতা করা কখনই শোভা পায় না। তাই যে সমস্ত বীর উদারহৃদয়, তাঁহারা গুণশালী শত্রুকে পাইয়া গৌরব অনুভব করেন। ইঁহারা শত্রুর গুণকে কখনো অপলাপ করেন না বরং প্রীত-চিত্তে তাহা কীর্ত্তনই করিয়া থাকেন। যাঁহারা যথার্থ বীর তাঁহাদের চরিত্র এইরূপই দেখা যায়। কিন্তু আর একজাতীয় লোক আছে, ইহারা শত্রুর গুণকে দেখিতেই পায় না, তাহার কীর্ত্তন করা ত দূরে। ইহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভীরু ও দুর্ব্বল, ইহাদিগকে কিছুতেই বীর শব্দে উল্লেখ করা চলে না। শত্রুর গুণকে যখন ইহারা দোষরূপে বর্ণনা করে, তখন ইহারা তাহাতে নিজেকেই সকলের নিকট ক্ষুদ্র করে মাত্র। সমস্ত লোকই ত অন্ধ নহে, আর সূর্য্যকেও কেহ চিরকাল ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

*
* *

আশ্রমসংবাদ

পূজনীয় গুরুদেব এপর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ছিলেন, সম্ভবত ৩রা আগষ্ট তিনি সুইডেন ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তারপরে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড সুইজারলেণ্ড এবং ফ্রান্স প্রভৃতি ঘুরিয়া অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তাঁহার আমেরিকায় যাত্রা করিবার কথা আছে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব গুরুদেব সম্বন্ধে কতকগুলি খবর জানাইয়াছেন। আমরা তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি।

লণ্ডনের Union of East and West সভার সভ্যেরা পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমাগত সভ্যদের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার উপলক্ষ্যে Mr. Charles H. Roberts বলিলেন—রবীন্দ্রনাথের বাণী মূলত এবং বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষীয় হইলেও তাহা সমগ্র জগতে সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। প্রাচ্য জগতে যে সকল নূতন শক্তি কার্য্য করিতেছে সেগুলি বিচার করিয়া বুঝিবার সময় আমাদের আসিয়াছে। এখন সমগ্র প্রাচ্য দেশের চিত্ত চঞ্চল। এই মহা যুদ্ধের অবসানে আমাদের ইউরোপে Militarismএর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রনীতিবিশারদরা যেন এ কথা বিস্মৃত না হন যে, কোন সাম্রাজ্য কেবলমাত্র বলের উপর ভর করিয়া চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ইহার পর Miss Sybil Throndike সভাস্থলে Mr. Lawrence Binyonএর রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন— এখানে আমাকে সমাদর করবার জন্য

আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা অধিকাংশই আমার কাছে অপরিচিত; ভবিষ্যতে আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না। আপনারা যে এই আতিথ্য-উৎসবে আমার উপর অজস্রধারে প্রীতিসুধা বর্ষণ করলেন তার প্রতিদান স্বরূপ ধন্যবাদ দেবার উপযুক্ত ভাষা আমার নাই। আমি যে ভাষায় আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করচি তা আমার মাতৃভাষা নয়; সেইজন্যে এই কৃতজ্ঞতা নিবেদন স্বল্প এবং নিরলঙ্কার হলেও ক্ষমার যোগ্য। আমার জীবনের অস্তাচলপথে আমি সম্মান লাভ করেছি, সেইজন্যে অকুণ্ঠিতচিত্তে তাকে নিজের জিনিষ বলে জোর করে গ্রহণ করতে আমার মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। সম্মান গ্রহণ করতেই আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকে এবং তার জয়মাল্য কণ্ঠে অম্লান শোভায় চিরশোভমান হবে এ আশ্বাস বাক্যে আমার মন ভুলতে চায় না। জীবনের পঞ্চাশ বৎসর আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্তে নির্জ্জনতার আনন্দ উপভোগ করেছি। মরুভূমির মেষপালকের মত কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুণে আমার যৌবনকাল কেটে গেছে; সে নক্ষত্রসভা আমার দোষগুণ বিচার করে নি, আমাকে পুরস্কারও দেয় নি। এই জন্যে অপরে জনসাধারণের বাহবা যেমন সহজে গ্রহণ করে, আমি তেমন করে পারি না।

সম্মান, সে ত সমাধিস্তম্ভের মত, তা মৃতের জন্য। কিন্তু প্রীতি সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোক, তা জীবিতের জন্য। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই আনন্দ উপভোগ করচি যে, এই পান্থশালায় দু'দিন যাত্রী হয়ে এসেও আমি এত বন্ধুসঙ্গ লাভ করলুম। যখন এখান থেকে চলে যাব তখন আপনাদের হৃদয়ে এই অতিথির আসনখানি চিরপ্রতিষ্ঠিত করে' রেখে যাব। আমার সাহিত্যপ্রতিভা এই যোগ রক্ষা করবে না, আমাদের এই প্রীতির বিনিময় এবং পরস্পরের আত্মার যোগের অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্ম অনুভূতি বাইরের তুচ্ছ ভেদাভেদকে উপেক্ষা করে আপনাদের সঙ্গে আমার যোগ রক্ষা করবে।

১০ই জুলাই গুরুদেব Professr ও Mrs.Hare Leonardএর সহিত ব্রিষ্টল

গিয়াছিলেন। কিছুদিনপূর্ব্বে Professor Leonard সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। Cliftonএর Boarding Schoolএর মেয়েরা গুরুদেবের 'রাজা' নামক নাটকের ইংরাজী অনুবাদ "The King of the Dark Chamber" অভিনয় করিয়াছিল। এই মেয়েরা পূর্ব্বেও একবার স্বেচ্ছায় এই নাটক অভিনয় করিবার জন্য বাছিয়া লইয়াছিল, এবং এবারেও কঠিন হইলেও এমন সহজে এবং এমন দক্ষতার সহিত সকলে অভিনয় করিয়াছিল যে, দর্শকেরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অভিনয়ের পূর্ব্বে খুব ছোট মেয়েরা ছন্দের গতিভঙ্গীর সহিত "Crescent Moon" হইতে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল। সকল শিশুই পরম উৎসাহে সমস্ত হৃদয় দিয়া এই অভিনয় এবং আবৃত্তি করিয়াছিল। নাট্যমঞ্চে আড়ম্বর খুব কমই ছিল; বালিকারা খুব ছোট হইলেও এমন ভাবে অভিনয় করিয়াছিল যে, দেখিয়াই মনে হইল যে তাহারা নাটকের অন্তর্নিহিত গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। উহাঁদের শিক্ষক বলিলেন, ঐ অভিনয়ের পর হইতে বালিকাদের চরিত্রে এবং ব্যবহারে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে।

বালিকারা অভিনয়ের পর গুরুদেবকে ঘেরিয়া বসিল এবং অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার বাক্যসুধা পান করিতে লাগিল। গুরুদেব বলিলেন, সুদূর বাঙ্‌লা দেশে তিনি যে নাটক লিখিয়াছেন ইংলণ্ডে তাহার অভিনয় দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁহার মনে হইল যেন সাত সমুদ্র পারে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম সোনার কাঠির স্পর্শে ভাঙিয়া গেল। ইংলণ্ড সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার দেশ, সোনার কাঠির স্পর্শে জাগরণের পর তাঁহার কথাগুলি যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গুরুদেব তাহাদিগকে "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নাটিকা ও Crescent moon হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি চলিয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিল। মেয়েরা সকলেই খুসী হইয়াছিল; কেবল গুরুদেব উটের পিঠে চড়িয়া না আসিয়া motorএ আসিয়াছেন দেখিয়া একটি মেয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল।

সেইদিন বিকালে গুরুদেব মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে Bristol Universityর Professor Lloyd Morgan Mr. Arnold Thomas প্রভৃতির সহিত গুরুদেবের পরিচয় হইয়াছিল এবং তাঁহার শিক্ষার আদর্শ কি তাহা তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন।

বিখ্যাত cinema অভিনেত্রী Mary Pickfordকে দেখিবার জন্য Kensington Palace gardensএ একদিন বহুলোক সমাগত হয়। এই জনতার কারণ জানিবার জন্য পূজনীয় গুরুদেব সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। জনতার মধ্যে কেহই জানিতে পারে নাই যে ভারতবর্ষের কবি তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

সেখান হইতে বাসায় ফিরিবার পরে প্রবেশদ্বারে Daily Newsএর এক সংবাদদাতা তাঁহার নিকটে গিয়া জনতার কারণ জানাইল। Cinemaর অভিনেত্রীকে দেখিবার জন্য এত জনতা, এত আগ্রহ সম্বন্ধে গুরুদেবের মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"এই জনতার উপর যিনি এমন প্রভাব বিস্তার করেচেন, তিনি আমার পরিচিত নন্, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে অসম্মানসূচক কোনো কথা বলা আমার উচিত নয়। আমাকে না বল্লে আমি কখনো এই ভীড়ের কারণ ভাবতেও পারতুম না। আমার এই ধারণা ছিল যে, সংসারের কোলাহলের বাইরে যেখানে আত্মার ক্ষুধার অন্ন প্রদত্ত হয় সেখানেই আপনা হতে সরল অন্তঃকরণ জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে পবিত্রাত্মা সাধুপুরুষের দর্শন পাবার জন্য লোকের ভিড় হয়; জাপানে cherry ফুল ফোটবার সময় আবালবৃদ্ধবনিতা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। Yokohamaর দিনমজুরও অবকাশের সময় সমুদ্রতীরে বনের মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম করে, কিন্তু কোনো উন্মত্ত আনন্দস্রোতে গা ঢেলে দেবার জন্যে নয়, নিভৃতে প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। অজানা সুদূরের দিকে ছুটে যাবার জন্যে মানবাত্মার যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা আছে, তার আভাস আমি ঐ জাপানের দিনমজুরদের অবকাশযাপনের ভিতর দেখ্‌তে পেয়েছিলুম।

প্রাচীনকালে গ্রীকদেশে উচ্চ অঙ্গের নাটকাভিনয় দেখ্‌বার জন্যে কেবলমাত্র

সুশিক্ষিত লোক নয় অশিক্ষিত জনসাধারণও এসে সমাগত হত, আর সেই উচ্চ সাহিত্যের রস সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপভোগ করত। কিন্তু ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করবার এই যে একান্ত আগ্রহ, তা দেখে আমার চিত্ত বড় ক্ষুব্ধ হয়। যে পূজার পাত্র তার মধ্যে যদি একটি চিরন্তন মাহাত্ম্যের আদর্শ থাকে তবেই জনসাধারণ তাকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে; একেই বলে যথার্থ বীরপূজা, আর এই আদর্শই দেশের চিত্তকে জাগিয়ে তুলতে পারে।”

*

* *

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিনে একটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

লোকমান্য টিলক মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ আশ্রমে পৌঁছিলেই সেদিনকার মত অধ্যাপনার কাজ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত এন্‌ড্রুজ্‌, বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন। টিলক মহাশয়ের শ্রাদ্ধদিনে প্রাতে মন্দিরে উপাসনা এবং অপরাহ্নে একটি সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মন্দিরে গীতা পাঠ করিয়াছিলেন। তারপর সায়াহ্নে শতাধিক দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজন করানো হইয়াছিল। সেই দিনও আশ্রমের অধ্যাপনাদির কার্য্য বন্ধ ছিল।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় গত ৩০শে শ্রাবণ আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তাঁহাকে কলাভবনে সংবর্দ্ধনা করা হইলে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি অতি সারবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

সুহৃৎ কাপের জন্য আশ্রম-বালকদের ফুটবল খেলা শেষ হইয়াছে। এবৎসরে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয় বর্গের ছাত্রেরা জয় লাভ করিয়াছে। তারপরে বোলপুরের ছাত্রদের সহিতও আশ্রমবালকদের দুইদিন খেলা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনের খেলায় আশ্রমপক্ষ এক গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়

দিনেও আশ্রমবালকেরা দুই গোলে জয়ী হইয়াছিল। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্রেরা গত ৩০শে শ্রাবণ ফুটবল খেলিবার জন্য আশ্রমে আসিয়াছিলেন। পরদিন অপরাহ্নে খেলা হইয়াছিল। আশ্রমবালকেরা এই খেলায় তিন গোলে পরাজিত হইয়াছিল।

শ্রীমান্ অনাদিকুমার দস্তিদার এবং শ্রীযুত মলয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে আশ্রম-সম্মিলনীর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাঁওতালপল্লী ও ভুবনডাঙার বিদ্যালয়াদি আশ্রম বালকেরা ভালই চালাইতেছে। তাহা ছাড়া সাহিত্য-সভারও কাজ নিয়মিত অধিবেশনাদি হইতেছে। শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশী সাহিত্য সভার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
পত্রিকাবিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও স্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadananda Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল

দ্রষ্টব্য

কলিকাতায় নং ২০।বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এণ্ড কোম্পানিতে খুচরা "শান্তিনিকেতন" নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁহারা ঐ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,

"শান্তিনিকেতন"

(পত্রিকাবিভাগ)

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩২৭ সাল

বৌদ্ধদর্শন

আত্মতত্ত্ব

[আজ আমরা এই প্রসঙ্গে মূল পালির দুইটি অংশ অনুবাদ করিয়া দিব; প্রথম অ ন ত্ত-ল ক্ খ ন সু ত্ত আর দ্বিতীয়, মিলিন্দপ্রশ্নের সুপ্রসিদ্ধ র থে র উ প মা।

অ ন ত্ত ল ক খ ণ সু ত্ত, (অনাত্মলক্ষণসূত্র) বিনয়পিটকের মধ্যে (মহাবগ্গ ১, ৬ ৩৮—৪৭)। বুদ্ধদেব বৈশাখী পূর্ণিমায় বোধি লাভ করিয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বারাণসীতে নিজের পূর্ব্ব সহচর পাঁচটি ভিক্ষুকে * প্রথম উপদেশ দিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, অর্থাৎ ধর্ম্মের চাকাকে চালাইয়া দেন। ইহার পর চারদিন চলিয়া গেলেও তিনি যখন দেখিলেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব যতদূর বুঝা উচিত ছিল ততদূর তাঁহারা বুঝিতে পারেন নি তখন তাঁহাদের আসব (আস্রব)† ক্ষয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, আলোচ্য সূত্রে তাহাই রহিয়াছে।

ভিতরে হউক বা বাহিরেই হউক, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান, এই কয়টি ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। ইহাদের মধ্যে কোনোটিকেই আত্মা বলিতে পারা যায় না।

---

* অঞ্ঞা কোণ্ডঞ্ঞ, ভদ্দিয়, বপ্প, মহানাম, ও অস্‌সজি।

† কাম, ভব, দৃষ্টি, ও অবিদ্যা। দ্রষ্টব্য জ্যৈষ্ঠের পত্রিবগ, পৃ-৬৯।

অ নু রা ধ সু ত্তে (আষাঢ়-সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ইহার একটি কারণ দেখান হইয়াছে, এখানেও অন্যান্য যুক্তিতে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

আত্মবাদীরা বলেন, আত্মা স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্ববশ, দেহাদির স্বামী, নিত্য, কর্ত্তা, জ্ঞাতা, ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বলেন এইরূপই যদি আত্মা হয়, তবে সে আত্মা কোথায়? এই বিশ্বের মধ্যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই। অতএব আত্মা নামে যদি কিছু থাকে তবে এই গুলিরই মধ্যে কোনোটি, অথবা ইহাদের সমষ্টিই আত্মা হইবে বলিতে হয়, কিন্তু তাহা বলা যায় না। ইহার কারণ এই—ইহা ঠিক যে, রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, ও ভঙ্গ আছে। এখন রূপের সম্বন্ধে যদি এইরূপ বলা যায় যে, ইহা তো উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ইহার যেন স্থিতি না হয়, অথবা স্থিতি হইলেও ইহার যেন ভঙ্গ না হয়, তাহা হইলে তদনুরূপ কার্য্য হয় না; স্বভাবানুসারে তাহার উৎপত্তিও হয়, স্থিতিও হয়, ভঙ্গও হয়। অতএব ইহা কাহারো বশীভূত নহে। এখন রূপ যদি আত্মা হয় তবে বলিতে হইবে, তাহা স্বতন্ত্র ও স্বামী। স্বতন্ত্র ও স্বামী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তেমনি হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, রূপ-আত্মা যাহা ইচ্ছা করিয়াছিল তাহা হয় নি। রূপ-আত্মা ইচ্ছা করে যে, তাহার যেন ভঙ্গ না হয়, কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না। বিজ্ঞানাদিরও প্রত্যেকের, অথবা ইহাদের সকলের সমষ্টি সম্বন্ধেও এইরূপ। অতএব যখন দেখা যাইতেছে রূপাদি স্বতন্ত্রও নহে, এবং স্বামীও নহে, তখন তাহারা আত্মা হইতে পারে না। আবার, রূপাদি যদি আত্মা হইত তবে তাহাদের রোগ-জরা-ধ্বংস হইত না, কেননা আত্মা কখনো নিজের এই সমস্ত দুখ চাহে না, অথচ এই সব হইয়া থাকে। আবার রূপাদির ক্ষয় আছে বলিয়া আত্মা নিত্যও হইতে পারিল না। আরো, রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে বাসকারী, কর্ত্তা, বা জ্ঞাতা, বা অধিষ্ঠাতা কেহ থাকিলে তাহাকেও আত্মা বলা যাইত, কিন্তু তাহাও তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেননা পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি স্কন্ধের অতিরিক্ত কিছু নাই। এইরূপে কোনো পদার্থ আত্মা হইতে পারে না ইহা দেখাইয়া আলোচ্য সূত্রে সমস্ত বস্তুকেই অনিত্য ও দুঃখ রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

মিলিন্দপ্রশ্নে (মি লি ন্দ প ঞ্‌ হ, ২ ১ ১ পৃ: Trenckner, pp. 25-28) রথের উপমায় সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা বলিয়া বস্তুত কোনো পদার্থ নাই, উহা কেবল একটা নাম বা সঙ্কেত, লৌকিক ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য একটা শব্দমাত্র।

এই প্রকরণে আত্মা শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই, পুগ্‌গল (অর্থাৎ সংস্কৃত পুদ্গল) শব্দ ধরা হইয়াছে। পুদ্গল শব্দের অর্থ পুরুষ বা জীব, এবং জীব ও আত্মা বস্তুত একই। নিম্নলিখিত বাক্যটি (শিক্ষাসমুচ্চয়, ২৩৬ পৃ) দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইবে—

" পুনরত্র কশ্চিদ্ আত্মভাবে সত্তো বা জীবো বা জন্তুবা পোষো বা পুবষো বা পুদ্গলো বা মনুজো বা যো জায়তে বা জীর্যতে বা চ্যবতে বোৎপজ্জতে বা। এষা ধর্ম্মণাং ধর্ম্মতা।"

"এই যে আত্মভাব অর্থাৎ জন্ম ইহাতে এমন কোনো সত্ত্ব, বা জীব, বা জন্তু, বা পুরুষ, বা পুদ্গল, বা মনুজ নাই যে জন্মায় বা জরা প্রাপ্ত হয়, বা মৃত হয়। ইহা বস্তুসমূহের স্বভাব।"

আত্মার সম্বন্ধে ত্রিপিটকে যাহা-যাহা বলা হইয়াছে, মিলিন্দপ্রশ্নে তাহাদের সিদ্ধান্ত করিয়া দেখান হইয়াছে।

অনত্তলক্খণসুত্ত

মহাবগ্গ, ১.৬.৩৮

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ আত্মা নহে। ভিক্ষুগণ, রূপ যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে এই রূপের রোগ হইত না, আর রূপের সম্বন্ধে বলিতে পারা যাইত যে, 'আমার রূপ এই প্রকার হউক, আমার রূপ যেন এই প্রকার না হয়।' কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপ আত্মা নহে, সেই জন্য রূপের রোগ হয়, এবং ইহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় না যে, 'আমার রূপ এই প্রকার হউক, আমার রূপ যেন এই প্রকার না হয়।'

হে ভিক্ষুগণ, বেদনা…সংজ্ঞা…সংস্কার… ও বিজ্ঞান আত্মা নহে,…সেই-জন্য বিজ্ঞানের রোগ হয়, এবং ইহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় না যে, 'আমার বিজ্ঞান এই প্রকার হউক, আমার বিজ্ঞান যেন এই প্রকার না হয়।'

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর? রূপ নিত্য কি অনিত্য?"

"ভগবন্, অনিত্য।"

"যাহা অনিত্য, তাহা সুখ না দুঃখ?"

"ভগবন্, দুঃখ।"

"যাহা অনিত্য, দুঃখ, ও যাহা বিবিধ পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কি এইরূপ ভাবে দেখা উচিত যে, 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা?' "

"নিশ্চয়ই না ভগবন্।"

"অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যে-কোনো রূপ অতীত, অনাগত, বা বর্ত্তমান, শরীরের ভিতরে বা বাহিরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট, দূরে বা নিকটে, —সেই সমস্ত রূপকে, ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, এবং ইহা আমার আত্মা নহে, এই প্রকারে যথাভূত ভাবে (যাহা যেরূপ রহিয়াছে তাহাকে ঠিক সেই-রূপে) সম্যক্ প্রজ্ঞার দ্বারা দেখিতে হইবে।

"যে কোনো বেদনা ··· সংজ্ঞা ··· সংস্কার ·· বিজ্ঞান ··· এইরূপে যথাভূত ভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান্ আর্য্যশ্রাবক এইরূপ দেখিয়া রূপেও, বেদনাতেও, সংজ্ঞাতেও, সংস্কারেও ও বিজ্ঞানেও নির্ব্বেদ অনুভব করে, নির্ব্বেদ অনুভব করিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়, বৈরাগ্য দ্বারা বিমুক্ত হয়, এবং বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান তাহার উৎপন্ন হয়, সে জানিতে পারে যে, জন্মের ক্ষয় হইল ব্রহ্মচর্য্যবাস সম্পন্ন হইল, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইল, আর কিছু এইরূপের (সংসারভাব বা সংসারক্ষয়ের) জন্য নাই।"

ভগবান্ ইহা বলিয়াছিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভগবানের উক্তিকে অভিনন্দন করিয়াছিল। যখন এই ব্যাখ্যা করা হইল তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত ('আমি' 'আমার' এইরূপ কোনো বিষয় বা আসক্তি) গ্রহণ না করিয়া সমস্ত আস্রব হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল।

মিলিন্দপ্রশ্ন

২. ১. ১

১। অনন্তর রাজা মিলিন্দ যে-স্থানে মাননীয় নাগসেন ছিলেন সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দিত হইলেন; এবং পরস্পরে স্মরণীয় প্রীতিপ্রদ সম্ভাষণ করিলে, এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মাননীয় নাগসেনও আনন্দিত হইয়া তাহা দ্বারা রাজা মিলিন্দের চিত্তরঞ্জন করিলেন।

রাজা মিলিন্দ মাননীয় নাগসেনকে বলিলেন—"ভগবন্ আপনি কিরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন?—ভগবন্, অপনার নাম কি?"

"মহারাজ, 'নাগসেন' বলিয়া আমি জ্ঞাত হইয়া থাকি; আমার সব্রহ্মচারিগণ আমাকে 'নাগসেন' বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। পিতা মাতা নাম করিয়া থাকেন—নাগসেন, বা শূরসেন, বা বীরসেন, বা সিংহসেন, কিন্তু মহারাজ, 'নাগসেন'—ইহা একটী বুদ্ধি, বিজ্ঞাপন, সংজ্ঞা, ব্যবহার, নাম মাত্র; কেন না, এখানে পুরুষের (অর্থাৎ জীবের বা আত্মার) উপলব্ধি হয় না।"

অনন্তর রাজা মিলিন্দ বলিলেন—"আপনারা এই পঞ্চশত যবন, ও অশীতি সহস্র ভিক্ষু শ্রবণ করুন—এই নাগসেন বলিতেছেন, পুরুষের উপলব্ধি হয় না। ইহা কি অভিনন্দনের উপযুক্ত?" অনন্তর তিনি মাননীয় নাগসেনকে বলিলেন—"ভগবন্ নাগসেন, যদি পুরুষ না থাকে তবে কে আপনাদিগকে চীবর, পিণ্ডপাত (পাত্রে খাদ্যপ্রদান) শয়নাসন স্থান, ব্যাধি সময়ে অপেক্ষিত ঔষধ, ও আবশ্যক দ্রব্যসমূহ প্রদান করে? কে তাহা উপভোগ করে? কে শীল রক্ষা করে? কে ভাবনা অভ্যাস করে? কে (স্রোত-আপত্তি প্রভৃতি) মার্গ, তৎফল-সমূহ ও নির্ব্বাণকে প্রত্যক্ষ করে? কে প্রাণিহত্যা করে? কে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করে? কে ব্যভিচার করে? কে মিথ্যা বলে? কে মদ্য পান করে? কে ইহ জন্মেই বিরস ফলোৎপাদক পঞ্চবিধ কর্ম্ম[৩] করিয়া থাকে? অতএব কুশল নাই, অকুশল নাই; কুশল ও অকুশল কর্ম্মের কর্ত্তাও কেহ নাই, তাহার কারয়িতাও কেহ নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল-বিপাকও কিছু নাই। ভগবন্ নাগসেন, যদি আপনাদিগকে কেহ বধ করে, তাহারও প্রাণাতিপাত করা হইবে না! ভগবন্ নাগসেন, আপনাদের তবে কেহ আচার্য্য নাই, উপাধ্যায় নাই, উপসম্পদা নাই, আপনি যাহাকে

৩। মাতৃবধ, পিতৃবধ, অর্হদ্‌বধ, দুষ্টচিত্তে তথাগতের রক্তপাত করা ও সঙ্ঘভেদ। মতান্তরে সঙ্ঘভেদ-স্থলে অপর ধর্ম্মশাস্তার অনুসরণ।

লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন 'মহারাজ, আমার সব্রহ্মচারিগণ আমাকে নাগসেন বলিয়া আহ্বান করেন; এখানে নাগসন কে? ভগবন্, কেশগুলি কি নাগসেন?"

"না মহারাজ।"

"লোমসমূহ নাগসেন?"

"না মহারাজ।"

তবে কি নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মূত্রাশয়, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুস্ফুস্, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, শ্লেষ্মা, পূয, শোণিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, কফ, সিংঘাণ, লালা, মূত্র অথবা মস্তিষ্ক নাগসেন?"

"না মহারাজ।"

"রূপ নাগসেন?"

"না মহারাজ?"

"বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা, বা বিজ্ঞান নাগসেন?"

নাগসেন সর্ব্বত্রই উত্তর করিলেন 'না'।

"তবে কি ভগবন্, রূপ, বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চ স্কন্ধ (সমষ্টিরূপে) নাগসেন?'

"না মহারাজ।"

"ভগবন্, তবে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হইতে অন্যত্র কিছু নাগসেন?"

"না মহারাজ।"

"ভগবন্, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া নাগসেনকে তো দেখিতে পাইতেছি না! ভগবন্, 'নাগসেন'—ইহা কি কেবল শব্দই? তবে এখানে বিদ্যমান নাগসেন কে? ভগবন্, ব্যর্থ আপনি মিথ্যা বলিতেছেন যে, নাগসেন নাই!"

মাননীয় নাগসেন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—"মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়ের

মধ্যে সুকুমার, অত্যন্ত সুকুমার। মধ্যাহ্ন সময় হইয়াছে, ইহাতে তপ্ত ভূমি ও উষ্ণ বালুকার উপর তীক্ষ্ণ শর্করা (কাঁকর), ভগ্নমৃৎপাত্রখণ্ড, ও বালুকা সকল মর্দ্দন করিয়া পদব্রজে আগমন করায় (সম্ভবত) আপনার চরণ উপহত হইয়াছে, এবং স্পর্শজ্ঞান দুঃখময় বোধ হইতেছে। মহারাজ, আপনি পদব্রজে অথবা কোন বাহনে আগমন করিয়াছেন?"

"ভগবন্, আমি পদব্রজে আসি না; রথে আসিয়াছি।"

"আপনি যদি মহারাজ, রথে আগমন করিয়া থাকেন, তবে রথ কি আমাকে বলুন:—

ঈষা (রথের অক্ষ ও যুগ সংযোজক দণ্ড) কি রথ?"

"না ভগবন্"

"অক্ষ রথ?"

"না ভগবন্।"

তবে কি চক্র, না রথপঞ্জর, না রথদণ্ড, না যুগ, না রজ্জু, না রথচালন যষ্টি রথ?"

রাজা সর্ব্বত্রই না বলিলেন।

"মহারাজ, তবে কি ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথ, পঞ্জর, রথ দণ্ড, যুগ রজ্জু ও রথ চালন যষ্টি (সমষ্টিরূপে) রথ?"

"না ভগবন্।"

"তবে কি মহারাজ, ঈষা, অক্ষ প্রভৃতি হইতে অন্যত্র কোন বস্তু রথ?"

"না ভগবন্।"

"মহারাজ, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া রথ দেখিতে পাইতেছি না! মহারাজ, 'রথ' ইহা কি কেবল শব্দই? তবে এখানে বিদ্যমান রথ কি? ব্যর্থ আপনি মহারাজ বলিতেছেন 'রথ নাই!' মহারাজ, আপনি জম্বুদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূপতি, কাহাকে ভয় করিয়া আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন? পঞ্চশত যবন ও অশীতি সহস্র ভিক্ষু, আপনারা শ্রবণ করুন,

এই মিলিন্দ নরপতি বলিতেছেন—'আমি রথে আগমন করিয়াছি,' কিন্তু যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল—মহারাজ আপনি যদি রথে আসিয়া থাকেন তবে বলুন রথ কি, তখন তিনি তাহা প্রতিপাদন করিতে পারিতেছেন না। ইহা কি অভিনন্দনের যোগ্য ?"

এই শুনিয়া পঞ্চশত যবন মাননীয় নাগসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—"মহারাজ, এখন যদি আপনি সমর্থ হন, আলাপ করুন।"

অনন্তর রাজা মিলিন্দ মাননীয় নাগসেনকে বলিলেন—"ভগবন্, আমি মিথ্যা বলিতেছি না। ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর ও রথদণ্ড-হেতুই 'রথ' এই বুদ্ধি সংজ্ঞা, বিজ্ঞাপন, ব্যবহার, ও নাম প্রবৃত্ত হয়।

"সাধু, মহারাজ। রথ কি আপনি তাহা জানেন। আমাদেরও মহারাজ, এইরূপ কেশলোমাদি ও রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ হেতুই 'নাগসেন' এই বুদ্ধি, সংজ্ঞা, বিজ্ঞাপন, ব্যবহার ও নামমাত্র প্রবৃত্ত হয়। পরমার্থত এখানে পুরুষের উপলব্ধি হয় না। মহারাজ, বজ্রা (বজিরা) নামক ভিক্ষুণী ভগবানের সম্মুখে ইহা বলিয়াছেনও—

"অঙ্গসমূহের যোগে 'রথ' সংজ্ঞা যথা।
স্কন্ধচয় হেতু 'জীব' ব্যবহার তথা॥" ৪

"আশ্চর্য্য ভগবন্ নাগসেন! অদ্ভুত ভগবন্ নাগসেন! অতি বিচিত্র রূপে প্রশ্নের উত্তর করা হইয়াছে। যদি বুদ্ধ উপস্থিত থাকিতেন তিনি আপনাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেন! সাধু সাধু নাগসেন! অতি বিচিত্র রূপে প্রশ্নের উত্তর করা হইয়াছে!"

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

৪। সংযুত্তনিকায়, ৫ ১০. ৫।

পারসীকপ্রসঙ্গ

গাথাচতুষ্টয়

শ্রাবণের পত্রিকায় পারসীকদেব বিবাহ অনুষ্ঠানে আশীর্ব্বাদের মধ্যে চারি স্থানে (§§ ২৩, ২৪-২৫, ৩০, ৩২) যস্নের চারিটি গাথার ভাবার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে অবেস্তার ঐ কয়েকটি গাথায় মূল, আক্ষরিক সংস্কৃত, ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইতেছে। এই সঙ্গে নের্যোসঙ্ঘের[১] সংস্কৃত যোজিত হইতেছে; পহ্লবী ভাষায় অবেস্তার যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা হইতেই এই সংস্কৃত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা নের্যোসঙ্ঘের করা অবেস্তার সংস্কৃত অনুবাদের আদর্শ বুঝা যাইবে। বাহুল্য-ভয়ে টীকায় ধ্বনিতত্ত্ব- (Phonology) বিষয়ক নিয়মগুলির উল্লেখ করা হইল না।[২]

১

যস্ন ৫৯. ৩০

অবেস্তা

১। বঙ্‌হু তূ তে বঙ্‌হওত্‌ বঙ্‌হো বুয়াত্‌,

২। হ্বাবোয় যত্‌ জ.ওথ্রে হনবেশ।

৩। তূ তুম্‌ তত্‌ মীঝা.দেম্‌ যত্‌ জ.ওত হনয়ন্নো আউঙ্‌হ

৪। ফ্রায়ো-হুমতো ফ্রায়ো-হূখ্‌তো ফ্রায়ো-হ্বরশ্‌তো।

১। অথবা দীনদাক বন্ধনের; দ্রষ্টব্য খুর্দ-অবস্তার্থ। (Collected Sanskrit Writings of the Parsis, Part 1) পৃ. ৪৩, "বৈবাহস্ত পইমানী"।

২। দুঃখের বিষয় আমাদের ছাপাখানায় যথাযথ ধ্বনি প্রকাশ করিবার উপযুক্ত কতকগুলি হরপ না থাকায় যেমন-তেমন করিয়া কোনরূপে কাজ সারিতে হইতেছে। পাঠকগণ এই ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

সংস্কৃত

১। বস্ব তু তে বসোঃ বসীয়স্ ভূয়াৎ,

২। স্বায় যৎ হোত্রে সনেথাঃ।

৩। ত্বম্ তু তৎ মীঢ়ম্ যৎ হোতা সনয়মানঃ আস

৪। প্রায়ঃ-সুমতঃ প্রায়ঃ-সূক্তঃ প্রায়ঃ-সুবর্হিতঃ।

নের্যোসজ্ঘের সংস্কৃত

১। উত্তম তে উত্তমতয়া উত্তমতরং ভূয়াৎ।

২। স্বকীয়ং যস্য তে জ্যেতি[২] যোগ্যা জাতোঽসি।

৩। ত্বং তৎ পায়িতোষিকং অর্হ যৎ কোঽপি হোতা স্বর্গীয়ং পারিতোষিকং আর্হ

৪। যো প্রায়েণ সুমতানি মন্তা প্রায়েণ সূক্তানি বক্তা প্রায়েণ চ সুকৃতানি কর্ত্তা।

বঙ্গানুবাদ

১। হে কল্যাণ, তোমার কল্যণ হইতেও কল্যণতর হউক।

২। হোম কার্য্যে যাহা তোমার নিজের জন্য তাহা তুমি লাভ কর।

৩। তুমি সেই কামকে (কাম্য বস্তুকে) লাভ কর হোতা যাহা লাভ করিয়া আছেন,

---

২। জ্যো তি পাঠান্তর।

৪। —যে হোতা যাহা সুচিন্তা প্রায় তাহা চিন্তা করেন, যাহা সুভাষিত প্রায় তাহা বলেন, এবং যাহা সুকৃত প্রায় তাহা করেন।

টীকা

ব ঙ্ হু, সং. ব সু, 'ভদ্র,' 'মঙ্গল,' 'উত্তম'। এখানে ইহা সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, তদনুসারে ব সো লিখিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে।

তূ, সং. তু, নিশ্চয়বোধক অব্যয়।

ব ঙ্ হ ও ত্, সং. ব সোঃ, ৫মী এক. 'মঙ্গল হইতে'।

ব ঙ্ হো, সং. ব সী য় স্ ১মা এক, 'বসুতর,' 'মঙ্গলতর'।

বূ য়া ত্, সং. ভূ য়া ৎ, 'হউক'।

হ্বা বো য়, সং. স্বা য়, স্বস্মৈ।

জ় ও থ্রে, সং, হো ত্রে, ৭মী এক., 'হোমীয় দ্রব্যে', 'হোমকার্য্যে'।

হ ন য়ে শ, সং. স নে থাঃ, অবেস্তার হ ন্ ধাতু = সং. স ন্ ধাতু, ইহারই বিধিলিঙ্. আত্মনে. মধ্য. এক.। আবেস্তায় প্রায়ই এই ধাতুর অর্থ 'যোগ্য হওয়া,' কিন্তু সংস্কৃতে 'অর্জ্জন করা,' 'লাভ করা'।

তূ, সং. ত্ব ম্, 'তুমি'।

তূ ম্, সং. তু, নিশ্চয়ার্থক অব্যয়।

মী ঝ্.দে ম্, সং. মী ঢ ম্, মি হ্ ধাতু ত প্রত্যয়, 'কাম' 'কাম্য বস্তু,' বৈদিক সাহিত্যেও ইহা এই অর্থে পাওয়া যায়। অবেস্তার ঝ.দ্ = সং. ঢ়, দ্রষ্টব্য Jackson's Avesta Grammer, § 183.

জ়্ ও ত, সং হো তা।

হ ন য় ম্নো, সং. স ন য় মা নঃ, পূর্ব্বোক্ত অবে. হ ন্ (সং. স ন্) ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় ; 'অর্জ্জন করিয়া,' 'লাভ করিয়া'।

আ উ ঙ্ হ্, সং. আ স, অ স্ ধাতু লিট্, প্রাচীন প্রয়োগ, 'ছিল,' এখানে 'আছে'।

ফ্রা য়ো স্থ ম তো, সং. প্রা য়ঃ সু ম তঃ, 'যে বহুল ভাবে সুচিন্তা করে'।

ফ্রা য়ো স্থ থ্ তো, সং, প্রা য়ঃ-সূ ক্তঃ, 'যে বহুল তালে যাহা ভাল কথা তাহাই বলে'।

ফ্রা য়ো হ্ব র শ্ তো, সং. প্রা য়ঃ সু ব র্হি তঃ। ব র্ শ ত পদ অবেস্তার ব রে জ্, সং. ব র্হ্ (= র রে হ্ = ব রে জ্) ধাতুর উত্তর ত-প্রত্যয় করিয়া। ব রে জ্. ধাতুর অর্থ 'কাজ করা,' ব র্হ্ অথবা বৃ হ্ ধাতুর (তুদাদি) অর্থ 'উদ্যম-করা'। অতএব সমগ্র পদটির অর্থ 'যাহা ভাল তাহাই বহুল ভাবে করে'।

২

যস্ন ৫৯. ৩১

অবেস্তা

১। জম্যাত্ বো বঙ্হ্ওত্ বঙ্হো।

২। মা বো জম্যাত্ অকাত্ অষো।

৩। মা মে জম্যাত্ অকাত্ অষো।

সংস্কৃত

১। গম্যাদ্ বো বসোঃ বসীয়ঃ।

২। মা বো জম্যাদ্ অকাদ্ অক্যঃ।

৩। মা মে জম্যাদ্ অকাদ্ অক্যঃ।

নযোসংজ্ঞের সংস্কৃত

১। প্রাপ্নোতু বো ভদ্রাৎ শ্রেয়ঃ।

২। মা বঃ প্রাপ্নোতু দুষ্টাদ্ দুষ্টতরম্

৩। মা মে প্রাপ্নোতু গর্হ্যাদ্ গর্হ্যতরম্।

বঙ্গানুবাদ

১। কল্যাণ হইতে কল্যাণতর তোমাদিগকে প্রাপ্ত হউক।

২। মন্দ হইতে মন্দতর তোমাদিগকে যেন প্রাপ্ত না হয়।

৩। আমাকেও যেন মন্দ হইতে মন্দতর প্রাপ্ত না হয়।

টীকা

জ ম্যা ত্, সং গ ম্যা ৎ, অবে. জ ম্ ধাতু = সং. গ ম্ ধাতু, আশীর্লিঙ্, ১ম. এক., 'প্রাপ্ত হউক'।

অ কা ত্, সং. অ কা ৎ, ৫মী. ১ব.। অ ক 'মন্দ,' 'দুঃখ', 'পাপ'; তুল :—না ক 'স্বর্গ,' ন + অ ক।

অ যো, সং. অ ক্যঃ, অকীয়ঃ, 'অকতর' 'মন্দতর'। অবেস্তার অ ষ্যো (= অকতর) হইতে ইহা হইয়াছে। দ্রঃ—অবে. অ চি শ্ ত, সং অ কি ষ্ঠ 'অকতম'। উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে সংস্কৃতে ঈ য় স্, য স্ এই উভয়ই প্রত্যয় হয়, যেমন ন ব হইতে ন বী য় স্ ও ন ব্য স্ 'নবতর'; ব শ হইতে ব শী য় স্ ও ব শ্য স্, ভূ (আমাদের বৈয়াকরণিকদের মতে ব হু) হইতে ভূ য় স্; ইত্যাদি। সংস্কৃতের য স্ স্থানে অবেস্তায় য হ্ হয়। এখন অ ক শব্দের উত্তর য হ্ প্রত্যয় করায় তালব্য য কারের সংসর্গে পূর্ব্বোক্ত ককার স্থানে প্রথমে চ, তদনন্তর শ এবং তাহার পর ষ হইয়া অ ষ্য হ্ পদ হয়। ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার এক বচনে অ ষ্যো হয়, ক্রমে য কারের লোপ হইয়া অ ষো পদ দাঁড়াইয়াছে। অতএব ঠিক মত ধরিতে হইলে সংস্কৃতে অ ক্য স্ পদ ধরাই উচিত। এখানে একটা কথা বলিবার আছে। অ ষ্য হ্ পদে উষ্ম বর্ণটি খাটি মূর্দ্ধন্য নহে। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণেই বুঝা

যায় ইহা অনেকটা তালব্য। তাই প্রায় পরে য থাকিলেই এই বর্ণটির প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের ছাপাখানায় অবেস্তার অক্ষর তো নাই-ই, এমন অন্য কোনো অক্ষরও নাই যাহা দ্বারা অবেস্তার অক্ষরটির ধ্বনি প্রকাশ করা যায়।

৩

যস্ন ৫৪, ১

এই প্রার্থনাটি অতি প্রসিদ্ধ, অর্থ আলোচনা করিলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে। ইহা অ যে ম্ বো হূ প্রভৃতিরই ন্যায় গণ্য হইয়া থাকে।

অবেস্তা

১। আ অইর্যেমা ইষ্যো রফেদ্রাই জন্তূ

২। নেরেব্যস্-চা নাইরিব্যস্-চা জরথুশ্ত্রহে

৩। বঙ্‌হেউশ্ রফেদ্রাই মনঙ্‌হো যা দএনা বইরীম্ হনাত্ মীঝ্দেম্।

৪। অষহ্যা য়াসা অষীম্ যাঁম্ ইষ্যাঁম্ অহুরো মসতা মজ্দাএ।

সংস্কৃত

১। আ অর্যমা ইষ্যো রভিত্রায় * গন্তু

২। নরেভ্যশ্-চ নারীভ্যশ্-চ জরথুশ্ত্রস্য।

৩। বসোঃ রভিত্রায় মনসো যেন ধ্যানা বর্যং সনাৎ মীঢ়ম্

৪। ঋতস্য যাচা (-মি) ঋতিম্ যাম্ ইষ্যঃ অহুরো "দদাতু" মহদ্ধ্যাঃ।

নর্যোসংঙ্ঘের সংস্কৃত

১। আ অর্যমা ইষ্যঃ প্রমোদায় গচ্ছতু

২। নৃভ্যশ্-চ নারীভ্যশ্-চ জরথুশ্ত্রস্য।

৩—৪। যেন ধর্মশীলজনা বর্য্যং সনেম (=কিল প্রাপ্নুম) পারিতোষিকম্।

বঙ্গানুবাদ

১—২। প্রার্থনীয় অর্যমা জরথুশ্ত্রের নর ও নারীগণের প্রমোদের জন্য আগমন করুন,

৩। শুভ মনের প্রমোদের জন্য (তিনি আগমন করুন,) যাহাতে ধর্ম্ম বরণীয় কাম (অর্থাৎ কাম্যবস্তু) লাভ করে।

৪। আমি সত্যের পবিত্রতার জন্য যাচ্ঞা করিতেছি, প্রার্থনীয় অহুর মজদা তাহা দান করুন।

টীকা

আ, সং. আ (উপসর্গ) পরবর্ত্তী জ স্তূ পদের সহিত অন্বিত।

অ ই র্যে মা, সং. অ র্য মা, ইনি সুখ-শান্তির অধিদেবতা।

ই ষ্যো, সং. ইষ্যঃ, ই ষ্+য, 'প্রার্থনীয়'।

র ফে ধ্রা ই, সং. র ভি ত্রা য়, র ভে ধ্র শব্দের ৪র্থী এক.। অবে. র প্, সং. র ভ্, ফা. র বু দ ন্ ধাতু একই, অর্থ 'আনন্দ দান করা'। সংস্কৃতে র ভ স্ 'বেগ' ও 'হর্ষ' উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। এই র প্ ধাতুর উত্তর ধ্র অথবা ই ধ্র (=সং. ত্র অথবা ই ত্র, See Jackson, § 791) করিয়া এই শব্দটি নিষ্পন্ন করিতে পারা যায় বলিয়া মনে হয়। অতএব

সংস্কৃতে প বি ত্র শব্দে অনুবাদ করা চলে। তুল:—প বি ত্র, ইত্যাদি।

জ ন্তু, সং. * গ ন্তু, গচ্ছতু, গ ম্ ধাতুর উত্তর লোট্ ১ম একবচনে তু, অবে. জ ম্ = সং. গ ম্। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত আ উপসর্গের অন্বয়, অতএব আ জ ন্তু = আ গ চ্ছ তু।

ব ঙ্ হে উ শ্, সং. ব সোঃ, পরবর্ত্তী ম ন ঙ্ হো পদের সহিত অন্বয়। ম ন ঙ্ হো, সং. ম ন সঃ। ব ঙ্ হে উ শ্ ম ন ঙ্ হো = ব সোঃ ম ন সঃ, 'বসু মনের', 'উত্তম মনের', (বো হু ম নে র)।

যা, সং. যে ন, অবে. যা = সং যদ্ শব্দের ৩য়া এক. আ বিভক্তি। বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ আছে, যেমন, প্রি য়া = প্রিয়েণ। সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গেও এইরূপ হয়, যেমন, প্রি য়া = প্রিয়য়া।

দ এ না, সং. ধ্যা না, এই শব্দটি অবেস্তার দী ধাতু হইতে হইয়াছে, দী (= সং. ধ্যৈ হইতে ধী, ফারসী দী দ ন্) 'ধ্যান করা' 'চিন্তা করা'। ধাত্বর্থ ধরিলে বলা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা (ঈশ্বরকে) ধ্যান বা চিন্তা করিতে পারা যায় তাহাই দ এ না অর্থাৎ ধর্ম্ম। সংস্কৃতে ধে না পদ ধরিলে ঠিক মিলে। দ এ না ফারসীতে দী ন।

ব ই রী ম্, সং. বর্য্যং, বার্য্যং, 'বরণীয়', প্রার্থনীয়।

হ না ত্, সং. স না ৎ, অবে. হন্ ধাতু = সং. স ন্, (প্রথম গাথার হ ন যে শ ও হ ন য় যো শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য)। এখানে লেট্, ১ম. একবচন, অর্থ 'লাভ করিতে পারে'।

মী. ঝ্ দে ম্, সং. মী ঢ় ম্, দ্রষ্টব্য—১ম গাথার টীকা।

অ ষ হ্যা, সং. ঋ ত স্য, ৬ষ্ঠী. এক. 'সত্যের'।

যা সা, সং. যা চা মি, অবে. যা স্ ধাতু = সং. যা চ্ 'প্রার্থনা করা'; লট্ ১ম একবচনে যা সা মি পদের মি-লোপে যা সা হইয়াছে।

অ ষী ম্, সং. ঋ তি ম্, অথবা ঋ র্তি ম, অবেস্তায় অ ষি শব্দের অর্থ 'কল্যাণ', 'আশীর্ব্বাদ', 'ফল', 'পবিত্রতা'।

ই ষ্যাঁ ম্, সং. ই ষ্যা ম্ স্ত্রীলিঙ্গ, অ ষী ম্ পদের বিশেষণ, অর্থ 'এষণীয়' 'অভিলষণীয়'।

অ হু রো, সং. অ সু রঃ।

ম স তা ক্রিয়া পদ, ইহার সংস্কৃত আমি ঠিক করিতে পরি নি, নের্যোসজ্ঞ 'দ দা তু' 'দান করুন' অর্থ ধরিয়াছেন, আমিও তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। Mill সাহেবও ইহাই করিয়া আবার প্রশ্ন করিয়াছেন, এই পদটিকে তৃতীয়ান্ত ধরিয়া 'মহত্ত্ব' বা 'উদারতা' অর্থে পূর্ব্বোক্ত জ স্ত্ পদের সহিত অন্বয় করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় কি?—'অহুর মজদা নিজের উদারতা বা মহত্ত্বে আগমন করুন।'

৪

যস্ন, ৬৮. ১১

অবেস্তা

১। অহ্মাই রএশ্-চ খরেনস্-চ, অহ্মাই তন্বো দ্রুবতাতেম্,

২। অহ্মাই তন্বো বজদ্বরে অহ্মাই তন্বো বেরেথ্রেম্,

৩। অহ্মাই ঈশ্তীম্ পওউরুশ্-খাথ্রাঁম্, অহ্মাই আস্নাম্-চিত্ ফ্রজন্তীম্।

৪। তূম্ অহ্মাই দরেঘাঁম্ দরেঘো-জীতীম্, অহ্মাই বহিশ্তেম্ অহুম্ অষওনাঁম্ রওচঙ্হেম্ বিস্পো-খাথ্রেম্।

সংস্কৃত

১। অস্মৈ রায়শ্চ স্বরণং চ, অস্মৈ তন্বা ধ্রুবতাতম্,

২। অস্মৈ ওজঃ (?), অস্মৈ তন্বা বৃত্রম্,

৩। অস্মৈ ইষ্টিং পুরুস্বাত্রাম্, অস্মৈ আজানাং চিৎ প্রজাতিম্,

৪। ত্বম্ অস্মৈ দীর্ঘাং দীর্ঘজীবিতিং অস্মৈ বসিষ্ঠং অসুম্

ঋতাব্যাম্ রোচসম্ বিশ্ব-স্বাত্রম্ ॥

নের্যোসঙ্ঘের সংস্কৃত

১। শুদ্ধয়শ্চ শ্রিয়শ্চ তনোঃ পাবরতা,

২। তনোঃ রূপপ্রবৃত্তিতা তনোঃ বিজয়িতা,

৩। লক্ষ্মীঃ সম্পূর্ণশুভা (কিল সদাচরাৎ উপার্জ্জিতা)

সহজশালবান্ পুত্রঃ কুলদীপকো মণ্ডনঃ

৪। যঃ কথয়তি জ্ঞানং জানাতি চ দীর্ঘং দীর্ঘতরং

জীবিতং মুক্তাত্মনাং সদোদ্দ্যোতং সমস্তশুভম্।

বাদানুবাদ

(হে অরেদ্বী সূর)

১। ইহাকে ধন, জ্যোতি, ও শরীরের স্থিরত্ব,

২। ইহাকে শরীরের ওজ (তেজ) ও শরীরের বিজয়,

৩। ইহাকে প্রচুর দীপ্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক পুত্র-সন্ততি,

৪। ইহাকে দীর্ঘ দীর্ঘতর জীবন ও ধার্ম্মিকগণের

বিশ্বপ্রকাশ উজ্জ্বল সর্ব্বোত্তম লোক (দান কর)।

টীকা

এই গাথাটি অ রে দ্বী সূ রা নামে প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় নদীকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে।

অ হ্মা ই, সং. অস্মৈ, 'ইহাকে'।

র য়ে শ্-চ, সং. রা য় শ্ চ, অবে. র এ=সং. রৈ, 'ধন', ২য়া বহু. 'ধনসমূহকে'।

খ্ বে ন স্-চ, সং. স্ব র্ ণং চ, ২য়া এক. 'জ্যোতিকে'। সং. স্বর্ 'জ্যাতিঃ'।

ত ন্বো, সং. ত ন্বাঃ, ত নু শব্দ ৬ষ্ঠী এক. 'শরীরের'।

দ্ র্ব তা তে ম্, সং. ধ্রু ব তা ত ম্ ২য়া এক. ধ্রুবতাকে। অবে. দ্ র্ব= সং. ধ্রু ব, অবেস্তার ন্যায় সংস্কৃতেও ভাবার্থে তা ৎ (এবং তা তি) প্রত্যয় হয়।

ব জ্ দ্ ব রে, ক্লীব. ২য়া এক. 'শক্তি অথবা তেজকে', কিংবা 'শরীরের ওজো-নামক ধাতুকে'। অবেস্তার এই শব্দটির প্রথম অংশ অবেস্তার ব জ্, ও সংস্কৃতের ব জ্ ধাতু হইতে হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা ইহাতেই অবেস্তার অ ও জ ঙ্ হ, সং. ও জ স্, ; অবে. উ গ্র, সং. উ গ্র, ইত্যাদি হইয়াছে। শেষ অংশ কিরূপে হইয়াছে আমি বুঝিতে পারি নি। সাধারণত ইহাকে ও জ স্ শব্দে সংস্কৃত করা হইতে পারে।

বে রে থ্র ম্, সং. বৃ ত্র ম্, ২য়া এক. এতাদৃশ স্থলে অবেস্তার এই শব্দের অর্থ 'বিজয়'।

ঈ শ্ তী ম্, সং. ই ষ্টি ম্, স্ত্রী. ২য়া এক. 'সুখকে' অথবা 'ধনকে' বা 'লক্ষ্মীকে'।

প ও উ রু শ্-খা থ্রাঁ ম্, সং. পু রু-স্বা ত্রা ম্, প্রচুর-দীপ্তিম্ স্ত্রী. ২য়া এক.। অবে. পো উ রু=সং. পু রু 'প্রচুর'। অবে খা থ্র=সং. স্বা ত্র।

সংস্কৃতের এই পদটি আমি কল্পনা করিতে চাহি। থা থ্র পদটি অবেস্তার থ ন্ ধাতু ('দীপ্তি') হইতে থ্র প্রত্যয় যোগ হইয়াছে। এই থ্. ন্ ধাতু আর সংস্কৃতের স্ব ন্ ধাতু শব্দত একই যদিও অর্থত ভেদ আছে। এমন অনেক সাধারণ শব্দ আছে যাহার অর্থ অবেস্তার একরূপ, আর সংস্কৃতে আর একরূপ, যেমন, সংস্কৃত মৃ গ পশুকে বুঝায়, কিন্তু অবেস্তায় তাহা মে রে ঘ এই আকারে পক্ষীকে বুঝাইয়া থাকে। তাই অর্থত ভেদ থাকিলেও অবেস্তায় থ ন্ ধাতু ও সংস্কৃতের স্ব ন্ ধাতুকে এক বলিয়া ধরিতে পারা যায়। (এই প্রসঙ্গে সংস্কৃতে শব্দার্থক ক ণ ধাতুর সহিত শব্দার্থক স্ব ন্ ধাতু তুলনীয়)। অবেস্তায় থ্র প্রত্যয় আর সংস্কৃতে ত্র প্রত্যয় একই। এখন স্ব ন্+ত্র হইতে নকারের লোপ ও পূর্ব্ববর্ত্তী অকারকে আকার করিলে স্বা ত্র পদ অনায়াসেই হয়। তুল:—জ ন্+ত=জা ত, খ ন্+ত=খা ত, ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য—পাণিনি. ৬. ৪. ৪২—৪৫। এইরূপে অবেস্তার থা থ্র শব্দের প্রতিরূপ স্বা ত্র শব্দের অর্থ 'দীপ্তি'। এই পদটি পূর্ব্ববর্ত্তী জ শ্. তী ম্ পদের বিশেষণ।

আ স্নাঁ ম্-চি ৎ, সং. আ জা না ম্-চি ৎ, স্ত্রীলিঙ্গে আ স্না শব্দের ২য়া এক.। ইহা পরবর্ত্তী ফ্র জ স্তী ম্ পদের বিশেষণ। আলোচ্য পদটি অবে. জ. ন্=সং. জ ন্ ধাতু হইতে হইয়াছে (আ+জ. ন্+আ= আ জ. না=আ জ্. না=আ স্ না)। সংস্কৃতে আ জা ন শব্দের অর্থ 'জন্ম'; 'আ জা ন সি দ্ধ' শব্দের অর্থ 'যাহা জন্ম হইতে সিদ্ধ' অর্থাৎ 'স্বাভাবিক'। অবেস্তাতে আ স্না শব্দ 'স্বাভাবিক' অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

ফ্র জ. স্তী ম্, সং. * প্র জ স্তী ম্, প্রজাতিম্, 'প্রজাম্', 'প্রজাকে' অর্থাৎ পুত্রাদি-সন্ততিকে। প্র+জ ন্+তি।

তূ ম্, সং. ত্ব ম্, অথবা নিশ্চয়ার্থক অব্যয় তু।

দ রে ঘাঁ ম্, সং. দী র্ঘা ম্। পরবর্ত্তী পদের বিশেষণ।

দ রে ঘ জী তী ম্, সং. দী র্ঘ জী বি তি ম্ 'দীর্ঘজীবনকে'।

ব হি শ্ তে ম্, সং. ব সি ষ্ঠ ম্, 'সর্ব্বোত্তম,' অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদের বিশেষণ, তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

অ হূ ম্, সং. অ সু ম্, 'জীবনকে'। অবে. অ ঙ্ হু (=অ হু, সং. অ সু) শব্দ 'লোক' অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ইহা হইতেই অ ঙ্ হু ব হি শ্ ত বলিতে 'সর্ব্বোত্তম লোক' অর্থাৎ 'স্বর্গ' বুঝা হয়। ফারসীতে কেবল এই ব হি শ্ ত শব্দ হইতেই উৎপন্ন বে হ শ্ ত শব্দ 'স্বর্গকে' বুঝায়। অপর দিকে অবেস্তায় ইহার বিপরীত অ ঙ্ হু অ চি শ্ ত (সং. অ সু অ কি ষ্ঠ, দ্রষ্টব্য পূর্ব্বোদ্ধৃত ২য় গাথার অ ষোঃ শব্দের টীকা) অর্থাৎ 'পাপতম বা মন্দতম লোক' বলিতে 'নরক' বুঝায়। আলোচ্য স্থলে 'অ হূং ব হি শ্ তে ম্' বলিতে 'সর্ব্বোত্তম জীবন' অথবা 'সর্ব্বোত্তম লোক' উভয়ই অর্থ করিতে পারা যায়।

অ ষ ও নাঁ ম্, সং. ঋ তা ব্না ম্, অবে. অ ষ ব ন্, সং. ঋ তা ব ন্ শব্দের ৬ষ্ঠী বহু.; 'পবিত্রগণের' 'ধার্ম্মিকগণের' বা 'সত্য-নিষ্ঠগণের'।

র ও চ ঙ্ হে ম্, সং. রো চ স ম্; অবে. র ও চ ঙ্ হ, সং. রো চ স (তুলঃ—রো চি স্) শব্দের ২য়া এক.। পূর্ব্বোক্ত 'অ হূ ম্' পদের বিশেষণ। 'প্রভাযুক্ত,' 'উজ্জ্বল'।

বি স্পো থ. থ্রে ম্, সং. বি শ্ব স্বা ত্র ম্, 'বিশ্বপ্রকাশ', ইহাও 'অ হূ ম্' শব্দের বিশেষণ, থা. থ্র শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বীরভূমের সাঁওতাল প্রতিবেশী

আমাদের আশ্রমের চারিদিকের সাঁওতাল পল্লী হইতে প্রতিদিন বহুসংখ্যক সাঁওতাল শ্রমজীবী এখানে কাজ করিতে আসে। ইহাদের চাল-চলন, জীবন-যাত্রার প্রণালী, ও গৃহনির্ম্মাণপদ্ধতি সবই বাঙ্গালী হিন্দু-মুশলমান হইতে এত তফাৎ যে, অতি সহজেই সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

সাঁওতাল মেয়েরা গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপের মধ্যে যখন গুরুতর পরিশ্রমের কাজে রত থাকে তখনও তাহাদের মুখে প্রসন্নতা ও সরল হাসি ম্লান হয় না। তাহারা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অপরাহ্নে সহচরীদের গলা জড়াইয়া নৃত্যের তালে তালে গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে। পথের ধারে কোথাও লাল ফুল দেখিলে দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া ফুলের জন্য কাড়কাড়ি করিতে থাকে। ফুলের মঞ্জরী দ্বারা অলকগুচ্ছ অলঙ্কৃত করিয়া তাহারা নাচের তালে ও গানের সুরে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া পথ চলিতে থাকে। দিনের কঠোর শ্রম, বা দারিদ্র্যের দারুণ নিষ্পেষণ কিছুই ইহাদের সহজ উচ্ছ্বসিত আনন্দধারার গতি রোধ করিতে পারে না।

ইহারা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু সর্ব্বদাই খোলা জায়গায় থাকে বলিয়া ইহাদের দেহ সুগঠিত, স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য মনোহর। ইহাদের সরল হাসির মধ্যে এমন একটি স্নিগ্ধতা আছে যাহা দেখিয়া দর্শকের মনে সহজেই ইহাদের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সাধারণত ইহারা লম্বায় ৫ ফিট্ ৭ ইঞ্চি, ওজনে প্রায় দেড় মন। ইহাদের চোখ চীনাদের মত সরু ও মিট্-মিটে, মাথার খুলি অনেকটা গোল, মুখের আকৃতিও গোল। নীচের চোয়াল ভারি। নাসিকা উপর দিকে ঈষৎ

বক্র। হিন্দুদিগের অপেক্ষা ঠোঁট পুরু কিন্তু নিগ্রোদের মত তত মোটা নহে। গণ্ডদেশের অস্থি উন্নত, কিন্তু মঙ্গোলীয়ানদের মত ততটা উন্নত নহে।

বীরভূম জিলায় যে সকল সাঁওতাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশেরই আদিম বাসস্থান পালামৌ ও রামগড়। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বহু সহস্র সাঁওতাল বীরভূমে চলিয়া আসে। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে এই জিলায় ৬, ৯৫৪ জন মাত্র সাঁওতাল ছিল। কিন্তু ১৯০১ এর আদম-সুমারিতে তাহাদের সংখ্যা ৪৭, ২২১ হইয়াছে।

এই লোকবৃদ্ধির প্রধান কারণ এই যে, ইহারা খোলা মাঠে সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু জায়গায় গ্রাম স্থাপন করে এবং গ্রামের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অন্যত্র গিয়া আবার উপনিবেশ স্থাপন করে। বীরভূমের হিন্দু অধিবাসীদের মত তাহারা বহু লোক অল্প জায়গায় ঘেঁসাঘেসি করিয়া বাস করিতে ভাল বাসে না। সেই জন্য ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ইহাদের গ্রামগুলি হাড়ি, ডোম ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু গ্রাম অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া ইহাদের সংখ্যা সহজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাঁওতাল পরগণার লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়াও অনেকে অন্নের সন্ধানে বীরভূমে চলিয়া আসিতেছে। বীরভূম জিলার পশ্চিমাংশের মাটী প্রস্তরময়। এই ঢালু ভূমির উঁচু ডাঙাগুলি চাষের পক্ষে অনুপযোগী। স্থানীয় হিন্দু গৃহস্থগণ ইহাদের শ্রমের সাহায্যে জমি তৈয়ারি করিয়া লয়, ইহারা দিন মুজরী খাটে মাত্র। জমির উপর কোনও স্বত্ব লাভ করিতে পারে না। জমিটি চাষের উপযোগী হইলেই জমিদারেরা ইহাদিগকে বেদখল করিয়া তাহা খাস্ করিয়া লয়।

জন্মের পর প্রথম সংস্কার দ্বারা সাঁওতালী-শিশু পরিবারভুক্ত হয়। পিতা শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া পৈত্রিক দেবতাদিগকে স্মরণ করে। এই উৎসব অতি পবিত্র। পিতার পক্ষে দেবতাদিগের নিকট শিশুকে নিজ ঔরসজাত বলিয়া স্বীকার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। নানাস্থানে এই উৎসবের প্রকারভেদ রহিয়াছে।

ইহার পরের অনুষ্ঠানের নাম "নার্থা"। কন্যা জন্মিলে তিন দিনের দিন এবং

পুত্র হইলে ৫ দিনের দিন এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শিশু জন্মিলে পরিবার অশুচি হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রসূতি শুচিতা লাভ করিয়া পুনরায় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে। এই সময় গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা সকলে শুচি হয়। অনন্তর স্নানান্তে তাহারা নিমের পাতা ও আতপ চাউল সিদ্ধ করিয়া ফেন-ভাত খায়। ভাঁড়ে করিয়া তাড়ি রাখা হয়। প্রতিবেশীরা শিশুর চারিদিকে বসিয়া তাড়ি ও নিমের জল পান করে।

শিশু পুত্র হইলে পিতামহের নামের সহিত মিল রাখিয়া এবং মেয়ে হইলে মাতামহীর নামের সহিত মিল রাখিয়া নাম রাখিতে হয়। পিতাই নামকরণ সম্পন্ন করেন।

অনন্তর "ছোটিয়ার উৎসব" এই উৎসবের সময় সাঁওতাল শিশু প্রথমে তাহার জাতির মধ্যে স্থান লাভ করে। এই অনুষ্ঠান ব্যতীত শুধু জন্মের দ্বারা সে সাঁওতাল হইতে পারে না। এই উৎসবের সময় তাহার বাম হাতের কব্জার উপরেরদিকে একটি গোল পোড়ার দাগ দেওয়া হয়। এই দাগ দেওয়ার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে শিশু দেবতার কোপের পাত্র হয়।

সাধারণত সাঁওতাল যুবকগণের ১৬।১৭ বৎসর বয়সে বিবাহের হয়। বিবাহের বয়স-সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে বাঁধিবাঁধি নিয়ম নাই। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া ঘটক আছে। বরের পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে, সে তাহার স্ত্রীর মত লইয়া ছেলে ও মেয়ের পরস্পরের মধ্যে দেখা-শোনার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। কোনও কার্য্যে বাজারে উভয়ের আলাপ-পরিচয় হয়। ছেলের পছন্দ হইলে তাহার পিতা মেয়েকে কোনোও উপহার প্রদান করে। কন্যা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে বোঝা যায় যে, সে তাহার পুত্রবধূ হইতে সম্মত আছে। পরে কতকগুলি হলদে রঙের সুতো একত্র বাঁধিয়া প্রতিবেশীর গৃহে বিতরণ করা হয়। যে কয় গাছি সুতা একত্রে বাঁধা থাকে ততদিন পরেই বিবাহ হইবে। এই সঙ্কেত বুঝিয়া নিমন্ত্রিতগণ সমাগত হইবে। বরযাত্রীরা বিবাহের পূর্ব্বে গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহারা নিজেরা চাল ডাল লইয়া যায়, ও

গ্রামের বাহিরে গাছ তলায় রন্ধন করে। বিবাহের পূর্ব্বে সকলে সমবেত হইলে বর ও কনেকে সরিষার তেল ও হলুদ্ মাখান্ হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও গায়ে হলুদ তেল মাখিয়া থাকে। বরকনে হলুদ্ রঙের কাপড় পরিয়া স্নান করে।

বর একটি ডালা নিয়া যায়। তাহাতে সিঁদুর ও কাপড় থাকে। ডালা ঘরে নিয়া গেলে কনে কাপড় পরিয়া তাহাতে বসে। পাত্র তখন কনের ভাইয়ের মাথায় তিন বা পাঁচ হাত কাপড় বাঁধিয়া দেয়। ২।৪।৬ ইত্যাদি জোড় অঙ্ক অমঙ্গলকর। তাহার পর বর একটি আম্র শাখা দ্বারা কন্যার ভাইয়ের মাথায় জল ছিটাইয়া দেয়। ছোট-ভাই এক্ষেত্রে কন্যার প্রতিনিধি। সেও বরের মাথায় জল ছিটাইয়া দেয়। তার পর বর-পক্ষের পাঁচ জন লোক ঐ ডালায় উপবিষ্ট কন্যাকে ডালা সুদ্ধ তুলিয়া লইয়া উঠানে চলিয়া আসে। পূর্ব্ব কালে ইহারা লড়াই করিয়া কন্যাকে কাড়িয়া নিয়া বিবাহ করিত, বর্ত্তমানে তাহারই শেষ চিহ্ন রহিয়াছে। কন্যাকে বাহিরে আনা হইলে বর এক জনের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কন্যার কপালে আঙ্গুল দিয়া একটি সিন্দুরের ফোঁটা দেয়। ইহাই তাহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

বিবাহের স্নানের পর কন্যা ও বরের হাতে হলুদ্ ও ধানের পুটুলি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের বিশ্বাস, শীঘ্র ধানের অঙ্কুর দেখা দিলে কন্যা অচিরে পুত্রবতী হইবে। আর উহার ভাল অঙ্কুর বাহির না হইলে বিবাহের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর নহে। বিবাহের সময় বরকে ১৬৲ টাকা পণ দিতে হয়। সাঙা করিতে ১২৲ টাকা পণ লাগে। ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহের চলন প্রায় নাই বলিলেই চলে। স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে অথবা রুগ্ণ বা গৃহকর্ম্মে অসমর্থ হইলে কখনও কখনও আবার বিবাহ করিতে দেখা যায়।

স্ত্রী অতি সহজেই স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে। কেবল পণের টাকাটা ফিরাইয়া দিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে কোনও স্ত্রীলোক চরিত্রভ্রষ্ট হইলে সমাজে তাহা তত দূষণীয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বিবাহের পর

নৈতিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি ইহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখা যায়।

সাঁওতালগণ সৌন্দর্য্যপ্রিয়। ইহারা বিবাহস্থানটিকে গোবর দিয়া লেপিয়া তাহার উপর সুন্দর রূপে আলপনা আঁকিয়া দেয়। বিবাহের আমোদপ্রমোদের মধ্যে নাচ গানই প্রধান। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাঁওতালগণ দলে-দলে নাচিতে থাকে। বর ও কন্যাপক্ষ বিবাহের ঠিক্ পূর্ব্বে নাচিতে-নাচিতে প্রতি-বেশীদের বাড়ীতে গিয়া কিছু কিছু গুড় খাইয়া আসে

সাঁওতালগণ প্রকৃতির সন্তান। শাল গাছ ইহাদের নিকট অতি প্রিয়। শালবনের ধারে ইহারা বাস করে। বসন্তের প্রারম্ভে দক্ষিণ হাওয়ার স্পর্শ লাভ করা মাত্র হঠাৎ দুই চারি দিনের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষ পত্রহীন হইয়া যায়। আবার হঠাৎ এক প্রভাতে সমগ্র বনভূমি নবীন কিশলয়ে রমণীয় হইয়া ওঠে। দুই তিন দিনের মধ্যে শালের ফুলের মৃদু গন্ধে চারিদিক্ বহুদূর পর্য্যন্ত আমোদিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পল্লীতে চারিদিক্ হইতে মাদল বাজিয়া ওঠে। বসন্তের শুক্ল পক্ষে ইহারা কাজ-কর্ম্ম করিতে চায় না। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা মাঠে নৃত্য করিয়া কাটায়। বসন্তোৎসবকে সাঁওতালরা "বাহা" বলে। এই উৎসবের কোনও নির্দ্দিষ্ট দিন নাই। এই উৎসবের পূর্ব্বে কেহ নবীন ফুল-সাজে সজ্জিত হইতে অথবা নূতন ফল-মূল ভক্ষণ করিতে পারে না।

পল্লীর বাহিরে পূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহারা তাহাতে উত্তমরূপে গোময় লিপ্ত করে। তথায় দুইটি পাথর বসাইয়া তাহাতে সিন্দুর লেপিয়া দেয়। ইহাই তাহাদের 'বোঙা' বা উপাস্য ভূত।

দেবতার উৎসর্গের জন্য তাজা ফল মূল ও মুর্গী সংগ্রহ করিয়া আনে। ইহারা দেবতাকে মুর্গী মানত করে। দেবতার সম্মুখে চাল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। মুর্গীগুলি যখন চাল কুড়াইয়া খাইতে ব্যস্ত থাকে তখন তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। তার পর সেই মুর্গীর মাংস ও চালে একপ্রকার খিচুড়ী রাঁধিয়া পরমানন্দে

ভোজন করে। এই উৎসবের সময় প্রত্যেক সাঁওতাল নিজের গৃহ হইতে চাল মুর্গী ও পয়সা লইয়া যায়। সকলের চাল একত্র করিয়া মহোৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসবের প্রধান উপকরণ মদ্য। ইহারা পেট ভরিয়া তাড়ি পান করে। অন্য আহার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ যথেষ্ট না হইলেও ইহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই পেট্ ভরিয়া তাড়ি খাইতে পারে এমন ব্যবস্থা চাই। উৎসবান্তে ইহারা বাড়ী গিয়া পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া দেয় এবং নিজেদের গ্রামকে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত করিয়া তোলে।

অসুখ হইলে ইহারা ডাক্তার ডাকে না। গ্রামে যে ওঝা থাকে তাহার হাতেই তাহারা রোগীকে সমর্পন করে। ওঝা তুকৃতাক মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়া-পোঁছা করিয়া রোগীর চিকিৎসা করে। তাহারা কোনও মঙ্গলময় দেবতাকে উপাসনা করে না। তাহাদের বিশ্বাস "বোঙা" বা ভূতই অনিষ্ট করে। তাই তাহারা পূজা করিয়া তাহাকে খুসী করিতে চেষ্টা করে। অসুখ হইলে ওঝা আসিয়া গাছের একখানা পাতায় তেল মাখাইয়া তাহা দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে যে, কোন্ অপদেবতা তাহার রোগীর রক্ত শোষণ করিতেছে। মৃত্যু হইলে হিন্দুদেরই মত শব চিতায় আরোহণ করাইয়া তাহার মুখাগ্নি করা হয়। পুত্র মাথার খুলির তিনটি টুক্‌রা যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয়, এবং পরে দামোদর নদে তাহা নিক্ষেপ করিবার জন্য যাত্রা করে। নিক্ষেপ করিবার সময় সে হাড়ের টুক্‌রা তিনটিকে মাথায় করিয়া ডুব দেয়। স্রোতের বেগে সেগুলি নিম্নাভিমুখে চলিয়া যায়। ইহার দ্বারাই মৃত ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বপুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারে।

সাঁওতালদিগের প্রত্যেক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আছে। তাহাদিগকে "বোঙা" অর্থাৎ ভূত বলে। পরিবারের কর্ত্তা কাহারও নিকট তাহার নাম প্রকাশ করে না। পিতা মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠ পুত্রের কানে কানে গৃহ দেবতার নাম বলিয়া যান।

তাহারা পিতৃপুরুষদিগের প্রেতাত্মার পূজা করে। শালকুঞ্জে পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়। দেবতারাও শাল গাছে বাস করেন। তাহার উপশাখাই সাঁওতাল দিগের জাতীয় পতাকা। ইহারা নানাবিধ ভূতকে দেবতার মত পূজা করে। ঝড়ে যেন চালা খানা উড়িয়া না যায়, ছেলেকে যেন বাঘে না খায় ইত্যাদি ধরণের প্রার্থনাই তাহাদের মধ্যে অধিক। নদীর দেবতার নাম "দা বোঙা" কূপ দেবতার নাম "দাদি-বোঙা" পর্ব্বতের দেবতার নাম "বুড়ো-বোঙা"। বন দেবতার নাম "বীর-বোঙা"। 'বীর' শব্দের অর্থ 'বন'। সাঁওতালদিগের মধ্যে ৭টী কুল (tribes) রহিয়াছে। :তাহাদের নাম—বেস্‌রা সরেন্‌, মুর্মু, মার্দ্দি, কিস্কু, চিল্‌ বিঁধা, ছুডু। এক এক কুলের এক একটী আলাদা বোঙা আছে। এক কুলের লোকেরা অন্য কুলের বোঙার পূজা করিবে না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আহার ও বিহারাদি চলিতে পারে—কিন্তু পূজা চলিতে পারে না।

"মারঙ বুড়" অর্থাৎ 'বিরাট পর্ব্বত'ই, তাহাদের জাতীয় দেবতা, ইহার আসন যাবতীয় কুল দেবতার উপরে। সমগ্র জাতির কল্যাণ তাহার উপর নির্ভর করে। এই দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের বিভিন্ন কুলের মধ্যে জাতীয় একতা রক্ষিত হয়। রক্তের দ্বারা এই দেবতার পূজা করিতে হয়। বলি না জুটিলে অন্তত রক্তবর্ণের ফুল ও ফলের দ্বারা তাহার পূজা সম্পন্ন হয়। এই দেবতার নিকটই তাহারা পূর্ব্বে নরবলি দিত। বর্ত্তমান সময়ে আইনের ভয়ে নরবলি উঠিয়া গিয়াছে। ছাগল, ভেঁড়া, বৃষ, মুর্গী, ধান, ফল, পুষ্প, মদ এবং এক মুষ্টি মাটি এই পূজার উপকরণ।

সাঁওতালগণ যখন কোনও নূতন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম যায় সেই নূতন গ্রামের "মাঁঝি" অর্থাৎ মোড়ল হয়। তাহার মৃত্যুর পর আবার নূতন মোড়ল নির্ব্বাচিত হয়। গ্রামের মধ্যে যখন কোনও বিচার নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয় তখন গ্রাম্য মোড়লের বাড়িতে দরবার বসে। গ্রামের অধিকাংশ লোকের মতানুসারে মোড়ল তাহার আদেশ প্রচার

করেন। কিন্তু সেই বৈঠকে যদি দুই পক্ষই প্রবল হয় তবে মোড়ল বাহির হইতে আরও দুই তিন গ্রামের লোকদিগকে আহ্বান করে। তাহারা গ্রামের বাহিরে বৃক্ষতলে সমবেত হয়। সেখানে অধিকাংশের মতে যাহা স্থির হইবে তাহা সকলকে মানিয়া লইতেই হইবে।

সাঁওতালগণ তাহাদের সমাজের নারীদিগকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখে। নাচের সময় পুরুষগণ মাদল বাজায়, বহুসংখ্যক নারী একত্র হইয়া নৃত্য করে। অনেকে একত্র হইয়া গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়। কাহারও আলাদা নৃত্য ভঙ্গী নাই। অর্দ্ধ বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ইহারা নৃত্য করে। সমগ্র শ্রেণীটি এক সঙ্গে মৃদু তালে পা ফেলিয়া সংযত চলন-ভঙ্গীতে শোভন গতি সঞ্চার করে। মেয়েদের নৃত্যে কোনও উন্মত্ততা নাই। তাহাদের সেই অর্দ্ধ বৃত্তাকার শ্রেণীর সম্মুখে একজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া নৃত্য করে। তাহার নৃত্য উচ্ছ্বাসময় মুক্ত চলন ভঙ্গীতে উদ্ধত। সাঁওতালেরা মদ্য পান করে বটে, কিন্তু নাচের জায়গায় কথনও নারীদের প্রতি তিল মাত্র অসম্মান প্রকাশ করেনা।

সাঁওতাল বালকেরাও আবার নিজেদের মধ্যে বালক দলপতি বা মোড়ল নির্ব্বাচন করে। কিন্তু বিবাহ করিলে সে আর তাহাদের উপর মোড়লী করিতে পারে না।

সাঁওতাল গ্রামে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি কম হয়। ইহারা সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। ইহাদের মোড়লেরা নিঃস্বার্থ ন্যায়-বিচারক।

মুক্ত আকাশ ও বাতাস ইহাদের একান্ত প্রিয় তাই ইহারা এখনও স্বভাবের ক্রোড়ে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সরলতার মধ্যে বাস করিয়া চরিত্রের এমন কতকগুলি মহত্ব রক্ষা করিয়াছে যাহা বর্ত্তমান সভ্যতার জটিল কৃত্রিমতার যুগে উন্নত সমাজে একান্ত দুর্লভ।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

পঞ্চপল্লব

শিক্ষাসম্বন্ধে টলষ্টয়ের মত

মহাত্মা টলষ্টয় তাঁহার মাতৃভূমির কৃষকদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করিতেন। এই শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষিত করাই একসময়ে তাঁহার সাধনার বিষয় হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জন্মভূমি ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানার (Yasnaya Polyana) নামক গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে তাহার নূতন আদর্শ প্রচারের জন্য সেখান হইতে একখানি পত্রিকা বাহির করেন। সেই বিদ্যালয়ের বর্ণনা এবং সেখানকার শিক্ষাসম্বন্ধে মতামত তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন নিম্নে তাহার সারমর্ম দেওয়া হইল।

টলষ্টয় বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রের বই বা খাতা আনিতে হয় না। বাড়ীতে অভ্যাসের জন্য কোন পাঠ দেওয়া হয় না। তাহারা হাতে কিছু লইয়া বা মস্তিষ্কে কিছু ঠাসিয়া বিদ্যালয়ে আসে না। আগের দিনের পড়াও তাহাদের মনে রাখার দরকার হয় না। তাহারা শুধু নিজেদের উৎসুক চিত্তখানি লইয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, আর জানে যে, আজও ঠিক গত কল্যের মতই আমোদ হইবে। বিলম্বে আসার জন্য কাহাকেও তিরস্কার করা হয় না। বিলম্বেও সাধারণত কেহ আসে না। শিক্ষক ক্লাসে আসিবার আগে ছেলেরা খেলা-ধূলা মারামারি করে। তিনি ক্লাসে আসিয়াছেন, ছেলেরা মেজের উপর হুড়াহুড়ি করিতেছে, যে ছেলেটির উপরে সকলে চাপিয়া বসিয়াছে সে 'মাষ্টার মশাই, মাষ্টার মশাই, এদের থাম্‌তে বলুন' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। অন্য ছেলেরা তার ঘাড়েই চাপিয়া শিক্ষককে অভিবাদন করিতেছে। যে দুই একটি

ছেলে তাঁহার সঙ্গে আসিল, শিক্ষক তাহাদের পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মারামারি হুড়াহুড়ি ছাড়িয়া দুটি-একটি করিয়া ছেলেরা বই হাতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে শিক্ষকের কাছে আসিতে লাগিল। মারামারির উৎসাহের বদলে পড়ার উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। মারামারি হইতে ছাড়াইয়া লইতে যতটা বেগ পাওয়া গিয়াছিল শেষে ছেলেদের পড়া থামাইতেও ততটা বেগ পাইতে হইল।

ছাত্রেরা বেঞ্চে, টেবিলে, চেয়ারের হাতার উপরে, মেজেতে যেখানে ইচ্ছা বসে। শিক্ষক এক বিষয় পড়াইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়োজন হইলে কোন কোন সময় অন্য বিষয়ও পড়াইতে আরম্ভ করেন। এক এক দিন ঘণ্টা পড়িয়া যায়, কিন্তু ছেলেরা চীৎকার করিতে থাকে "পড়ুন পড়ুন"। ২।৩ ঘণ্টা হয়ত এক বিষয়ই পড়ানো চলে।

শিক্ষকের কাছে এই রকম বাহিরের অব্যবস্থা অদ্ভুত এবং অসুবিধাজনক ঠেকিলেও ইহার খুব প্রয়োজন আছে। আমরা নিজেরা অন্য রকম শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া এই সব অব্যবস্থায় আমাদের বড় অসুবিধা হয়। মানুষের অন্তর-প্রকৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া আমরা বড় তাড়তাড়ি ফল পাইতে চাই। আমাদের ধৈর্য্য গুণ নাই। একটু ধৈর্য্য ধরিলেই অব্যবস্থা ধীরে ধীরে চলিয়া যায় এবং তখন যে শৃঙ্খলা আসে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

বিদ্যালয়ের তরফ হইতে ছাত্রদের শাস্তি দিবার কোন অধিকার নাই। যে বিদ্যালয় যত বেশী স্বাধীনতা দিতে পারে, সে বিদ্যালয় তত ভাল চলিতেছে বলিতে হইবে। ছেলেদের অপরাধে কড়া শাস্তি-প্রয়োগে বিশেষ ফল না পাইয়া টলষ্টয় বুঝিয়া ছিলেন যে, আত্মার রহস্য আমাদের অজানা। তাহার উপরে সাধু জীবনীর প্রভাব আছে, কিন্তু সেখানে বড় বড় উপদেশ বা শাস্তি কোন কাজ করিতে পারে না।

টলষ্টয়ের বিদ্যালয়ে সাত হইতে দশ বছরের ছেলেই বেশী ছিল। তাঁহার মত এই যে, ছয় হইতে আট বছরের বয়সের ছেলেরাই সব চেয়ে তাড়াতাড়ি

সহজে ভাল করিয়া পড়িতে শিখে। শিক্ষকেরা নিজেদের সুবিধার জন্ত যে রীতিতে শিক্ষা দেন, সাধারণত সে রীতি ছাত্রদের পক্ষে সুবিধার নয়। শিক্ষকের অসুবিধা হইলেও ছাত্রদের যাহা প্রিয় সেই রীতি-অনুসারে পড়াইলে তাহাদের সুবিধা হয়।

সাধারণত ছাত্রেরা শাস্তির ভয়ে, পুরস্কারের লোভে, অথবা সংসারে উন্নতির জন্ত পড়া শুনা করে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের প্রকৃত গঠন হয় না। ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম কোন-রকমেই বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা পরীক্ষকের খেয়ালের উপর ছাত্রের ভাগ্য নির্ভর করে এবং ছাত্রেরা প্রায়ই ভয়ে অসদুপায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়া সচেষ্ট হয়।

আসল কথা, ছাত্রের খুসী অনুসারে শিক্ষকের চলিতে হইবে। ছাত্রের মনের স্ফূর্ত্তিই শিক্ষাদানের প্রধান উপায়। সে যাহা পড়িতে চায় না, তাহা তাহাকে জোর করিয়া পড়ানো উচিত নয়। তাহার যখন পড়িতে অনিচ্ছা তখন তাহাকে পড়াইতে বসানো অনর্থক এবং অনুচিত। বাড়ীতে যে ছেলেকে দেখিতে বেশ চালাক, বুদ্ধিমান, বা অনুসন্ধিৎসু বলিয়া মনে হয়, সেই ছেলেরই চেহারা স্কুলে অন্ত রকম। বেচারা শ্রান্ত, অমনোযোগী—অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে যেন শুধু ওষ্ঠাগ্রভাগের সাহায্যে অন্যের চিন্তা, অন্যের ভাষা নির্জীবভাবে আওড়াইতেছে। তাই স্কুলের যন্ত্রবৎ শিক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া অনেক সময় সব চেয়ে নির্বোধ ছেলে হয়ত প্রথম স্থান অধিকার করে এবং সব চেয়ে বুদ্ধিমান বালকটি সর্ব্বনিম্ন স্থানে নামিয়া পড়ে।

শিশু যখন স্বাধীন, তখনই তাহার চিত্তবৃত্তিগুলি সজাগ হইয়া উঠে। সেই বাধাহীন ছাত্রটির দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাহার মনের যথাযথ খাদ্য যোগাইয়া দেওয়াই শিক্ষকের কাজ।

জোর করিয়া স্কুলের ডিসিপ্লিন রাখার জন্ত ছেলেরা ক্রমশ পড়াশুনারই প্রতি বিরাগী হইয়া উঠে এবং তাহারা বড় হইয়া ভুলেও আর বই হাতে করে না। শিক্ষকের যাহাতে সুবিধা হয়, ছাত্রদের জন্ত এমনি করিয়া স্কুলের নিয়মকানুন

জারি করা হয়। কিন্তু তাহাতে ছাত্রের স্ফূর্ত্তি, হাসি ঠাট্টা, কথাবার্ত্তা, চলাফেরা পদে পদে বাধা প্রায়, কাজেই তাহাদের কাছে স্কুল জিনিষটা জেলখানা হইয়া দাঁড়ায়।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, কি নিয়মে শিক্ষা দিতে হইবে? তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে, ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্বন্ধ যে নিয়মে ক্রমশ নিকটতর হইয়া আসে, সেই নিয়মেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকাই অভিপ্রেত কিন্তু তাহার বিপরীত রকমের সম্বন্ধই জোর-জবরদস্তির সম্বন্ধ। শিক্ষাদানের যে রীতিতে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধটা যত বেশী উৎকর্ষ লাভ করে, সেই রীতি তত বেশী বাঞ্ছনীয়। সুখের বিষয়, অনেকেই স্বীকার করেন যে, খাবার, ওষুধ, অথবা ব্যায়াম মানুষের উপর জুলুম করিয়া প্রয়োগ করিলে তাহা তাহা শরীরের পক্ষে অমঙ্গলজনক হয়। শিক্ষা-সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যায়, বালককে জোর করিয়া কিছু গিলাইয়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

শিক্ষক যে বিষয় কম জানেন সাধারণত সে বিষয় তিনি পড়াইতে পছন্দ করেন না। বাধ্য হইয়া পড়াইতে হইলে তিনি বড়ই বিপদে পড়েন। তিনি তাঁহার বিষয় পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া ছেলেদের না বুঝাইতে পারিয়া অবশেষে জোর-জবরদস্তির দ্বারা ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বৃথা চেষ্টা করেন। আর শিক্ষকের যে বিষয়টির উপর খুব দখল থাকে তিনি সে বিষয়টি এমনি করিয়া পড়াইতে পারেন যে, ক্লাসে ঘন ঘন তাঁহার চক্ষু রাঙাইতে হয় না, ছাত্রেরাও ঘন ঘন হাই তুলিতে থাকে না।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাধীনতা দিয়া টলষ্টয় নিষ্ফল হন নাই। যাঁহারা নাম মাত্র শিক্ষক তাঁহারা কোন্ কোন ছাত্রের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলেন, ছেলেটি বুদ্ধিমান বটে কিন্তু কিছুই করিতেছে না, বড় অমনোযোগী। টলষ্টয়ের বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাহা বলিতে পারিতেন না। তাঁহারা ছাত্রের কিছু হইতেছে না দেখিলে নিজেদের দোষী মনে করিতেন। যে রীতিতে পড়ানো হইতেছে, তাহা বদলাইয়া ছাত্রের সুবিধা ও ইচ্ছামত তাঁহারা অন্য উপায় অবলম্বন

করিতেন। কোন একটা বিশেষ উপায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লইতেন না, নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় থাকিতেন। তা'ছাড়া তাঁহারা নিজেরাও পড়াশুনা করিয়া সর্ব্বদা স্বীয় উন্নতি করিতে কখনও বিরত হইতেন না।

অনেকে বলেন যে, বাড়ীর কাজকর্ম্ম, গ্রামের খেলাধূলা চাষবাসের কাজ ছেলেদের পড়াশুনার ক্ষতি করে। কিন্তু সে কথাটি খাঁটি সত্য নয়। বরং এই সমস্ত কাজকর্ম্ম খেলাধূলা সমস্ত শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। সমস্ত জিনিস জানিবার জন্য ঔৎসুক্য এ সমস্ত হইতেই জন্মে। জীবন্ত প্রাণের স্বতঃ-উৎসারিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা করাই শিক্ষার লক্ষ্য কিন্তু স্কুলে তাহার ঠিক বিপরীত হয়। প্রশ্ন করিবার যো নাই, পুলিশ-সদৃশ শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে তাঁহার ইচ্ছামত পড়াইয়া যাইতেছেন।

টলষ্টয়ের মত এই যে, বাড়ীর কাজকর্ম্মে এতটা শিক্ষা হয় যে, ছেলেদের কখনই বাড়ী হইতে দূরের বোর্ডিং-স্কুলে রাখিয়া পড়ানো উচিত নয়। তিনি তাঁহার এক বন্ধুপত্নীকে তাঁহার সন্তানদের শিক্ষাসম্বন্ধে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে আছে—"আমার মনে হয়, প্রথমে শিশুকে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, জগতে যে সমস্ত জিনিসপত্র সে ব্যবহার করিতেছে তাহা স্বর্গ হইতে পড়ে নাই, কেহ তাহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সেগুলি তৈরি করিয়াছে। তাহার বাটি গ্লাস ধোওয়া, জুতা সাফ করা প্রভৃতি কাজ যাহারা করে, তাহারা সব সময় তাহাকে যে ভাল বাসিয়া করে তাহা নহে। তাহারা যে কেন তাহার জন্য খাটিয়া মরে ইহা শৈশব হইতেই তাহার জানা উচিত এবং জানিয়া লজ্জিত হওয়া উচিত। যদি লজ্জা বোধ না হয়, তবেই কুশিক্ষার বীজ রোপণ করা হইল, এবং ইহার ফল সমস্ত জীবন ধরিয়া ভোগ করিতে হইবে।

এই আমার অনুরোধ, আপনার ছেলে মেয়েদের কাজ যতটা সম্ভব নিজেদের করিতে বলুন। তাহারা নিজেরা নিজেদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করুক, নিজেদের ঘর নিজেরা পরিষ্কার করুক, কাপড়, জুতা টেবিল নিজেরা সাফ করুক।

এগুলি যদিও খুব ছোটখাটো জিনিস বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ছেলেদের ভবিষ্যতের সুখের জন্য এগুলি সাহিত্য এবং ইতিহাস পড়ার চেয়ে বেশী দরকারী।

একদল লোক শৈশবাবধি একজনকে অকারণে সেবা করিয়া আসিতেছে এবং সেও অকাতরে সেবা গ্রহণ করিতেছে, এমত অবস্থায় ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার কাছে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যতই কেন মানবের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বক্তৃতা করা হউক না কেন, তাহার মনের সুদৃঢ় সংস্কার সহজে ঘুচিবার নহে।

পরিশেষে, ইতিহাস-ভূগোল ও প্রবন্ধরচনার সম্বন্ধে টলষ্টয়ের দুই একটি মতামত আমার কাছে নূতন ঠেকিয়াছে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তাঁহার বিদ্যালয়ের ছেলেরা রচনাসম্বন্ধে একটু কাচা দেখিয়া টলষ্টয় একদিন তাহাদিগকে একটা প্রবাদ-কথার (Proverb) বিষয়ে একটি গল্প লিখিতে বলেন। বিষয়টি দুরূহ বলিয়া ছাত্রেরা কেহই এ কাজে হাত দিল না, কেবল একটি ছাত্র টলষ্টয়কে তাহাদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া গল্প লিখিতে অনুরোধ করিল। তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ছেলেরা তাঁহার কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তিনি একটু একটু লেখেন আর ছেলেদের পড়াইয়া শোনান, ছেলেরা তাঁহার সমালোচনা করিতে লাগিল। টলষ্টয় ছেলেদের আশ্চর্য্য রকমের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনদিন পর-পর এই মত ছেলেরা নিজেরাই টলষ্টয়ের সঙ্গে গল্প লিখিতে লাগিল, এবং এই রকম করিয়া ছেলেদের প্রবন্ধ রচনার উৎসাহ জাগিয়া উঠিল।

ইতিহাস-সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বলেন যে, সমসাময়িক ঘটনাবলী জানিবার ঔৎসুক্য বশত মানুষের ইতিহাসপাঠের দিকে প্রথম নজর পড়ে। সুতরাং চিন্তাশীল শিক্ষক মাত্রই সমসাময়িক কাল হইতে ইতিহাস পড়াইতে আরম্ভ করিবেন।

ভূগোল-সম্বন্ধেও তিনি বলেন যে, কলেজে পড়িবার আগে ছাত্রদের ভূগোল পড়াইয়া লাভ নাই। অমুক দেশে কোন নদী আছে, সেখানকার প্রাকৃতিক ও

অধিবাসীদের বিবরণ প্রভৃতি শৈশব হইতেই জানিয়া শিশুর মননশক্তি কিছু মাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জাপানে 'কা-কানি'

ইউরোপে আমেরিকায় যেমন Strike, আমাদের যেমন ধর্ম্মঘট বা হরতাল, জাপানীদের 'কা কানি' সেই রকম একটা ব্যাপার। কিন্তু 'কা-কানির' মানে ঠিক ধর্ম্মঘট নয়, ইহার কথার কথার অর্থ "ধীরে চল"—Go Slow. Capitalistদের অত্যাচারদমনে জাপানী শ্রমজীবীদের ইহাই প্রধান অস্ত্র।

ইউরোপ এবং আমেরিকার শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষার্থে যেমন ভিন্ন ভিন্ন সভা সমিতি আছে, জাপানে শ্রমজীবীদের মধ্যে তেমন কিছুই নাই। সেখানে সেরূপ কোন সমিতি গঠন করিবার উপায়ও নাই; কারণ জাপান-গভর্ণমেণ্টের আইন এ সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া। শ্রমজীবীদের মধ্যে সেরূপ চেষ্টামাত্র হইলে জাপানী গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে, দলপতিদের জেলে দেয় এবং শ্রমজীবীদেরও বিধিমত শাস্তি প্রদান করিয়া বিদ্রোহ দমন করে।

এই দমননীতি সত্ত্বেও জাপানে শ্রমজীবীদের শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং দিন দিনই তাহাদের শক্তি প্রসার লাভ করিতেছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৫০, ইহার চার বৎসর পর ১৯১৮খৃষ্টাব্দে ৪০০, এবং পরের বৎসরে এক হাজারের উপর ধর্ম্মঘট ঘটে। শ্রমজীবীদের অভিযোগে কারখানার মালিকগণের কর্ণপাত না করাই ইহার কারণ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রমজীবীদের মধ্যে যে বিদ্রোহ ঘটে লেনিন্ ট্রট্‌জ্‌কি প্রভৃতির স্থায় সুযোগ্য দলপতি পাইলে ইহা যে রুষিয়ার স্থায়

রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিণত হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুলিশ ও সৈন্য দ্বারা গভর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ দমন করে বটে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা কিছুমাত্র কমে নাই। প্রতিবৎসরই ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি এই আগুন গভর্ণমেণ্টের কারখানাসমূহেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের গোলাগুলি ও জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানায় শ্রমজীবিগণ একযোগে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে; সেবারও পুলিশ ও ফৌজের সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট এই বিদ্রোহ দমন করে। ইহার পর হইতে জাপানী শ্রমজীবিগণ তাহাদের বিখ্যাত "কা-কানি" উদ্ভাবন করে।

জাপান গভর্ণমেণ্টের আইন-অনুসারে শ্রমজীবীদের ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার নাই। কোন কারখানায় সেরূপ কিছু হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই গভর্ণমেণ্টের পুলিশ ও ফৌজ আসিয়া তাহাদের দমন করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহারা যদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াই একযোগে কাজ ভুলিয়া যায়, যে হাত কাজ করিতে করিতে পাকিয়া গিয়াছে হঠাৎ যদি তাহার নৈপুণ্য আর না থাকে বা কাজ করিতে করিতে যদি তাহার কেবলি ভুল হয়, তাহা হইলে পুলিশের আইনত তাহাদের উপর জুলুম করিবার কোন অধিকার নাই। এইরূপে ইচ্ছাপূর্ব্বক একযোগে কর্ম্মের নৈপুণ্য ভুলিয়া যাওয়া, ইচ্ছাকৃত অক্ষমতার দ্বারা কল-কবজা নষ্ট করিয়া ফেলা, এক মিনিটের কাজে একঘণ্টা সময় লাগানো এবং এইরূপ আরো দশ রকম উৎপাত সৃষ্টি করিয়া কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া রাখাকে জাপানী ভাষায় 'কা-কানি' বলে।

অল্প সময়ের মধ্যে জাপানী শ্রমজীবিগণ এই বিদ্যায় এমন পাকিয়া উঠিয়াছে যে, ইহার শক্তি এখন আর ধর্ম্মঘটের শক্তি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এমনকি জাপানের কুলি-মজুরেরাও 'কা-কানির' শক্তি অনুভব করিয়াছে। এই 'কা-কানির' হাওয়া লাগামাত্র দশহাত দূরে গাড়ির উপর একটা জিনিষ তুলিয়া দিতে তাঁহারা সমস্ত কারখানাটাকে এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া সময় নষ্ট করে।

কোয়াসিকি জাহাজের কারখানার জাপানী শ্রমজীবিগণ প্রথম এই 'কা-কানি' অস্ত্র প্রয়োগ করে। এই কারখানাটি প্রাচ্য দেশের মধ্যে একটি বৃহৎ জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা। এখানে দৈনিক প্রায় ১৮০০০ হাজার লোক কাজ করে। বেতন বৃদ্ধি, প্রাপ্য লভ্যাংশ শোধ, ছয় মাস অন্তর নূতন লভ্যাংশের প্রাপ্তি, থাকিবার সুন্দর বাসস্থান এবং আহারের জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া প্রভৃতির দাবি করিয়া তাহারা কারখানার মালিক-দের নিকট আবেদন করে। কারখানার মালিকগণ তাহাদের শেষোক্ত দাবি তিনটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে এইরূপ আশ্বাস দিলেন কিন্তু প্রথমোক্ত দাবি অর্থাৎ বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না।

শ্রমজীবিগণ পূর্ব্ব হইতেই 'কা-কানির' জন্য প্রস্তুত ছিল। এইবার তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কাজ আর অগ্রসর হইল না, 'কা-কানির' হাওয়ায় প্রত্যেক বিভাগে এমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল যে, কারখানার মালিকগণ প্রথমে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অবশেষে যখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, তখন তাহারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিল। পুলিশ ও ফৌজ আসিয়া সর্দ্দারদের জেলে পুরিল, শ্রমজীবীদের অনেক বুঝান হইল, ভয়ও দেখান হইল। তাহাতেও যখন কিছু হইল না, তখন তাহারা দুয়ারে তালা চাবি লাগাইয়া কারখানার ফটক বন্ধ করিয়া দিল।

কিন্তু ইহাতেও বিপদ কাটিল না। সে সময় অনেকগুলি জাহাজ মেরামতের জন্য কারখানায় মজুত ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে সকল জাহাজ মালিকের নিকট ফিরাইয়া দিতে না পারিলে তাহাদের সমুদয় চুক্তির সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া যাইবে, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবশেষে তাহারা শ্রমজীবীদের সমুদয় দাবিই পূরণ করিতে রাজি হইল।

এই বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে-না-হইতেই ওয়াকার লোহার কারখানায়

শ্রমজীবিগণ "কা-কানি" করিয়া বসিল। এবারেও কারখানার মালিকগণ তাহাদের দাবি পূরণ করিতে বাধ্য হইল। ইহার পর হইতে সমস্ত জাপানময় এই আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রবল শক্তিতে এখন জাপানী Capitalistরা সন্ত্রস্ত।

কিন্তু Capitalistগণও এসম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট নয়, শ্রমজীবিদের এই নবলব্ধ শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পক্ষে, সুতরাং উপায় উদ্ভাবন করিতেও তাহাদের দেরী হয় নাই। স্থির হইয়াছে, যাহারা কারখানায় কাজ করিবে তাহাদের প্রত্যেকের নাম রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে এবং রেজেষ্ট্রী আপিস হইতে তাহাদের নামে একখানা কার্ড দেওয়া হইবে। এই কার্ড দেখাইতে না পারিলে তাহারা কোন কারখানায় কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। পুলিশের নিকটেও তাহাদের নামের তালিকা থাকিবে। কোন কারণে পুলিশ কিম্বা কারখানার মালিকগণ অসন্তুষ্ট হইলে তাহাদের নামের কার্ড কাড়িয়া লওয়া হইবে, তখন তাহাদের আর কোন কারখানাতেই প্রবেশ করিবার অধিকার থাকে না।—Nation

শ্রীতেজশচন্দ্র সেন।

বৃহৎকথা

গুণাঢ্য-কৃত বৃহৎকথা-নামক কথা গ্রন্থের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী কালে বহু কথাসাহিত্যের ইহাই মূল। ইহা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা এখনো পাওয়া যায় নাই। নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় ইহার কথাভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে; যথা, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী,

সোমদেবভট্টের কথাসরিৎসাগর, ও বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ। মূল পুস্তকখানির রচনাকাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। প্রফেসার ওয়েবার ইহাকে ও দণ্ডীর দশকুমারচরিতকে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু ডাক্তার বুলার বলেন, ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, বৃহৎকথা যে, সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা নির্ণয়সাগরে মুদ্রিত সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের ভূমিকায় উদ্ধৃত বচনগুলি হইতে বেশ বোঝা যায়। কথাসরিৎসাগরের প্রথমেই কথাপীঠ-নামক অংশে উক্ত হইয়াছে যে, মূল প্রাকৃতে যাহা ছিল ইহাতেও ঠিক তাহাই আছে, কেবল ভাষাটা সংস্কৃত, আর কথাটাকে কিছু সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অধিপতি শাতবাহনের সভায় গুণাঢ্যের অভ্যুদয় হয়। গুণাঢ্য ইঁহার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কেহ-কেহ বলেন, এই শাতবাহন দীপকর্ণির পুত্র। কিন্তু শাতবাহনগণের পৌরাণিক তালিকায় দীপকর্ণির পরিবর্ত্তে শাতকর্ণি নাম আছে। দীপকর্ণি ও শাতকর্ণিকে অভিন্ন বলিয়া ধরিলে গুণাঢ্যকে সম্ভবত খৃষ্টের পূর্ব্ব শতাব্দীতে ফেলিতে হয়।

এই স্থানে প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে অতর্কিতভাবে নূতন আলোক পাওয়া যায়। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে একখানি গ্রন্থ আছে, ইহা উ দ য় ণ ন্ ক দৈ, ক দৈ, অথবা পে রু ঙ্গ দৈ নামে কথিত হইয়া থাকে। এই পুঁথীর কিয়দংশ মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজের পণ্ডিত ভিঃ শ্রীনিবাস আয়ারের নিকট রহিয়াছে। ইহা নিম্নোক্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত :—

১। উ ন্ জে ক কা ণ্ড ম্ (উজ্জয়িনীকাণ্ড), ইহার ৫৮ অধ্যায় মধ্যে ৩২ অধ্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২। ই লা বা ণ কা ণ্ড ম্ (লাবাণকাণ্ড), ২০ অধ্যায়।

৩। ম গ ধ কা ণ্ড ম্, ২৭ অধ্যায়।

৪। ব ত্ত ব কা ণ্ড ম্ (বৎসকাণ্ড) ১৭ অধ্যায়।

৫। ন র বা ণ কা ণ্ড ম্ (নরবাহনকাণ্ড) ৯ অধ্যায়।

বৃহৎকথার তামিল অনুবাদের পর্য্যালোচনা হইলে বৃহৎকথার রচনাকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে আশা করা যায়।

পণ্ডিত শ্রীনিবাস শিলপ্পধিকারমের অডিয়ার্কুনল্লার-রচিত টীকা পরীক্ষা করিয়া এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করিয়াছেন। অডিয়ার্কুনল্লার অতি সুন্দর ও বিশ্বাস-যোগ্য টীকাকার। ইনি যেখানেই অন্য পুস্তক হইতে কোনো কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন সেখানেই গ্রন্থকর্ত্তার উল্লেখ করিয়াছেন। যদি-চ তাঁহার কৃত টীকা হইতেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি সমস্ত গ্রন্থখানির টীকা করিয়া-ছিলেন, তথাপি সম্প্রতি কেবল তাহার একদেশমাত্র অবশিষ্ট আছে। অডিয়ার্কুনল্লার তাঁহার টীকার একস্থানে প্রথম কুলোত্তুঙ্গ চোলের সভাস্থ কবি-চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত টীকাকার খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অংশে বর্ত্তমান ছিলেন।

অডিয়ার্কুনল্লার যে, পেরুঙ্গদই বা উদয়ণঙ্গদৈ হইতে কেবলমাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি ইহাকে কাব্য এবং কথার মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায় তাহাও বিচার করিয়া অবশেষে ইহাকে কাব্যের শ্রেণীতেই স্থান দিয়াছেন। ইনি উদয়ণ কথৈ হইতে 'কাপিয় অরশন্' (কাব্যরাজ) কথাটি উদ্ধার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কপাডপুরমস্থ মধ্য 'সঙ্গমের' (কবি ও সমালোচকদিগের মহাবিদ্যালয়ের) প্রচারিত গ্রন্থ অলোচনা করিয়া এই কথা লিখিত হইয়াছে।

সুতরাং আমাদের ইহা ধরিতে হইবে যে, ইহা তৃতীয় সংঙ্গমের সুবৃহৎ গ্রন্থা-বলীর পূর্ব্বে রচিত। বিশেষত, যখন দেখা যায় এই কথায় বর্ণিত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র পরবর্ত্তী কালের কোথাও উল্লিখিত নাই, তখন ইহাই আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্‌ভিন্ন তামিল কাব্যসমূহের এবং বৃহৎকথার মধ্যে অনেক স্থানে ভঙ্গিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহা আকস্মিক হইতে পারে না, কারণ অনেক স্থানেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিল আছে।

অতএব বলিতে হয়, এই তামিল-অনুবাদ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে শাত-বাহন-রাজশক্তির অধঃপতনের সময়ে তৃতীয় তামিল সঙ্গমের পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং বৃহৎকথা খৃষ্টীয় শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে রচিত না হইলেও খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে নিশ্চয়ই হইয়াছিল।—JRAS.

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

বিশ্ববৃত্তান্ত

সন্ধির সর্ত্তানুসারে তুর্কীকে য়ুরোপের কিয়দংশ রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু যে সর্ত্তে সুলতান তাহা রক্ষা করিতেছেন তাহা অনেকেরই প্রীতিপ্রদ হয় নাই। কন্‌স্ট্যান্‌টিনোপলেই তুর্কী সুলতানের রাজধানী থাকিবে, কিন্তু তিনি তাঁহার ব্যবহারের জন্য কেবলমাত্র (৭০০) সাতশত সৈন্য রাখিতে পারিবেন। এই সামান্য সৈন্যে রাজ্য রক্ষা তো দূরের কথা রাজ-সম্মান বজায় রাখার পক্ষেও যথেষ্ট নয় বলিয়া কেহ কেহ অভিযোগ করেন। কন্‌সট্যান্‌টিনোপোলের সম্মুখস্থিত প্রণালী এক্ষণে সকল জাতির ব্যবহার ও অবাধ গতির জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারই তদারক করিবার জন্য একটি 'কমিটি' গঠিত হইয়াছে। গ্রীস্, রুমানিয়া, এমন কি সেদিনকার শত্রু বুলগেরিয়াও এই কমিটিতে নিজ নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তুর্কীকে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। এশিয়াতে আনাটোলিয়র অধিকাংশ নামত তুর্কীর অধীন। ইহার ব্যবস্থার জন্য তুর্কী সরকার দায়ী, অথচ তাহার শক্তি সকল দিক হইতে হ্রাস করা হইয়াছে। এশিয়াতে তুর্কী ৫০ হাজার সৈন্যের

অধিক রাখিতে পারিবে না। আবার এই সৈন্য কোনো এক স্থানে রক্ষিত হইবে না, কোথায় কত সৈন্য থাকিবে আন্তর্জাতিক কমিশন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তুর্কী সৈনিক বিভাগে য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে। আয়ব্যয়-বিভাগের ভার বৃটিশ, ফরাসী ও ইতালীয় প্রতিনিধিগণের উপর ন্যস্ত হইবে। তুর্কী প্রতিনিধিও থাকিবেন, তবে তিনি কেবল মাত্র পরামর্শ-দাতা-হইয়া উপস্থিত থাকিবেন।

মার্কিন দেশের মধ্যস্থতার ভার আমেরিকার উপর পড়িয়াছে। এ স্থানটি ইংলণ্ডের অপেক্ষা আয়তনে ন্যূন নহে। এ ছাড়া তুর্কী স্থানের লোকেরা স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য "লীগ অব্ নেশনের" নিকট তাহাদের আবেদন জানাইয়াছে। সিরিয়া, পালেসটাইন ও মেসোপটেমিয়া ফরাসী ও ইংরাজ ভাগ করিয়া লইয়াছেন। আরেবীয়াতে নূতন সুলতান নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। আনাটোলিয়ার বিখ্যাত বন্দর স্মির্না গ্রীস্‌কে দিবার কথা হইয়াছে। এই সকল কারণে চারি-দিকে নানা কথা ও নানা আন্দোলন হইতেছে। —Fortnightly Review.

কিছুদিন হইতে পোলাণ্ডের নূতন রাজ্যের সহিত রুশের যুদ্ধ বাধিয়াছে। য়ুরোপের শক্তিশালী জাতিরা এই যুদ্ধে কোনো অংশ লইবেন কিনা তাহা ভাবিতে-ছিলেন। ফ্রান্স রুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার জন্য ব্যস্ত। প্রত্যক্ষ-ভাবে সৈন্যাদি প্রেরণ করিয়া ফ্রান্সের সাহায্য করা অসম্ভব, তথাপি রুশের স্বাধীনতা বা তাহার নূতন শাসনপ্রণালী সে সহ্য করিতে পারিতেছে না। ফরাসীরা গত যুদ্ধের পর হইতে স্বাধীনতা ও উদারনীতির পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বৃটিশদের সহিত তাহাদের এই সব ব্যপার লইয়া মতদ্বৈত প্রায়ই হইতেছে। ফ্রান্স যাহা খুসি করুক, ইংল্যাণ্ড এবিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করিবে না এইরূপ ভাবিতেছিল।

ইংলণ্ডের এই মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা দায়ী নহেন। গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃটীশ জনসঙ্ঘ এই বিষয়ে

প্রতিবাদ করিয়াছে,—ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত কথনো দেখা যায় নাই যে সমগ্র 'নেশন' বা সাধারণ লোক একবাক্যে যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়াছে। লোকে মন্ত্রীকে জানাইয়াছে যে, বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট রুশের বিরুদ্ধে বড় বা সামান্য কোনো প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন না। অথবা বাণিজ্য বন্ধ করিয়া বা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া বধসাধন বা নিরস্ত্র অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতে পারিবেন না। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকে নীরবে প্রতিবাদ না করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিয়া তাহাদের অন্তর এখন জাগিয়াছে। জার্ম্মনীতে শ্রমজীবিরা সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যাপারে সরকারের সহিত অসহযোগিতার বাণী ঘোষণা করে। ইংলণ্ডে এখন সেই বাণী ধ্বনিত হইয়াছে। —Nation.

মধ্য য়ুরোপে ও জার্ম্মানীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। জার্ম্মানীর ক্ষুৎপীড়িত শিশু ও ছাত্রদের জন্য আবেদন পত্রিকাদিতে প্রায়ই দেখা যায়। এক লাইপ্‌জিগ্‌ সহরে জনৈক মহিলা প্রতিদিন ১১ হাজার শিশুদের খাওইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনালড্‌ প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোক নেশনের সম্পাদকের নিকট যে পত্র দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, যুদ্ধের সময় যে দুঃখ লোকে ভোগ করিয়াছে, তাহার চেয়ে শতগুণ কষ্ট বর্ত্তমানে লোকে ভুগিতেছে। শিশুদের হাসপাতাল রোগীতে পূর্ণ। রোগীরা ভাল আহার পাইতেছে না। এক বার্লিন সহরে ৩০ হাজার শিশু যক্ষ্মাতে ভুগিতেছে, ও যুদ্ধ শেষ হইতে ১০ লক্ষ অনাহারে ও যক্ষ্মাতে মরিয়াছে। অষ্ট্রীয়াতে সাড়ে তিন লক্ষের উপর লোক যক্ষ্মাতে ভুগিতেছে। এখানকার বিখ্যাত হাসপাতালগুলিতে কোনো প্রকার আসবাবপত্র নাই, ঔষধ নাই, পথ্যের ব্যবস্থা নাই! আমাদের দেশের কত শিশু না খাইয়া মরে তাহার কোনো সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, নতুবা তাহা দেখিলেও আমারা শিহরিয়া উঠিতাম। (May Sinclair লিখিত Worse than War প্রবন্ধ পাঠ করুন;—The English Review, Ang. 1920)

Field Marshal স্যার হেন্‌রী উইলসন্ General Staff এর প্রধান। তিনি সৈন্যদের এক সভাতে বলিয়াছিলেন, যুদ্ধের সময়ে আমরা শুনিতাম যে এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ, এসব নিতান্ত ভুয়ো কথা। সৈন্যবিভাগের জন্য Journal of the Royal United Service Institution নামে একখানি ত্রৈমাসিক কাগজ আছে, যুদ্ধাদি সংক্রান্ত বিষয়ই ইহাতে লিখিত হয়। সেই কাগজের লেখক ও পাঠক অধিকাংশই সৈনিক বিভাগের লোক। তাঁহারা পৃথিবীকে যুদ্ধের চোখে দেখেন, যুদ্ধে ও হত্যায় তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করেন। তাঁহারা উক্ত পত্রিকাতে ভাবী যুদ্ধ-সম্বন্ধে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, আগামীবারে যে যুদ্ধ হইবে তাহা গত যুদ্ধের তুলনায় কিছুই নয়। আগামী যুদ্ধে শত্রুজাতিকে সমূলে বিনাশ সাধন করিতে হইবে। এখন এই সমূলে বিনাশ-সাধন কেমন করিয়া করা যায়, তাহা লইয়া জল্পনাকল্পনা হইতেছে। গতযুদ্ধে কিছু কিছু 'গ্যাস' ব্যবহার করায় ইহাকে লোকে প্রথম প্রথম 'বর্ব্বরতা' 'নিষ্ঠুরতা' 'সয়তানী' ইত্যাদি অনেক আখ্যায় বিভুষিত করে। আগামী যুদ্ধে অদৃশ্য গ্যাস্ হইবে মানুষ মারিবার প্রধান উপাদান; বারুদ যেমন যুদ্ধ-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনিয়াছিল, ভাবি যুদ্ধে গ্যাস সেইরূপ যুগপরিবর্ত্তন করিবে। উপকূলে মোটর নৌকা করিয়া এই গ্যাস ছাড়া হইবে। আর একজন যোদ্ধা বলিয়াছেন, 'এক্স-রে' যেমন নূতন জগৎ খুলিয়া দিয়াছে, তেমনি কোনো প্রকার আলোক-রশ্মি আবিষ্কার করিয়া এবং তাহা দূর হইতে শত্রু উপর ফেলিয়া শত্রুকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত বা বিষ-জর্জ্জরিত করা দুরাশা নয়। তিনি আরও বলেন, আগামী যুদ্ধে রোগ-জীবাণু শত্রুর দেশে ছড়াইয়া দিতে হইবে; যুদ্ধ যদি করিতেই হয়, শত্রুকে যদি মারিতেই হয়, তবে তাহাকে সমূলে বিনাশ করাই শ্রেয়। যে সভায় এই সব বিষয় আলোচিত হইয়াছিল সেখানে একটি লোকও এই অমানুষিক প্রস্তাব ও জল্পনার বিরুদ্ধে কিছু বলে নাই! ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারণের জন্য, পৃথিবীতে শান্তি আনিবার জন্য লক্ষ লক্ষ যুবক য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে! এসব কি তাহারই পরিণাম! Nation

---o---

মানুষ ছাড়া আর সব প্রাণীর মৃত্যু হয় একই রকমে, অর্থাৎ না খাইতে পাইয়া। মানুষ মরে দুই রকমে—না-খাইতে পাইয়া এবং মনের ক্ষুধা তৃপ্ত না করিতে পাইয়া রুশে যাহাতে রসদপত্র, খাদ্যদ্রব্য না প্রবেশ করে সেজন্য জার্ম্মানী যুদ্ধের সময় যথাসাধ্য করিয়াছিল। তার পর সেখানে বিপ্লব সুরু হইলে ইংরাজ ফরাসী তার শত্রু হইয়া উঠিলেন ও বহুকাল রুশকে ঘিরিয়া রাখিয়া জব্দ করিয়া বশ মানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯১৬ সাল হইতে রুশের সঙ্গে বাহিরের পৃথিবীর যোগাযোগ একপ্রকার বন্ধ। গত চার বৎসর সে দেশে কোনো বই বা পত্রিকা পৌঁছায় নাই। এমনকি সেভিয়েট শাসন-সংস্কার সন্ধির সম্পূর্ণ সর্ত্তগুলি পর্য্যন্ত জানে না, য়ুরোপের রাজনৈতিক ভূগোলের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছেন, তাহার উড়ো খবর ছাড়া কোনো ঠিক খবর তাহারা পায় না। একজন বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানবিদ্ Physics সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন, কিন্তু তিনি এপর্য্যন্ত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও জার্ম্মানী হইতে Einstein এর Theory of Relativity সম্বন্ধে বইখানি যোগাড় করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে জ্ঞান জগতের কোনো বাধা ছিল না। এক ভাষায় কিছু বাহির হইলে তখনই তাহা অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইত। শত শত লেখক ও প্রকাশক এমনি করিয়া তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিত। সে সব পথ এখন বন্ধ। রুশে কাগজের অভাবে অনেক বই ছাপা বন্ধ; দুই বৎরের মধ্যে একখানিও বৈজ্ঞানিক বই ছাপা হয় নাই। রুশ জাতির মানসিক বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ। এ মরণ না-খাইয়া মরণের চেয়ে কম নয়।

Nation

বৈচিত্র্য

কোনো-কোনো মানুষ কোনো এক বিষয়ে অথবা একাধিক বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ হন, কিন্তু এই বলিয়াই তিনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, ইহা বলা যায় না; আর যদি বিবেচক হন তাহা হইলে তিনি নিজেও ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু কাজে ইহা ঠিক দেখা যায় না। তিনি যাহা জানেন সে বিষয়ে তো বলেনই, যাহা জানেন না সে বিষয়েও বলেন,—এতদূর বলেন যে, তিনি যেন তাহার তন্ন তন্ন করিয়া যাহা কিছু জানিবার-বুঝিবার আছে সবই জানিয়া-বুঝিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার বিষয়বিশেষে অভিজ্ঞতার প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধা-বশত লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অজ্ঞতারও কথা অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। সে যে এইরূপে কত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হয়, এবং কত অকল্যাণকে আনিয়া ফেলে বলিয়া শেষ করা যায় না।

*

* *

সংস্কার জিনিসটা নিতান্তই দুরপনেয়, আর ইহার এমন একটা শক্তি আছে যে, বস্তুতত্ত্বকে কিছুতেই যথাযথ ভাবে বুঝিতে দেয় না, অথবা বুঝিতে দিলেও তদনুসারে কাজ করিতে দেয় না। যতই কিছু বলা-কহা যাউক না, অথবা যতই কেন নিজে দেখুক-শুনুক না, মানুষ তাহা অনুসরণ না করিয়া ঠিক যাহাতে তাহার সংস্কারের সাড়া পায় তাহাই গ্রহণ করে, তা তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার নিকটে তাহাই ভাল।

দেখা যায়, যাঁহারা সংস্কারের এই দোষ দেখিয়া যে-কোনরূপে হউক ইহার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহারাও ঐ বিশেষ একটা সংস্কারের ত্যাগ করিলেও অন্য সংস্কারের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা লোককে একটা সংস্কারের অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে গিয়া নিজের সংস্কারটা তাহার মধ্যে ঢুকাইয়া ঐ পূর্ব্বের অমঙ্গলের স্থানে নূতন একটা অমঙ্গল আনিয়া উপস্থিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, এই শ্রেণীর লোকেরা অন্যের সংস্কারটাকে যেমন দেখিতে পায়, নিজের সংস্কারকে তাহার তিলমাত্রও দেখেন না।

*

* *

ভাল সংস্কারও আছে, মন্দ সংস্কারও আছে। ভালকে রাখিতে হইবে, মন্দকে তাড়াইতে হইবে। কিন্তু কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সব সময় ঠিক করা সহজ নহে। দেশ, কাল, পাত্র, ধর্ম্ম, সমাজ-প্রভৃতির ভেদে, যাহা কাহারো নিকটে ভাল, অন্যের নিকটে তাহাই মন্দ। তাই এ সব বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা শক্ত হয়। কিন্তু যাহা বিশেষ কোনো দেশ, কাল, পাত্র, ধর্ম্ম, সমাজ-প্রভৃতির অতীত সেখানে এ প্রশ্নের মীমাংসা দুষ্কর নহে। যে সংস্কার সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বধর্ম্মে সর্ব্বসমাজে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিকূল, যাহার দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ না হইয়া কেবল সঙ্কোচই হইয়া যায়, সেই সংস্কার কু, ইহাতে কাহারো কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। এই কু সংস্কারকেই তাড়াইতে হইবে।

*

* *

যেখানে বালকগণের সংস্কার-মুক্ত শিক্ষার কথা বলা হয়, সেখানে সংস্কার বলিতে এই কু সংস্কারকেই বুঝিতে হইবে। অন্যথা সংস্কার-মুক্ত শিক্ষা আকাশ-কুসুম বৈ আর কিছুই নহে, ইহা একবারে অসম্ভব; কারণ, শিক্ষক বালকের

পূর্ব্ব সংস্কারটা ছাড়াইলেও নিজের সংস্কারটা তাহাকে না দিয়া কিছুতেই পারেন না,—তা তিনি যেখানেই শিক্ষা দিন, লোকালয়েই হউক বা লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া বনে গিয়াই হউক।

*
* *

মানুষের দুর্ব্বলতার সীমা নাই। সে সময়ে সময়ে নিজের চিন্তিত কোনো বিষয়ে যুক্তি পাইবার জন্য সত্য সত্য যাহা তাহার নিজের ব্যক্তিগত, তাহাই সাধারণের বলিয়া প্রচার করে। যাহা তাহার নিজের সুবিধা-অসুবিধার কারণ, তাহা ঠিক ঐরূপ ভাবেই প্রকাশ না করিয়া সাধারণের বলিয়া সে প্রচার করে; এবং ইহাই যদি অনুসরণ করা না হয়, তবে সে সাধারণের নামে প্রতিকূল তর্ক করিতে আরম্ভ করে, যদিও বস্তুত দেখা যাইবে যে, সে যাহা বলিতেছে সাধারণে তাহা বলে না।

*
* *

সত্যকে বুঝা বড় শক্ত, কিন্তু বুঝিলেও তাহাকে পালন করা আরো শক্ত। সত্যকে বুঝিয়াছি অথচ তাহা পালন করিতেছি না, লোক ইহা সহিতে পারে না, অথবা ইহা মানিতে চায় না। তাই সে যতটা যেমন করিতে পারে, বা যতটা যেমন করিলে তাহার সুবিধা হয়, সে সত্যকে তেমনি ভাবেই দেখে, বা তেমনি করিয়াই তাহাকে লোকের সামনে খাড়া করিতে চেষ্টা করে, এবং ততটাই তাহার দিকে অগ্রসর হয়। ইহাতে বস্তুত সে সত্য দেখিতে পায় না, নিজের মনগড়া যা হয় একটা কিছু করিয়া তাহাকেই সত্য বলিয়া জ্ঞান করে মাত্র। তাই সত্য পালনের আসল ফল ইহাতে হয় না।

*
* *

নূতনের প্রতি লোকের একটা বিশেষ অনুরাগ আছে, থাকা আবশ্যকও। এমন সব জীর্ণ-শীর্ণ প্রাচীন আছে, যাহাতে কাজ চলে না, এখানে নূতনের প্রতিষ্ঠা অবশ্য চাই। কিন্তু এমনো প্রাচীন আছে যাহা বস্তুত কখনো জীর্ণ-শীর্ণ হয় না, যাহা নিত্য-নূতন। কিন্তু নূতনপন্থী ইহা দেখিতে পায় না। সে নূতনে অতি-আসক্তিবশত প্রাচীনের দিকে তাকাইতেই চাহে না। প্রাচীনের ন্যায় নবীনেও অতি-আসক্তি কুশলের জন্য হয় না। এমন প্রচীন আছে, যাহা সম্পূর্ণ, যেখানে আর কিছু জানিবার নাই, যেখানে নূতনের কোনো আবশ্যকতা নাই। ইহাকে অনুসরণ করিতে পারিলেই নূতনপন্থী নিজের সম্মুখের পথকে নিত্য আলোকিত দেখিতে পারে, এবং 'নূতন কৈ' 'নূতন কৈ' এই বলিয়া আর তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না।

***

সিদ্ধি কে না চায়? সাধন না করিলে সিদ্ধি পাওয়া যায় না, ইহাই বা কে জানে? সাধন করিতে গেলে কিছু না-কিছু ক্লেশ আছেই, ইহাও তো সকলের জানা কথা। যদি সিদ্ধি পাইতেই হয় তবে সাধনের ক্লেশ পাইতেই হইবে। কিন্তু তথাপি লোক এমনি সুখাসক্ত, এমনি অলস যে, সে সাধন করিবে না, অথচ সিদ্ধি তাহার চাই-ই। কথটা দাঁড়াইতেছে এই যে, পুণ্যের ফলটা চাই, কিন্তু পুণ্য চাই না। সিদ্ধিলাভ করা ভীরু জড় অলস দুর্ব্বলের কাজ নহে; নির্ভীক তপস্বী বীর সাধকের প্রয়োজন, সে-ই একমাত্র সিদ্ধি-শ্রী লাভ করিতে সমর্থ।

***

জনসঙ্ঘ কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য একত্র সমবেত হয়। যাহা মঙ্গল, তাহাই কর্ত্তব্য। মঙ্গলই সকলে চায়, এবং তাহাই যে কর্ত্তব্য, ইহাতেও কাহারো সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই মঙ্গলটা কি ইহাই লইয়া তর্ক-বিতর্ক বাদ-বিবাদ বা গণ্ডগোল হইয়া থাকে। লোকের মত ভিন্ন-ভিন্ন হয়; কেহ বলে এক তো অন্যে বলে

আর এক। তখন সম্বহুলতার প্রয়োজন হয়। কোন্ কথাটা বহু জনে বলিতেছে তাহা গণিয়া দেখিয়া হয়। বহু জনে যাহা বলে, স্থির হইল, তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু মঙ্গল কি ঠিক তাহাই? তাহা মঙ্গল হইতেও পারে, না-ও পারে। তাই বলা যায় না বহু লোকে যাহা বলে তাহাকে মঙ্গল হইতেই হইবে—তা তাহা দেশেরই সম্বন্ধে হউক বা অন্য সম্বন্ধেই হউক। সমস্ত লোকে যদি একমত হইয়া কিছু স্থির করে তবে তাহারও সম্বন্ধে এই কথা, তাহা মঙ্গল হইতেও পারে না ও পারে। তবে বহুর বা সকলের মতে কাজ করার এই মাত্র ফল যে, যদি তাহাতে মন্দই হয় তথাপি কাহাকেও কিছু বলিতে পারা যায় না। কিন্তু মানুষ মনে করিয়া থাকে, এইরূপে কাজ করা হইলে বস্তুত তাহাতে মঙ্গলই হয়, ইহা অত্যন্ত ভুল।

* * *

শত-সহস্র লোকের মধ্যে হয় তো এক-আধ জন সত্যকে দর্শন করেন। কিন্তু তাঁন যে সত্য উপলব্ধি করেন তাহা অন্যকে বুঝান বড় শক্ত হয়; অথচ না বুঝাইয়াও উপায় নাই। লোকে এ জন্য কত প্রতিকূল আচরণ করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তা যাহাই হউক সে যত দিন এই সত্যকে গ্রহণ না করে ততদিন তাহার যথার্থ মঙ্গলের আশা নাই, ইহা নিঃসন্দেহ।

* *

আশ্রমসংবাদ

পূজনীয় গুরুদেব গত শ্রাবণ মাসের শেষে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে আসিয়াছেন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পারিস হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে পত্র আসিয়াছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"পারিসে Autour du Monde বলে একটা সমিতি আছে। গুরুদেব এসেছেন খবর পেতেই তার কর্ত্তারা সমিতির বাড়ীতে এসে থাক্‌বার জন্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লুম। এই সমিতি-সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে না বল্লে ব্যাপারটা আপনারা ধরতে পারবেন না। ব্যাপারটার সবটাই M. Kahn নামে একটি ভদ্রলোকের মাথা থেকে বেরিয়েছে এবং তাঁর টাকায় চলছে। কতকটা যেন 'বিচিত্রা'। এই লোকটি প্রায় চল্লিশ বছর আগে ৩০৲ টাকা মাইনের একটি চাকরী নিয়ে পারিসে এসেছিলেন। তার থেকে এখন তিনি এখানকার প্রধান ক্রোড়পতি। এদেশে এঁর মত ধনী আর বোধ হয় কেও নেই। তিনি অবিবাহিত, নিরামিষাশী ; অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও নিজে এক ছেঁড়া কাপড় পরে, একটা ছোট্ট বাড়ীতে নেহাৎ গরীবের মত থাকেন। নিজের সম্বন্ধে এত মিতব্যয়ী, কিন্তু তাঁর দানের সীমা নেই। তাঁর যেখানে বাড়ী সেটা পারিস সহরের বাইরে—Bois du Boulogne ছাড়িয়ে, Seie নদীর ধারে। তিনি নিজে একটি ছোট বাড়ীতে থাকেন, কিন্তু আশে-পাশের প্রায় ১০।১৫ বাড়ী সবগুলই তাঁর। তার প্রত্যেকটিতে একটা-না-একটা প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের যে বাড়ীতে

থাকতে দিয়েছেন সেটা একটা ক্লাবের মত, কতকটা 'বিচিত্রার' ধরণের। তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাকে দেশ-বিদেশের লোকদের একটা মিলনক্ষেত্র করা। বাড়ীটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দরভাবে সাজান। একটি চমৎকার লাইব্রেরিও আছে এবং দুচারটি থাকবার ঘর আছে। অতিথি-সেবার ব্যবস্থা খুব ভাল, পশ্চিমে এরকম দেখা যায় না। যা হোক, এই বাড়ীতে যে দেশবিদেশের গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা এসে থাকতে পারেন এবং মিশতে পারেন কেবল তাই নয়, Autour du Mondeর উদ্দেশ্য ও কর্ম্মণ্যতা আরো বিস্তৃত। প্রত্যেক দেশ থেকে দুজন চারজন করে লোককে তাঁরা টাকা দিয়ে এক বছরের জন্যে পৃথিবী ঘুরতে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একটি কোনো বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করবার লক্ষ্য রেখে ভ্রমণ করেন, এবং ঘোরা শেষ হয়ে গেলে তাঁদের প্রতিবেদন লিখে এখানে পাঠিয়ে দেন। Mr. Lowes Dickianson এই বৃত্তি নিয়ে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের লোকদের কাওকে এখনো এই বৃত্তি দেওয়া হয় নি— গুরুদেব প্রস্তাব করেছেন, আর Mr. Kahn বলেছেন ভবিষ্যতে হবে। তিনি নিজে এত গরীবের মত থেকেও যেগুলি তাঁর সখ তার জন্যে অজস্র খরচ করেন। তাঁর বাড়ীর পিছনে একটি বাগান করেছেন, সে যে কি চমৎকার কি বলব! প্রকাণ্ড জায়গা নিয়ে বাগান, তার কোথাও কৃত্রিম পাহাড় পর্ব্বতের দেশ—পাইনের জঙ্গল, কোথাও উপত্যকার মধ্যে নীচু জলা জমি—পদ্ম পুকুর, কোথাও কৃত্রিম চীন-জাপানি মুলুক—ছোট ছোট ঝরনা, বাঁকা-চোরা গাছপালা, —আবার কোথাও ফরাসী ফল-বাগিচা। বাগান সম্বন্ধে বর্ণনা লিখি ত সে এক পুঁথি হয়ে দাঁড়াবে, তার দরকারও নেই, কেন না যখন Mr. Kahn আমাদের নিয়ে তাঁর বাগান দেখাচ্ছিলেন তখন আমাদের অজানাতে সমস্তটির Moving Picture তোলা হয়ে গেছে! সেই ছবি আবার আমরা কাল দেখলুম। এই film টী শান্তিনিকেতনে তিনি পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন।"

শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধানন্দ স্বামী গত ১৪ই ভাদ্র সোমবারে আশ্রমে আসিয়াছিলেন।

সঙ্গে গুরুকুলের কয়েক জন স্নাতক ছাত্র ছিলেন। কলাভবনে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। বিচিত্র ভূর্জপত্রে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখানি অভিনন্দন-পত্র সংবর্দ্ধনার পরে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমের বালকবালিকারা "বাল্মীকি-প্রতিভা" নাটকের কিয়দংশ অভিনয় করিয়াছিল। স্বামীজী কেবল একদিন মাত্র আশ্রমে ছিলেন।

ইহার পরে গত ২৬শে ভাদ্র মহাত্মা গান্ধী মহাশয় আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ভারতের নানা প্রদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মহাত্মাজীর আগমন-সংবাদ পাইয়া বোলপুর রেল-ষ্টেশনে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সহরের লোকেরা ষ্টেশনের রাস্তাটি ফুল ও পাতা দিয়া সাজাইয়াছিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইলে কলাভবনে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করা হয়। মহাত্মাজী একটু অসুস্থ শরীরে আশ্রমে আসিয়াছেন, যতদিন শরীর সুস্থ না হয় ততদিন সম্ভবত তিনি আশ্রমে থাকিয়া বিশ্রাম করিবেন। মহাত্মাজীর সহিত তাঁহার পত্নী এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবদাস আশ্রমে আছেন। অতিথিগণের বিনোদনের জন্য আশ্রমের ছাত্রেরা আর একবার "বাল্মীকি-প্রতিভার" অভিনয় করিয়াছিল।

মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ মোলানা সওকত আলি মহাশয়ও আশ্রমে আগমন করেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সকলে আনন্দিত হন।

গত একমাসের মধ্যে আশ্রমের ছাত্রেরা অনেকগুলি ফুটবল ম্যাচ খেলিয়াছে। স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের ডণ্ডা হোষ্টেলের ছাত্রেরা আশ্রম-বালকদের সহিত ফুট্‌বল্ খেলিতে আসিয়াছিলেন। আমাদেরই বালকেরা—এক 'গোলে' জয়-লাভ করিয়াছিল। ইহার পরে Y. M. C. A.-এর ছাত্রেরা খেলার জন্য আশ্রমে আসিয়াছিলেন। এই খেলায় কোন পক্ষই জয় লাভ করিতে পারে নাই। তার পরে "সুহাসিনী সিল্‌ডের" খেলার জন্য আশ্রম-বাল্‌কেরা লাবপুরে গিয়াছিল। এখানেও আমাদের ছাত্রেরা এক "গোলে" জয়ী হইয়া আসিয়াছে।

ইহা ছাড়া আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের সহিত বর্ত্তমান ছাত্রদের এক দিন খেলা হইয়াছিল। ইহাতে কোন পক্ষই জয় লাভ করিতে পারে নাই।

গত ২০ শে ভাদ্র রবিবারে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ সর্ব্বেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হওয়ায় আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। অল্প কয়েক দিনের পীড়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

আশ্রমের ছাত্র মুক্তিদা প্রসাদের বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিনে ভুবনডাঙা ও সাঁওতাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ভোজন করাইবার জন্য তাঁহার পিতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পনেরো টাকা দান করিয়াছিলেন। গত ৩০ শে ভাদ্র সন্ধ্যার সময়ে ঐ দুই গ্রামের প্রায় চল্লিশ জন দরিদ্র বালককে আহার করানো হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৵০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়

কার্য্যাধ্যক্ষ,

"শান্তিনিকেতন"

পত্রিকাবিভাগ

শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadananda Roy

at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop.

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ... আশ্বিন, ১৩২৭ সাল

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শান্তিনিকেতন পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হয় বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্রষ্টব্য

কলিকাতায় নং ২০।বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এণ্ড কোম্পানিতে খুচরা "শান্তিনিকেতন" নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁহারা ঐ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
(পত্রিকাবিভাগ)

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা — আশ্বিন, ১৩২৭ সাল

বৌদ্ধদর্শন

আত্মতত্ত্ব

[আজ আমরা এ সম্বন্ধে নাগার্জ্জুনের উক্তির কিয়দংশ প্রকাশ করিব। তিনি ইহা স্বরচিত মূল মধ্যমক কারিকার নবম প্রকরণে আলোচনা করিয়াছেন। চন্দ্রকীর্ত্তির টীকার সহিত তাহাই অনুবাদ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। বৌদ্ধেরা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ইহাদের মধ্যে বজ্জিপুত্তক (বৃজিপুত্রক) ও সম্মিতিয় (সাম্মিতীয়)[১] সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ আত্মবাদী (কথাবত্থুপ্পকরণ—অট্‌ঠকথা ১. ১ ; PTS p ৪)। নাগার্জ্জুন সাম্মিতীয়গণেরই মত উল্লেখ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

নিম্নে নাগার্জ্জুনের কারিকা বৃহৎ অক্ষরে ও চন্দ্রকীর্ত্তির টীকা ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হইয়াছে।]

১। চন্দ্রকীর্ত্তি ইহাই লিখিয়াছেন, অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে সম্মতীয়। এই সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্যের নাম সম্মত, এবং ইহা হইতেই ইহার এই নাম হইয়াছে (Rockhills' Life of Buddha, 1884, p. 184)

মূলমধ্যমককারিকা

মধ্যমকবৃত্তিঃ

নবম প্রকরণ, কারিকা ১—১২

১

কেহ-কেহ বলেন—যাহার দর্শন-শ্রবণাদি ও বেদনাদি হয়, সে ইহাদের (দর্শন-শ্রবণ-বেদনাদির) পূর্ব্বে থাকে।

সাম্মিতীয়গণ বলেন—যে গ্রহীতার দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদ-প্রভৃতি ও বেদনা, স্পর্শ ও মনস্কার-প্রভৃতি হইয়া থাকে, সেই গ্রহীতা দর্শনাদি গ্রহণের পূর্ব্বে থাকে। কেন? যেহেতু—

২

সেই পদার্থ যদি পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকে, তবে তাহার দর্শনাদি কিরূপে হইতে পারে? অতএব দর্শনাদির পূর্ব্বে যাহার দর্শনাদি হয়, সে ব্যবস্থিত থাকে।

দেবদত্ত বিদ্যমান থাকে বলিয়াই ধন গ্রহণ করিতে পারে, বন্ধ্যাপুত্র তাহা করিতে পারে না, কারণ বন্ধ্যাপুত্র অবিদ্যমান। এইরূপই দর্শন-প্রভৃতির পূর্ব্বে যদি পুদ্গল (অর্থাৎ জীব বা আত্মা) ব্যবস্থিত না থাকে তাহা হইলে সে দর্শনাদি করিতে পারে না। অতএব ধনের পূর্ব্বে যেমন দেবদত্ত থাকে, সেইরূপ দর্শনাদিরও পূর্ব্বে পুদ্গল আছে,—যে দর্শনাদি করে।

(নাগার্জ্জুন) বলিতেছেন—

২। Bibliotheca Buddhica, IV. pp. 192—201; Buddist Text Society, pp. 63—67 (ইহা অতি অযত্ন সংস্করণ)।

৩

দর্শন-শ্রবণাদির ও বেদনাদির পূর্ব্বে যে (পুদ্গল) ব্যবস্থিত থাকে (বলা হইতেছে), তাহাকে জানায় কে?

দর্শনাদির পূর্ব্বে ঐ যে পুদ্গল আছে বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, তাহাকে কে জানাইয়া দেয়? (আপনারা বলিবেন) পুদ্গলকে জানাইবার কারণ, দর্শনাদি (অর্থাৎ দর্শনাদিরই দ্বারা জানা যায় যে, পুদ্গল আছে)। এখন যদি কল্পনা করা যায় যে, সেই পুদ্গল দর্শনাদির পূর্ব্বে আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাহা দর্শনাদি-নিরপেক্ষ—সে দর্শনাদির অপেক্ষা রাখে না, যেমন পট ঘটের অপেক্ষা রাখে না। আবার, যে নিজের জন্য কোনো কারণের অপেক্ষা রাখে না, সে নির্হেতুক—হেতুনিরপেক্ষ, এবং যে নির্হেতুক—হেতুনিরপেক্ষ সে থাকিতে পারে না, যেমন ধননিরপেক্ষ ধনী থাকে না। আরো—

৪

দর্শনাদি ছাড়াও (পূর্ব্বে) যদি উহা (পুদ্গল) ব্যবস্থিত থাকে, তাহা হইলে, সন্দেহ নাই, উহারাও (দর্শনাদিও) তাহা (পুদ্গল) ছাড়া থাকিবে।

যদি আপনারা মনে করেন, পুদ্গল দর্শন-প্রভৃতির পূর্ব্বে থাকে এবং তাহা দর্শনাদিরূপ গ্রহণকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ দর্শনাদিও পুদ্গল বিনা থাকিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ ধনের সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই দেবদত্ত থাকে, এবং সে ধন হইতে অন্য থাকিয়াই নিজ হইতে অন্য ও পৃথক্-সিদ্ধ ধনকে গ্রহণ করে; এইরূপ গ্রহীতা হইতেও দর্শনাদিরূপ গ্রহণ ব্যতিরিক্ত—তাহা হইতে পৃথক পদার্থ বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না, এই জন্য (নাগার্জ্জুন) বলিতেছেন—

৫

কিছুরো দ্বারা কিছু অভিব্যক্ত হয়, কোনো পদার্থের দ্বারা

কোনো পদার্থ অভিব্যক্ত হয়। কিছু বিনা কিছু কোথায়? এবং কোনো পদার্থ বিনা কোন পদার্থ কোথায়?

বীজরূপ কারণের দ্বারা অঙ্কুররূপ কোনো কার্য্য অভিব্যক্ত হয়, আবার সেই অঙ্কুররূপ কার্য্যের দ্বারা বীজরূপ কারণ অভিব্যক্ত হয়—ইহা ইহার কার্য্য, ইহা ইহার কারণ। এইরূপ যদি দর্শনাদি কোনো গ্রহণের দ্বারা আত্মস্বভাবরূপ কোনো পদার্থ অভিব্যক্ত হয় যে, ইহা ইহার গ্রহীতা; আবার আত্মরূপ কোনো পদার্থের দ্বারা দর্শনাদি গ্রহণরূপ কিছু অভিব্যক্ত হয় যে, ইহা ইহার গ্রহণ; তাহা হইলে পরস্পরাপেক্ষ গ্রহীতা ও গ্রহণের সিদ্ধি হয়। কিন্তু যখন আপনারা স্বীকার করিতেছেন যে, গ্রহণ গ্রহীতাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহা হইতে পৃথক্‌রূপে সিদ্ধ, তখন তাহা নিরপেক্ষ এবং এইরূপে তাহা অসৎই। অতএব (গ্রহীতা ও গ্রহণ) উভয়ই সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ইহা যুক্তিযুক্ত নহে যে, গ্রহীতা দর্শন-প্রভৃতি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত।

এ স্থলে (পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বোক্ত ৩য় কারিকা উল্লেখ করিয়া) বলেন—এই যে আপনারা বলিতেছেন "দর্শনশ্রবণাদির" ইত্যাদি, সে সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, যদি এইরূপ স্বীকার করা হয় যে, (পুদ্‌গল) স ম স্ত দর্শণ-শ্রবণাদির পূর্ব্বে থাকে, তবে (আপনারা যাহা বলিতেছেন) সেই দোষ হইতে পারে; কিন্তু যখন—

৬

স ম স্ত দর্শনাদির পূর্ব্বে কেহ নাই,

—তবে কি? (দর্শনাদির) এক-একটির পূর্ব্বে কেহ নাই—যখন এইরূপ (স্বীকার করা হয়), তখন বলিতে পারা যায় যে,

(পুদ্‌গল) দর্শনাদির এক-একটির দ্বারা এক-এক সময়ে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

(অর্থাৎ) দ্রষ্টা যখন দর্শনের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা শ্রবণাদির গ্রহণে বিজ্ঞাপিত হয় না। এইরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষের আর স্থান থাকে না।

(উত্তরপক্ষী বলিতেছেন, ইহার উত্তর) বলা যাইতেছে—(আপনাদের) ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ যাহার দর্শনাদি নাই, যাহা কিছু গ্রহণ করে না, যাহার কোনো হেতু নাই, এইরূপ নিরঞ্জন বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

৭

(পুদ্গল) যদি স ম স্ত দর্শনাদির পূর্ব্বে না থাকে তবে তাহা এ ক এ ক টি দর্শনাদিরই.বা পূর্ব্বে কিরূপে থাকিতে পারে?

আপনারা কল্পনা করিতেছেন (পুদ্গল স ম স্ত দর্শনাদির পূর্ব্বে থাকে না), কিন্তু ইহা হইলেও (—যদি স্বীকার করা যায় যে, পুদ্গল সমস্ত দর্শনাদির পূর্ব্বে থাকে না, তাহা হইলেও), এ ক এ ক টি দর্শনাদির পূর্ব্বে তাহা কিরূপে থাকিতে পারে? স ক লে র পূর্ব্বে যে থাকে না, এ ক এ ক টির‍ও পূর্ব্বে সে থাকে না; যেমন, বন যখন সমস্ত বৃক্ষের পূর্ব্বে থাকে না, তখন এক-একটি বৃক্ষেরও পূর্ব্বে তাহা থাকে না; সমস্ত বালু হইতে যখন তেল উৎপন্ন হয় না, তখন এক-একটি বালু হইতেও তেল হয় না।

আরো, যে এক-একটির পূর্ব্বে থাকে, স্বীকার করিতে হয় যে, সে সকলেরও পূর্ব্বে থাকে; কেননা এক একটি ছাড়া সকল হয় না। অতএব ইহা যুক্তিযুক্ত নয় যে, (পুদ্গল) এক-একটির (অর্থাৎ এক-একটি দর্শনাদির) পূর্ব্বে থাকে।

এই (বক্ষ্যমাণ) কারণেও ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু—

৮

যদি সে-ই দ্রষ্টা, সে-ই শ্রোতা, এবং সে-ই বেত্তা হয়,

তাহা হইলে

(পুদ্গল) এক-একটির (অর্থাৎ এক-একটি দর্শনাদির) পূর্ব্বে থাকিতে পারে,

কিন্তু ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে যে, সে-ই দ্রষ্টা সে-ই শ্রোতা (অর্থাৎ যে দ্রষ্টা সেই শ্রোতা); কেননা, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যে শ্রোতা দর্শনাদিক্রিয়া-

রহিত সেও দ্রষ্টা হইতে পারে ; যে দ্রষ্টা শ্রবণাদিক্রিয়ারহিত সেও শ্রোতা হইতে পারে।[৩] কিন্তু এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, দর্শনাদিক্রিয়ারহিতও দ্রষ্টা হইতে পারে, বা শ্রবণক্রিয়ারহিতও শ্রোতা হইতে পারে। এই জন্য (কারিকাকার) বলিতেছেন—

(কিন্তু) ইহা এইরূপ যুক্তিযুক্ত হয় না।[৪]

প্রত্যেক ক্রিয়ায় যখন ভিন্ন ভিন্ন কারক হইয়া থাকে (অর্থাৎ ক্রিয়ার ভেদে কর্ত্তার ভেদ হয়), তখন কিরূপে ইহা এইরূপ হইতে পারে, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য (কারিকাকার) বলিতেছেন—

(কিন্তু) ইহা এইরূপ যুক্তিযুক্তি হয় না।

আর পূর্ব্বোক্ত দোষের পরিহারেচ্ছায়

৯

যদি দ্রষ্টা অন্য, শ্রোতা অন্য, বেত্তা অন্য হয়,

—ইহা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না, কেননা এইরূপ ইচ্ছা করিলে—

৩। অর্থাৎ দ্রষ্টা ও শ্রোতা একই হইলে শ্রবণ না করিলেও তাহাকে শ্রোতা বলা যাইতে পারে, বা দর্শন না করিলেও তাহাকে দ্রষ্টা বলা যাইতে পারে, কেননা দ্রষ্টা ও শ্রোতার মধ্যে কোনো ভেদ নাই, তাহারা একই।

৪। চন্দ্রকীর্ত্তি এখানে আচার্য্য বুদ্ধপালিত ও আচার্য্য ভাববিবেকের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আচার্য্য বুদ্ধপালিত কিন্তু ব্যাখ্যা করেন :—'আত্মা এক হইলে, যেমন লোকে এক বাতায়ন হইতে আর এক বাতায়নে যায়, সেইরূপ পুরুষকে (আত্মা) এক ইন্দ্রিয় হইতে আর এক ইন্দ্রিয়ের নিকট যাইতে হয় বলিতে হইবে।' আচার্য্য ভাববিবেক ইহার দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন—'আত্মা সর্ব্বগত (ব্যাপক), অতএব আত্মাকে ইন্দ্রিয়ান্তরের নিকট গমন করিতে হইবে বলিয়া যে দোষ দেখান হইতেছে তাহা হইতে পারে না।' (কিন্তু আচার্য্য ভাববিবেকের) ইহা (এইকথা) যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, নিজেরই দলের মধ্যে যে পুদ্গলবাদ পরিকল্পিত আছে, তাহারই খণ্ডনের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে, এবং ইহাতে এরূপ প্রতিজ্ঞা করা হয় নি যে, আত্মা সর্ব্বগত। অতএব (আচার্য্য বুদ্ধপালিত) যে দোষপ্রসঙ্গের কথা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত।".

তবে দ্রষ্টা থাকিলে শ্রোতাও থাকিবে, (এবং তাহা হইলে) আত্মার বহুত্ব হইয়া পড়ে।

যেমন, অশ্ব গো হইতে অন্য, গো থাকিলে একই কালে অশ্ব যে, থাকে না তাহা নহে; এইরূপ শ্রোতা যদি দ্রষ্টা হইতে অন্য হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টা থাকিলে শ্রোতাও এককালে থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ আপনারা ইচ্ছা করেন না। অতএব (দ্রষ্টা শ্রোতা ইত্যাদি পরস্পর) অন্য নহে। আরো, এরূপ (অর্থাৎ ইহারা পরস্পর অন্য) হইলে, আত্মা বহু হইয়া পড়ে, কেনন', আপনারা স্বীকার করিতেছেন যে, দ্রষ্টা শ্রোতা বেত্তা ইত্যাদি পৃথক্-পৃথক্ সিদ্ধ। অতএব এক-একটি দর্শনাদিরও পূর্ব্বে পুদ্গল নামে কিছু নাই।

(পূর্ব্বপক্ষী) এথানে বলেন—সমস্ত দর্শনাদির পূর্ব্বে আত্মা থাকেই। যদি আপনারা মনে করেন যে, বদি থাকে তবে তাহাকে কে জানাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে বলিতেছি— দর্শনাদির পূর্ব্বে নাম-রূপ অবস্থায় চারিটি মহাভূত (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু) থাকে, তাহা হইতে ক্রমে নাম-রূপাত্মক কারণ হইতে ষড়ায়তন (পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন) হয়, এবং এইরূপে দর্শন-প্রভৃতি হইয়া থাকে। অতএব দর্শনাদির পূর্ব্বে চতুর্মহাভূতরূপ উপাদানই থাকে।

(সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) এইরূপ হইলেও—

১০

দর্শন-শ্রবণাদি ও বেদনাদি যাহা হইতে হয় সেই মহাভূত-সমূহেরও মধ্যে ইহা (দ্রষ্টা শ্রোতা, ইত্যাদি) থাকে না।

যে সমস্ত মহাভূত হইতে দর্শনাদি উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে ইহা (দ্রষ্টা, শ্রোতা, ইত্যাদি) রহিয়াছে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, যদিও মহাভূতসমূহের গ্রহণ ইহার নিমিত্ত। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; পূর্ব্বে যেমন উক্ত হইয়াছে (৫ম কারিকা দ্রষ্টব্য)—

কিছু বিনা কিছু কোথায়? এবং কোনো পদার্থ বিনা কোনো পদার্থ কোথায় ?

—এখানেও সেইরূপ বলিতে হইবে। মহাভূতসমূহকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যে আত্মা সিদ্ধ থাকিবে (আপনারা বলিতেছেন), সে তো (আপনাদের মতে) মহাভূত-সমূহকে গ্রহণ করিয়াই হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ হইতে পারে না, কেননা তাহার কোনো হেতু নাই। যে নাই সে কেমন করিয়া মহাভূতসমূহ গ্রহণ করিবে? এইরূপ দর্শনাদিগ্রহণের ন্যায় ভূতসমূহের গ্রহণেরও দোষ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বলিয়া আর বলা হইতেছে না।

(পূর্ব্বপক্ষী) এখানে বলিতেছেন—যদি এইরূপে আত্মা প্রতিষিদ্ধ হয় তাহা হইলেও দর্শনাদি আছে, কেন না ইহাদের নিষেধ করা হয় নি। এই দর্শনাদির সম্বন্ধ অনাত্মস্বভাব ঘটাদির সহিত থাকে না, অতএব যাহার সহিত এই দর্শনাদির সম্বন্ধ থাকে সেই আত্মা আছে।

(সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহার উত্তর) বলিতেছি—আত্মা থাকিতে পারে যদি দর্শনাদি থাকে, কিন্তু (বস্তুত দর্শনাদি) নাই। যাহার দর্শনাদিরূপ গ্রহণ সে-ই যখন নাই বলিয়া প্রতিপাদন করা হইল, তখন সেই গ্রহণকর্ত্তা না থাকিলে দর্শনাদিরূপ গ্রহণের অস্তিত্ব কোথায়? (কারিকাকার) ইহাই বলিতেছেন—

১১

দর্শন-শ্রবণাদি ও বেদনাদি যাহার সে যদি না থাকে তবে ইহারাও (দর্শনাদি) থাকে না।

দর্শনাদি যাহার বলিয়া কল্পিত হয় সে-ই যখন নাই বলা হইল, তখনই তো ইহাও স্পষ্টরূপে দেখান হইল যে, দর্শনাদিও নাই। অতএব দর্শনাদি না থাকায় আত্মা নাই-ই।

(পূর্ব্বপক্ষী) এখানে বলেন—ইহা কি আপনার নিশ্চিত যে, আত্মা নাই?

(সিদ্ধান্তী—) কে ইহা বলিল?

(পূর্ব্বপক্ষী—) এই যে অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই বলিলেন, দর্শনাদি না থাকায় আত্মাও নাই!

(সিদ্ধান্তী—) হাঁ, আমরা ইহা বলিয়াছি; কিন্তু আপনি ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করিতে পারেন নি। কেন না, আপনারা কল্পনা করিয়াছেন যে, আত্মা ভাবরূপ; কিন্তু স্বভাবত তাহা (ভাবরূপ আত্মা) নাই। আত্মার অভাবরূপ প্রতিকূল পক্ষ লইয়া আমি যে বলিয়াছি 'আত্মা নাই', তাহার তাৎপর্য্য আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সম্বন্ধে (আপনাদের যে) অভিনিবেশ আছে তাহাকেই নিবৃত্ত করা; ইহার দ্বারা আত্মার অভাব কল্পনা করা হয় নি।[৫] ভাবে অভিনিবেশ ও অভাবে অভিনিবেশ এই উভয়কেই ত্যাগ করিতে হইবে, যেমন আর্য্যদেব বলিয়াছেন:—

৫। মাধ্যমিক দর্শনে বস্তুর স্বভাব বলিয়া কিছু নাই, তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্বভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই এই মতে সমস্ত পদার্থই নিঃস্বভাব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে 'আত্মা আছে' ইহা দ্বারা বলা হয় যে, 'আত্মা ভাবরূপ,' আবার 'আত্মা নাই' ইহা দ্বারা বলা হয় যে, 'আত্মা অভাবরূপ,' কিন্তু তত্ত্বালোচনায় দেখা যায়, ভাব-অভাব কিছুই আত্মার স্বভাব নহে। ভাব-অভাব লোকের অভিনিবেশমাত্র। এই উভয়ই অভিনিবেশকে ত্যাগ করিতে হইবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহা বহুস্থানে সবিশেষ উক্ত হইয়াছে। নাগার্জ্জুনের দুইটি কারিকা নিম্নে তুলিয়া দিতেছি

"অস্তিত্বং যে তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ।
ভাবানাং তে ন পশ্যন্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবম্ ॥"

মধ্যমককারিকা, ৫-৮।

"কাত্যায়নাববাদে চাস্তীতি নাস্তীতি চোভয়ম্।
প্রতিষিদ্ধং ভগবতা ভাবাভাববিভাবিনা ॥"

সমাধিরাজে (ঐ, Bibliothica Budhica. p-135)—

"অস্তীতি নাস্তীতি উভেপি অন্তা
* * *
তস্মাদুভে অন্ত বিবর্জ্জয়িত্বা
মধ্যেঽপি স্থানং ন করোতি পণ্ডিতঃ ॥" ঐ, ১৫.৭।

মধ্যমকবৃত্তির ১৫শ প্রকরণের নাম স্বভাব পরীক্ষা, অ-লা৮১) মধ্যমকবৃত্তির বিষয়টি চূড়ান্ত আলোচিত হইয়াছে। টীকাকার চন্দ্রকীর্ত্তি এখানে বলিতেছেন, তিনি যে বলিয়াছেন 'আত্মা নাই'

"যে তোমার আত্মা, সে আমার অনাত্মা, অতএব নিয়মত সে আত্মা নহে; (রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানরূপ) অনিত্য পদার্থসমূহে (আত্মা এই) কল্পনা উৎপন্ন হয়।"৬

ইহাই প্রতিপাদন করিয়া (কারিকাকার) বলিতেছেন :—

১২

যাহা দর্শনাদির পূর্ব্বে থাকে না, সম্প্রতি থাকে না, পরেও থাকে না, তাহার বিষয়ে 'আছে' (ও) 'নাই' এই কল্পনা নিবৃত্ত হয়।

দর্শনাদির পূর্ব্বে তো আত্মা নাই, কারণ সে সময়ে তাহার (অর্থাৎ দ্রষ্টা আত্মার) অস্তিত্বের অভাব আছে। যে সময় দর্শনাদি হয়, সেই সময়েও দর্শনাদির সহভূত হইয়া (আত্মা) থাকে না কারণ যাহারা পৃথক্ পৃথক্ অসিদ্ধ তাহাদের

তাহার ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য যে, 'আত্মা আছে' বলিয়া যে অভিনিবেশ আছে তাহা পরিত্যাজ্য, কেননা 'আছে' ও 'নাই' এই উভয়ই অভিনিবেশ মাত্র, স্বভাবত এই উভয়ই নাই। অতএব তিনি আত্মার অভাব প্রতিপাদন করেন নি।

৬। চতুঃশতিকা, ১০. ৩ (Memoirs of the A S B. Vol. III No. 8 p. 486, Verse 225)। টীকাকার চন্দ্রকীর্ত্তি এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যে তোমার আত্মা, তোমার 'অহম্'-বুদ্ধির বিষয়, এবং তোমার আত্মস্নেহের বিষয়, আমার তাহা আত্মা নহে, কেননা আমার তাহা 'অহম্' বুদ্ধির বিষয় নহে, এবং আমার আত্মস্নেহেরও বিষয় নহে। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেই জন্য নিয়মত তাহা (আত্মা) নহে, এবং যাহা নিয়মত আত্মা নহে তাহা স্বভাবত নাই। অতএব অসৎপদার্থে আত্মার অধ্যারোপ ত্যাগ কর। যদি আত্মা না থাকে তবে এই 'অহম্' বুদ্ধি আর আত্মস্নেহ কোথায় থাকে? এই জন্য বলিতেছেন—'অনিত্য পদার্থসমূহে (আত্মা এই) কল্পনা জাত হয়।' পূর্ব্ব বর্ণিত যুক্তি অনুসারে রূপাদি স্কন্ধসমূহের অতিরিক্ত স্বরূপসিদ্ধ আত্মার সর্ব্বপ্রকারে অভাব হেতু অনিত্য রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ পদার্থসমূহে 'আত্মা' এই কল্পনারূপ নিজের আরোপ করিয়া বলা হয় যে, আত্মা, সত্ত্ব, জীব, জন্তু। যেমন ইন্ধনকে গ্রহণ করিয়া অগ্নি, এইরূপ স্কন্ধসমূহকে গ্রহণ করিয়া আত্মা খ্যাত হয়, এবং তাহা (আত্মা) সমগ্র স্কন্ধ-সমূহ হইতে বা পৃথক পৃথক পাঁচটি স্কন্ধ হইতে অনন্য অথবা অন্য ইহা নিরূপিত হইলে দেখা

সহভাব (অর্থাৎ এক সঙ্গে অবস্থিতি) দেখা যায় না। দুইটি শশশৃঙ্গের ন্যায়[৭] পরস্পর নিরপেক্ষ আত্মা ও দর্শনাদি-গ্রহণের পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধি না থাকায় সম্প্রতিও (দর্শনাদি গ্রহণের সময়েও) আত্মা নাই, পরেও (দর্শনাদি গ্রহণের পরেও) নাই। পূর্ব্বে যদি দর্শনাদি থাকে, তবে (তাহার) পরে আত্মা থাকিতে পারে, এবং তখনই (অর্থাৎ যখন পূর্ব্বে দর্শনাদি থাকে) তাহার পর (অর্থাৎ পরবর্ত্তী কাল) সম্ভবপর হয়। কিন্তু (বস্তুত) এরূপ হয় না; কারণ, কর্ত্তা নাই অথচ কর্ম্ম আছে ইহা হয় না। অতএব পরীক্ষা করিয়া দর্শনাদির পূর্ব্বে, পরে ও যুগপৎ (একসঙ্গে) যে আত্মার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, সেই অনুপলব্ধস্বভাব আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কোন্ প্রাজ্ঞ কল্পনা করিবে? অতএব কর্ত্তা ও কর্ম্মের ন্যায়[৮] উপাদান ও উপাদাতার (অর্থাৎ গ্রহণ ও গ্রহীতার) পরস্পরের অপেক্ষা দ্বারা স্বাভাবিক সিদ্ধি হয় হয় না, ইহাই স্থির হইল।

চন্দ্রকীর্ত্তি ইহার ঠিক পরেই উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য আ র্য্য স মা ধি-রা জ ভ ট্টা র ক হইতে ছয়টি গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিম্নে চারিটির অনুবাদ দেওয়া যাইতেছঃ—

সেই সময়ে অনবদ্য দশবল জিন এই শ্রেষ্ঠ সমাধি বলিয়াছিলেন—এই ভবের গতিসমূহ স্বপ্নের ন্যায়; কেহ জাতও হয় না, মৃতও হয় না। সত্ত্ব, জীব, বা মানব পাওয়া যায় না, এইসমস্ত পদার্থ ফেন ও কদলীর সমান।[৯] ইহা মায়ার

যায় যে, তাহা স্বভাবত নাই। অতএব (কেবল পঞ্চ স্কন্ধকে) গ্রহণ করিয়াই (লোকেরা) সংজ্ঞা দ্বারা (আত্মাকে) কল্পনা করিয়া থাকে। এইরূপে অনিত্যসংসারে আত্মার কল্পনা হইয়া থাকে, ইহা স্থির হইল।"

৭। যাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকে না—যাহাদের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, এক সঙ্গেও তাহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এক-একটি শশশৃঙ্গের পৃথক্ ভাবে অস্তিত্ব থাকে না, তাই এক সঙ্গে দুইটি শশশৃঙ্গেরও অস্তিত্ব নাই। এইরূপ আত্মা ও দর্শনাদির পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায় তাহারা এক সঙ্গেও থাকিতে পারে না।

৮। মধ্যমকবৃত্তির অষ্টম প্রকরণে (pp. 180—191) এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করা হইয়াছে।

ন্যায়, আকাশের বিদ্যুতের ন্যায়, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায়, ও মরুমরীচিকার ন্যায়। এই লোকে কোনো নর মৃত হয় না, কেহ পরলোকে সংক্রমণ বা গমন করে না। কৃত কর্ম্ম কথনো নষ্ট হয় না, সংসারী লোককে ইহা শুক্ল বা কৃষ্ণ ফল প্রদান করে। শাশ্বতও কিছু নাই এবং উচ্ছেদও কাহারো নাই, কর্ম্মের সঞ্চয় নাই, স্থিরভাবে অবস্থিতিও কাহারো নাই। কর্ম্ম করিয়া যে (তাহার ফল) স্পর্শ করে সে সে-ও নহে, আবার কর্ম্ম করার পর অন্য যে (সেই ফল) অনুভব করে তাহাও নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

১। কলার গাছের খোলাগুলি তুলিতে তুলিতে শেষ পর্য্যন্ত গেলেও যেমন তাহার মধ্যে কোনো সার পাওয়া যায় না, সেইরূপ।

চিত্রকলার বিষয়

ভারত-চিত্রকলার এই নব জাগরণের যুগে চিত্রকরদের মনে এখন এক প্রশ্ন স্বতই উদয় হতে পারে যে, আমরা কেবল পৌরাণিক বা আধুনিক সাহিত্য থেকেই ভাব নিয়ে চিত্র রচনা করে চলেছি; এতে আমাদের ক্রমাগত কোন-না-কোন প্রাচীন বা আধুনিক ভাবুকের ভাবের দাসত্বই করতে হচ্ছে, নিজেদের ভাবের বিকাশ হচ্ছে না; ইহার মুক্তি কোথায়? এর উত্তরে আমাদের ভাবতে হবে যে, কাব্যের মধ্যে যেমন Epic ও Lyric, এবং সঙ্গীতের মধ্যে যেমন ধ্রুপদ ও খেয়াল আছে, তেমনি চিত্রশিল্পের মধ্যে দুইটি প্রধান বিষয় আছে। এদের মধ্যে একটি আগম (Tradition) বা পৌরাণিক ভাব অবলম্বনে প্রকাশ পায়, অপরটি প্রত্যেক শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবে মূর্ত্তি পায়। জাতীয় ভাবের প্রাচীন

পৌরাণিক ইতিহাস থেকে কাব্যে যেমন Epicএর জন্ম, এবং সঙ্গীতে প্রাচীন ভাবের সুরযোজনার সার্থকতার যেমন ধ্রুপদের সৃষ্টি, তেমনি আগম (Tradition) বা পৌরাণিক ভাব থেকে এক শ্রেণীর চিত্রকলার উৎপত্তি হয়, তাকে Epic-চিত্র বলা যেতে পারে। কাব্যে ব্যক্তিগতভাবের খোস-খেয়ালে কবি যেমন গীতিকবিতা (Lyric) রচনা করেন, এবং সঙ্গীতের মধ্যে গায়কেরা যেমন ধ্রুপদের মত প্রাচীন কালের বাঁধা স্বরগ্রামকে অতিক্রম করে খেয়াল গানের সৃষ্টি করে থাকেন, তেমনি চিত্রের Lyric বা খেয়াল হ'ল শিল্পীর ব্যক্তিগত খেয়াল-খুসীর আঁকা ছবি।

সাহিত্য ও পুরাণাদি গ্রন্থ শিল্পীদের মনের খোরাক আজও যেমন যোগাচ্ছে, শতবৎসর পরেও তেমনি যোগাবে। আসল কথা এই যে, পুরাণ, কাব্য, প্রচীন চিত্রকলা বা প্রকৃতির ঘটনা থেকে শিল্পীর মনে যদি সত্যি-সত্যি কোন চিত্রের ভাব আপনা থেকে জেগে ওঠে এবং সেটা যদি অনুকরণের প্রবৃত্তি না হয়ে সৃষ্টি করার ইচ্ছা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেটি শিল্পীর নিজেরই জিনিষ হয়ে পড়ে। তখন সে জিনিষটিকে কাব্যের বা পুরাণ প্রভৃতির illustration বলা যায় না, তখন সেটি হয়ে দাঁড়ায় শিল্পীর নূতন সৃষ্টি, অর্থাৎ আর্টের অভিব্যক্তি। এইরূপেই প্রাচীন গ্রীসে ও মিশরে পৌরাণিক দেবদেবী, রাজন্যবর্গ, বা যোদ্ধৃগণের ভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করে শত শত ভাস্কর ও চিত্রকর শিল্পজগতে অনেক অপূর্ব্ব নিদর্শন রেখে গেছেন, এবং ভারতবর্ষেরও প্রচীন যুগে তাই পৌরাণিক চিত্রাবলীর অনেক নিদর্শন আছে।

সব প্রথমে অর্থাৎ আদিমকালে মানুষ যা আঁকত তা সবই একপ্রকার Lyric ছবি, কেননা তারা তখন তাদের আসবাবপত্রে বসনভূষণের উপরে ছবি আঁকত নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুগুলি সুন্দর দেখাবে বলে। তার পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে আমাদের দেশে এবং অপর সকল সভ্য দেশে দেখা যায় যে, সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে কোন-না-কোন বীরপুরুষ, রাজা, বা ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েচে এবং তাঁকেই অবলম্বন করে শিল্পকলা জন্মগ্রহণ করেচে। সেই সব

মহাপুরুষদের গৌরব-কাহিনী জগতের সামনে স্থায়ী ভাবে ধরাই সেই শিল্পস্বষ্টির উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের এই মধ্যবর্ত্তী যুগের শিল্পের মধ্যে দেবদেবীর ছবি ছাড়া প্রধান বিষয় হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। তাই ভারতের সব স্থানেই তাঁরই ছবির নিদর্শন ভূরি ভূরি আমারা আজ দেখতে পাচ্চি। গ্রীস, মিশর ও ইটালিতেও ঠিক তাই দেখা যায়। মধ্যযুগের প্রধান যোদ্ধা ও দেবতাই ছিলেন ঐ সকল দেশের ছবির অবলম্বন। তার পরে খৃষ্টের জন্ম হ'লে তাঁর কাহিনী অবলম্বন করে ইটালীর চিত্রকলা গড়ে উঠেছিল। আজও পর্য্যন্ত জগতের সম্মুখে তার নিদর্শন-গুলি উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের শিল্পে হচ্চে Lyrical; কেননা এখন মানুষ চায় তার মনের ভিতরকার সৌন্দর্য্যের বিকাশ চিত্রশিল্পে দেখতে। এ ছাড়া অধুনিক শিল্পের আর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই।

কাব্য, সঙ্গীত, বা পুরাণ থেকে শিল্পী যদি ভাব গ্রহণ করেন, তা হ'লে তাকে কাব্য, সঙ্গীত, বা পুরাণের দাসত্ব করা বলা চলে না। এই ব্যাপারটাকে দাসত্ব বল্লে পুরাণ কাব্য প্রভৃতি বাদ দিয়ে প্রকৃতি থেকে যদি কেউ ভাব গ্রহণ করে তাহ'লে তাকেও প্রকৃতির দাসত্ব করা বল্‌তে হয়। কিন্তু প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে অদ্ভুত কিছু সঙ্কেতের দ্বারা ত চিত্রকলা হয় না। হুবহু নকল করাই দোষ। আসলে অনুকরণ জিনিষটা বাহ্য, তাই তা বাহ্য ভাবেই প্রকাশ পায়। যদি প্রকৃতি থেকেও নেওয়া হয় তাহলে বাহ্য অনুকরণ এক জিনিষ, আর প্রকৃতিগত কোন একটি ভাবকে ফুটিয়ে তোলা আর এক জিনিষ। প্রকৃতি থেকে ভাব আহরণ করলেই যে প্রকৃতির দাসত্ব করা হয় এমন নয়। প্রকৃতি থেকে ভাব চয়ন করে শিল্পী ঠিক মনের নিজস্ব ভাব থেকে সেটিকে পুনরায় চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলে যদি একটি স্বাতন্ত্র্য দিতে পারেন, তবে তাকে প্রকৃতির দাসত্ব করা বলা চলে না। ফুল গাছেই শোভা পায় কিন্তু ফুলকে আবার প্রয়োজন মত ঘরেও তুলতে হয়। এই ঘরে তোলার সময় তাকে নতুন করে

সাজিয়ে তুলতে না জানলে ফুলগুলির অপচয় করা হয় মাত্র। তেমনি মনের মধ্যে আহরণ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে চিত্রপটে সাজিয়ে তুলতে না পারলে চিত্রকলা হয় না, সেটা ছেলেখেলা হয় মাত্র। অনুকৃতি ও প্রতিকৃতি সম্বন্ধে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর "আর্য্যামী ও সাহেবিআনা" * প্রবন্ধের একস্থানে বলেচেন—"অনুকরণ যে কাহাকে বলে সে বিষয়ে এক্ষণে আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। কিন্তু অনুকরণ যে কাহাকে বলে না, সে বিষয়ে যৎস্বল্প একটি কথা এখনো আমাদের বলিবার আছে—সেটি এই যে, আদর্শের প্রতিকৃতি অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে। মনে কর দুই জন চিত্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন; আর মনে কর যে, প্রথম চিত্রকর সুন্দর একটি ছবি চিত্রপটে উদ্ভাবন করিয়াছেন; সেই অঙ্কিত চিত্রটি দেখিয়া দ্বিতীয় চিত্রকরের অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্বোধন হইল; তাহার পরে সেই দ্বিতীয় চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে পটে অভিব্যক্ত করিতে গিয়া প্রথম চিত্রটির অবিকল অনুরূপ দ্বিতীয় একটি চিত্র তাঁহার হস্ত দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ স্থলে প্রথম চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি—আদর্শ, এবং দ্বিতীয় চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি—তাহার প্রতিকৃতি; এ ভিন্ন—দ্বিতীয় চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের অনুকৃতি বলিতে পারি না; তাহা না বলিতে পারিবার কারণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি চিত্র দুই জনের সমান মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হওয়াতেই সমান আকার ধারণ করিয়াছে, তা বই—একটার দেখা-দেখি আর একটা তাহার সমান হইয়া উঠে নাই; একটার দেখাদেখি যখন আর একটা জন্মগ্রহণ করে নাই তখন কাজেই একটা আর একটা অনুকৃতি হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন যে, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইয়া তবে তো দ্বিতীয় চিত্রটি উৎপাদন করিয়াছেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুকৃতি নহে? ইহার উত্তর এই

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধমালা পৃঃ ১৩৯।

যে, লোকে যেমন জলাশয় হইতে জল তুলিয়া কলস পূরণ করে সেরূপ করিয়া কেহ কোনো একটি ভাবকে বাহির হইতে লইয়া উঠাইয়া অন্তরে পুরিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? ভাব তো আকাশব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নহে যে, তাহাকে একস্থান হইতে উঠাইয়া আনিতে আরেক স্থানে রাখিতে পারা যাইবে ভাব মানসিক পদার্থ—আকাশের মধ্য দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি সম্ভবে না, অতএব দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইয়াছেন, ইহার অর্থ এরূপ না যে, প্রথম চিত্রটির গায়ে একটি ভাব আটা দিয়া জোড়া ছিল, সেখান হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনার মনের ভিতর পুরিয়াছেন; উহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, প্রথম চিত্রটি দেখিবামাত্র দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি ভাবের উদ্বোধন হইল—বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না, কিন্তু অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধন হইল;—তাঁহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত ছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল; যাহা মুকুলিত ছিল তাহাই বিকশিত হইল, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই অভিব্যক্ত হইল; কাজেই ভাবগ্রহণ বলিতে বাস্তবিকই কিছু আর বাহির হইতে ভাবগ্রহণ বুঝায় না, প্রত্যুত অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধনই বুঝায়। এই জন্য উদ্বোধিত ভাব হইতে যদি দৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শের অবিকল অনুরূপও একটা প্রতিকৃতি উদ্ভাবিত হয় তথাপি তাহা প্রতিকৃতি ভিন্ন অনুকৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।"

অনেক সময় চিত্র-পরিকল্পনায় চিত্রের মধ্যে শিল্পীর দেখা-বস্তুর ছাপ আপনা থেকেই হুবহু এসে পড়ে। এরূপ স্থলে দেখা বস্তুর সঙ্গে ছবিটির হুবহু মিল হলেও সেটি তার প্রতিকৃতি হতে পারে,—অনুকৃতি হয় না। প্রতিকৃতি আঁকাই চিত্রকরের কাজ, অনুকৃতি চিত্রকলায় চলে না। প্রতিকৃতির সঙ্গে অনুকৃতির তফাৎটা ফোটোগ্রাফের সাহায্যে তোলা ছবি ও চিত্রকরের আঁকা ছবিতে সহজে ধরা পড়ে।

পটে চিত্র এঁকে চিত্রকর দেখাকে সুন্দর করে তোলেন রেখা ও রঙের সাহায্যে। এই সুন্দর করে তোলাই হ'ল শিল্পীর উদ্দেশ্য এবং রং রেখা প্রভৃতি হ'ল তার সৌন্দর্য্যপ্রকাশের উপায়। সাধারণের চক্ষে যে সকল জিনিষও ঘটনা

চোখে পড়েও পড়েনা, সেই সব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে থেকে শিল্পী সেই সুন্দরের আভাস ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন। দিনমজুর মাটি কাটে, অনেকই তাকে অস্পৃশ্য ও দরিদ্র বলেই মনে ক'রে থাকেন; কিন্তু একজন শিল্পী সেই দিনমজুরের মাটিকাটার ছবিটীই সকলের সামনে এঁকে ধরে দেখাতে পারেন, কত বড় একটা সৌন্দর্য্য তার দৈনিক কর্ম্মে, স্বাস্থ্যে, এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার সহজ সম্বন্ধে ফুটে আছে। চিত্রকরের মনে যদি সেই দিনমজুরের দৈনিক কর্ম্মের এই ভাবটী ফুটে না উঠে, তা'হ'লে তিনি সেটী চিত্রকলায় কখনও ধরতে পারেন না। চিত্রকলা বা কাব্য আবিষ্কৃত হবার বহুযুগ পূর্ব্বে থেকেই প্রকৃতির বক্ষে ঝড়-বৃষ্টি, আলো-আঁধার প্রভৃতির খেলা চল্‌চে, শিল্পীরা চিত্রপটে এবং কবিরা তাঁদের কাব্যে সেগুলিকে সকলের সামনে বিশেষ সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি দিয়ে ধরেচেন বলেই আজ প্রকৃতির সেই সব লীলারহস্য আমাদের কাছে এত সহজে ধরা পড়েচে।

চিত্রশিল্পের দু'টা দিক্ আছে। একটী তার অন্তর ও অপরটী তার বাহিরের। চিত্রের অন্তর হ'ল তার ভাব; আর বাহিরটা হ'ল তার আকার ও রং প্রভৃতি।

বর্ণব্যঞ্জনায় ও বাহ্য আকারে চিত্রের ভাবপ্রকাশ অনেকটা নির্ভর করলেও ভাবুক শিল্পীর ভাবের বিকাশ বাহ্য আকারের সৌষ্ঠবকে বাদ দিয়েও কখন কখন সম্পূর্ণ হয়—যদিও শিল্পকলায় এরূপ নিদর্শন খুব কমই দেখা যায়। চিত্রের বিষয় বাহিরের যেখান থেকেই শিল্পী সংগ্রহ করুন না কেন, সেটাকে প্রাণময় করে তুলতে পারার ক্ষমতা না থাক্‌লে সবই বৃথা হয়ে পড়ে। ভাব জিনিষটা মানসিক ভাবনাসম্ভূত, এটিকে বাইরের পূর্ণ-অঙ্গে প্রকাশ করার ক্ষমতা চিত্রশিল্পীর না থাকলে চিত্র আঁকাই হ'তে পারে না। সাধারণত প্রায় সকল লোকেরই কোন-না-কোন জিনিষ দেখে আনন্দের উদয় হ'তে পারে, কিন্তু সেটিকে কানায় কানায় সকলের জন্যে বিতরণ করতে পারেন একমাত্র কবি ও শিল্পী তাঁদের কাব্যে ও কলায়।

চিত্রের বিষয়নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম জারি করা চলে না। কোন শিল্পী খেয়াল বা খুসী মত অনায়াসে এমন আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য রচনা করেন, যা অপর শিল্পীদের বিশেষ করে পর্য্যবেক্ষিত বা চিন্তাপ্রসূত শিল্পের চেয়ে অনেক বড় জিনিষ হয়ে পড়ে। আবার এমনও দেখা যায় যে, একটি অতি সাধারণ ছবির বিষয় বা অবলম্বন করে বহুপূর্ব্বে বহুবার শিল্পীরা অনেক ছবি এঁকে গেছেন, সেটিকে কোন শিল্পী এমন একটি নতুন মূর্ত্তি দিয়ে গড়ে তুল্লেন যে, সেটি জগতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ বলে গণ্য হ'ল। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা আঁকার বহুপূর্ব্বে আরো অনেক আর্টিষ্ট ম্যাডোনা এঁকেছিলেন, কিন্তু র‍্যাফেলের ম্যাডোনাই আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হয়েচে। ধ্যানী বুদ্ধের অসংখ্য মূর্ত্তি ভারতবর্ষের নানান স্থানে ছড়ান আছে, কিন্তু সারনাথের প্রশান্তভাবমণ্ডিত ও সিংহলে বিরাট নিবাতনিকম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির ও গম্ভীর বুদ্ধমূর্ত্তিই বিশেষভাবে মনে লাগে। ম্যাডোনার ছবি ইটালিতে র‍্যাফেলের হাতে পড়ে যে, এত উচ্চ স্থান অধিকার করেচে, এবং সারনাথ ও সিংহলের ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি যে, এতটা মনকে আকৃষ্ট করে তুলেচে, সেগুলির বিষয় (Subject) কোন আধুনিক শিল্পীর হাতে পড়ে যে উৎকৃষ্টতর হয়ে উঠবে না, তা কেউ বল্‌তে পারে না।

দেশকাল-ভেদে চিত্রের বিষয় বদলায়। যেমন প্রাচীন যুগে প্রায় অধিকাংশ দেশকেই পৌরাণিক (Epic) চিত্র আঁকতে দেখা গিয়াছে, তেমনি আধুনিক যুগে দৈনন্দিন জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলারই বেশী রেওয়াজ দেখা যায়। কিন্তু যেখানে খুব একটা বড় ভাবকে অল্পের মধ্যে দানা বাঁধতে হয়, সেখানে দেশীয় আগম (Tradition) বা রূপক (Symbol) না আনলে চলে না। তখন অনেক সময়েই পৌরাণিক গাথার শরণাপন্ন হ'তে হয়। আমাদের দেশের লোকের মনে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদনের সঙ্গে যে ভাব ফোটে, রামচন্দ্রের পাদুকাবহনে ভরতের যে ভ্রাতৃভক্তি ফুটে উঠে, এবং সীতাদেবীর অরণ্যবাসে যে ত্যাগের ও পতিভক্তির ছবি মনে জাগে, তা বাদ দিয়ে ঠিক এই সব ভাবের ছবি কোন শিল্পীই ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এগুলি পূর্ব্বসঞ্চিত ভাবের ভাণ্ডার এবং

দেশের শিল্পীদের বিষয় আহরণের বস্তু। এক পদ্মের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলায় যে কত ভাবের বন্যা এসেচে তা দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। এমনকি ভারতবর্ষ বোঝাতে হলে পদ্ম এঁকেই ভারতবর্ষ বোঝান হ'ত।

চিত্রের আঁকবার বিষয় কখনও পুরাতন হ'তে পারে না। নতুন ক'রে ভাববার ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনি সব জিনিষেই নূতনকে দেখতে পান। গাছপালা জীবজন্তু যা আমরা আশে-পাশে সদাসর্ব্বদা দেখচি সেগুলি যদি আমাদের কাছে সত্যিই পুরাতন হয়ে যেতো, তাহলে আমাদের দেখবার বা রচনা করবার কিছুই থাকত না। সাধারণের চোখে যেটি পুরোণো হয়ে যায়, শিল্পী সেই বহু পুরাতন নদনদী, গাছপালা পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গম থেকেই নতুন সুরে রঙের ও ভাবের আভাস পান, তাই দিন-দিন নতুন-নতুন শিল্প রচনা হতে পারচে, নচেৎ সবই এক যায়গায় এসে থেমে যেতো। নতুনের রস পান বলেই বিধাতার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সন্ধান জানতে পারেন প্রধানত শিল্পীরা, কেননা তাঁদের সেই নতুনের সন্ধান করাই হল কাজ। প্রতিদিনের রচনা প্রতিদিনই নতুন কিছু দেয়, সেইজন্যেই চিত্রের আঁকবার বিষয় আহরণের জন্য বিশেষ কোন বাঁধা পথ নেই। মৌমাছিরা যেমন আনন্দে ফুলে মধু আহরণ ক'রে ফেরে, শিল্পীরাও তেমনি নতুন নতুন রচনায় নতুন নতুন ভাবের রস সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

পারসীকপ্রসঙ্গ

শুদ্ধিতত্ত্ব

১

শুদ্ধিসম্বন্ধে বেদপন্থীদের সহিত অবেস্তাপন্থীদের অত্যন্ত মিল দেখা যায়। আজ আমরা এখানে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পারসীক-শাস্ত্রে শুদ্ধির পরম তত্ত্ব এই যে, মূল উপাদানগুলি (পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু) যেন কোনোরূপে দূষিত না হয়। কারণ এই সমস্ত দূষিত হইলে সমস্তই দূষিত হইয়া যায়। তাই পারসীকেরা যতদূর পারেন এইগুলিকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখিতে চেষ্টা করেন। জল ও অগ্নির সম্বন্ধে বেদপন্থীদেরও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়,[১] কিন্তু অবেস্তাপন্থীদের মত ততদূর কঠোর নহে।

পারসীকগণের মতে মৃত্যু অশুদ্ধির প্রধান স্থান, আর সন্তানপ্রসবও তদনুরূপ। এ বিষয়ে বেদপন্থীদেরও এই ধারণা, মৃত্যুতেও অশুদ্ধি বা অশৌচ হইয়া থাকে, আর বাড়ীতে প্রসব হইলেও অশৌচ হয়; প্রসূতির অশৌচ তো অনেক দিন থাকে। সময়ান্তরে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

---

১ দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুস্মৃতি (৭১) হইতে কয়েকটি সূত্র তুলিয়া দিতেছি:—অমেধ্য দ্রব্য অগ্নিতে ফেলিবে না॥ ৩২॥ রক্ত (ফেলিবে) না॥ ৩৩॥ বিষ (ফেলিবে) না॥ ৩৪॥ এইরূপ জলেও (অমেধ্য, রক্ত, বা বিষ ফেলিবে না)॥ ৩৫॥ অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না॥ ৩৬॥ (অগ্নিতে) পা তাতাইবে না॥ ৩৭॥ দ্রষ্টব্য মনু, ৪.৫৩-৫৪।

পারসীকগণের (এবং অনেকটা বেদপন্থীদেরও) ধারণা, যাহা কিছু শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় বা নির্গত হইয়া আসে মড়ার ন্যায় তাহাও অশুচি। তাই নিঃশ্বাসও অপবিত্র, এবং ইহা দ্বারা অগ্নিতে বাতাস দেওয়া চলে না। বেদ-পন্থীরও ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়, মুখ দিয়া আগুনে বাতাস দেওয়া নিষিদ্ধ।২ উভয় সমাজেই কাটা নখ ও চুল নিতান্ত অপবিত্র। পারসীরা বলেন, যথাবিধি শাস্ত্রীয় উপায়ে যদি রক্ষা করা না যায় তো ইহারা দৈত্যদের অস্ত্র হয়। যাহা কিছু দ্বারা শরীরের বিক্রিয়া হয় তাহাকেই এই সমাজে দৈত্যের কার্য্য বলিয়া মনে করা হয়; এবং যাহার এইরূপে বিক্রিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে সে অশুচি বলিয়া বিবেচিত হয়। ঋতু অবস্থায় স্ত্রীলোকগণকেও এই জন্য অত্যন্ত অশুচি মনে করা হয়। তাহাদের এই ঋতু-অবস্থাকে দৈত্যের কার্য্য বলিয়া ধরা হয়; বিশেষত যদি রজোনির্গম বেশী দিন ধরিয়া হয়। ঋতুমতী স্ত্রীর আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে

২। "নাগ্নিং মুখেনোপধমেৎ" — মনু, ৪ ৫৩। মনুর এই প্রথা যে, অতি প্রাচীন তাহা পারসীক-গণের শাস্ত্রের কথায় বুঝিতে পারা যায়। বেদপন্থীদের মধ্যে সর্ব্বত্র ইহা অনুসৃত হয় নাই দ্রষ্টব্য—কর্ম্মপ্রদীপ, ১.৯ ১৪ ১৫)। তাজিক-নামে প্রসিদ্ধ এক ইরান-জাতির মধ্যে এখনো ইহা মানা হয়। নিঃশ্বাসটা অপবিত্র এবং তাহার স্পর্শে অপর বস্তু অশুচি হয় বলিয়াই পারসীক সমাজের পুরোহিতেরা শাস্ত্রীয় কাজ করিবার সময় নাক ও মুখকে ঢাকিবার জন্য এক টুকরা সাদা কাপড় নাকের মূল হইতে মুখের নীচে ২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখেন। অবেস্তার ভাষায় ইহার নাম প ই তি দা ন, ফারসীতে সাধারণত বলা হয় পে নো ম। মুখ বা নিঃশ্বাসের দ্বারা আগুনে বাতাস না দেওয়ার পদ্ধতি আরো বহু দেশের বহু সমাজে প্রসিদ্ধ আছে; যেমন পোলিনিসিয়ার মাওরি জাতির মধ্যে, আয়র্লণ্ডে St. Brigitএর কুমারীগণের মধ্যে, বল্‌কান সাবদের মধ্যে, ইত্যাদি। Frazar's The Golden Bough, Vol. II. p 240-241, III 136; ইত্যাদি। নিঃশ্বাসের দ্বারা যে, ব্যাধির সঞ্চার হয় তাহা হিন্দুচিকিৎসকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ :—

"প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্ নরম্॥"

পারসীক সমাজের সহিত হিন্দু সমাজের অনেক স্থানে অতিঘনিষ্ঠ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহাই আলোচিত হইতেছে, ইহা দ্বারা উভয় সমাজের প্রাচীন ঐক্য অনেকটা বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অবেস্তাপন্থীর মতে স্ত্রীলোকের ঋতু, বিশেষত অসাময়িক বা অতিরিক্ত ঋতু[৩] দৈত্যের কার্য্য (বেন্দীদাদ্,১. ১৯ ; ১৬. ১১)। বেদপন্থীদের মতে ইহাকে পাপের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করা যায়। তৈত্তিরীয় সাংহিতায় (২.৫.১) এ বিষয়ে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটি উক্ত হইয়াছে ঃ—

> ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। ইনি অসুরগণের ভাগিনেয় হইতেন। তাঁহার তিনটি মাথা ছিল, একটির দ্বারা তিনি সোম পান করিতেন, একটির দ্বারা সুরা পান করিতেন, আর একটির দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেন। তিনি প্রত্যক্ষত বলিতেন দেবতারা ভাগ পাইবেন, কিন্তু পরোক্ষে বলিতেন অসুরেরা পাইবেন। ইন্দ্র ইহা জানিয়া তাহার মাথাগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। লোকেরা ইন্দ্রকে 'ব্রহ্মঘাতী!' 'ব্রহ্মঘাতী!' বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। ইন্দ্র তখন পৃথিবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া ও তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া তাহাকে নিজকৃত ব্রহ্মহত্যার এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিলেন। ইহার পর তিনি পূর্ব্ববৎ বনস্পতি-সমূহকে আর এক তৃতীয়াংশ

৩। পারসীরা সাধারণত বলেন দ শ্ তা ন্। অবেস্তাতে ইহা চি থ্ র্ (উজ্জ্বল, প্রকাশ, বীজ, রজঃ), দ খ্ শ্ ত (লক্ষণ, চিহ্ন,) ও বো হ ন (রক্ত) শব্দে উক্ত হয় ; এবং ঋতুমতী স্ত্রীকে তদনুসারে বলা হয় চি থ্ র্ ব ই তি, দ খ্ শ্ ত ব ই তি, এবং বো হ ন ব ই তি। K. E. Kanga মহাশয়ের অভিধানে যদিও এই কয়টি শব্দের অর্থের বিশেষ ভেদ দেখান হয় নি, তথাপি বেন্দীদাদ্, ১৬.১৪, পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চি থ্ র্ ও দ খ্ শ্ ত ভিন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যথাক্রমে অনুবাদ করিয়াছেন blood and whites, অর্থাৎ রজঃ ও শ্বেত প্রদর।

অর্পণ করিয়া শেষে স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের অভিলষিত বর-প্রদানে সম্মত হইয়া ব্রহ্মহত্যার অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ দান করেন। এবং এই ব্রহ্মহত্যাকেই রজোরূপে প্রতিমাসে তাহারা ধারণ করিয়া থাকে।[৪]

উভয় সমাজেই এই অবস্থায় স্ত্রীলোককে নিতান্ত অশুচি বলিয়া মনে করা হয়। অবেস্তাপন্থীর ধর্মশাস্ত্রে (বেন্দীদাদ্, ১৬. ১, ইত্যাদি) উক্ত হইয়াছে:—

১। হে ভূতময় জগতের ধাতা, হে পবিত্র, মজদযাজীর গৃহে যদি কোনো নারী ঋতুমতী হয় তাহা হইলে মজদযাজীদের কি কর্ত্তব্য?

২। অহুর মজদা উত্তর করিলেন যে, তাহারা তাহার পথটি[৫] এমন পরিষ্কার করিয়া দিবে যেন তাহাতে কোনো গাছ, বা উদ্ভিদ্ (ছোট-ছোট ফুলগাছ ইত্যাদি, ব রে ধ, সং. ব র্ধ), বা কোনো কাঠ না থাকে,[৬] তাহারা (সেই) স্থানে শুষ্ক পাংশু (ধূলি) নিহিত করিবে,[৭] এবং সর্ব্বপ্রথমে গৃহের অর্দ্ধেক, বা তৃতীয়াংশ বা

৪। "ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষা বর্ণং প্রতিমুচ্য আস্তে।" তৈ. স. ২. ৫. ১. ৬।

৫। যেখানে ঋতুমতী স্ত্রীক থাকিতে হয় (দ শ্ তা নি স্তা ন), সেইখানে যাইবার পথ।

৬। ইহার উদ্দেশ্য, পাছে দশ্তানিস্তানে যাইবার সময় তাহার সংস্পর্শে ইহারা দূষিত হইয়া যায়। কোচিন রাজ্যে ক নি য়া ন নামে এক নিম্ন জাতি আছে। ইহারা ব্রাহ্মণ হইতে ৩৬ পা দূরে থাকিতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথা আছে যে, ঋতুমতী স্ত্রী ফুটন্ত ফুল-গাছের ধার দিয়া যাইতে পায় না। ঋতু সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অনেক আচার ইহাদের মধ্যে অদ্যাপি অনুসৃত হয় দেখা যায়। L. K. Anantha Krishna Ieyer, The Cochin Tribes and Castes, Vol. I, p. 203.

৭। পাছে তাহার সংস্পর্শে পৃথিবী দূষিত হইয়া পড়ে। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশেরও কোন কোন জাতির মধ্যে প্রথা আছে যে, ঋতুমতীরা সাধারণ পথ দিয়া যাইতে পারে না। Golden Bough vol. x. pp. 78, 80, etc.

চতুর্থাংশ, অথবা পঞ্চমাংশ পৃথক্ করিয়া রাখিবে, কেন না পাছে সেই নারী অগ্নিকে দেখে।

৩। অগ্নি হইতে কত দূরে? জল হইতে কত দূরে? যজ্ঞিয় শাখা[৮] হইতে কত দূরে, এবং পবিত্র বা সাধু (অ ষ ব ন্ = ঋতাবান্) নরগণ হইতে কত দূরে?

৪। অহুর মজদা বলিলেন—১৫ পা অগ্নি হইতে, ১৫ পা জল হইতে, ১৫ পা যজ্ঞিয় শাখা হইতে, এবং ৩ পা সাধুগণ হইতে।

৫। ঋতুমতীকে যে ব্যক্তি খাদ্য আনিয়া দিবে সে তাহা হইতে কত দূরে থাকিবে?

৬। অহুর মজদা বলিলেন—৩ পা দূরে।

৭। কাহাতে করিয়া খাদ্য আনয়ন করিবে? কাহাতে করিয়া যব (-পানীয়) আনয়ন করিবে?

লোহার, বা সীসার, অথবা অন্য কোনো নিকৃষ্ট ধাতুর পাত্রে।

অন্যত্র (শদ্ দর্, ৬৮.১ ইত্যাদি[৯]) উক্ত হইয়াছে:—

১। যদি কোনো ঋতুমতী নারী অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে তাহা দ্বাদশ দি র্হা ম-পরিমাণ[১০] পাপ; যদি তিনি অগ্নির তিন পায়ের মধ্যে যান, তাহা হইলে তাহা একহাজার দুইশত দির্হাম-পরিমাণ পাপ; আর যদি তিনি আগুনের উপর হাত রাখেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার পনের ত না ব র-পরিমাণ[১০] পাপ।

৮। ব রে স্ম ন্ (সং. ব্র হ্ম ন্); দাড়িমের শাখা, বেন্দীদাদ্ ও যস্নের বিহিত ক্রিয়াসমূহে এই শাখাগুচ্ছের ব্যবহার হইয়া থাকে। আজকাল ইহার পরিবর্তে পিতল বা রূপার তার দিয়া কাজ করা হয়। কার্য্যবিশেষে তারের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।

৯। S B E. Vol. XXIV. Palhavi Texts, Part, III, pp. 232ff.

১০। পারসীকদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে তিন রাত্রি অতীত হইলে জীবকে র শ্ নু দেবতার নিকট নিজের জীবিতাবস্থার কার্য্যের হিসাব দিতে হয়। * ঐ দেবতা তখন নিজের সোনার দাঁড়ি-পাল্লার

২। ঠিক এইরূপে যদি তিনি প্রবহমান জলের দিকে তাকান, তবে তাহা তাঁহার দ্বাদশ দির্হাম-পরিমাণ পাপ; তিনি যদি প্রবহমান জলের মধ্যে পনের পা যান, তবে তাহা তাঁহার পনের দির্হাম-পরিমাণ পাপ; তিনি যদি প্রবহমান জলের মধ্যে উপবেশন করেন তবে তাহা পনের তনাবর-পরিমাণ পাপ।

৩। তিনি যদি বৃষ্টির মধ্যে বেড়ান তবে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পতিত প্রত্যেক বিন্দু জল হইতে তাঁহার এক তনাবর-পরিমাণ পাপ উৎপন্ন হয়।

৪। তিনি যদি সূর্য্যের প্রার্থনা করিবার জন্য আগমন করেন তাহা হইলে কোনো সাধু ব্যাক্তির সহিত তাঁহার কথা বলা উচিত নহে।[১১]

৫। ভূমির উপর নগ্ন পদ নিক্ষেপ করা তাঁহার উচিত নহে।

৬। খালি হাতে কোনো খাদ্য খাওয়া তাঁহার উচিত নহে,[১২] তৃপ্ত থাকিলে তাঁহার কিছু খাওয়া উচিত নহে।

৭। দুইজন ঋতুমতী নারীর একত্র ভোজন উচিত নহে, তাঁহাদের

তাহার পাপ-পুণ্য ওজন করিয়া দেখেন, এবং তদনুসারে তাহার স্বর্গ বা নরক হয়। পাপ-পুণ্য মাপিয়া দেখা হয় বলিয়া তাহাদের একটা ওজন কল্পনা করা হয়—কোন্‌টার ভার কত বেশী বা কত কম। দির্হাম (dirham, জ্‌ জ ন) নামক স্বর্ণমুদ্রার ওজনে ঐ মাপ করা হয়। দির্হামের পরিমাণ সময়ে-সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ৪৫ হইতে ৬০ গ্রেন পর্য্যন্ত ইহার ওজন জানা যায়। ৪ দির্হাম=১ স্তীর। এইরূপ ৩০০ স্তীর=১ তানাপুহর, বা তনাবর।—শায়স্ত লা-শায়স্ত, ১-২ (SBE, Vol V Pahlvi Texts, Part I. p 241)

১১। পাঠান্তর—'সূর্য্যের দিকে বা কোনো ধার্ম্মিক ব্যক্তির দিকে তাকান তাঁহার উচিত নহে।'

১২। বেদপন্থীদের শাস্ত্রে কিন্তু অঞ্জলিতে পান করিবার ব্যবস্থা আছে, তৈ. স. ২.৫. ১. ৭; বসিষ্ঠস্মৃতি, ৫ ৭।

একত্র শয়নও উচিত নহে। তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর স্পৃষ্ট হয় ইহাও অভিলষণীয় নহে।[১৩]

৮। ঋতুমতী নারী কোনো বিধিবোধিত কর্ম্মের জন্য প্রক্ষালিত কোনো বস্তুর ধার দিয়া গমন করিবেন না, কেন না ইহা যদি হাজার গজের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তিনি ইহাকে দুষিত করিয়া ফেলেন, এবং ইহা অপবিত্র হয়।

৯। যে-কোনো ব্যক্তি যজ্ঞিয় শাখা ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত তিনি কোনো কথা বলিবেন না; যদি কোনো পুরোহিত হস্তে যজ্ঞিয়শাখা ধারণ করিয়া থাকেন, আর কোনো ঋতুমতী নারী দূর হইতে তাঁহাকে কিছু বলেন, অথবা সেই পুরোহিত হইতে ঐ নারী তিন পায়ের মধ্যে বেড়াইয়া যান, তাহা হইলে ঐ ঋতুমতী নারী সেই যজ্ঞিয় শাখাকে অশুচি করেন।

এই সমস্ত বিধানের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় আছে :—

(১)। ঋতুমতী নারীর অগ্নিকে স্পর্শ করা তো দূরে, তাহার নিকট যাওয়াও অন্যায়, এমন কি তাহাকে দেখিতেও হয় না (বেদীদদ্, ১৬.২, ৩; শদ্ দর্, ৬৮.১; শাযস্ত লা-শাযস্ত, ৩.২৭)। বেদপন্থীরও ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ বিধি আছে, কিন্তু তত বাড়াবাড়ি নহে; ইহাতে কেবল অগ্নির স্পর্শ নিষিদ্ধ হইয়াছে (বসিষ্ঠ ৫,৭)[১৪]

"অগ্নিকে স্পর্শ করিবে না।"

(২)। অবেস্তাপন্থীদের মতে জল-সম্বন্ধেও ঋতুমতী স্ত্রীর ঐরূপ বিধান (শদ্ দর্, ৬৮.২-৩; শাযস্ত লা-শাযস্ত, ৩.৩৩); বেদপন্থীদেরও (বসিষ্ঠ, ৫.৭) এই বিধি আছে :—

১৩। পুস্তকান্তরে শেষোক্ত বাক্যটি অধিক।

১৪। "নাগ্নিং স্পৃশেৎ।" স্মৃতিসমুচ্চয় (আনন্দাশ্রম, ১৯০৫), ১৯৬ পৃ.; বঙ্গবাসী, ঊনবিংশতিসংহিতা, ১৩১০, পৃ ৪৮৬।

জলের মধ্যে স্নান করিবে না।[১৫]

(৩)। পারসীকদের মতে ঋতুমতী স্ত্রীকে সূর্য্য বা অন্যান্য গ্রহ দেখিতে হয় না (শায়স্ত লা-শায়স্ত, ৩, ১৯; নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইবে)। বেদপন্থীদেরও ধর্ম্মে (বসিষ্ঠ, ৫.৭) তাহাই বলে—

"গ্রহসমূহকে দেখিবে না।"[১৬]

(৪)। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি পারসীকগণের মধ্যে ঋতুমতী স্ত্রী কোনো সাধু বা পবিত্র ব্যাক্তির সহিত কথা কহিবেন না, কেন না সেই ব্যক্তি তাহাতে অশুচি হন (শদ্ দর্, ৬৮. ৪, ১৪; শায়স্ত লা-শায়স্ত, ৩. ২৯)। বেদপন্থীরাও (তৈত্তরীয় সংহিতা, ২, ৫. ১, ৫) বলেন—

মলিনবসনা অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবে না।[১৭]

(৫)। অবেস্তাপন্থীদের মতে ঋতুমতী স্ত্রীর ভোজন পাত্র লোহার, সীসার, অথবা অন্য কোনো নিকৃষ্ট ধাতুর হইবে (বেন্দীদাদ্, ১৬. ৬; শায়স্ত লা-শায়স্ত, ৩. ৩৪)। বেদপন্থীরাও (বসিষ্ঠ, ৫.৮) বলেন—

"অথবা তিনি তাম্র বা লৌহ পাত্রে পান করিবেন।"[১৮]

১৫। "নাপ্সু স্নায়াৎ।" দ্রষ্টব্য– বৌধায়নগৃহ্যসূত্র, ১ ৭ ২৬। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ঋতুমতী স্ত্রী নদী পার হইতে পারে না, এমন কি নদীর জলও আনিতে পারে না।—Golden Bough, Part VII. Vol. p 77.

১৬। "ন গ্রহান্ নিরীক্ষেত।" ঋতুমতী স্ত্রীর সূর্য্যের দর্শনপরিহার পৃথিবীর বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।.Golden Bough Part VII Vol, I, pp 35, 36, &c

১৭। "মলবদ্‌বাসসা ন সংবদেত।" বৌধায়নগৃহ্যসূত্রে পরিপাটী রক্ষার জন্য এই বচনই একটু পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে:—"অথ যদৈষা মলবদ্‌বাসাঃ স্যান্ নৈ ন য়া সহ সং ব দে ত।" দ্রষ্টব্য—বিষ্ণু, ৭১ ৫৮; মনু, ৪ ৫৭।

১৮। "লোহিতায়সেন বা।" লো হি ত শব্দে 'তাম্রনির্ম্মিত,' এবং আ য় স শব্দে 'লৌহনির্ম্মিত', আবার সমগ্র লো হি তা য় স শব্দে 'তাম্রনির্ম্মিত' অর্থও বুঝা যায়। অবেস্তার সহিত যখন অর্থের মিল হইতেছে তখন অনুবাদে ধৃত অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি। এখানে আর একটি কথা দেখিবার আছে। বসিষ্ঠ-ধর্ম্মশাস্ত্রে, বৌধায়নগৃহ্যসূত্রে ১ ৭, ৩৪-৩৫, এবং

(৬)। যে ঋতুমতী স্ত্রী এতদূর অশুচি, বলা বাহুল্য, তাহার পক্ক অন্ন অপবিত্র ও অভোজ্য। অবেস্তাপন্থী বলেন (শায়স্ত লা-শায়স্ত, ৩, ১২), ঋতুমতী স্ত্রীর তিন পায়ের মধ্যে পক্ক দ্রব্য থাকিলে তাহা দূষিত হয়। আর বেদপন্থী স্পষ্ট ভাষাতেই বলেন, তাহার অন্ন অপবিত্র এবং তজ্জন্যই অভোজ্য (তৈ. স. ২. ৫. ১. ৬; বসিষ্ঠ ৫. ১০; বৌধায়ন, ১. ৭. ২২; গৌতম, ১৭. ১০; মনু, ৪. ২০৮)।[১৯]

(৭)। একস্থানে (শদ্ দর্, ৬৮. ৭) উক্ত হইয়াছে যে, দুইটি ঋতুমতী নারীর এক সঙ্গে ভোজন ও শয়ন উচিত নহে। পুস্তকান্তরে এখানে একটি অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায়, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর স্পৃষ্ট হয় ইহাও উচিত নহে। বেদপন্থীরাও এইরূপ বলেন যে, তাদৃশ দুইটি স্ত্রীর পরস্পর স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। (বৃদ্ধহারীতস্মৃতি, ৯ম অধ্যায়, শ্লোক ৩৮১—৩৮২=স্মৃতি-সমুচ্চয়,পৃ.৩২১); অত্রিসংহিতা, ২৭৯ ২৮৪ শ্লো. (স্মৃতিস. পৃ.২২)।

ইহাদের উভয়েরই মূলভূত তৈত্তিরীয়সংহিতায়, ২৫১৭, পা ন করার কথা উক্ত হইয়াছে, ইহাতে মনে হয় অবেস্তায় (বেন্দীদাদ্, ১৬.৭) উল্লিখিত য ব অথবা য ব নি র্মি ত পানীয়েরই (যবাগূ) কথা বেদপন্থীদেরও গ্রন্থে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবেস্তা (বেন্দীদাদ্, ১৬৬, ও ৭৭৫) আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ঋতুমতীর ভোজন বা পান-পাত্র কোনো নিকৃষ্ট ধাতুর হইতে পারে, কিন্তু মাটীর হয় না, কেননা অবস্থাপন্থীদের মতে মৃন্ময় পাত্র একবার অশুচি হইলে আর শুচি হয় না (বেন্দীদাদ্ ৭৭৫)। বেদপন্থীর শাস্ত্রে অশুচি মৃন্ময় পাত্রকে পোড়াইয়া লইলেই তাহা শুদ্ধ হইতে পারে (শঙ্খস্মৃতি, ১৬১; =স্মৃতিসমুচ্চয়, পৃ.৩৮৯)। তাই ইঁহাদের মতে ঋতুমতী স্ত্রী মৃন্ময় শরাবাদি পাত্র ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা অবিকলাঙ্গ ("অখর্ব") অর্থাৎ অভাঙা হওয়া চাই (তৈ স ২.৫.১.৭; বসিষ্ঠস্মৃতি, ৫৭; বৌধায়ন, ১.৭ ৩৫)। সায়ণ তৈত্তিরীয সংহিতার উল্লিখিত স্থান ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে, কাঁচা শরাব ("অদগ্ধশরাবাদিঃ") ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, তাহা সহজেই ফেলিয়া দিতে পারা যায়।

১৯। Baganda (East Africa), Toaripi (New Guinea), প্রভৃতি অন্যান্যও বহু জাতির মধ্যে এই প্রথা আছে। Golden Bongh, Part VII, vol I, pp. 80, 84.

অতঃপর আমরা ঋতুমতী নারীর অন্যান্য কতকগুলি আচারের উল্লেখ করিব, ইহাদেরও মধ্যে উভয় সমাজের সাদৃশ্য দেখা যাইবে। বেন্দীদাদে (১৬শ ফর্গর্দ) উক্ত হইয়াছে :—

৮। তিন রাত্রি অতীত হইলেও যদি সেই নারী রক্ত দেখিতে পান তবে তিনি চারি রাত্রি না কাটা পর্য্যন্ত এক নির্জন স্থানে উপবিষ্ট থাকিবেন।

চারি রাত্রি অতীত হইলেও যদি তিনি রক্ত দেখিতে পান তবে পাঁচ রাত্রি না কাটা পর্য্যন্ত তিনি এক নির্জন স্থানে উপবিষ্ট থাকিবেন।

৯-১০। ক্রমশ তাহার পরেও রক্ত দেখিতে পাইলে তিনি নয় রাত্রি না কাটা পর্য্যন্ত এক নির্জন স্থানে উপবিষ্ট থাকিবেন।

১১। যদি নয় রাত্রিও অতীত হইবার পর তিনি রক্ত দেখেন, তাহা হইলে সেই প্রতিকূল কার্য্য দানবগণের; তাহারা তাহা নিজেদেরই পূজা ও স্তুতির[২০] জন্য করিয়া থাকে।

তখন (অথবা 'সেখানে'[২১]) মজদযাজীরা তাহার পথটি[২২] এমন পরিষ্কার করিয়া দিবে যে, তাহাতে কোনো গাছ বা উদ্ভিদ্ বা কোনো কাঠ না থাকে।

১২। তাহারা সেখানে জমির উপর তিনটি গর্ত্ত খনন করিবে, এবং তাহাদের দুইটিতে গোমূত্র ও একটিতে জল দ্বারা (তাহাকে) ভাল করিয়া স্নান করাইবে (বা ধুইয়া দিবে)।

তাহারা দুইশত ক্ষতিকরজন্তু[২৩] (শস্যের) দানাবাহী[২৪] পিপীলিকাকে[২৫]

২০। "যস্নাইচ বক্ষাইচ"=সং যজ্ঞায় চ ব্রহ্মণে (?) চ।

২১। "অএতধা (=অএতদা)" =সং *এতদা, তুল :— তদা।

২২। যে স্থানে তাহার শুদ্ধি করা হইবে সেই স্থানে যাইবার।

২৩। মূল "খ্‌ফ্‌স্ত্র."

২৪। "দানোকর্ষ." সং ধানাকর্ষ।

২৫। "মওইরি," সং. বম্রী, বল্মী। বম্রী হইতে বর্ণ বিপর্য্যয়ে মব্রি, তদনন্তর মওইরি। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত বল্মীক শব্দও ইহা হইতে উৎপন্ন।

বধ করিবে, যদি গ্রীষ্মকাল[২৬] হয়; আর যদি শীতকাল হয়, তবে অঙ্‌্রমইন্যু-কৃত যে কোনো ক্ষতিকর জন্তুর দুই শত বধ করিবে।[২৭]

অতঃপর বেন্দীদাদে (১৬.১৩-১৬), যদি কেহ কোনো স্ত্রীর ঋতু নিরোধ করে বা কামাসক্ত ভাবে একবার, দুইবার, তিনবার অথবা চারবার ঋতুমতীর অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত ইহা বলিয়া ঋতুমতীর সহিত সংসর্গে গুরুতর দোষ দেখান হইয়াছে (ঐ, ১৭)। বেদপন্থীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও (সংহিতা[২৮] হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত) এইরূপ কথা প্রচুর।

স্পর্শ দোষ বা ছোঁয়াছুঁয়ি দ্বারা অশুদ্ধি বেদপন্থীদের মধ্যে খুবই আছে ইহা সকলেরই জানা কথা; কিন্তু অবেস্তাপন্থীর মধ্যে কোনো-কোনো স্থলে ইহার এত বাড়াবাড়ি যে বলিবার নহে।[২৯] সাক্ষাৎ স্পর্শে তো অশৌচ হয়-ই, পরম্পরা স্পর্শেও হইয়া থাকে; যেমন এক জন যদি সাক্ষাৎ স্বয়ং শব স্পর্শ করে আর সেই ব্যক্তিকে আর এক জন স্পর্শ করে তবে শেষোক্ত ব্যক্তিও অশুচি হইবে। স্থানে-স্থানে এইরূপ অশৌচ পর-পর দশম বা দ্বাদশ স্পর্শকারী পর্য্যন্ত অনুসরণ করে। ঋতুমতী স্ত্রীসম্বন্ধেও এইরূপ পরম্পরা-স্পর্শেও অশৌচ হইয়া থাকে (শায়স্ত লা-শায়স্ত, ২.৬১)। বেদপন্থীর শাস্ত্রের (মনু, ৫.৮৫; গৌতমধর্ম্মসূত্র, ৪.২৯)[৩০] মতে কেবল দ্বিতীয় সংস্পর্শী পর্য্যন্ত অশুচি হয়।

২৬। মূল "হ ম," সংস্কৃত স মা, Ger Sommer; A S Sumer, Sumor; Eng Summer সংস্কৃতে 'বৎসর' অর্থে ঋতুবাচক শ র ৎ, হি ম শব্দের ন্যায় স মা শব্দও প্রযুক্ত হয় যদিও এই শব্দটি 'গ্রীষ্ম' ঋতু অর্থে সংস্কৃতে দেখা যায় না।

২৭। সাপ, বেঙ্‌ প্রভৃতি যত কিছু অনিষ্টকর জীব সমস্তই অঙ্‌্রমইন্যুর সৃষ্টি, তাই ইহাদের যত নষ্ট হয় ততই ভাল। সম্ভবত ইহাই এইরূপ বধের উদ্দেশ্য।

২৮। "যাং মলবদ্বাসসং সম্ভবন্তি যস্ততো জায়তে সোঽভিশস্তঃ"—তৈ স.২.৫ ১ ৬; মনু, ১১ ১৭৪; ইত্যাদি, ইত্যাদি। অন্যান্যও বহু জাতির মধ্যে ইহা আছে।

২৯। দ্রষ্টব্য বেন্দীদাদ, ৫.২৭, ৩৮; শায়স্ত লা-শায়স্ত, ২.৫৯, ইত্যাদি।

৩০। পতিত, চণ্ডাল, সূতিকা, রজস্বলা ও শব, ইহাদিগকে স্বয়ং স্পর্শ করিলে, অথবা যে ইহাদিগকে স্পর্শ করে তাহাকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হয়।

নিম্নে শাষস্ত লা-শায়স্ত (২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ) হইতে কতকগুলি কথা উদ্ধৃত হইতেছে,[৩১] আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পাঠকগণ ইহা হইতে অনেক জানিতে পারিবেন :—

ঋতুমতী স্ত্রীর দেহস্পর্শে ঘুঁটে ও ছাই উভয়ই অপবিত্র হয়। ২.১৭।

ঋতুমতী স্ত্রীর পরিধানে যে বস্ত্রাদি থাকে তাহা পরিত্যাজ্য। ২.৯৬।

তাঁহাকে পরিধানের জন্য যে নূতন বস্ত্র দেওয়া যায়, তাহা অশুচি হয়; কিন্তু যাহা তিনি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা অশুচি হয় না। ৩.১।

শয়নগৃহে যদি গালিচা ও গদি বিছান থাকে, এবং তাহাতে উপবেশন কালে যদি ঋতু হয়, আর ঐ গৃহ ও উক্ত দ্রব্যদ্বয়কে যদি সেই ঋতুমতী স্ত্রী প্রথম ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ তিনই অশুচি হয়, কিন্তু ঐ সমস্তকে তিনি যদি ব্যবহার করিয়া আসেন, তাহা হইলে আর তাহারা অশুচি হয় না। ৩.২-৩।

যে মুহূর্ত্তে কোনো স্ত্রী (দস্তানিস্তানে) জানিতে পারিবেন যে, তিনি ঋতুমতী হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রথমে তাঁহার হার, পরে কুণ্ডল ও তাহার পর কেশবন্ধনী, এবং তদনন্তর জামা খুলিয়া ফেলিবেন। ৩.৪।

ঋতুমতী হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি যতক্ষণ তাঁহার সমস্ত বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করেন, ততক্ষণ মনে মনে একটি প্রার্থনা স্মরণ করিবেন। পূজা-কালে মনে মনে প্রার্থনা স্মরণ করিবার সময় যদি ঋতু হয়, তাহা হইলে প্রার্থনাটি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে হইবে। মনে মনে প্রার্থনাস্মরণ-কালে যদি মল-মূত্রাদি ত্যাগের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঐ প্রার্থনা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি না করিয়া তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হইবে। ৩.৬—৯।

পূতবারিধৌত হস্ত ও বজ্জিয় শাখার দিকে ঋতুমতী স্ত্রীর দৃষ্টিপাত ঘটিলে

৩১। মূল পুস্তক পহ্লবী ভাষায়; SBE গ্রন্থমালায় (Vol.v) ইহার যে ইংরাজী অনুবাদ আছে, তাহা হইতেই শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় ইহা বাঙলায় সঙ্কলন করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

তাহারা অপবিত্র হয়। কোনো গৃহে ঋতুমতী স্ত্রীর ঠিক পঞ্চদশ পদ নিম্নে যষ্ঠির শাখা থাকিলে তাহাও অশুচি হয়। ৩.১০-১১।

ঋতুমতী স্ত্রীর নিকট হইতে ত্রিপাদের মধ্যে পক্কদ্রব্য থাকিলে তাহা অশুচি হয় এবং তাহার ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য সকলের পক্ষে, এমন কি তাহার নিজেরও পক্ষে অখাদ্য। সোশ্যান্‌স্ বলেন রজস্বলা স্ত্রীকর্তৃক কাহারও শয্যা কিংবা বস্ত্রাদি স্পৃষ্ট হইলে, তাহা গোমূত্র ও জলদ্বারা ধৌত করা উচিত। কিন্তু তাহার শয্যা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে অপরের শয্যা অশুচি হয় না। ৩.১২-১৩।

যে ঋতুমতী স্ত্রী তিনরাত্রির পরেই রজোমুক্ত হয়, তাহার পঞ্চম দিনে স্নান বিধেয়। কিন্তু যাহারা পঞ্চম দিবস হইতে নবম দিবসের মধ্যে রজোমুক্ত হয়, তাহারা রজোমুক্তির পর একদিন শুচিভাবে অবস্থানান্তর তবে স্নানযোগ্য হয়। ৩.১৪।

সন্তান প্রসব করিলে কিংবা গর্ভস্রাব ঘটিলে, চত্বারিংশৎ দিবস পর্য্যন্ত সেই প্রসূতির লক্ষ্য রাখা উচিত আর কোনরূপ রজোনির্গম হয় কি না। যদি সে বুঝিতে পারে যে, সে সম্পূর্ণরূপে রজোমুক্ত হইয়াছে তাহা হইলে চত্বারিংশৎ দিবস পরে অন্যের সহিত বসিতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে সামান্য রজোনির্গম হইলেও তাহাকে ঋতুমতী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ৩.১৫।

মাসাবধি ঋতুমতী অবস্থায় অবস্থানের পর ত্রিংশ দিবসে শুচিস্নাত হওয়ার পরই আবার যদি রজস্বলা হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পঞ্চম দিবসের পূর্ব্বে সে স্নান করিবে না। পঞ্চম দিবসে স্নানান্তে পরবর্ত্তী তিন দিন শুচিভাবে অবস্থানান্তর পুনরায় যদি সে রজস্বলা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ পঞ্চম দিবসে সে স্নান করিবে বটে, কিন্তু নয় দিন নয় রাত্রি অতীত না হইলে সে শুচি হইবে না। ৩. ১৬-১৮।

রজোনির্গমের পূর্ব্বে কিংবা পরে যাহার শ্বেতস্রাব (প্রদর) হয় তাহাকেও রজস্বলার ন্যায় অশুচি বলিয়া পরিগণিত করা হইবে। ৩.১৯।

পূর্ণরূপে রজোমুক্ত হইয়া সাধারণভাবে স্নানাদি আরম্ভ করার পর তাহার

তিন পায়ের মধ্যে যজ্ঞির শাখা অথবা অপর কোনো দ্রব্য অশুচি হয় না। ৩.২০।

অত্যন্ত শীত বোধ করিলে সে অগ্নির নিকটে বসিতে পারে। স্নানের সময় তাহাকে মনে মনে প্রার্থনাবিশেষ স্মরণ করিতে হইবে, এবং স্নানান্তে গোমূত্র দ্বারা হস্তদ্বয় ধৌত করিতে হইবে। তৎপরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে দুই শত অস্বাস্থ্যকর প্রাণী বধ করিতে হইবে।[৩২] ৩.২১।

নিয়মিত ঋতুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর গর্ভাবস্থায় যদি কাহারও রজোনির্গম হয়, আর যদি তাহা গর্ভপাতজনিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গোমূত্র এবং জল দ্বারা স্নান করান বিধেয়। কিন্তু সে গর্ভবতী কি না ইহা স্থির করিতে না পারিলে তাহাকে রজস্বলারূপে গণ্য করা হইবে। কেহ-কেহ বলেন যে, গর্ভ-হইলেও সে রজস্বলা বলিয়া পরিগণিত হইবে; আবার কেহ বলেন যে, গর্ভপাতবিষয়ে সন্দেহ থাকিলে তাহাকে মন্ত্রাদি পাঠের সহিত স্নান করিতে হইবে। ৩.২২—২৪।

রজস্বলা স্ত্রীর, এবং যাহাকে গোমূত্র ও জল দ্বারা ধৌত করা বিধেয় এইরূপ ব্যক্তির সহিত কেহ সংস্পর্শে আসিলে পাপ হয়; জ্ঞাতসারে রজস্বলা স্ত্রীর সহবাসেও পাপ হয়। ৩.২৫-২৬।

রজস্বলা স্ত্রীর পক্ষে অগ্নিদর্শন, অগ্নির নিকট হইতে ত্রিপাদ মধ্যে অবস্থান এবং অগ্নিতে হস্তস্থাপন উত্তরোত্তর অধিকতর পাপের কার্য্য।[৩৩] ছাই এবং জলের বিষয়েও ঐ নিয়ম খাটিবে। সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহের দিকে, জন্তু বা লতার দিকে দৃষ্টিপাত করা কিংবা কোনো সাধু ব্যক্তির সহিত আলাপ করা তাহার উচিত নয়। ৩.২৭—২৯।

যে গৃহে রজস্বলা স্ত্রী অবস্থান করিবে তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে না। কোনোরূপ আচ্ছাদন-বস্ত্র তাহার সম্মুখে থাকিলেও সে যদি স্পর্শ না করে তবে অশুচি হইবে না। ৩. ৩০—৩১।

৩২। ২৭ শ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩। পারিভাষিকরূপে এই তিন কার্য্য-জনিত ত্রিবিধ পাপের পরিমাণ বা ওজন যথাক্রমে ১ ফ্রামান, ১ তনাপূহর, ও ১৫ তনাপূহর। পূর্ব্বোক্ত ১০ম টীকা দ্রষ্টব্য।

বজ্রির পিষ্টক (দ্রোণ, দ্রোণ)-উৎসর্গে বা বজ্রিশাখা-ধারণকালে ঋতুমতী হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়াই যদি সে তাহা ভূমিতে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহা অশুচি হয় না। ৩. ৩২।

রজাস্বলা অবস্থায় তাহাকে এরূপভাবে উপবেশন করান উচিত যাহাতে তাহার নিকট হইতে জল অগ্নি এবং বজ্রির শাখা পঞ্চদশ পাদ দূরে এবং সাধু ব্যক্তি ত্রিপাদ দূরে অবস্থান করে। তাহার খাদ্য লোহ কিংবা সীসার পাত্রে লইয়া যাওয়া উচিত, আর যে ব্যক্তি তাহার আহার্য্য লইয়া যাইবে, সে তাহার নিকট হইতে ত্রিপাদ দূরে অবস্থান করিবে। পূজার পিষ্টক-উৎসর্গকালে মন্ত্রাদি রজাস্বলাস্ত্রীকর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়া উচিত। ৩.৩২—৩৫।

রজাস্বলা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রাপ্ত যে কোনো দ্রব্য গোমূত্র ও জল দ্বারা ধৌত করা উচিত। ১০. ৩৯।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

প্রাকৃত ভাষা

প্রাকৃত ভাষাকে প্রা কৃ ত বলা হয় কেন, ইহার উত্তরে আমাদের দেশের প্রাচীন বৈয়াকরণিকেরা সাধারণত এই কথা বলেন যে, প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে হইয়াছে, সংস্কৃতই প্রাকৃতের প্র কৃ তি; তাই অর্থাৎ সংস্কৃতরূপ প্র কৃ তি হইতে হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম প্রা কৃ ত।*

ইহার বিরুদ্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, এবং অনেকেই ইহা বলিয়াছেন, তাই সে সমন্ধে এখানে কিছু বলিবার নাই। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, সাধারণ লোকের যে প্রা কৃ তি ক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ভাষা তাহাই প্রা কৃ ত। সংস্কৃতের মধ্যে অন্তত একখানি পুস্তকে এই মত দেখিতে পাইয়াছি; সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। রুদ্রট-প্রণীত কাব্যালঙ্কারের (নির্ণয়সাগর, ২.১২) টীকাকার নমিসাধু (১১২৫ বিক্রমাব্দ = ১০৬৯ খ্রীঃ) বলিতেছেন :—

"সকলজগজ্জন্তূনাং ব্যাকরণাদিভিরনাহিতসংস্কারঃ সহজো বাগ্‌ব্যাপারঃ প্র কৃ তিঃ, তত্র ভবং, সৈব বা প্রা কৃ ত ম্‌।"

জগতের সমস্ত জীবের যে স্বাভাবিক কথা বলা —ব্যাকরণাদির দ্বারা যাহার কোনোরূপ সংস্কার করা হয় নাই, তাহার নাম প্র কৃ তি, এই প্রকৃতিতে যাহা হইয়াছে তাহা প্রা কৃ ত; অথবা সেই প্র কৃ তি ই প্রা কৃ ত, (অর্থাৎ প্র কৃ তি ও প্রা কৃ ত শব্দের কেবল আকারগত ভেদ, অর্থত দুইই এক, তাদৃশ স্বাভাবিক কথা বলাই প্রাকৃত)।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

---

* "অথ প্রাকৃতম্‌॥...প্রকৃতিঃ, সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্‌।"—হেমচন্দ্র, ৮, ১.১। "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং মতম্‌।"—প্রাকৃতচন্দ্রিকা। "প্রাকৃতস্য তু সর্ব্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ।"—প্রাকৃতসঞ্জীবনী।

বিলাতযাত্রীর পত্র

৬

দক্ষিণ-ফ্রান্স,
Cap Martin,
Alpes Maritimes.

এখানকার যে সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তি লাভ করে। কেননা, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র—সেই-খানে স্বার্থলোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়—সেইখানে মানুষ নিজের সুখদুঃখের, নিজের ভোগসম্ভোগের অতীত হয়ে বিচরণ করে—সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধরে রাখ্‌তে পারেনা, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবিকালবিহারী তারাই অমৃতলোকের অধিবাসী, কেননা মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্চে বর্ত্তমান। এইখানেই পদে পদে ক্ষয়, এইখানেই যত আঘাত যত নৈরাশ্য—এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মানুষ পীড়িত হয়। মানুষ হচ্চে "অমৃতস্য পুত্রাঃ", মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী। সেই দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, খণ্ডকালে নয়। আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা আমাদের মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়,—সেই ব্যথা বর্ত্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে, সেই হচ্চে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্চে অকিঞ্চন,

কালের ক্ষেত্রে যার ঘর মাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই। অধুনিক ভারতবর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে বর্ত্তমানের সব দাবীও সে পুরাপুরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চল্‌চে না, ঋণের প্রত্যাশায় সে ধনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে বসে আছে। কিন্তু যার বর্ত্তমানের সম্বল স্বল্প সে আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায়—আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতচি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্চি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবী কাল বাধাগ্রস্ত, এই জন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে পারচে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে যা লিখেচ তার কারণ হচ্চে মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসেব বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে সকল পরিবার থেকে এই সব ছাত্র আসে তারা আত্মার দীনতা দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম্ম করতে নিযুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বদ্ধ হয় তাহলে বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ" আমাদের পক্ষে সত্য নয়, "বিপুলা চ পৃথ্বী" সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা।

মানুষ যখন তার কীর্ত্তির জন্যে বৃহৎকালের ক্ষেত্র না পায় তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করতেই পারেনা, সে আপন অভাবকে হীনতাকেই ব্যক্ত করে। নিরন্তর যে দেশে কেবল এই অভাব এবং দুঃখদুর্গতিই প্রকাশ পাচ্চে সেখানে আত্মার উপরে মানুষের শ্রদ্ধা চলে যায়—পরস্পরের কুৎসাবাদে ঈর্ষ্যা-পরতায় সেই শ্রদ্ধাহীনতা মানুষের আত্মাবমাননাকে উদ্‌ঘাটিত করতে থাকে। আমাদের দেশের লোককে বার বার জানাতে হবে যে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ" —আমরা দিব্যধামবাসী। কি করে জানাতে হবে? ত্যাগের দ্বারা। চিরন্তন

কালের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে সেই ত আনন্দের সঙ্গে বর্ত্তমানকালকে ত্যাগ করতে পারে—এবং সেই চিরন্তন কালই আত্মার অমৃতধাম। পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে অর্থসংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহুলোক এখানে ভাবের জন্যে বস্তুকে, ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ করচে যে তার সংখ্যা নেই। সেই রকম অনেক লোককে দেখ্‌চি। যতই দেখ্‌চি ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে মানুষের সেই আত্মদানের দ্বারা—ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নৈব নৈবচ। কোনো রিফর্ম বিল্ আমাদের দুঃখসমুদ্র পার করাতে পারবে না—আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না—ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর—মণ্টেগুসাহেব তাকে বাঁচাবে কি করে?

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

২৮ আগষ্ট, ১৯২০

৭

Villa Dunare

Cap Martin

Alpes Maritimes

28th Agust, 1920.

We are in a most beautiful part of France. But of what avail is the beauty of nature when you have lost your trunks which contained your dresses and underwears? I could have been with perfect sympatyy with the trees surrounding me, if, like them, I were not dependent upon tailors for maintaining my self-respect. However, the most

important event for me in this world at present is not what is happening in Poland or Ireland or Mesopotamia, but that all the trunks belonging to our party have disappeared from the goods van in their transit from Paris to this place. And therefore, though the sea is singing its hymns to the rising and the setting sun and to the starlit silence of the night, and though the forest round me is standing tiptoe on the rock like an ancient druid, raising its arms to the sky, chanting its incantation of primeval life, we have to hasten back to Paris to be restored to the respectability ministered by tailors and washermen. This is what our first parents have brought upon us. Our clothes are acting like screens dividing us from the rest of the world; and for this we have to pay—pay the bills. Do you not think that it is outrageously undignified for my humanity that standing face to face with the magnificient spirit of this naked nature I can think and speak of nothing but my wretched clothes which in three years time will be tattered into rags while these pine trees will remain standing ever fresh and clean majestically unaffected by the soiling touch of hours? But enough of this.

I suppose I told you in my last letter that I met Sylvan Levy in Paris. He is a great scholar as you know, but his heart is larger even than his intellect and his bearing. His Philosophy has not been able

to wither his soul. His mind has the translucent simplicity of greatness and his heart is overflowing with trustful generosity which will never acknowledge disillusionment. His students come to love the subject he teaches tnem because they love him. I realise clearly when I meet these great teachers that only through the medium of personality truth can be communicated to men. This fundamental principle of education we must realise in Santiniketan. We must know that only he can teach who can love. The greatest teachers of men have been lovers of men. The real teaching is a gift, it is a sacrifice, it is not a manufactured article of routine work, and because it is a living thing it is the fulfilment of knowledge for the teacher himself. Let us not insult our mission by allowing us to bocome mere school masters, the dead feeding bottles of lessons for children who need human touch lovingly associated with their mental food.

I have just received your letter and for some time I feel myself held tight in the bosom of our Ashrama. I can not tell you how I feel about prolonged separation from it which is before me, but at the same time I know that unless my relationship with the wide world of humanity grows in truth and love my relationship with the Ashrama will not be perfect. Through my life my Ashrama will send its roots into the heart of this

great world to find its sap of immortality. We who belong to Shantiniketan can not afford to be narrow in our outlook and petty in our life's mission and scope. We have seen in Tiretta Bazar thirty or more birds packed in one single cage, where they neither can sing nor soar in the sky, but make noise and peck at each other. Such a cage we build ourselves for our souls with our petty thoughts and selfish ambitions and then spend our life quarreling with each other clamouring and scrambling for small advantages. But let us bring freedom of soul in to Shantiniketan.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চপল্লব

ম্যাক্সিম্ গরকি লিখিত টলষ্টয় স্মৃতি

London Mercury

অতীতকাল ও টুর্গেনিভ সম্বন্ধে আলোচনাকালে টলষ্টয়ের বাক্যে ভাষায় আশ্চর্য্য শ্রী ফুটিয়া উঠিত। সমসাময়িক সাহিত্যিক ও লেখকদের তিনি আপন সন্তানের ন্যায় মনে করিতেন; তাহাদের দোষগুণ সবই তাঁহার জানা ছিল।

টলষ্টয় যেমন লেখকদের গুণের প্রশংসা করিতেন তেমনি তাহাদের সম্মুখেই তাহাদের দোষ-ত্রুটির জন্য তিরস্কারও করিতেন। তাঁহার এই তিরস্কার তাহাদের নিকট দরিদ্রের মুখে অন্নস্বরূপ ছিল।

ডষ্টভোস্কির কথা উঠিলেই টলষ্টয় কেমন যেন সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। এই লেখক সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলিতে চাহিতেন না, যাহা বলিতেন তাহাও অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত। ডষ্টভেস্কি সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"তাঁহার কন্‌ফিউকাস্‌ ও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত পরিচয় থাকা উচিত ছিল। তাহা হইলে তাঁহার মনের প্রচণ্ড উগ্রতা অনেক পরিমাণে দূর হইত। তাঁহার রক্তমাংসের মধ্যে যেন কেমন একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ ছিল, ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার মস্তকের শিরা উপশিরা স্ফীত হইয়া উঠিত; কর্ণমূল পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে থাকিত। তাঁহার অনুভব করিবার শক্তি অসাধারণ ছিল কিন্তু চিন্তার প্রাচুর্য্য যথেষ্ট ছিলনা। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার স্বভাব ইহুদিদের অনুরূপ ছিল; তিনি তাহাদেরই মত অকারণে

সন্দিগ্ধপরায়ণ উচ্চাভিলাষী বিষাদগ্রস্ত ও অদৃষ্টতাত্ত্বিক ছিলেন। লোকে কেন যে তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি আদরের সহিত পড়ে আমি তাহা বুঝিতে পারি না, সে-গুলি আমাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়—তাঁহার অধিকাংশ রচনাই আমার ভালো লাগে না। তাহার কারণ তার Idiots, Adolescent, Ruskolnikov-এর মধ্যে কোন বাস্তবতা নাই। ইহারা অত্যন্ত সাধারণ এবং সহজেই বোধগম্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় লোকে লিস্‌কভের (Lieskov) রচনা পড়ে না। তাহার যথার্থই লিখিবার ক্ষমতা আছে, তুমি কি তাহার বই কিছু পড়িয়াছ?"

"হাঁ। তাহার বই আমার অত্যন্ত প্রিয়, বিশেষভাবে তাহার ভাষা।"

"ভাষার উপর তাহার দখল অসাধারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার লেখা তোমার ভাল লাগে। তুমি ঠিক রাশিয়ান নও, তোমার চিন্তাও রাশিয়ান নয়। আমার কথায় তুমি অসন্তুষ্ট হইলে কি? আমি এখন বুড়া হইয়াছি, তোমাদের কালের সাহিত্য হয়তো আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমার কেমন মনে হয়, একালের সাহিত্য ঠিক রাশিয়ান নয়। এখনকার কালের কবিতা কেমন এক অদ্ভুত রকমের, আমি কিছুই বুঝিতে পারিব না। কবিতা যদি লিখিতে হয় তাহা হইলে পুষ্‌কিন্ (Pushkin) টিয়াশেভ্ (Tiulchev) ফেট্ (Fet) এই সকল কবিকে আদর্শ করা উচিত।" শেকভের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুমি রাশিয়ান, একেবারে যথার্থ খাঁটি রাশিয়ান।"

শেকভ্‌কে টলষ্টয় অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি যখন তাহার দিকে তাকাইতেন তখন তাঁহার সস্নেহ কোমল দৃষ্টি যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দিতেন। একদিনের কথা মনে আছে। আমরা তাঁহার বাড়ীতে অতিথি। শেকভ গৃহসংলগ্ন তৃণাস্তরণের উপর আলেকজেণ্ডার লভ্‌নার (Lvovna) সহিত পদ-চারণা করিতেছিলেন। টলষ্টয় তখনো পীড়িত তিনি বারান্দায় একটি আরাম কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে শেকভের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—কি চমৎকার লোক! মেয়েদের মত স্নিগ্ধ, কোমল মধুর। হাঁটাও যেন মেয়েদের মত। লোকটি বড় অসাধারণ রকমের।

টলষ্টয়ের বাড়ীতে তাঁহার চেলার দলকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। যখনই তাহাদের দেখিয়াছি তখনই আমার মনে হইয়াছে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভণ্ডতা, কাপুরুষতা, অর্থলিপ্সা দ্বারা তাহারা যেন সমস্ত বাড়ীটিকে অপবিত্র ও কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। রাশিয়ার এক রকমের দরবেশ আছে তাহারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা কুকুরের হাড়কে সাধু মহাত্মাদের দেহাবশেষ বলিয়া লোকদের প্রতারণা করে, এইরূপ আরো অনেক রকমের মিথ্যা চাতুরী দ্বারা তাহারা লোকদের ঠকায়। টলষ্টয়ের চেলারাও অনেকটা তাহাদের মত ছিল। একবার আমি তাঁহার বাড়ীতে একজন চেলাকে ডিম খাওয়াইতে পারি নাই কিন্তু তাহাকেই আমি ষ্টেশনে পরম পরিতোষের সহিত মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল—"বুড়া বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে।"

টলষ্টয় তাহার চেলাদের সম্বন্ধে যে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তাহা নয়—তিনি তাহাদের বিশেষরূপেই চিনিতেন। একবার একজন চেলা খুব উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার শিক্ষাদীক্ষায় তাহার প্রাণকে কত উন্নত পবিত্র করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতেছিল। টলষ্টয় আমার পাশেই বসিয়া ছিলেন—আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন—"হতভাগা আগাগোড়াই মিথ্যা বলিতেছে। মনে করিতেছে ইহাতে আমি খুসি হইব।"

তিনি যখন ইচ্ছা করিতেন তখন কথায় এবং আলাপে লোকজনদের সহজেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিতেন। তাঁহার আলাপশক্তি অসাধারণ ছিল। যতদূর সম্ভব তিনি সহজ সরল এবং মার্জ্জিত ভাষায় কথা বলিতেন, কিন্তু কখনো কখনো তাঁহার আলাপ আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিত। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কথা উঠিলেই তিনি বিশেষভাবে অকথ্য কদর্য্য, ভাষা প্রয়োগ করিতেন। তাহাদের উপর তাঁহার কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক আক্রোশ ও বিদ্বেষ ছিল। আমার মনে হইত স্ত্রীলোকেরা তাঁহার প্রতি কি যেন একটা অন্যায় করিয়াছে যাহা তিনি জীবনে আর ভুলিতে কিংবা ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

একবার আমরা কয়েক জনে অন্ধকারে বসিয়া মেয়েদের সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলাম, তিনি অদূরে দাঁড়াইয়া আমাদের আলাপ শুনিতেছিলেন। হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"যখন আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইব তখন আমি তাহাদের সম্বন্ধে খাঁটি সত্যকথা বলিব। আমি তার পরে শবাধারে ঢুকিয়া পড়িব এবং উপরের ডালা ফেলিয়া দিয়া বলিব—'এইবার তোমরা যা করিতে পার কর'।"

আমার কেমন মনে হইত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার তেমন অনুরাগ নাই। অনেক পরিমাণে তাহা সত্যও বটে—কিন্তু গ্রন্থকারদের জীবনসম্বন্ধে তাঁহার আশ্চর্য্য কৌতূহল ছিল। "তুমি কি জান, সে কেমন লোক? তাহার কোথায় জন্ম?" এরূপ প্রশ্ন তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনিতে পাইতাম, তাহাদের বিষয় আলাপ করিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে সে সম্বন্ধে কোন-না-কোন নূতন তথ্য জানিতে পাইতাম।

আমি কখন কি পড়ি টলষ্টয় সে সম্বন্ধে প্রায়ই খোঁজ লইতেন। আমার নির্ব্বাচিত কোনো গ্রন্থ তাঁহার মনঃপূত না হইলে তিনি আমাকে তিরস্কার করিতেন।

তিনি বলিতেন—"কাস্টমারভের (Kustomarov) অনেক নীচে গিবনের স্থান। সকলেরই মম্‌সেন (Mommsen) পড়া উচিত। অনেক সময় তাঁহার লেখা পড়া কষ্টকর বটে তবু তাহার মধ্যে অনেক শিখিবার জিনিস আছে।"

যখন শুনিলেন আমি Brothers Sanmanıo পড়িতেছি তখন টলষ্টয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বাজে নভেল। ফরাসীদের মধ্যে তিন জন মাত্র যথার্থ লেখক আছেন—Stendhal, Balzac ও Flambert। Maupassautকেও ভাল বলা যাইতে পারে কিন্তু শেকভ তাঁহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। Gancourt ভাঁড় বিশেষ। তাহার লেখাতে কোন আন্তরিকতা নাই, কেবল বাহাড়ম্বরে পূর্ণ। মানুষের সম্বন্ধে তাহার যে অভিজ্ঞতা তাহা কেবল পুঁথি হইতে সংগ্রহ করা—সে

পুঁথিও তদনুরূপ বাহ্যাড়ম্বরে পূর্ণ, সেইজন্য তাহার লেখা মানুষের মনকে স্পর্শ করেনা।

আমি এ কথার প্রতিবাদ করিলে তিনি একটু বিরক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার মতের প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। এক এক সময় তাঁহার মত ও ধারণা আমাদিগের নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত।

আমার গল্প সম্বন্ধে বলিলেন, আমার লেখার মধ্যে বেশী বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু Dead Souls এর কথা উঠিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমরা সকলেই স্বাভাবিকের উপর কারিকরি খাটাইতে ওস্তাদ। যখন আমি লিখিতে বসি তখন কাহাকেও কুৎসিত কদর্য্য করিতে গিয়া আমার নিজেরই তাহার প্রতি কেমন মায়া হইতে থাকে। তখন তাহার মধ্যে কিছু সৎগুণ আরোপ করিয়া দিই কিংবা তাহার পারিপার্শ্বিক কোন চরিত্র হইতে কিছু সৎগুণ কাড়িয়া লই। তখন তাহাকে আর অত বীভৎস কুৎসিত বলিয়া মনে হয় না।" তাহার পরেই নিষ্ঠুর বিচারকের মত কঠোর স্বরে বলিলেন—"সেই জন্যেই আমি বলি Art মিথ্যা, স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা, ইহা মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর। যথার্থ যা তা আমরা লিখিনা ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের ধারণা কি তাই আমরা লিখি। আমার চোখ দিয়া একজন তাতার কিংবা একটা বুরুজ, কিংবা সমুদ্র দেখিয়া তোমার কি লোভ?"

একবার আমি তাঁহার সহিত রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। এক-জায়গায় আসিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আমাদের দেহের উচিত প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় আমাদের আত্মাকে অনুসরণ করা, তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলা। কিন্তু আমরা কি ভাবে জীবন যাপন করি? দেহই যেন আমাদের প্রভু আর আত্মা যেন তার দাস।" হঠাৎ কি যেন তাঁহার মনে পড়িল—জোরে বুকে হাত ঘসিতে ঘসিতে বলিতে লাগিলেন—"একবার মস্কো নগরে একটি স্ত্রী-লোককে আমি নর্দ্দমায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার উত্থানশক্তি রহিত—তাহার পিঠদাঁড় নর্দ্দমায়, নীচ দিয়া যত পচা নোংরা জল

বহিয়া যাইতেছে শীতে ঠাণ্ডায় সে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে ; হাত পা এপাশে ওপাশে ছুঁড়িতেছে ; এক একবার একরকম অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে।” বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু অর্দ্ধমুদিত হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“এস, এইখানে একটু বসি……। মাতাল স্ত্রীলোক কি কুৎসিৎ কি বীভৎস দৃশ্য ! আমার ইচ্ছা হইল তাহাকে ধরিয়া তুলিতে সাহায্য করি—কিন্তু পারিলাম না। এমনি কদর্য্য তাহাকে দেখাইতেছিল ! আমার মনে হইতেছিল একবার তাহাকে স্পর্শ করিলে একমাসেও যেন আমার হাত আর পরিষ্কার হইবে না। নিকটেই রাস্তার মোড়ে একটি ছোট্ট শিশু বসিয়া ছিল—তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীলোকটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিতেছে—মা, মা, উঠ উঠ। স্ত্রীলোকটি হাত পা নাড়িতেছে, গোঁ গোঁ করিয়া অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে, একএকবার চোখ মেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই আবার কাৎ হইয়া নর্দ্দমায় পড়িয়া যাইতেছে।”

তিনি চুপ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় একবার চারিদিকে তাকাইয়া অস্ফুট অনুচ্চস্বরে বলিলেন—“কি কুৎসিৎ, কি ভয়ানক ! তুমি অনেক মাতাল স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, না ? নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কখনো লিখিওনা—কখনওনা, কখনওনা।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কেন।”

তিনি আমার দিকে তাকাইলেন, তারপর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “কেন” ? তখনি আবার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন—সেই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—“কেন, বলিতে পারি না। কথাটা হয় তো হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে……। এমন কুৎসিৎ বিষয় না লেখাই ভাল। তাই বা কেন, সকলই লিখিতে হইবে—না না কিছুই বাদ দিবে না।”

বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি রুমাল দিয়া একবার চোখ মুছিলেন। একবার আমার দিকে তাকা-

ইয়া ঈষৎ হাসিলেন। আবার তখনি তাঁহার চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি বুড়া হইয়াছি, কোন কুৎসিৎ দৃশ্যের কথা মনে আসিলেই কান্না পায়।"

ধীরে ধীরে আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—"তোমাকেও একদিন কাঁদিতে হইবে। তুমি আমা অপেক্ষা অনেক বেশী দেখিয়াছ, সহ্য করিয়াছ। কিন্তু কিছুই বাদ দিও না—সব লিখিবে। তাহা না হইলে ঐ বালকটির প্রতি অন্যায় করা হইবে, সে আমাদের তিরস্কার করিয়া বলিবে—'মিথ্যা, সব মিথ্যা', তাহার নিকট সত্য হওয়া চাই।"

তাঁহার স্বর কোমল নরম হইয়া আসিল। সস্নেহে আমাকে বলিলেন—"একটা গল্প বল। তুমি বেশ গল্প বলিতে পার। তোমার শৈশব জীবনের গল্প। আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না এক সময়ে তুমি শিশু ছিলে। তোমার মধ্যে কি যেন একটা আছে। আমার কেবলি মনে হয় এমনই বড় হইয়াই যেন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার ভাব চিন্তা এখনও অনেক পরিমাণে অপরিণত রহিয়াছে, তোমার শৈশব এখনও যেন সম্পূর্ণ ঘোচে নাই কিন্তু তবু তুমি অনেক জান---ইহার অধিক আমরা কাহারও কাছ হইতে আশা করিতে পারি না। তোমার নিজের গল্প আমার নিকট কর।"

তিনি একটা গাছের শিকড়ের উপরে বসিয়া পড়িলেন। ঘাসের উপর কতকগুলি পিঁপড়া নড়াচড়া করিতেছিল, তাহাদের মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন।

হঠাৎ যেন তিনি আমাকে তীব্র প্রশ্নবাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন—"কেন তোমার ভগবানে বিশ্বাস নাই?"

"আমি যে নাস্তিক।"

"কখনও না। তুমি কিছুতেই নাস্তিক হইতে পার না। তোমার প্রকৃতিই তেমন নয়। ভগবানের কাছ হইতে কিছুতেই তুমি দূরে যাইতে পারিবে না। একদিন তোমাকে তাঁর কাছে আসিতেই হইবে। জোর করিয়া তুমি নিজেকে

নাস্তিক বলিয়া মনে করিতেছ, কারণ তোমাকে অনেক সহিতে হইয়াছে। কিন্তু মনে ভাবিও না এই জগৎটা তোমার ইচ্ছানুসারেই চলিবে। অনেকে সঙ্কোচবশত নিজেকে নাস্তিক বলিয়া মনে করে। যাহাদের বয়স অল্প তাহাদের মধ্যেই এইরূপ দেখা যায়। তাহারা কোন স্ত্রীলোককে হয় তো ভালবাসে কিন্তু প্রকাশ করিতে চায় না—ভয়ও করে, আবার মনে করে সে হয় তো তাহার ভালবাসা বুঝিতে পারিবে না। বিশ্বাসীরও প্রেমিকের মত সাহসী নির্ভীক হওয়া চাই। একবার সাহস করিয়া বলা চাই 'আমি বিশ্বাস করি', অমনি অন্তরের দ্বিধা সঙ্কোচ সব দূর হইয়া যায়। তোমার মধ্যে ভালবাসা প্রচুর আছে। এই ভালবাসার উচ্চ আদর্শই বিশ্বাস। তোমাকে আরো ভালবাসিতে হইবে—তখন তোমার ভালবাসা বিশ্বাসে পরিণত হইবে। একজন স্ত্রীলোককে যখন ভালবাসা যায়, তখন তাহাকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়—তাহার সমকক্ষ যেন আর কেহই নয়। ইহাই বিশ্বাস। যার বিশ্বাস নাই সে ভালবাসিতে পারে না—সে আজ একজনকে কাল অন্যজনকে ভালবাসে। তাহার আত্মা ভবঘুরের মত শূন্য শুষ্ক ও নীরস। তুমি কিছুতেই এরূপ হইতে পার না—তুমি বিশ্বাসী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। মিথ্যাদ্বারা নিজেকে ভুলাইয়া রাখা তোমার পক্ষে বৃথা। তুমি সৌন্দর্য্যের দোহাই দিবে। সৌন্দর্য্য কি? ভগবান অপেক্ষা সুন্দর আর কি আছে?"

এই সব কথা পূর্ব্বে তিনি কখনো এমনভাবে আমাকে বলেন নাই। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার সম্মুখে আমি কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার মুখের দিকে একবার তাকাইলেন, যেন তাঁহার মুখে দীপ্ত উজ্জ্বল হাসি।

কেন জানিনা, এই অবিশ্বাসী আমি, ভীত সতর্কভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম। অমনি আমার অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল—এই লোকটি ভগবানেরই প্রতিচ্ছবি।"

শ্রীতেজেশচন্দ্র ঘোষ

আলেয়া

গ্রীষ্মকালের রাত্রে প্রায়ই দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি পোকা শূন্যে একবার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার পর মুহূর্ত্তে নিবিয়া যাইতেছে। গভীর রাত্রির অন্ধকারে কখন কখন ইহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাখণ্ডের মত দেখায়। গাছের পত্রাবরণের ভিতর এই প্রাণীগুলির ঈষৎ পীতাভ আলোককণাসমূহ যে কি অপরূপ দেখায় তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না।

মনে আছে, আমাদের আশ্রমের চারিদিকে ধানের ক্ষেতে ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে অনেক আলেয়া দেখা দিত। আশ্রমের পূর্ব্বদিকের প্রান্তরে রেললাইনের ওপারে শ্রাবণের গভীর রাত্রে প্রকাণ্ড একটি মশাল জ্বলিয়া উঠিত। ভূতের প্রত্যাশায় আমরা ২।১ জন কত রাত্রি সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজও সে কথা মনে পড়ে।

লাল দিয়াশালাই হাতে ঘসিয়া অন্ধকারে ধরিলে হাত জ্বল-জ্বল করিতে থাকে —এইরূপ আলোক বিকীর্ণ করাকে আমরা "ফসফোরেন্স" (Phosphoresence) বলিয়া জানি। জোনাকি প্রভৃতির আলোক এই জাতীয়। জোনাকির আলোর কি দরকার, সে সম্বন্ধে নানাজনের নানামত। কেহ বলেন এই আলোর সাহায্যে, ইহারা ছোট ছোট পোকা ধরিয়া খায়,—কাহারও মতে ইহা নিশাচর পক্ষীদের আগুণের ভয় দেখায় এবং তাহাতে জোনাকিদের আত্মরক্ষার সাহায্য হয়।

আলেয়া সম্বন্ধে কত দেশে মানুষ কত রকম যে জল্পনা কল্পনা করিয়াছে, তাঁহা বলা যায় না। ইংলণ্ডে ইহার নাম "উইল দি উইপ্স অথবা জ্যাক-ও ল্যানটার্ণ ইহাদের সম্বন্ধে অনেক ভয়াবহ গল্প প্রচলিত ছিল। অল্প দিন মাত্র বিজ্ঞানের প্রসাদে এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভয় ভাঙ্গিয়াছে। কতবার শোনা গিয়াছে, পথ হারাইয়া, এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে কত পথিক সন্ত্রস্ত হইয়া দেখিয়াছে

রাত্রি আসিয়া পড়িল—গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া আর কিছুই দেখা যায় না। এমন সময় হঠাৎ দূরে আলোক দেখা দিল, পথিক পুলকিত হইয়া ভাবিল যে লোকটি আলোক লইয়া যাইতেছে তাহার সাহায্যে রাস্তা চিনিয়া লইতে পারিবে। আনন্দে চীৎকার করিয়া সে বেগে আলোক লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া চলিল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সব কোথায় অন্তর্হিত হইল, কোথাও কিছু থাকিল না। সে বিস্মিত হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে দেখে, আলোক তাহার পার্শ্বেই জ্বলিতেছে, সম্মুখে নহে। ভ্যাবাচাকা খাইয়া সে বেচারা আবার সেই দিকে দৌড়াইয়া যায়, এবং আবার প্রতারিত হয়, কেন না আলোক প্রতিবারেই নূতন নূতন দিকে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। এইরূপ ছুটাছুটী করিতে করিতে হয় ভোর হইয়া যায়, না হয় সে বেচারি জলার মধ্যে চোরা পাঁকের কবলিত হয়। এই পাঁকের মধ্যে একবার পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার হইবার আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না

আয়র্ল্যাণ্ডে আলেয়া নাকি প্রায়ই দেখা যায়। সেখানকার সাধারণ লোকেরা মনে করে, এ আলোকগুলি ছোট ছোট পরী; পথহারা পথিকদিগকে ভুলাইয়া জলা ভূমিতে লইয়া যাওয়াই ইহাদের খেলা। এই দুর্ভাগারা পঙ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে যখন ডুবিতে থাকে তখন নাকি ইহাদিগকে ঘিরিয়া পরীরা উল্লাসে নৃত্য করে। অবশেষে হুস্ করিয়া হতভাগ্য পথিক যখন ডুবিয়া যায়, তখন তাহারা ছোট ছোট ধূম-বৃত্তের আকারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে।

"Living Age" নামক মাসিক পত্রে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে J. Barnard James নামক জনৈক লেখক, এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'বেন, মা-চ্রি' নামক নাতি উচ্চ পর্ব্বতের কাছে আয়র্লণ্ডের কোনও গ্রামে তখন তিনি বাস করিতেছিলেন। এই পর্ব্বতটির নামের অর্থ—"আমার হৃদয়ানন্দ"—ইহার চূড়া হইতে চতুষ্পার্শ্বের, বিশেষতঃ কার্লিংফর্ড হ্রদ ও সমুদ্রের উপকূলগুলির দৃশ্য বড় চমৎকার দেখায়। সমস্ত দিন এখানকার অপরূপ দৃশ্য

এবং প্রাণমন-উন্মাদক পার্ব্বত্য বায়ুর মধ্যে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যায় তিনি শিখর হইতে নিম্নে নামিয়া আসিতেছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল ইতস্তত ঝুলিতেছিল। তাহাদের অবকাশ-পথে যে ক্ষীণ পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া নীচের দিকে নামিয়াছে তাহার মাটি অত্যন্ত কোমল এবং আগাছায় আচ্ছন্ন বলিয়া দেখিয়া-শুনিয়া সতর্কভাবে তাঁহাকে পা ফেলিতে হইতেছিল। অর্দ্ধেক পথ এইভাবে অতিক্রম করিয়া তিনি দেখিলেন, সম্মুখে পথরোধ করিয়া সুবৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর। সেটিকে ছাড়াইয়া যাইবার জন্য তিনি পাশ কাটাইয়া অন্যদিকে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার বামপার্শ্বে আন্দাজ ত্রিশগজ দূরে একজন কেহ নাড়িতেছে। আর একটু কাছে আসিলে তিনি ঠাহর করিয়া দেখিলেন, লোকটি খর্ব্বকায় বৃদ্ধ, সাড়ে পাঁচ ফুটও উচ্চ হইবে না,—তাহার পরিধানে সে দেশের সাধারণ চাষার কাপড়, সে কাঠের বোঝা এবং একটি লণ্ঠন লইয়া চলিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"তাহাকে দেখিয়া সেখানকার বনরক্ষক বলিয়া মনে না হওয়ায় আমি ভাবিলাম হয়ত সে ব্যক্তি বাহিরের লোক, লুকাইয়া শীকারের চেষ্টায় ফিরিতেছে। সে কে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময় সম্মুখে পাথরের এক সুবৃহৎ স্তূপ, আমাকে বাধা দিল। একটু ঘুরিয়া সেটিকে উত্তীর্ণ হইতে গিয়া দেখি, কেহ কোথাও নাই!—বৃদ্ধকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।

"ব্যাপারটা আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম—ঘটনাটিতে খুব বিস্ময়জনক কিছু আছে তাহা মনে করিবারও হেতু ছিল না। সেদিন রাত্রে আহারের সময় টেবিলে কি একটা কথা উপলক্ষ্যে আমার পর্ব্বত হইতে অবতরণের কথা আসিয়া পড়িল। সেই বৃদ্ধের কথা বলিতে আরম্ভ করিবা মাত্র দেখি সকলে একেবারে স্তব্ধ এবং গম্ভীর হইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতেছেন।—আমি কথার মাঝখানে একবার একটু থামিতেই গৃহস্বামিনী রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

"আচ্ছা বলুন ত—সে বৃদ্ধটির হাতে কি কিছু ছিল?" আমি বলিলাম,

"হাঁ একটা লণ্ঠন ও জ্বালানি কাঠের একটা বোঝা!" সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিলেন "ওঃ আপনি আমাদের পাহাড়ের ছোট জনি কে দেখিয়াছেন!" মানুষ নহে—সে ভূতবিশেষ, যাহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে চায় না, তাহাদের সে বৃদ্ধের রূপে দেখা দেয়। "বেন-মা-ট্রি" অন্তঃস্থলে তাহার বাস—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেই সে তাহার বাতিটি জ্বালাইয়া বাহির হয়, তাহার পর সে সমস্ত রাত্রি পাহাড়ের নীচে জলা জমিতে নানারূপ রঙ্গ করিয়া বেড়ায়। এদেশের লোকের এই বৃদ্ধের প্রতি অটল বিশ্বাস—কিছুতেই কাহারও মনে তাহার সম্বন্ধে দ্বিধা আনিতে পারিলাম না।"

লেখক এই "পর্ব্বতবাসী জনির" কথা কাহারও কাছে পূর্ব্বে শোনেন নাই; শুনিলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কল্পনার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, এরূপ কিছু ভাবিবার অবকাশ থাকিত। 'জনি' ভূত কি প্রেত তাত্ত্বিকগণের তাহা আলোচ্য—তবে ইহা যে আলেয়ারই রূপবিশেষ তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আলেয়ার সঙ্গে ভূতপ্রেত জড়াইয়া মানুষ যে অনেক মিথ্যা কুসংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে ইহার দ্বারা প্রতারিত হইয়া অনেকে বিষম বিপন্ন হইয়াছেন এমন কি ইহার জন্য অনেককে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে হইয়াছে। মিঃ বার্ণাড জেমস্ একবার আর্জ্জেনটাইন রিপাবলিকের 'পরণা' নদীর তীরে কোনও জলাভূমির ভিতর দিয়া এক বন্ধুর সহিত যাইতে যাইতে দেখিলেন একস্থানে ক্রমাগত বুদ্বুদ উঠিতেছে। দেখিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইল, সেখানে কোনও আলেয়ার জন্ম হইতেছে। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটি দিয়াশলাই সেই বুদ্বুদের উপর ধরিতেই তাহা একটু শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, দিবালোকে ও তাহার উজ্জ্বলতা ঢাকা পড়িল না। অনেকবার তিনি এই পরীক্ষা করিলেন, প্রত্যেকবারই বুদ্বুদের গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এই জলাভূমির মধ্যে লতাপাতা পচিয়া প্রজ্জ্বলনশীল গ্যাস বিশেষের

যে সৃষ্টি করিতেছে সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না, কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন এ গ্যাস জ্বালাইয়া দিয়া যায় কে ?

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহারা তিন চারিজন আর এক স্থান হইতে রাত্রিকালে যাত্রা করিয়াছিলেন, পথে এক প্রকাণ্ড জলাভূমি উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া একজন পথপ্রদর্শকেরও সাহায্য লইতে হইয়াছিল। জলাভূমির সে পথ অত্যন্ত বিপদ জনক, বহুবার তাঁহাদের অশ্বেরা হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতেছিল। তাহার পর পা উঠাইতেই হঠাৎ অগ্নিশিখা দেখা দিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পটকা ফাটিয়া যাইবার মত একটা শব্দ এবং উজ্জ্বল আলোক সোয়ার এবং অশ্বগণকে চকিত করিয়া দিতেছিল। এইরূপ একবার অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিবার পরই তাঁহারা পচা মাছের তীব্র গন্ধ পাইতেছিলেন। সেই স্তব্ধ জনহীন বিশাল জলাভূমিতে অগ্নির এই আবির্ভাবের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা ভীষণতা ছিল। কিন্তু এই ঘটনায় আলেয়া সম্বন্ধে রহস্য অকস্মাৎ তাঁহাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।

পচনশীল উদ্ভিদ প্রভৃতি হইতে জলাভূমিতে যে গ্যাস উঠে, রাসায়নিকের কাছে তাহা মিথেন (Methane) নামে পরিচিত। একবার জ্বলিলে ইহা চতুর্দ্দিকে ঈষৎ পীতাভ উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকে। কিন্তু খুব প্রজ্জ্বলনশীল হইলেও বাহিরের অগ্নিসংস্পর্শ ব্যতীত আপনা আপনি ইহা কখনও জ্বলিয়া উঠে না। মৃত মাছ ও পশুপক্ষীর শরীর জলাভূমির কাদার মধ্যে প্রায়ই যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। পচনশীল জীবশরীর এবং অস্থি হইতে যে ফস-ফারস মিশ্রিত হাইড্রোজেন গ্যাসের (Phosphuretted Hydrogen) উদ্ভব হয়, তাহা উপরে উঠিয়া বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই ছোট ছোট ধূমময় বৃত্তাকারে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। মিথেন গ্যাস বায়ু অপেক্ষা ভারি। নিস্তব্ধ রাত্রে যখন বাতাসের বেগ থাকে না তখন জলের উপর স্তরে স্তরে ইহা বহু পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ফসফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস সশব্দে ফাটিয়া গিয়া যখন এই মিথেন গ্যাস আসিয়া লাগে তখন যে ঈষৎ পীতাভ উজ্জ্বল আলোকের সৃষ্টি হয়, দূর হইতে

দেখিলে মানুষের মন প্রবলভাবে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাই আলেয়া।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

বিশ্ববৃত্তান্ত

যুবজনখৃষ্টীয়সমিতি (Y. M. C. A.) কিছুকাল পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া গ্রামের শিক্ষার অবস্থা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের এই বে-সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা গ্রামে নূতন ধরণের মধ্য-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে মাইনর স্কুল দুইশ্রেণীর আছে, কতকগুলিতে কেবল মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, এ গুলিকে প্রাথমিক পাঠশালারই উচ্চ সংস্করণ বলিলেই চলে; আর কতকগুলিতে কিছু কিছু ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয় সমস্ত বাঙালী পাঠকেরই পরিচিত। সেখানে যে-শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ছাত্রদের জীবনে কোনো কাজে লাগে কিনা তাহা ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

কমিশন বলেন যে, সাধারণত লোকে খৃষ্টানী শিক্ষায় নাক সিঁটকাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন এই যে, লোকে আর্থিক উন্নতির জন্য খৃষ্টান হয় একথা গোপন করিবার কোনো প্রয়োজন নাই এবং সেই জন্যই তাঁহারা মনে করেন শিক্ষা যাহাতে কার্য্যকরী হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে লোকে যে খৃষ্টানী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিতেছে তাহার কারণ এই যে

লোকে এইরূপ শিক্ষা চায়। পাঠকেরা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে খৃষ্টানদের প্রচারের ফলে গ্রামকে-গ্রাম খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সব স্থানের লোকের অধিকাংশই অস্পৃশ্য পারিহা, নমশূদ্র, সাঁওতাল, কোল ইত্যাদি। খৃষ্টান পাদরীরা দেখিতেছেন যে দীক্ষিত খৃষ্টানদিগকে কেবল ছোট দুই চার খানি ছাপা পুঁথি পড়াইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল না। ভারতের নানা শিল্পকেন্দ্রে শ্রমজীবীর প্রয়োজন। গ্রামের কাঁচামালের সদ্ব্যবহার ও কুটীর-শিল্পের উন্নতির প্রয়োজন। সেইজন্য উক্ত কমিশন মাইনর স্কুলে পুঁথিগত বিদ্যার সহিত হাতে-কলমে শিল্প দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। যেখানে স্কুল খুলিবার মতো খৃষ্টান ছাত্রদের সংখ্যা পাওয়া যাইবে সেইখানেই এই শ্রেণীর স্কুল খুলিতে হইবে; সকল জায়গাতেই মাতৃভাষা প্রধান শিক্ষনীয় হইবে। এবং সব শ্রেণীতেই শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষার ন্যায় শিখানো হইবে; সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলা নয়, ইংরাজী পড়িয়া বুঝিবার শক্তি লাভ মাত্র। সমাজের সেবা কিরূপে করা যায় তাহাই পুঁথি-বিদ্যার বিষয় হইবে।

দেশের নানাস্থানে নানা জাতীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। সেইজন্য স্থানভেদে শিল্প শিক্ষা পৃথক-পৃথক হইবে। একটা কোনো বাঁধা পাঠ্য সমগ্র ভারতের জন্য হইতে পারে না। স্থানীয় প্রাচীন শিল্পকলার উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, স্থানীয় লোকদের কোন দিকে ঝোঁক তাহা দেখিয়া, শিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। কমিশন দেখিয়াছেন শিল্প-শিক্ষার যে সকল স্কুল নানা বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেইগুলিই সব চেয়ে ভাল; অর্থাৎ একটি শিল্পের সহিত যে খানে আরও অনেকগুলি শিল্প পাশাপাশি আপনা হইতে গড়িয়া উঠে, সেই খানেই কার্য্য সুচারু রূপে চলে। যেমন কৃষির পাশাপাশি কামারের কাজ, ছুতারের কাজ; বয়ন শিল্পের পাশাপাশি সুতাকাটা, রংছোপানো প্রভৃতি কাজ স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

এই কমিশন খৃষ্টীয় সমাজকে অনতিবিলম্বেই এই কার্য্যে নামিবার জন্য

অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা আমাদের চারিপাশের প্রতিবেশীর জন্য কি করি-তেছি চিন্তা করিব কি ?

মার্কিন রাজ্যের শিক্ষিত ও রাজনীতিজ্ঞ-গণ আমেরিকায় শিক্ষা সম্বন্ধে খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, গ্রামের ২১ হইতে ৩১ বৎসর বয়সের লোকের মধ্যে শতকরা ২৫ জন নিরক্ষর। এ ছাড়া প্রায় ৫০ লক্ষ মার্কিন ইংরাজী ভাষা বলিতে বা বুঝিতে পারে না। এই সব উদাহরণ দেখিয়া সকলেই খুব ব্যাকুল হইয়াছেন। আজকাল এমন একখানিও মার্কিন কাগজ চোখে পড়ে নাই যাহাতে এইসব বিষয়ের তীব্র সমালোচনা না হইতেছে। আমাদের দেশের বর্ণজ্ঞানহীন লোকের সংখ্যা শতকরা ৯০ জন, কিন্তু তেমন করিয়া, দেশব্যাপী আলোচনা ত দেখা যায় না।

মার্কিন দেশের নেতারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবল অর্থ ঢালিলেই বিদ্যা বাড়ে না, তাহার ভিতর প্রাণ থাকা চাই, প্রতিপলকে সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চাই ; সেইজন্য পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমানে মার্কিন সরকার নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন।

(১)স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি প্রথমে পড়িয়াছে। ইহার কারণ যুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ২১ বইতে ৩১ বৎসরের যুবকদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধের অনুপযুক্ত। যদি যথাসময়ে তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িত তবে তাহারা এমন অকর্ম্মণ্য হইত না। এমন কি যাহারা সৈন্য বিভাগে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই কঠিন শ্রম বিমুখ। স্বাস্থ্য, শক্তি, কঠোর-শ্রমসহিষ্ণুতা, ও শরীর চেষ্টার সংযম কেবল যে, যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তাহা নহে, প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে ও সুখে বাস করিবারও জন্য ইহাদের প্রয়োজন আছে। মার্কিন সরকার স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বার্ষিক সাড়ে ৬ কোটি টাকা ব্যয় করিবার জন্য এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন।

(২) যোগ্য নাগরিক করিবার জন্য শিক্ষাদান রাষ্ট্রেরই কর্ত্তব্য। দেশের রাজনীতি, শাসননীতি, ও অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা রাষ্ট্রের সমূহ অকল্যাণের কারণ। মার্কিন দেশের শিক্ষা, বাণিজ্য, অর্থ, সমস্তই সকল দিক দিয়া পৃথিবীর শীর্ষস্থানে উঠিতেছে, এই সময়ে লোকে তাহাদের দায়িত্ব বুঝিতে চেষ্টা না করিলে এই অর্থ তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে; এই মূঢ়তাই তাহাদের রাষ্টনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবে। সেইজন্য civic বা নাগরিক-নীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ছাত্রদের সৌখীন অধ্যয়নের বিষয় না করিয়া সেগুলিকে তাহাদের প্রতিদিনের জীবনের সহিত অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা হইতেছে। স্কুলেও এইসব বিষয় শিক্ষা দিবার কথা হইতেছে।

আমাদের দেশে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ইতিহাস পড়িবার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই কম। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর গুণে অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া citizen হইতে পারেন, অথচ ভারতশাসন কেমন করিয়া হয় তাহার একবর্ণও তাঁহার জানিবার কোন সুবিধা নাও হইতে পারে। ভারতের নূতন জাগরণের সময়ে বিদ্যালয়ে, কলেজে ছাত্রেরা যাহাতে civics ও অর্থনীতি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জানিতে পারে তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন; নতুবা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার জন্য যোগ্যতা ও জ্ঞান কেমন করিয়া জন্মিবে ?

(৩) মার্কিন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কত অধিক। কিন্তু সেখানকার লোকেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ, একথা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলিতেছেন, ইহার চেয়েও বড় কথা পেট চালাবার মতো বিদ্যাদান। সেইজন্য তাঁহারা শিল্পবিদ্যালয় খোলার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অনুভব করিয়া শাসনবিভাগকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

গ্রামে ও সহরে শিক্ষার সমস্যা শিক্ষাপ্রচারকদিগের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। Equal opportunity for all our children in country and town

—'গ্রামে বা সহরে,আমাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ চাই'—এই দাবি ক্রমেই স্পষ্টতর শোনা যাইতেছে।

আমাদের দেশের উচ্চ-শিক্ষার প্রসার দেখিয়া যেমন কেহ কেহ অহিত আশঙ্কা করিয়া শিহরিয়া উঠেন, মার্কিন দেশেও সেইরূপ লোক আছে কি না জানি না, তবে গত বিশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের দেশে উচ্চবিদ্যালয় ও ছাত্র-সংখ্যা যেরূপ ভাবে বাড়িয়াছে তাহা "ভয়াবহ", অর্থাৎ বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল বর্ত্তমানে তাহার পাঁচগুণ বিদ্যার্থী বাড়িয়াছে। মার্কিন দেশের শিক্ষা পরিচালক মনে করেন উচ্চশিক্ষাদানের সুযোগ প্রত্যেক ছাত্রকে দিতে হইবে। "We are now coming to feel that in soms way we must provide for universal high school education, for systematic instruction and training through the years of early and middle adopscence. এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা মার্কিন-স্কুলগুলিকে পুনর্গঠন করিতেছেন। ছাত্রেরা প্রথম ছয় বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, দ্বিতীয় তিন বৎসর জুনিয়ার উচ্চ-বিদ্যালয়ে, এবং তৃতীয় তিন বৎসর সিনেটের উচ্চবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে।

(৬) আমেরিকার দশকোটি লোকের জন্য প্রায় ৬০০ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও টেক্‌নিক্যাল্ কলেজ আছে। আর সমগ্র ভারতে ১৪০টির অধিক কলেজ নাই!

বিলাতের শিক্ষার জন্য ব্যয় খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের পরিচালক মিঃ ফিশারকে সেইজন্য অনেক অপ্রিয় সমালোচনা শুনিতে হইতেছে; কিন্তু তিনি সে-সব শুনিয়া দমিবার মতো লোক নহেন। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষাবিস্তারের দিকে ঝোঁক থাকিলেও তাঁহাকে বাহিরের এত কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, তিনি শিক্ষার দিকে নজর দিতে পারেন না। অথচ শিক্ষা-বিস্তার ছাড়া ইংরাজ-জাতির উদ্ধার নাই একথা সকলেই বুঝিতেছেন। শ্রমজীবীরা ক্রমেই শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে অত্যন্ত

সজাগ হইয়া উঠিতেছে। বিলাতে শিক্ষার ব্যয় কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—১৯১৩-১৪সালে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৩কোটি ৭লক্ষ ৭৫হাজার পাউণ্ড, ইহার মধ্যে সরকারী দান ছিল ১কোটি ৪৩লক্ষ, ৮০হাজার পাউণ্ড। ১৯২০-২১সালে ব্যয় অনুমান ৭কোটি ৭৩লক্ষ ৭১হাজার পাউণ্ড হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪কোটি ৫৭লক্ষ ৫৫হাজার পাউণ্ড সরকার দান করিবেন। চারিদিকে শিক্ষা-সেস্ খুব বাড়িয়াছে; এবং এ লইয়া আন্দোলনও হইতেছে।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পর অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা নানা বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডে উপস্থিত হইতেছেন। ইঁহাদের থাকিবার স্থানের খুবই অসুবিধা হইতেছিল। বিদ্যালয়ে প্রবেশ লইয়াও তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। ভারতের অধিকাংশ ছাত্রী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইতেছেন। এই সকল বিদ্যার্থিনীর যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেইজন্য সেখানকার প্রবাসিনী ভারত-বাসীনীরা ও কয় জন ইংরাজ মহিলা একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। ভারত-সচিব তাঁহাদিগকে এক হাজার পর্য্যন্ত বিনা সুদে ধার দিয়া আটজন চিকিৎসা-শিক্ষার্থিনী ছাত্রীর উপযোগী হোষ্টেল ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

—— o ——

বৈচিত্র্য

মানুষ বড় অভিমানী। সে অভিমানের বশে নিজেরও ভাল-মন্দের দিকে তাকাইতে পারে না, অথবা তাকাইলেও তদনুরূপ কাজ করিতে পারে না। সে সুস্পষ্ট দেখিতে পায়, কোনো একটা কাজ নিজে সে করিতে পারে না, ঐ কাজ করার শক্তি বস্তুত তাহার নাই; এ অবস্থায় যদি অন্য কেহ আসিয়া তাহা করিয়া দেয়, অথবা সর্ব্বাংশে ভাল করিয়াও যদি কেহ তাহা করিয়া দেয়, তবুও সে তাহাতে সন্তুষ্ট তো হয়ই না, বরং তাহা সহ্যই করিতে পারে না। তাহার অভিমানে আঘাত লাগে, সে ভাবে 'আমি করিতে পারি না, অন্যে করিয়া দিবে!' কিন্তু সে যে সত্য-সত্যই করিতে পারে না, তাহা করিবার শক্তিই যে তাহার নাই, সে ইহা ভাবে না। এরূপ অভিমানে লাভ কি?

*

* *

দেশের সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য মানুষ কখন্ কোথায় ভৌগোলিক রেখা টানে তাহার কিছু ঠিক নাই; আজ সে যেখানে রেখাপাত করিল, দেখা যাইবে, পরদিন আর একখানে তাহা করিয়াছে। আর ঐই রেখারই উপর নির্ভর করিয়া মানুষ স্বদেশ-বিদেশ ঠিক করিয়া লয়। ঐ সীমা রেখাটি যেমন চঞ্চল বা অস্থায়ী, স্বদেশ-বিদেশের কল্পনাও ইহার নিকট তেমনি অস্থায়ী। তাই সে আজ যাহাকে নিজের স্বদেশী ভাবিয়া তাহার সুখ-দুঃখের কথা অনুকূল চিন্তা করিত, সীমারেখাটা একটু সরাইয়া দিলে তখনই তাহার প্রতিকূল চিন্তা

করিতে তাহার কোনো বাধা ঠেকে না। স্বদেশের অন্ধ অভিমানে লোক কত অন্যায় করে, বলিয়া শেষ করা যায় না। যে সব কাজ কখনো কোনো মানুষের চিন্তাও করা উচিত নহে, স্বদেশাভিমানী তাহাও করিয়া কত গৌরবই না অনুভব করে। স্বদেশের অভিমানে মনুষ মানুষকে দেখিতে পায় না, এবং এইরূপেই সে অবশেষে নিজের মৃত্যুকে নিজেই নিকটে ডাকিয়া আনে।

*
* *

আজ যাহা স্বদেশ কাল তাহা বিদেশ হইতে পারে, আবার বিদেশও স্বদেশ হইতে পারে। তাই মানুষের যে প্রেম এইরূপ স্বদেশ-বিদেশ-কল্পনার উপর নির্ভর করে, তাহা কখনই নিবিড় ও অনাবিল হয় না। মানুষকে মানুষ বলিয়াই ভাল বাসিতে হইবে, তা সে যে-কোনো ভৌগোলিক সীমারই মধ্যে থাকুক না। যতক্ষণ এইভাবে তাহার সহিত প্রেম-ভালবাসা না হয়, ততক্ষণ যতই না কেন তাহার সহিত মিলন হউক, যতই না কেন তাহার সহিত আত্মীয়তা করা যাউক, বা আহার-বিহার শয়ন-ভোজন ইত্যাদি সমস্ত কার্যেই ঐক্য দেখান হউক, মিলনটি সত্য অনাবিল ও নিবিড় হয় না। তাই সে যদি কখনো কোনো অনভিমত কাজ অনিচ্ছাতেও করিয়া ফেলে তবে তখন তাহার উপর এই ভাবিয়া ক্রোধ বা অসন্তোষ হয় না যে, ঐ কাজটা খা রা প হইয়াছে, কিন্তু ইহাই মনে হয় যে, ঐ বি দে শী লোকটা কাজটা খারাপ করিয়াছে। যতদিন এই ভাবটি দূর না হয়, বস্তুত আন্তর মিলন না হয়, স্বদেশ-বিদেশের ব্যর্থ অভিমান লীন হইয়া না যায়, ততদিন বিদেশী লোকের সহিত এক যোগে কাজ না করাই ভাল।

*
* *

যিনি মহান্, যিনি মহাত্মা, যিনি যথার্থ কর্ম্মী তাঁহাকে কত দুঃখ, কত অবজ্ঞা, কত অপমান, কত বা তিরস্কারই সহ্য করিতে হয়; কিন্তু ধন্য তাঁহার শক্তি, অদ্ভুত তাঁহার ধৈর্য্য, যাহা অন্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অসহনীয়, তাহাই তিনি

অবলীলায় অম্লানবদনে সহিয়া চলিয়া যান। বিস্ময়ের বিষয়, উপযুক্ত প্রতীকারের সমর্থ হইলেও তিনি তাহা না করিয়া মৌনাবলম্বনে অবিকৃতচিত্তে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া চলেন। এই জন্যেই তো তিনি মহান্। নমস্কার তাঁহার চরণকমলে! তাঁহারাই যে জগতের গুরু!

*
*

অজ্ঞ বিজ্ঞের সহিত বিরোধ করে। সে নিজের শারীরিক বল প্রয়োগ করিয়া তাহার এটা ওটা সেটা যা কিছু পায় কাড়িয়া লইয়া মনে মনে নিজেকে বিজয়ী ভাবে, অহঙ্কারে উঁচু হইয়া উঠে, বিজ্ঞকে সে কতই না করুণার পাত্র বলিয়া মনে করে; কিন্তু সে বুঝিতে পারে না, সে নিজে কত পরাজয় প্রাপ্ত হয়, কত নীচে নামিয়া পড়ে, এবং নিজেই সে কত করুণার পাত্র হয়। আত্মার বলের সহিত শরীরের বলের কি বিন্দুমাত্রও তুলনা হয়? সমুদ্রের সহিত গোষ্পদের, অমৃতের সহিত বিষের তুলনা! অজ্ঞ সাম্রাজ্যেও যে সুখ না পায়, বিজ্ঞ যে অরণ্যেও তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ও নির্ম্মল সুখ পাইয়া থাকে।

* *

দিক্ যদি ঠিক থাকে তবে সমুদ্রযাত্রী নাবিক নিজের লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা ঠিক না থাকিলে কখনো এদিকে কখনো ওদিকে কখনো বা আর একদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ফিরিয়া-ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে; শেষে বিনাশ উপস্থিত হয়। সাধারণ মানুষ একথা ভাবে না, এ অনুসারে কাজ করে না, তাই তার সুখ হয় না, দুখ বাড়িয়া উঠে। আহারে তাহার তৃপ্তি হয় না, বিহারে তাহার আনন্দ হয় না। কিরূপে হইবে? আহারের লক্ষ্য যে, তাহার জানা নাই, লক্ষ্যের অনুকূলরূপে যে সে চলে না, সে যে কেবল ছুটাছুটিটাকেই কর্ত্তব্য মনে করিয়া বসিয়াছে; কিন্তু লোকে যেটাকে যা মনে করে তাহাই তো তা সব সময়ে বস্তুত হয় না।

*
* *

একরকম মানুষ আছে যে দেখিয়া-শুনিয়া শিখে। আর এক রকম মানুষ—দেখিয়াও শিখে না শুনিয়াও শিখে না, শিখে সে ঠেকিয়া। আবার আরো একরকম মানুষ আছে যে একবার নয়, দুইবার নয়, বার-বার ঠেকিয়াও শিখিতে চায় না। ইহার সম্বন্ধে কিছু করিবার নাই। ইহার যদি দুর্গতি না হয় তো হইবে কাহার ?

* * *

গরীবের কথা নাকি বাসি হইলে ফলে। তা যাই হউক, যখন ইহা ফলেই তখন তো আর তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছু থাকে না ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তখনো লোকে তাহা মানিতে চাহে না। তা লোকে না-হয় না-ই মানিল কথাটা যে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এখন সে মানে ভাল না মানে ভাল ; কিন্তু একদিন না-একদিন ফলটা আসিয়া, সে ইচ্ছা না করিলেও, তাহাকে মানাইবেই। আগুনকে আগুন বলিয়া না মানিলে সে ছাড়ে কৈ ? তাহাতে হাত দিলে সে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া যেরূপে হউক নিজের স্বরূপকে মানাইয়া লইবেই

* * *

ইস্কুল বল, কলেজ বল, টোল বা মাদ্রাসা বল, গুরুকুল বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বল, এইরূপ অন্য যা খুসী বল, তোমার শিক্ষালয়ের যে কোনো নাম তুমি দিতে পার, যে-কোনো বিষয় সেখানে শিখাইতে পার, যে কোনোরূপে তাহা চালাইতে পার, কোনো আপত্তি নাই ; কিন্তু একটা কথা সকলের উপরে মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার্থীকে তোমার সমগ্র শিক্ষা প্রদান করিয়া কোন্ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাও ; ধরা যা'ক, সে যদি বনী-সন্ন্যাসী না হইয়া গৃহী হইয়া থাকিতে চায় তবে তাহার সম্মুখে জীবনযাত্রার কোন্ প্রণালী ধরিয়া দিবে, কিরূপ হইবার জন্য তাহাকে তুমি অভ্যাস করাইবে, এক কথায় তোমার ছাত্র কিরূপ হইয়া বাহির হইবে।

* * *

একই কথায় ইহার উত্তর দিতে পারা যায়, এবং আচার্য্যেরা বহু-বহু পূর্ব্বে ইহা দিয়াছেন। সে এরূপ হইবে যাহাতে সে লোকের উদ্বেগের কারণ না হয়, এবং সে নিজেও যেন লোকের সহিত থাকিতে উদ্বেগ প্রাপ্ত না হয়। এই মূল সূত্রটি অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। আর সর্ব্বদাই ইহা সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা চাই, বাঁচিতে হইবে সত্য, কিন্তু অন্যকে বাঁচিতে দিতে হইবে ইহাও ঠিক তেমনি সত্য। ইহাই যদি না হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তাহা আসুরী শিক্ষা, দৈবী শিক্ষা নহে। আমরা যে চাই দৈবী শিক্ষা, আসুরী শিক্ষা তো নহে। এই বিংশ শতাব্দীর তুমুল যুদ্ধের আদি-মধ্য-অবসান আসুরী শিক্ষার চরম পরিণতিকে জগতের চোখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে। ইহাতেও যদি চোখ না ফুটে তবে কিসে ফুটিবে বলা যায় না।

*

* *

তবে উপায়? উপায়? প্রথমত অহিংসা, সার্ব্বভৌম অহিংসা। জাতি, দেশ, কাল, বা প্রয়োজনবিশেষ, ইহাদের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বতো-ভাবে প্রাণিবধ বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা যেমন মানবের সম্বন্ধে, তেমনি যতদূর সম্ভব হয় অন্য জীবেরও সম্বন্ধে। মানুষের মনে হয় 'ভাল, এই জাতিকে বধ করিব না, বা অমুক জীবকে বধ করিব না, কিন্তু অন্য, জাতিকে অন্য জীবকে বধ করিব; অথবা এই দেশের লোককে বধ করিব না, কিন্তু অপর দেশের লোককে বধ করিব; কিংবা এই স্থানে বধ করিব না অন্যস্থানে করিব; আচ্ছা, এখন আমি বধ করিব না, কালান্তরে বধ করিব; অথবা এই প্রয়োজনটা উপস্থিত হইয়াছে তাই এখন বধ করি, অন্য সময় আর করিব না; সে এইরূপ ভাবিয়া তদনুরূপই কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ করিলে হইবে না, সার্ব্বভৌম অহিংসা চাই। ছাত্রকে এই সার্ব্বভৌম অহিংসা ব্রত গ্রহণ করিয়া

অস্খলিতভাবে তাহা পালন করিতে হইবে, এবং এইরূপেই অহিংসক হইয়া তাহাকে নিজে বাঁচিতে হইবে, এবং অন্যকেও বাঁচিতে দিতে হইবে।

*
* *

তাহার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য সত্যনিষ্ঠ হওয়া। সে যেমন যাহা দেখিবে-শুনিবে, যেমন যাহা জানিবে-বুঝিবে, ঠিক তাহা তেমনি বাক্যে প্রকাশ করিবে। সে দেখিবে-শুনিবে এক, জানিবে-বুঝিবে এক, আর প্রকাশ করিবে আর এক, ককৃখনো তাহা হইতে পারিবে না। সে নির্ভীক হইয়া মনের সহিত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে। সে যেন ককৃখনো এরূপ না ভাবে যে, বিশেষ কোনো জাতির সম্বন্ধে, বিশেষ কোনো দেশের সম্বন্ধে, বিশেষ কোনো কালে, বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অসত্য বলিয়া লইবে। তাহাকে সার্ব্বভৌম সত্য অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলেই সে নিজেও বাঁচিবে আর অন্যকেও বাঁচিতে দিতে পারিবে।

*
* *

তৃতীয় কর্ত্তব্য? তৃতীয় কর্ত্তব্য এই যে, তাহাকে এরূপ সংযত ও এরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া থাকিতে হইবে যে, যাহা তাহার বস্তুত নয় কিছুতেই তাহা সে অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে না, তা তাহা যে-কোনো জাতিরই হউক, যে-কোনো দেশেরই হউক, যে-কোনো কালেই হউক, বা যে-কোনো প্রয়োজনই তাহার উপস্থিত হউক। ছল-বল-কৌশল কিছুই তাহা সে ইহার জন্য প্রয়োগ করিবে না। তাহাকে এইরূপ সার্ব্বভৌম অস্তেয় ব্রত গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবন চলিতে হইবে

* *

তারপর? তারপর তাহাকে এই একটি মহাপ্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে হইবে যে, তাহার জীবনযাত্রার— কেবল জীবনযাত্রার

জন্য যাহা আবশ্যক বা নিতান্ত আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত কিঞ্চিন্মাত্রও সে গ্রহণ করিবে না। সে প্রতিদিন নিজের নূতন-নূতন অপরিমেয় অভাব সৃষ্টি করিয়া, আর তাঁহার পূরণের জন্য ধনসঞ্চয় করিয়া অন্যের অন্ন হরণ করিবে না, অন্যের জীবিকার উচ্ছেদ করিবে না। তাহাকে অহোরাত্র মনে রাখিতে হইবে যে, যতটুকুতে তাহার উদরপূর্ত্তি হয় ততটুকুতেই তাহার স্বত্ব, তাহার অতিরিক্ত লইবার কোনো অধিকার তাহার নাই। যে অতিরিক্ত চায় সে চোর, সে দণ্ডার্হ।* যে কোনে জাতি, যে কোনো দেশ, যে-কোনো কাল, বা যে-কোনো প্রয়োজনই হউক, তৎসম্বন্ধে তাহাকে এই ভাবেই চলিতে হইবে, তাহাকে এইরূপেই সার্ব্বভৌম অ প রি গ্র হ ব্রত গ্রহণ করিয়া অস্খলিত ভাবে পালন করিতে হইবে।

*

* *

ইহার পরও আছে? আছে; আর একটিমাত্র ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য। তাহাকে ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। অন্যথা সাধ্য কি তাহার যে গৃহীর এই দুর্ব্বহ ভার সে বহন করিতে পারে। সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে ইন্দ্রিয় রক্ষা করিতে হইবে, সর্ব্বতোভাবে তাহাকে সংযতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। চিত্তে, বাক্যে ও কর্ম্মে সর্ব্বত্রই তাহাকে পবিত্র থাকিয়া নিপুণ হইয়া তেজস্বী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য সমস্ত কল্যাণের মূল, ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইলে আর বাকী থাকিল কি? ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে অন্য ব্রত পালন করিবার শক্তি পাইবে কোথায়? তাই তাহাকে ব্রহ্মচারী হইতেই হইবে। ব্রহ্মচারীই মৃত্যুর অতীত হইতে পারে। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য করিবার জন্য

---

* "যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ৭.১৪.৮।

জগতের লোককে যাঁহারা আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহারা তো এই কথাই বলেন, এবং ইহার ফলও প্রত্যক্ষগম্য।

* *

এই তো হইল সাধারণ কথা। একটু বিশেষ কথা আছে। ঈশ্বরপন্থী অনীশ্বরপন্থী উভয়কেই ঐ সাধারণ নিয়ম মানিতেই হইবে। তারপর ঈশ্বর-পন্থীকে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্য অভ্যস্ত হইতে হইবে, তাঁহার সত্তা সর্ব্বত্র অনুভব করিবার যোগ্যতা তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। আর অনীশ্বর-পন্থীকে নিজের উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া চরম মুক্তির অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলেই ছাত্রের কর্ত্তব্য শেষ হইল। সে তখন মানুষের মত মানুষ হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পারিবে; এবং এইরূপে সে জগতের আশার স্থল হইবে, আতঙ্কের স্থল নহে; সর্ব্বত্র কল্যাণ আনয়ন করিবে, অকল্যাণ নহে।

* *

শিষ্যেরা যদি এইরূপ শিক্ষা পাইয়া বাহির হয়, তবে কি এই এত রক্তস্রোত, এত অত্যাচার, এত হাহাকার, এত অশান্তি চারিদিকে দেখা দেয়? ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার তো কম হইতেছে না, কিন্তু জগতের অশান্তির মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা কোথায় গিয়া ঠেকিবে কে জানে। তাই শিক্ষার যে ধারা চলিয়াছে, তাহাকে ফিরাইতেই হইবে, এবং এইরূপেই ফিরাইতে হইবে। ইহা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, অত্যন্ত দুরাশা, জানি; কিন্তু উপায় নাই, যেরূপেই হউক যতদিনেই হউক, উহাকে বাধা দিতেই হইবে, উদ্যম করিতেই হইবে। একদিন যাহা কল্পনা, কালে তাহা কর্য্যে পরিণত হয়। অসত্যের দ্বারা সত্য পাওয়া যায় না, অকল্যাণ দ্বারা কল্যাণের লাভ হয় না; যদি এই কথা সত্য হয়, আর যদি জগতে শান্তির: ব্যবস্থা করিতেই হয়, তাহা হইলে বস্তুত এই উপায় ভিন্ন আর কোন্ উপায় আছে? তা শুনিতে যতই কেন দুঃসাধ্য অসাধ্য বা অদ্ভুত বোধ হউক না। হে বন্ধু, ইহাই লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে।

* *

আশ্রমসংবাদ

সবির (সর্ব্বেশ্বর মজুমদারের) আকস্মিক মৃত্যুর পর আশ্রমের সুধীর (সুধীরকুমার মিত্র) নামে একটি শিশু ছাত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, ইহাতে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি।

সবি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, এবং আমাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ সহোদর। সে অতি শৈশবে আশ্রমে আসে। সে নিতান্ত শান্ত, নির্ভীক ও ক্লেশসহিষ্ণু ছিল। সমস্ত বিষয়ই জানিবার জন্য তাহার একটা ঔৎসুক্য লক্ষিত হইয়াছিল। কোনো আদেশ করিলে সে তাহা বুঝিয়া-শুনিয়া তবে পালন করিত। আমরা তাহার মাতৃভক্তির ও ভ্রাতৃস্নেহের গভীরতার পরিচয় পাইয়াছি। লোকের নিকট আশ্রমের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিত। সঙ্গীত বা অন্যান্য ব্যাপারে যদি কোন বালক কখনো কোনো স্থানে কোনোরূপ অসংযম প্রকাশ করিত, সবি তখনই তাহার প্রতিবাদ করিত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর সে কাশীর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিল।

সুধীর কলিকাতার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মিত্র মহাশয়ের পুত্র। সে গত গ্রীষ্মের ছুটির পরে আশ্রমে আসে। তাহার বয়স ১১ বৎসর মাত্র ছিল। সে দেখিতে যেমন বড় সুন্দর ছিল তাহার ব্যবহারও সেইরূপ অতি শোভন ও ভদ্র ছিল। ধনীর পুত্র হইলেও কেহ যদি তাহাকে তাহা বলিত তবে সে বড় লজ্জিত হইত। সে অত্যন্ত লাজুক, নিরীহ ও সর্ব্বদা প্রফুল্ল ছিল। কোনো বালক তাহার অপরাধ করিলেও সে তাহার নামে অভিযোগ করিত না। সামান্য শাস্তিও তাহার মনে বিশেষ ভাবে লাগিত। সে কবে কার নিকটে কি জন্য কি শাস্তি পাইত নিজের এক খাতায় লিখিয়া রাখিত, মৃত্যুর পর ইহা দেখা গেল। তাহার চরিত্রের একটা বিশেষ মধুরতা ছিল, যে অধ্যাপক ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া আশ্রমের কর্ম্মে আসিয়া যোগ দিতেছেন। সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে মোট দশজন এইরূপ ছাত্র নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপনা-বিভাগে ছয় জন রহিয়া-

ছেন। প্রাক্তন ছাত্র শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, শ্রীভুবনেশ্বর নাগ ও শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় গত গ্রীষ্মের ছুটির পরে আশ্রমের অধ্যাপনায় কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

পূজনীয় গুরুদেব এখন আমেরিকায়। গত ১৮ই আশ্বিন তারের সংবাদে তাঁহার আমেরিকা-যাত্রার কথা জানা গিয়াছে। তারপরের কোনো সংবাদ আসার সময় এখনও হয় নাই। অন্যান্য চিঠিপত্রে তাঁহার ফ্রান্স হইতে হল্যাণ্ডে যাইবার উদ্যোগের কথা জানা গিয়াছিল। গুরুদেবের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, ও শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব আমেরিকায় গিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সর্ব্বাধ্যক্ষের পদ ও বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে শ্রীজগদানন্দ রায় মহাশয় আগামী ৭ই পৌষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাধ্যক্ষ, এবং শ্রীযুক্ত এণ্ডুজ সাহেব কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন ঘোষ মহাশয় আশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অভাব আমরা দুঃখিত হৃদয়ে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। তিনি কার্য্যবশত এখন দূরে থাকিলেও হৃদয় তাঁহার এই আশ্রমেই রহিয়াছে।

গত পূর্ণিমা তিথিতে আশ্রমসম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল। সতীশ কুটীরের পুরোবর্ত্তী প্রাঙ্গণে ঐ সভার অধিবেশন হয়। স্থানটি বেশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছিল, এবং তাহার মধ্যস্থলে বৃত্তাকারে বিচিত্র আলপনা আঁকিয়া তন্মধ্যে একটি পদ্মস্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছিল। আলপনা প্রভৃতির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅসিত কুমার হালদার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়গণ, আর আঁকিয়াও ছিলেন তাঁহারা নিজে আর বিশ্বভারতীর ছাত্র ও ছাত্রীরা। চতুর্দ্দিক্ জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইলে আশ্রমের সকলে বৃত্তের চতুর্দ্দিকে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানারূপ বাদ্য-সংযোগে প্রায় দেড়ঘণ্টা পর্য্যন্ত শরতের সমস্ত গান একটার পর একটা গাওয়া হইয়াছিল। মাঝে-মাঝে ছাত্রগণ শরতের উপযোগী কবিতার আবৃত্তিও

করিয়াছিল। গানের পর প্রাঙ্গণেই সকলে আহার করিয়াছিলেন। আহারেরও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল।

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় এবার আশ্রমে আসিয়া প্রায় দিন কুড়ি আমাদের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে এই অল্প সময়ের জন্য পাইয়া সকলে বিশেষ তৃপ্ত ও উপকৃত হইয়াছেন। তিনি আশ্রমসম্মিলনী, সাহিত্যসভা, অধ্যাপকসভা প্রভৃতির কার্য্যের সহিত এমন ঘনিষ্ট ভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন যে, আমাদের মনেই হইতেছিল না যে, তিনি আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী রাজার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীমতী হেমলতা দেবী পরিবারবর্গের সহিত রাজার আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প বলেন। শাস্ত্রীমহাশয় রাজার মহাপুরুষোচিত কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নিজের ধারণা প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রথমে ও শেষে অতিনিপুণভাবে রাজার জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করেন, ইহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ভুবনডাঙার "প্রসাদবিদ্যালয়" ও সাঁওতাল-গ্রামের "সুহৃৎবিদ্যালয়" বেশ ভাল চলিতেছে। প্রসাদবিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা মোট ১২ জন। এখানে প্রাতঃকালে সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত একজন বৃত্তিভোগী শিক্ষক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিকালে আশ্রমের বালকগণ ঐ সকল ছাত্রদিগকে পড়ায়। ইহার ব্যয় প্রসাদের পিতার প্রদত্ত টাকার সুদ: হইতে নির্ব্বাহিত হইতেছে। সুহৃৎ-বিদ্যালয় একই ভাবে চলিতেছে। আশ্রমের কয়েকজন স্বেচ্ছাব্রতী ছাত্র বিকালে গিয়া ঐ সকল বালকদিগের সহিত খেলা করেন। সম্প্রতি সাঁওতাল বালকগণ আশ্রমের খেলোয়াড়দের সহিত একটি ফুটবল ম্যাচ খেলিয়া আশ্রমকে এক গোলে হারাইয়া দিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা নির্ব্বাহ করা হয়।

উভয় বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনার জন্য আশ্রমসম্মিলনী হইতে একটি কমিটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত এবং ছাত্রদিগের মধ্য হইতে শ্রীমান্ অনিলকুমার দাস-গুপ্ত ঐ কমিটিতে আছেন।

এণ্ড্রুস্ সাহেব ৭ই অক্টোবর আশ্রম হইতে ডালটনগঞ্জ গিয়াছেন। সেখানে তিনি Behari Stndents' Conference-এ সভাপতির কার্য্য করিয়া দিল্লী, সিন্ধু, করাচি ও বোম্বাই অঞ্চলে গমন করিবেন।

এবার পূজার ছুটি ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) হইতে ১৩ই কার্ত্তিক (৩১এ অক্টোবর) পর্য্যন্ত ১৫ দিন মাত্র। ১৪ই কার্ত্তিক হইতে আবার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

গুজরাট ও বড়োদা রাজ্যে পুস্তকালয়-কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, তৎসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, শিক্ষাপ্রচারক ও অশ্রান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মোতিভাই আমিন মহাশয় তাঁহার কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের সহিত আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। ইনি গুজরাটে বহু বিদ্যালয় ও গ্রামে-নগরে বহু-বহু পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং তৎসমুদয় পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের ইতিবৃত্ত ও বিবরণ শুনিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। তাঁহার কথা শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, অতি অল্প ব্যয়েও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় খুলিতে পারা যায়, কেবল একটু খাটিতে পারিলেই হয়। কিন্তু এই একটু খাটাই আমাদের হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার তারাপুরওয়ালা এখানে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ শারদাবকাশ সপরিবারে এখানেই কাটাইবেন।

বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লেদার সাহেবও শারদাবকাশের কয়দিন এখানে থাকিবেন।

ডেনমার্কের কুমারী পিটার্সন দক্ষিণভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করিতে-ছেন। কয়দিন হইল তিনি এখানে আসিয়াছেন। তিনি কত স্নেহময়ী, এবং ভারতবর্ষকে তিনি কত ভাল বাসেন, তাঁহার আচার-ব্যবহারেই সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়।

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
পত্রিকাবিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadanand Roy

P. O. Santiniketan E.I.Ry. Loop.

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা — কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শান্তিনিকেতন পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হয় বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্রষ্টব্য

কলিকাতার নং ২০।বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এণ্ড কোম্পানিতে খুচরা "শান্তিনিকেতন" নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁহারা ঐ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
(পত্রিকাবিভাগ)

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা — কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল

বৌদ্ধদর্শন

আত্মতত্ত্ব

[আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে নাগার্জ্জুনের কিছু কথা আমরা গত সংখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি, এ সংখ্যায় আরো কিছু করিব। তিনি নিজের মূলমধ্যমককারিকার অনেক স্থানেই আত্মবাদ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন অষ্টাদশ প্রকরণে, এই জন্য এই প্রকরণের নাম আত্মপরীক্ষা। নিম্নে চন্দ্রকীর্ত্তির টীকার সহিত তাহার কিয়দংশের অনুবাদ দিতেছি।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধের সাধারণ বিবরণ জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায় (পৃ-৪-৫) দিয়াছি। তাহা হইতে জানা যাইবে আত্মবাদীরা আত্মার যে সব লক্ষণ সাধারণত বলিয়া থাকেন (যেমন দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞান, অনুভব, ইত্যাদি), তৎসমুদয়ই নাম অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই স্কন্ধসমূহেরই অন্তর্গত, ইহার অতিরিক্ত কিছুই নাই। ইহাই

মূলরূপে ধরিয়া নিম্নোদ্ধৃত বিচার আরম্ভ করা হইয়াছে যে, স্কন্ধসমূহই আত্মা অথবা স্কন্ধসমূহ হইতে তাহা ভিন্ন। 'স্কন্ধসমূহ' শব্দে রূপস্কন্ধ বিবক্ষিত নহে বলিয়া ধরিতে হইবে, কেননা, আত্মবাদীরা আত্মার সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা অবশিষ্ট চারিটি স্কন্ধের অন্তর্গত। তবে যাহারা দেহাত্মবাদী তাহাদের সম্বন্ধে রূপস্কন্ধকেও ধরিতে হইবে।

শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধির নাম উদীচ্য বা সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে পারিভাষিক ভাবে স ৎ কা য় দৃ ষ্টি, পালিতে স ক্ কা য় দি ট্ ঠি (সংস্কৃত স্ব কা য় দৃ ষ্টি)। পালি শব্দটিকে উদীচ্য বৌদ্ধগণ ভুল করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। কখনো কখনো কা য় দৃ ষ্টি শব্দও প্রয়োগ করা হয়।]

তত্ত্ব পাইতে হইবে, কিন্তু তত্ত্বটা কি? মাধ্যমিকগণ বলেন আধ্যাত্মিকই (শারীরিক ও মানসিকই) হউক, আর বাহ্যই হউক, কোনো পদার্থই বস্তুত না থাকায় অধ্যাত্মত ও বাহ্যত 'আমি' ও 'আমার' এই বুদ্ধির যে সর্ব্বপ্রকারে ক্ষয় তাহাই তত্ত্ব। এই তত্ত্বেই সকলকে অবতরণ করিতে হইবে। এই তত্ত্বে অবতরণ করিবার উপায় আ ত্ম নি ষে ধ, আত্মা নাই ইহাই অবধারণ করা।

এই সংসারের মূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, আত্মবুদ্ধির বিষয় আত্মা। কিন্তু আত্মাকেই যখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন শরীরে আত্মবুদ্ধি থাকিতে পারে না; এবং শরীরে আত্মবুদ্ধি না থাকিলে তন্মূলক কোনো ক্লেশ থাকিতে পারে না। এই দেখিয়া আচার্য্য (নাগার্জ্জুন) প্রথমে আত্মারই পরীক্ষা করিতেছেন—এই আত্মা কে?

যে অহঙ্কারের (অর্থাৎ 'অহম্' 'আমি' এই বুদ্ধির) বিষয় সেই আত্মা।

ভাল, অহঙ্কারের বিষয় বলিয়া যে আত্মাকে আপনারা কল্পনা করিতেছেন, তাহা কি স্কন্ধসমূহই অথবা স্কন্ধসমূহ হইতে অন্য?[১]

আচার্য্য (নাগার্জ্জুন উত্তরে) বলিতেছেন—

১। এসম্বন্ধে আরো তিনটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে:—(১) স্কন্ধসমূহ কি আত্মাতে থাকে? (২) আত্মা কি স্কন্ধসমূহে থাকে? (৩) স্কন্ধসমূহবান্ই কি আত্মা? চন্দ্রকীর্ত্তি বলিতেছেন, এই তিনটি প্রশ্নও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন দুইটির অন্তর্গত হইতে পারে বলিয়া আচার্য্য নাগার্জ্জুন সংক্ষেপে ঐ দুইটি প্রশ্নই করিয়াছেন।

১

আত্মা যদি স্কন্ধসমূহ হয় তবে তাহার উদয় ও ব্যয় (উৎপত্তি ও বিনাশ) হইবে; আর যদি তাহা স্কন্ধসমূহ হইতে অন্য হয় তাহা হইলে স্কন্ধসমূহ তাহার লক্ষণ হইতে পারে না।

যদি কল্পনা করা যায় যে, স্কন্ধসমূহই আত্মা, তাহা হইলে বলিতে হয় আত্মার উদয় ও ব্যয় আছে, অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, কারণ স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে। কিন্তু আপনারা আত্মাকে এরূপ ইচ্ছা করেন না, কেন না ইহাতে অনেক দোষ আসিয়া পড়ে। তাই (আচার্য্য পরে) বলিবেন (২৭.১২)২—

আত্মা (পূর্ব্বে) না থাকিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলা যায় না, কারণ ইহাতে দোষপ্রসঙ্গ হয়,—আত্মা ইহাতে কৃত্রিম হইয়া পড়ে; আর যদি বা উৎপন্ন হয় তবে তাহার (উৎপত্তির) হেতু থাকে না।৩

আবার (২৭.৬)—

২। চন্দ্রকীর্ত্তি এখানে এইরূপ অবতরণিকা দিয়াছেন:—যদি এই আত্মা পূর্ব্ব আত্মা হইতে ভিন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে ইহা পূর্ব্বে না থাকিয়া পরে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহা সঙ্গত হয় না, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন—।

৩। চন্দ্রকীর্ত্তি কারিকাটিকে এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—যদি আত্মা পূর্ব্বে না থাকিয়া পশ্চাৎ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আত্মা কৃত্রিম হয়; কিন্তু আত্মা কৃত্রিম ইহা ইচ্ছা করা হয় না, কেন না ইহাতে তাহার অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ হয়। আবার আত্মার নিষ্পাদক কোনো ভিন্ন কর্ত্তা না থাকায় কিরূপে তাহার কৃত্রিমতা

উপাদানই আত্মা হইতে পারে না, কেন না তাহার (উপাদানের) উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে। উপাদান কি রূপে উপাদাতা হইবে ?[৪]

যোজনা করিতে পারা যায় ? আত্মাকে কৃত্রিম বলিয়া কল্পনা করিলে সংসারের আদি আছে বলিতে হয়, আর বলিতে হয় যে, অপূর্ব্ব জীবের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহা এরূপ হয় না। তাই আত্মা কৃত্রিম নহে। আরো, আত্মা উৎপন্ন হইলেও তাহা নির্হেতুক ; অর্থাৎ আত্মা পূর্ব্বে না থাকিয়া যদি উৎপন্ন হয় তবে তাহা নির্হেতুক—তাহার উৎপত্তির হেতু নাই, ইহাই উপপন্ন হয়, কারণ পূর্ব্বে আত্মা নাই। যে অকৃত্রিম সে নির্হেতুক হইতে পারে (কৃত্রিম নির্হেতুক হয় না)।

৪। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধকে উপাদান স্কন্ধ বলা হয়। চন্দ্রকীর্ত্তি কারিকাটি এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এই স্কন্ধরূপ উপাদান প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু আত্মা তো এইরূপ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় না। আত্মা স্কন্ধসমূহ হইতে অন্য কি অনন্য, অথবা তাহা নিত্য কি অনিত্য ইহা বলিতে পারা যায় না, কেন না ইহাতে বহু দোষ-প্রসঙ্গ হয়। আত্মা নিত্য হইলে শাশ্বতবাদ হয়, অনিত্য হইলে উচ্ছেদবাদ হয়। শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ উভয়ই মহা অনর্থকর বলিয়া গ্রহণীয় নহে। অতএব উপাদানই আত্মা, ইহা তো যুক্তিযুক্ত হয় না। আরো, যাহাকে উপকারক বা সহায়ক ভাবে (উপ) গ্রহণ (আ দা ন) করা যায় তাহা উ পা দা ন, অর্থাৎ কর্ম্ম ; ইহার কেহ উ পা দা তা, গ্রহীতা, অর্জ্জক অবশ্যই থাকিবে। সেই উপাদানকেই যদি আত্মা বলিতে ইচ্ছা করা হয়, তাহা হইলে উপাদানই উপাদাতা ইহাও বলিতে হয়। এবং তাহা হইলে কর্ত্তা ও কর্ম্ম একই হইয়া যায় (—ইহাদের কোনো ভেদ থাকে না, যে কর্ম্ম সেই কর্ত্তা) ; এবং ইহা হইলে ছেদ্য ও ছেদক, ঘট ও কুম্ভকার, এবং ইন্ধন ও অগ্নি, ইত্যাদিরও অভেদ হইয়া পড়ে।

আরো—

আত্মা যদি স্কন্ধসমূহ হয়, তাহা হইলে স্কন্ধ বহু বলিয়া আত্মাও কিন্তু ইহা দেখাও যায় না, আর সঙ্গতও হয় না। ইহাই প্রতিপাদন করিয়া (আচার্য্য নাগার্জ্জুন) বলিতেছেন—"উপাদান কিরূপে উপাদাতা হইবে?" অর্থাৎ এই পক্ষ অত্যন্ত অসম্ভব, ইহাই অভিপ্রায়।

(পূর্ব্বপক্ষী এখানে) বলেন—ইহা সত্য যে, কেবলমাত্র উপাদান আত্মা, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।

(সিদ্ধান্তী—) তবে কি?

(পূর্ব্বপক্ষী—) আত্মা উপাদান হইতে অতিরিক্তই হইবে।

(সিদ্ধান্তী—) ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে।

(পূর্ব্বপক্ষী—) কি কারণে?

(সিদ্ধান্তী—) যেহেতু

৭

আত্মা উপাদান হইতে অন্য ইহা উপপন্ন হয় না। কেন না, যদি তাহা উপাদান হইতে অন্য হয়, তাহা হইলে, তাহাকে উপাদান হইতে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যাইবে কিন্তু গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

আত্মা যদি উপাদান হইতে ব্যতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে, (বলিতে হইবে,) উপাদান হইতে ব্যতিরিক্ত ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায়; যেমন ঘট হইতে পটকে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করা যায়; কিন্তু এরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অতএব আত্মা উপাদান হইতে ব্যতিরিক্ত নহে। উপাদান-ব্যতিরেকে যখন তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তখন তাহা আকাশকুসুমের ন্যায়, ইহাই অভিপ্রায়।

এখন বিষয়টিকে পূর্ব্বে যেরূপ প্রতিপাদন করা হইল, সেইরূপে স্পষ্ট করিয়া (আচার্য্য) বুঝাইতেছেন—

বন্ধ হইবে। আর যদি আত্মা সেই প্রকারই হয় তবে তাহা দ্রব্য হয়, এবং দ্রব্য হইলে তাহার কোনো বৈপরীত্য হইবে না।[৫]

৮

এইরূপে তাহা (আত্মা) উপাদান হইতে অন্যও নহে, এবং তাহা উপাদানও নহে, আবার উপাদান ব্যতিরেকেও তাহা নহে ;

আত্মা যদি উপাদান-স্বরূপ না হয়, কেননা, তাহা হইলে, উপাদান ও উপাদাতার একত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, আর (আত্মারও) উৎপত্তি ও বিনাশ-প্রসঙ্গ হয় ; আর যদি তাহা উপাদান হইতে অন্যও না হয়, কেননা তাহা হইলে উপাদানের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে তাহা গ্রাহ্য হইয়া পড়ে (কিন্তু বস্তুত সেরূপ গ্রাহ্য হয় না) ; এবং যদি তাহা উপাদান ব্যতিরেকেও না থাকে, কেননা, তাহা হইলে উপাদান-নিরপেক্ষ হইয়াই তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে ; তবে ইহাই (স্বীকার করা) হউক যে আত্মা নাই।—যদি (এইরূপ বলা) হয়, (তবে আচার্য্য তাহার উত্তরে) বলিতেছেন—

এবং (তাহা) নাই, এ নিশ্চয়ও নহে।

স্কন্ধসমূহকে গ্রহণ করিয়া যে ব্যবহারের বিষয় হয় সে নাই, ইহা কিরূপে হইতে পারে ? অবিদ্যমান বন্ধ্যাপুত্র স্কন্ধসমূহকে গ্রহণ করিয়া ব্যবহারের বিষয় হয় না। উপাদান থাকিতে উপাদাতা নাই, ইহা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয় ? তাই ইহার (আত্মার) নাস্তিত্বও যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব আত্মা নাই এই নিশ্চয়ও উপপন্ন হয় না।

এই আত্মার বিস্তৃত ব্যবস্থা (অর্থাৎ মীমাংসা) ম ধ্য ম কা ব তা রে (ইহা চন্দ্রকীর্ত্তি-কৃত, সম্প্রতি ইহার তিব্বতী অনুবাদমাত্র পাওয়া যায়, Bibliotheca Buddhica Series-এ ছাপা হইয়াছে) জানিবে। ইহাতেও (মধ্যমকবৃত্তিতেও) পূর্ব্বে বহুস্থানে করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর সে জন্য যত্ন করা হইল না।

৫। শেষাংশ আমার নিকট স্পষ্ট নহে। মনে হয় সাধারণ দ্রব্যের

(স্কন্ধসমূহ আত্মা হইলে তাহাদের ন্যায়) নির্ব্বাণে আত্মার অবশ্যই উচ্ছেদ হইবে, আর নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রতিক্ষণেই তাহার নাশ ও উৎপত্তি হইবে। কর্ত্তার নাশ হইলে তৎকৃত কর্ম্মের ফল তাহার হইবে না, এবং অন্যকৃত কর্ম্মের ফল অন্য ব্যক্তি ভোগ করিবে।

—ইত্যাদি প্রকারে মধ্যমকাবতারে বিস্তারপূর্ব্বক যে বিচার করা হইয়াছে, তাহা হইতেও (স্কন্ধসমূহ আত্মা) এইপক্ষ বুঝিতে পারা যাইবে এইজন্য এখানে আর বিস্তার করা হইতেছে না।

এইরূপে স্কন্ধসমূহ আত্মা নহে। আত্মা স্কন্ধসমূহের ব্যতিরিক্ত ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, আত্মা যদি স্কন্ধসমূহ হইতে অন্য হয় তাহা হইলে স্কন্ধসমূহ আত্মার লক্ষণ (স্বভাব) হইতে পারে না। যেমন অশ্ব গো হইতে অন্য হওয়ায় তাহা গো'র লক্ষণ হয় না, এইরূপ, আত্মাকে যদি স্কন্ধসমূহ হইতে ব্যতিরিক্ত কল্পনা করা যায় তাহা হইলে স্কন্ধসমূহ তাহার লক্ষণ হইতে পারে না। স্কন্ধসমূহ সংস্কৃত[৬] এজন্য ইহারা মূল ও সহকারী কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ ইহাদের লক্ষণ (স্বভাব)। এখন স্কন্ধসমূহ যদি আত্মার লক্ষণ না হয়, তাহা হইলে আপনার মতে আত্মার উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ-রূপ লক্ষণ নাই।[৭]

অনিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম আছে, আত্মা দ্রব্য হইলে তাহারও ঐ সমস্ত হইবে, তাহার বৈপরীত্য হবে না।

৬। বৌদ্ধমতে আকাশ ও নির্ব্বাণ ছাড়া সমস্ত পদার্থকেই সংস্কৃত বলা হইয়া থাকে, আকাশ ও নির্ব্বাণ অসংস্কৃত। মূল ও সহকারী কারণে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাই সংস্কৃত। সংস্কৃত শব্দের এস্থানে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ একত্রকৃত।

৭। আত্মবাদীরা আত্মাকে বস্তুত স্কন্ধসমূহ হইতে অতিরিক্তই বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে স্কন্ধসমূহ বস্তুতই আত্মার লক্ষণ নয়। তাই এ আলোচ্য যুক্তি দ্বারা তাঁহাদের মত খণ্ডিত হয় না। চন্দ্রকীর্ত্তি নিজেই ইহা উল্লেখ করিয়া একটু পরেই ইহার উত্তর দিতেছেন।

আর যাহা এইরূপ হয়, তাহার সত্তা না থাকায় অথবা তাহা সংস্কৃত না হওয়ায় আকাশকুসুমের ন্যায় বা নির্ব্বাণের ন্যায় আত্মা এই সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। ইহা 'অহম্' বুদ্ধিরও বিষয় হইতে পারে না। অতএব আত্মা স্কন্ধসমূহের ব্যতিরিক্ত ইহাও যুক্তিযুক্ত হয় না।

অথবা, ইহার (অর্থাৎ 'স্কন্ধসমূহ আত্মার লক্ষণ নহে' ইহার) অন্য অর্থ এই —আত্মা যদি স্কন্ধ-ব্যতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে স্কন্ধসমূহ তাহার লক্ষণ হইতে পারে না। (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) এই পাঁচটি স্কন্ধ, এবং ইহাদের (যথাক্রমে) লক্ষণ রূ প ণ (অর্থাৎ কোনোরূপে বিকার-প্রাপ্তি), অ নু ভ ব, নি মি ত্তো দ্ গ্র হ ণ (অর্থাৎ নীল-পীত, হ্রস্ব-দীর্ঘ, শুভ-অশুভ, সুন্দর-অসুন্দর, ইত্যাদিরূপে সামান্যত উপস্থিত আকারকে গ্রহণ), অ ভি সং স্ক র ণ (অর্থাৎ বিতর্ক বিচারাদি মানসিক ক্রিয়া), ও বি ষ য় প্র তি বি জ্ঞ প্তি (অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান)। এখন যদি ইচ্ছা করা যায় যে, রূপ হইতে বিজ্ঞান যেমন ভিন্ন, আত্মাও সেইরূপ স্কন্ধ-সমূহ হইতে ভিন্ন, তাহা হইলে আত্মার লক্ষণ স্কন্ধসমূহের লক্ষণ হইতে পৃথক্ হইবে। এবং রূপ হইতে চিত্ত যেমন পৃথগ্‌লক্ষণ-রূপে গৃহীত হইয়া থাকে, আত্মাও সেইরূপ স্কন্ধসমূহ হইতে পৃথগ্‌লক্ষণ-রূপেই গৃহীত হইবে, কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না। অতএব স্কন্ধসমূহ হইতে ব্যতিরিক্তও আত্মা নাই। (এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—) তীর্থিকেরা[৮] তো আত্মাকে স্কন্ধসমূহ হইতে ভিন্নই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাহার লক্ষণকেও স্কন্ধসমূহের লক্ষণ হইতে ভিন্ন বলেন। অতএব এই (পূর্ব্বোক্ত) ব্যবস্থা তাঁহাদিগের কোনো বাধা দেয় না। তীর্থকেরা আত্মার যেরূপ ভিন্ন লক্ষণ বলিয়া থাকেন, তাহা ম ধ্য ম কা ব তা রে উক্ত হইয়াছে :—

> "তীর্থিকেরা কল্পনা করিয়া থাকেন, আত্মা নিত্য, অকর্ত্তা, (অ-) ভোক্তা, নির্গুণ, ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহাদের এই প্রক্রিয়াই কোনো কোনো ভেদ স্বীকার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।"

৮। বৌদ্ধেরা অপর সম্প্রদায়কে সাধারণত এই নামেই উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(আমাদের উত্তর এই—) তীর্থিকেরা (আত্মার) স্কন্ধব্যতিরিক্ত লক্ষণ বলিয়া থাকেন সত্য ; কিন্তু তাঁহারা আত্মাকে স্বরূপত উপলব্ধি করিয়া তাহার লক্ষণ বলেন না। তবে কি (করেন)? (উপাদানস্কন্ধ-সমূহের) গ্রহণে 'আত্মা' এই প্রজ্ঞপ্তি অর্থাৎ সংজ্ঞা বা ব্যবহার মাত্র হয়, ইহা তাঁহারা যথাযথ জানেন না। ইহা না জানায়, আত্মা যে বস্তুত কেবল নামমাত্র তাহা ত্রাস-বশত[৯] বুঝিতে না পারিয়া এবং এইরূপে ব্যবহারিকও সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা কেবল মিথ্যাকল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং এই প্রকারে কেবল দোষপূর্ণ অনুমানের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া মোহবশত আত্মাকে কল্পনা করেন, ও তাহার লক্ষণ বলিয়া থাকেন। ইহাও উক্ত হইয়াছে :—

"যেমন দর্পণ গ্রহণ করিলে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু তত্বত তাহা (প্রতিবিম্ব) কিছু নহে ; সেইরূপ স্কন্ধসমূহ-গ্রহণ করিলে 'আমি' এই বুদ্ধি (অহঙ্কার) হয়, কিন্তু তত্বত তাহা কিছু নহে। দর্পণকে গ্রহণ না করিলে যেমন নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, সেইরূপ স্কন্ধসমূহকে গ্রহণ না করিলে 'আমি'কেও দেখা যায় না। আর্য্য আনন্দ এইরূপ তত্ব গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ধর্ম্ম চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ভিক্ষুগণকে নিয়ত ইহা বলিয়াছিলেন।"

এই জন্য পুনর্ব্বার ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য যত্ন আরম্ভ করিতেছি না। স্কন্ধসমূহকে গ্রহণ করায় ('আমি' বা 'আত্মা' এইরূপ) যাহা সংজ্ঞিত বা ব্যবহৃত হয়, এবং যাহা অবিদ্যানুযায়ী ব্যক্তিগণের 'আত্মা' এই অভিনিবেশের বিষয়ভূত হইয়া থাকে, মুমুক্ষুরা তাহাকেই এইরূপে বিচার করেন—স্কন্ধ পাঁচটি যাহার উপাদানরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে, স্কন্দসমূহই কি তাহার লক্ষণ, অথবা

৯। বস্তুত কোনো পৃথক্ স্থির আত্মা নাই ইহা মনে করিলে তত্বজ্ঞান না থাকায় সাধারণ লোকের মনের মধ্যে ত্রাসের উদ্রেক হয়, আত্মার উচ্ছেদ ভাবিয়া লোক ভীত হয়।

স্কন্ধসমূহ তাহার লক্ষণ নহে? কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বিচার করিয়া (আত্মা স্কন্ধলক্ষণ অথবা অ-স্কন্ধলক্ষণ) এই প্রকার কিছুই ভাবরূপে পান না। তখন ইঁহাদের—

২

আত্মা না থাকিলে আত্মীয় কোথা হইতে হইবে?

আত্মারই যখন উপলব্ধি হয় না, তখন স্কন্ধপঞ্চক আত্মীয় এইরূপে তো তাহার উপলব্ধি হইবেই না; কারণ, 'আত্মীয়' ইহা আত্মা এই সংজ্ঞা বা ব্যবহারকে গ্রহণ করিয়া হইয়া থাকে। রথ দগ্ধ হইলে যেমন তাহার অঙ্গগুলিও দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া উপলব্ধ হয় না, যোগীরাও সেইরূপ যখনই আত্মার নৈরাত্ম্য জানেন (অর্থাৎ যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে করিতেছিলেন বস্তুত তাহা আত্মা নহে, ইহা জানেন,) তখনই 'আত্মীয়' রূপে অভিমত স্কন্ধসমূহ-রূপ বস্তুরও নৈরাত্ম্যকে নিশ্চিতরূপে জানেন। যেমন রত্নাবলীতে বলা হইয়াছে:—

"স্কন্ধসমূহ অহঙ্কার ('আমি' এই বুদ্ধি) হইতে উৎপন্ন হয়, সেই অহঙ্কার বস্তুত মিথ্যা। বীজ যাহার মিথ্যা অঙ্কুর তাহার কিরূপে সত্য হইবে? এইরূপে স্কন্ধসমূহকে অসত্য দেখিলে অহঙ্কার নষ্ট হয়, অহঙ্কার নষ্ট হইলে আর স্কন্ধের উৎপত্তি হয় না। যেমন গ্রীষ্মকালে অতিরূক্ষ ভূপ্রদেশে প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণসমূহকে দর্শন করিয়া দূরবর্ত্তী পুরুষের তাহাতে জলবুদ্ধি হয়, কিন্তু নিকটবর্ত্তী পুরুষের হয় না, সেইরূপ এই সংসারপথে 'আত্মা' ও 'আত্মীয়' ইহার যথাযথ তত্ত্ব যাহারা জানে না তাহারা স্কন্ধসমূহকে 'আত্মা' বা 'আত্মীয়' মনে করে, কিন্তু যাহারা পদার্থতত্ত্ব জানে তাহাদের ওরূপ বুদ্ধি হয় না। আচার্য্যপাদ (নাগার্জ্জুন) যেমন বলিয়াছেন:—

"দূরে যাহা দৃষ্ট হয় নিকটস্থ ব্যক্তি তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়। সূর্য্যের কিরণ যদি জল হয়, তবে নিকটবর্ত্তী পুরুষ তাহা দেখিতে পায় না কেন? দূরস্থ ব্যক্তি এই লোককে যেমন দেখে, নিকটস্থ

ব্যক্তি সেরূপ দেখে না। ইহা মরুমরীচিকার ন্যায়। মরুমরীচিকা জলের মত বটে, কিন্তু তাহা জল নহে, আর বস্তুতও কোনো পদার্থ নহে; সেইরূপ স্কন্ধসমূহ আত্মার সমান বটে, কিন্তু তাহারা আত্মা নহে, এবং বস্তুতও কিছু নহে।"

অতএব 'আত্মা' ও আত্মীয়' না থাকায় পরমার্থদর্শী যোগী—

নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হয়, কেননা তাহার 'আত্মা' ও 'আত্মনীন' (অর্থাৎ আত্মহিতকর, আত্মীয়) এই উভয়ই বুদ্ধি শান্ত হইয়া যায়।

আত্মার হিত আত্মনীন, অর্থাৎ আত্মীয়। অহঙ্কারের বিষয় আত্মার, এবং মমকারের ('আমার' এই বুদ্ধির) বিষয় আত্মীয়ের অর্থাৎ স্কন্ধাদি বস্তুর শান্তি হওয়ায় অনুৎপত্তি হওয়ায়, অর্থাৎ আর তাহার উপলব্ধি না হওয়ায় যোগী নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হয়।

(পূর্ব্বপক্ষী এখানে বলিতে পারেন—) ওহে, ঐ যে ব্যক্তি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হয় সে তো আছে? আর সে যখন থাকিল তখন তো আত্মা ও স্কন্ধও সিদ্ধ হইল।

(সিদ্ধান্তী উত্তর করিয়াছেন—)

৩

যে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার সেও নাই। যে ব্যক্তি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কারকে দর্শন করে সে (ঠিক) দর্শন করে না।

আত্মা ও স্কন্ধসমূহের যখন সর্ব্ব প্রকারেই উপলব্ধি হয় না তখন তাহাদের হইতে অন্য পদার্থ আর কোথা হইতে হইবে? 'ঐ যে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার' এইরূপে যে ব্যক্তি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কারকে দেখে,—যাহার কোনো স্বরূপ নাই, সে তত্ত্ব দেখিতে পায় না। ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন—

"অধ্যাত্ম (ভিতরে) শূন্য দেখ, বাহিরেও শূন্য দেখ। যে শূন্য ভাবনা করে সেও কেহ নাই।"

এইরূপে—

৪

অধ্যাত্ম ও বাহিরে 'আমি' ও 'আমার' (এই বুদ্ধি) ক্ষীণ হইলে, উপাদান[১০] নিরুদ্ধ হয়, এবং তাহার ক্ষয়ে জন্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

সূত্রে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত ক্লেশের (রাগ-দ্বেষ-মোহের) মূল হইতেছে সৎকায়দৃষ্টি, ইহাই ক্লেশসমূহের কারণ, ইহা হইতেই ক্লেশসমূহ উদিত হইয়া থাকে। 'আত্মা' ও 'আত্মীয়' এই বুদ্ধি না থাকায় সৎকায়দৃষ্টি নষ্ট হয়, সৎকায়-দৃষ্টি নষ্ট হইলে কাম, দৃষ্টি, শীল-ব্রত, ও আত্মবাদ এই চতুর্বিধ উপাদান নষ্ট হয়, উপাদানের ক্ষয়ে পুনর্ভবের (অর্থাৎ পুনর্ভবজনক কর্ম্মের) ক্ষয় হয়। যেহেতু এইরূপে জন্মনিবৃত্তির ক্রম ব্যবস্থাপিত হয়, সেই জন্য—

৫

কর্ম্ম ও ক্লেশের ক্ষয়ে মোক্ষ হইয়া থাকে।

১০। কোনো বিষয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে তাহাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়া রাখার বাসনার নাম উ পা দা ন। এই উপাদান হইতে জন্ম হয়। উপাদান চার প্রকার (১) কাম, অর্থাৎ কাম্য বিষয় উপভোগের বাসনা; (২) দৃষ্টি, অর্থাৎ মিথ্যা দৃষ্টি, যাহা যা নয় তাহাকে তাই মনে করিয়া ধরিয়া থাকার বাসনা; (৩) শীল-ব্রত-পরামর্শ, অর্থ শীল ও ব্রতানুষ্ঠানেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে ইহা মনে করিয়া তাহাই ধরিয়া থাকা; এবং (৪) আত্মবাদ, অর্থাৎ আত্মা ও আত্মীয় কল্পনা করিয়া তাহাই ধরিয়া থাকা। চন্দ্রকীর্ত্তির টীকাতেও ইহা একটু পরেই উক্ত হইতেছে।

উপাদানের ক্ষয় হইলে উপাদান-হেতুক ভব (অর্থাৎ পুনর্ভবজনক কর্ম্ম) হয় না, ভব নিরুদ্ধ লইলে জন্ম-জরা-মরণাদির আর সম্ভব কোথায়? এই রূপে কর্ম্ম ও ক্লেশের ক্ষয়ে মোক্ষ হয় স্থিব হইল। আচ্ছা, তবে কাহার ক্ষয়ে কর্ম্ম ও ক্লেশসমূহের সর্ব্বপ্রকারে ক্ষয় হয়, ইহা তো বলা উচিত। তাহাই বলা হইতেছে :—

কর্ম্ম ও ক্লেশ-সমূহ বিকল্প হইতে হয়, এবং বিকল্প হয় প্রপঞ্চ হইতে; (এই) প্রপঞ্চ শূন্যতায় নিরুদ্ধ হয়।

মূঢ় ও প্রাকৃত ব্যক্তি রূপাদি দর্শন করিয়া প্রজ্ঞার অভাবে বিকল্প করে, ১১ এবং তাহাতে রাগ-প্রভৃতি ক্লেশ ১২ উৎপন্ন হয়। (আচার্য্য পরে) বলিবেন (২৩.১)—

কথিত হইয়া থাকে যে, দ্বেষ ও মোহ সঙ্কল্প১৩ হইতে হয়; কারণ রাগ শুভ বিষয় হইতে, দ্বেষ অশুভ বিষয় হইতে, এবং মোহ বিপর্য্যাস১৪ হইতে হইয়া থাকে।

এইরূপে বিকল্প হইতে কর্ম্ম ও ক্লেশসমূহ হইয়া থাকে। আর এই বিকল্প হয় অনাদি সংসারে অভ্যস্ত জ্ঞান-জ্ঞেয়, বাচ্য-বাচক, কর্ত্তৃ কর্ম্ম, ক্রিয়া-করণ, ঘট পট, রথ-মুকুট, রূপ-বেদনা, স্ত্রী-পুরুষ, লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, যশ-অযশ,

---

১১। অর্থাৎ রূপাদির স্বরূপ বস্তুত কি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা না বুঝিয়া-শুনিয়া তৎসম্বন্ধে 'ইহা এই' 'উহা ঐ' ইত্যাদি বিবিধ—নানারূপ কল্পনা করে।

১২। রাগ, দ্বেষ, ও মোহ অন্যান্য সমস্ত ক্লেশের মূল, আর এই তিনটিই ক্লেশসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কেবল ইহাদেরই উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে।

১৩। বিতর্ক, বিকল্প।

১৪। অর্থাৎ শুভকে অশুভ, আর অশুভকে শুভ বলিয়া বিপরীতভাবে গ্রহণ করায়।

নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদিরূপ বিচিত্র প্রপঞ্চ[১৫] হইতে। এই যে লৌকিক প্রপঞ্চ তাহা শূন্যতায়, অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থেরই বস্তুত কোনো স্বভাব নাই—সমস্তই বস্তুত স্বভাব-শূন্য এই শূন্যতা-দর্শনে নিরুদ্ধ হয়। কিরূপে? যেহেতু বস্তুর যদি উপলব্ধি থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত প্রপঞ্চজালও থাকিতে পারে, (অন্যথা নহে)। কেননা, অনুরাগী নর ও অমরগণ রূপ-লাবণ্য-যৌবনবতী বন্ধ্যাদুহিতাকে দেখিতে না পাওয়ায় তাহার জন্য কোনোরূপ প্রপঞ্চের অবতারণা করেন না, এবং প্রপঞ্চের অবতারণা না করিয়া তদ্বিষয়ে কোনোরূপ বিকল্পও অপ্রস্তাবশত করেন না। আবার তাদৃশ বিকল্প না করায় 'আমি' ও 'আমার' এই অভিনিবেশে সৎকায়দৃষ্টি-মূলক ক্লেশসমূহ (রাগ-দ্বেষ-মোহ) উৎপাদন করেন না; তাহা না করায়, শুভ, অশুভ, ও না-শুভ-না-অশুভ কর্ম্মও করেন না; এবং এই কর্ম্ম না করায় জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, খেদ, আয়াসাদি দ্বারা পরিপূর্ণ সংসার-কান্তারকে অনুভব করেন না। এইরূপে যোগীরা শূন্যতা দর্শনের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্কন্ধ-প্রভৃতিকে স্বরূপত আর দেখিতে পান না; বস্তুর স্বরূপকে দেখিতে না পাওয়ায় তদ্বিষয়ে কোনো প্রপঞ্চ করেন না; প্রপঞ্চ না করায় বিকল্প করেন না; বিকল্প না করায় 'আমি' 'আমার' এই অভিনিবেশে সৎকায়দৃষ্টিমূলক ক্লেশসমূহকে উৎপাদন করেন না; তাহা না করায় (জন্মের কারণভূত) কর্ম্ম করেন না; এবং কর্ম্ম না করায় জন্ম-জরা-মরণ-রূপ সংসারকে অনুভব করেন না। যেহেতু এইরূপে অশেষ প্রপঞ্চের উপশম-স্বরূপ শিব শূন্যতা লাভ করায় কল্পিত অশেষ প্রপঞ্চ চলিয়া যায়, প্রপঞ্চ চলিয়া যাওয়ায় বিকল্পের নিবৃত্তি হয়, বিকল্পের নিবৃত্তিতে সমস্ত কর্ম্ম ও ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, এবং কর্ম্ম ও ক্লেশের নিবৃত্তিতে জন্মের নিবৃত্তি হয়, সেইজন্য সর্ব্ব প্রপঞ্চের নিবৃত্তিরূপ শূন্যতাকেই নির্ব্বাণ বলা হয়।......

(পূর্ব্বপক্ষী এখানে) বলেন—যদি এইরূপ আধ্যাত্মিক বা বাহ্য কোনো বস্তুর উপলব্ধি না থাকায় অধ্যাত্মত বা বাহ্যত 'আমি' ও 'আমার' এই কল্পনার

১৫। মিথ্যা ব্যবহার, মিথ্যা ব্যবহারের নিমিত্ত, বিপর্য্যাস বা মায়া।

অনুৎপত্তিই তত্ত্ব, ইহাই আপনারা ব্যবস্থাপিত করেন, তাহা হইলে এই যে, ভগবান্ বলিয়াছেন ১৬—

"আত্মাই আত্মার নাথ, অন্য নাথ কে হইবে? পণ্ডিত ব্যক্তি সুদান্ত আত্মার দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

আত্মাই আত্মার নাথ, অন্য নাথ কে হইবে? আত্মাই আত্মার কৃত ও অপকৃত কর্ম্মের সাক্ষী।"

সেইরূপ আর্য্যসমাধিরাজে (উক্ত হইয়াছে)—

"শুভ ও অশুভ কর্ম্ম নষ্ট হয় না; কর্ম্ম করিয়া আত্মাকে তাহা (তাহার ফল) অনুভব করিতে হইবে। কর্ম্মফল (অন্যে) সংক্রান্ত হয় না, এবং বিনা কারণেই কেহ তাহা অনুভব করে না।"

ইত্যাদি অনেক, (ইহার সহিত আপনাদের কথার) কিরূপে বিরোধ হয় না?

(সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—) বলিতেছি। ইহাও কি ভগবান বলেন নি?—

"এখানে সত্ত্ব বা আত্মা নাই, (কেবল) সহেতুক পদার্থসমূহ রহিয়াছে। ইহা এইরূপই; কারণ, রূপ আত্মা নহে, রূপবান্ আত্মা নহে, রূপে আত্মা নাই, আত্মাতে রূপ নাই। এইরূপ……বিজ্ঞান আত্মা নহে, বিজ্ঞানবান্ আত্মা নহে, বিজ্ঞানে আত্মা নাই, এবং আত্মাতে বিজ্ঞান নাই।"

এইরূপ (আরো বলিয়াছেন)—"সমস্ত পদার্থ অনাত্মা।"

(পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—) তা হইলে কিরূপে এই আগমের (সম্প্রদায়াগত শাস্ত্রের) সহিত পূর্ব্ব আগমের বিরোধ হইবে না?

(সিদ্ধান্তী—) সেইজন্যই এখানে ভগবানের উপদেশের অভিপ্রায় অন্বেষণ করিতে হইবে। ভগবদ্ বুদ্ধগণের উক্তিতে এমন সমস্ত কথা আছে যাহাদের অর্থ স্পষ্টভাবে করিয়াই দেওয়া হইয়াছে (নীতার্থ), আবার এমনো সব কথা আছে যাহাদের অর্থ বুঝিয়া লইতে হয় (নেয়ার্থ)। তাঁহারা জগতের শিষ্যগণের

১৬। দ্রষ্টব্য ধম্মপদ,১৬০; বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকা, ৯. ৭৩।

বুদ্ধিরূপ পদ্ম-সরোবরের বিকাশে সূর্য্যস্বরূপ, তাঁহারা তাহাদের সেই বুদ্ধিপদ্ম-সরোবরের বিকাশের নিমিত্ত মহাকরুণাময় কৌশলবিজ্ঞানরূপ কিরণ বিস্তার করিয়া—

৬

'আত্মা' ইহাও জানাইয়াছেন, 'অনাত্মা' ইহাও উপদেশ দিয়াছেন; আবার বুদ্ধেরা ইহাও উপদেশ দিয়াছেন যে, 'আত্মা' 'অনাত্মা' কিছুই নহে।

এখানে অভিপ্রায় এই :—বুদ্ধগণের উপদেশ্য শিষ্য ত্রিবিধ, হীন, মধ্যম, ও উৎকৃষ্ট। হীনেরা কেবলমাত্র ব্যাবহারিক সত্য[১৭] অনুসরণ করিয়া চলে। আত্মা বস্তুত অভাব পদার্থ, এই বিপরীত কুমতরূপ নিবিড় অন্ধকাররাশিতে তাহাদের প্রজ্ঞা-নেত্র আচ্ছাদিত থাকে। এই জন্য যে সকল বিষয় লৌকিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের অতীত নহে তাহাদিগকেও তাহারা দেখিতে পায় না। তাহারা কেবল পৃথিবী, জল, তেজ, ও বায়ু এই কয়টিমাত্র পদার্থ দেখিয়াই তাহাদেরই বর্ণনা করে। তাহারা মনে করে, মদ্যপান করিলে যেমন কোনো মূল, অন্ন, জল ও কিণ্ব (মদ্যবীজ) প্রভৃতি দ্রব্য একত্র পরিপাক-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মদ-মূর্চ্ছাদি অবস্থা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কললাদি[১৮] ও মহাভূতসমূহের পরিপাকে বুদ্ধি (বা চৈতন্য) হইয়া থাকে। এইরূপে বর্ত্তমান জীবের পূর্ব্বাবস্থা বা পরাবস্থা তাহারা খণ্ডন করে। তাহারা পরলোক ও আত্মাকে খণ্ডন করিয়া বলে—'এই লোক

১৭। যাহা বস্তুত যেরূপ, তাহাকে যদি ঠিক সেইরূপেই জানা যায়, তবে সেই জানা পরমার্থ বা পারমার্থিক সত্য; আর যদি তাহাকে ঠিক সেইরূপ না জানিয়া সাধারণ লোকেরা যেমন জানে-বুঝে সেইরূপ জানিয়া-বুঝিয়া তাহা দ্বারা ব্যবহার করা যায়, তবে এইরূপ লৌকিকভাবে জানা-বুঝাকে ব্যাবহারিক সত্য বলে। ইহা দ্বারা কেবল সাধারণ লোকের ব্যবহার মাত্র চলে।

১৮। জ্রূণের আদিম অবস্থার নাম ক ল ল।

নাই, পর লোক নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল বা বিপাক নাই, এবং কোনো অযোনিসম্ভব জীব নাই।' ইহা খণ্ডন করিয়া স্বর্গ বা অপবর্গ-বিশিষ্ট কোনো অভীষ্ট ফলের প্রত্যাখ্যানেও তাহারা পরাঙ্মুখ [১৯] হয় না। এবং এইরূপে অকুশল কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্ত হইয়া নরকাদি মহা পতন-স্থানে পতিত হইতে উদ্যত হয়। ইহাদের এই কুবুদ্ধির (বা কুমতের) নিবৃত্তির জন্য, নিয়ত অকুশল কর্ম্ম-কারী এই হীন শিষ্যগণকে অকুশল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, ইহাদের হৃদয়ের অভিপ্রায়কে অনুবর্ত্তন করিয়া ভগবদ্ বুদ্ধেরা কোনো স্থানে 'আত্মা আছে' ইহাও জানাইয়াছেন। এসম্বন্ধে মধ্যমকাবতারে সবিশেষ উক্ত হইয়াছে, এই জন্য এখানে আর কিছু বেশী বলা হইল না।

আর যাহারা 'আত্মা আছে' এই মতে পরিচালিত হওয়ায় 'আত্মা' ও 'আত্মীয়' এই বুদ্ধির স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহারা সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় দূরে গমন করিলেও সংসারকে অতিক্রম করিয়া শিব অজর অমরণ নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে না। এই সৎকায়দৃষ্টিশালী মধ্যম শিষ্যগণের 'আত্মা আছে' এই অভি-নিবেশকে শিথিল করিবার জন্য এবং নির্ব্বাণে তাহাদের অভিলাষকে উৎপাদন করিবার জন্য শিষ্যজনানুগ্রহকারী ভগবদ্ বুদ্ধগণ 'অনাত্মা' ইহাও বলিয়াছেন।

আর যাহাদের আত্মস্নেহ বিগত হইয়াছে, যাহরা পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা গম্ভীর ধর্ম্মের অভিপ্রায় জানিয়া নির্ব্বাণের সমীপস্থ হইয়াছে, যাহারা পরম গম্ভীর বুদ্ধবচনের অর্থতত্ত্ব অবগাহন করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত উত্তম শিষ্যগণের হৃদয়ের অভিপ্রায়-বিশেষ অবধারণ করিয়া বুদ্ধগণ 'আত্মা অনাত্মা কিছুই নাই' ইহা উপদেশ দিয়াছেন। আত্মদর্শন যেমন অতত্ত্ব, অনাত্মদর্শনও তেমনি অতত্ত্ব। যেমন আর্য্যরত্নকূটে উক্ত হইয়াছে:—

> "হে কাশ্যপ, 'আত্মা' এই এক অন্ত, আর 'নৈরাত্ম্য' (অনাত্মা) এই অপর অন্ত। এই দুই অন্তের যাহা মধ্য তাহা অরূপ্য (অবর্ণনীয়)

১৯। "স্বর্গাপ ... ক্ষেপপরাঙ্মুখাঃ", এখানে কি, "স্বর্গাপ ... ক্ষেপা-পরাঙ্মুখাঃ" হওয়া উচিত নয়?

অনির্দর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অবিজ্ঞাপ্য ও অনাধার। হে কাশ্যপ, ইহাই মধ্যম পথ, অর্থাৎ পদার্থসমূহের যথাযথ তত্ত্বাবধারণ।"[২০]

যেহেতু এইরূপে হীন, মধ্যম, ও উৎকৃষ্ট শিষ্যজনের আশয় ভিন্ন-ভিন্ন বলিয়া তদনুসারে, 'আত্মা' 'অনাত্মা' ও 'আত্মাও নহে অনাত্মাও নহে' এই রূপে ভগবদ্ বুদ্ধগণের ধর্ম্মোপদেশ ভিন্ন-ভিন্ন, সেইজন্য মাধ্যমিকগণের আগমবাধা নাই। এই জন্য আর্য্যদেব (চতুঃশতিকা, ৮.১৫) বলিয়াছিলেন—

"প্রথমে অপুণ্যের নিষেধ, মধ্যে আত্মার নিষেধ, এবং শেষে সমস্তের নিষেধ, যে ইহা জানে সে বুদ্ধিমান্।"

আচর্য্যপাদও সেইরূপ বলিয়াছেন :—

"বৈয়াকরণ যেমন মাতৃকাও পড়াইয়া থাকেন,[২১] বুদ্ধও সেইরূপ শিষ্যগণকে যথাযোগ্য ভাবে ধর্ম্ম উদেশ দিয়াছেন।"

তিনি কাহাকেও কাহাকেও পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য, কাহাকেও-কাহাকেও তাহাদের পুণ্যসিদ্ধির জন্য, কাহাকেও কাহাকেও বা পাপনিবৃত্তি ও পুণ্যসিদ্ধি এই উভয়েরই জন্য ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন। কাহাকেও দয়া মিশ্রিত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন—যাহা গম্ভীর এবং যাহা শুনিলে ভীরুরা ভয় প্রাপ্ত হয়।[২২] তিনি কাহাকেও শূন্যতা ও করুণা-মিশ্রিত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, এবং কাহাদিগকে এমন ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন যাহাতে বোধিলাভ হয়।"

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

২০। দ্রষ্টব্য—সংযুত্তনিকায়, ১২.১৫.৭ (PTS. Vol II. p. 17) :—"হে কাত্যায়ন, 'সমস্ত আছে' এই এক অন্ত ; আর 'সমস্ত নাই' এই দ্বিতীয় অন্ত। হে কাত্যায়ন, তথাগত এই দুই-ই অন্ত গ্রহণ না করিয়া (ইহাদের) মধ্য দ্বারা ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া থাকেন।"

২১। বৈয়াকরণ ব্যবকরণেরই তত্ত্ব শিখাইবেন, কিন্তু তিনি কোনো কোনো ছাত্রকে মাতৃকা অর্থাৎ বর্ণমালাও শিখাইয়া থাকেন।

২২। "যাহা গম্ভীর" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যেরও সহিত অন্বিত হইতে পারে।

রঘুবংশের দিলীপাখ্যান

কালিদাসের রঘুবংশে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত রাজা দিলীপের রমণীয় আখ্যান সুপ্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ১৯৮ ও ১৯৯ তম অধ্যায়েও ঠিক এই আখ্যান পাওয়া যায়। উভয় আখ্যানের কেবল ঘটনাগত নহে, শব্দ- ও অর্থ-গতও কতদূর মিল আছে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

কালিদাস ও পুরাণকার উভয়ের মধ্যে কে কাহা হইতে এই আখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিয়া থাকে। পুরাণসমূহের প্রাচীনতা লোকের নিকট সাধারণত প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আধুনিক আলোচনায় দেখা গিয়াছে, পুরাণগুলিকে সাধারণ ভাবে যতদূর প্রাচীন বলিয়া মনে করা হইত সমস্ত পুরাণই বস্তুত সেরূপ নহে, বা কোনো কোনো পুরাণের সমগ্র অংশই প্রাচীন রচনা নহে, কোনো কোনো পুরাণের কোনো কোনো অংশ অনেক পরবর্ত্তী কালেও যোজিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পদ্মপুরাণের রচনা ও আলোচ্য বিষয়সমূহ দেখিয়া মনে হয় ইহারও অনেক অংশ বহু পরবর্ত্তী কালে রচিত। উত্তরখণ্ডে (২৫২) মধ্বসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ তপ্ত চক্রাদির চিহ্নধারণের বিধিসম্বন্ধে[১] আলোচনা দেখিলে বোধ হয় মাধ্বাচার্যের (১১৯৭-১২৭৭খ্রী.) পরে ঐ অংশ যোজিত। সৃষ্টিখণ্ডে (৯. ১৫৩) উক্ত হইয়াছে রঘুর পুত্র দিলীপ, কিন্তু আলোচ্য অংশে (উত্তরখণ্ড, ১৯৯. ৬৫) ঠিক রঘুবংশেরই মত বলা হইয়াছে দিলীপের পুত্র রঘু।

১। মাধ্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা বাহুমূলে ও বক্ষস্থলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের ছাপ আগুনে তাতাইয়া তাহার দাগ লইয়া থাকেন।

উভয় অংশের রচয়িতা যে এক ব্যক্তি নয় ইহা দ্বারাও তাহা বুঝা যায়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ন্যায় পদ্মপুরাণেরও উত্তরখণ্ড উত্তর কালেই রচিত। ইহা উ ত্ত র কাণ্ড, উ ত্ত র খণ্ড এই নামেরও দ্বারা সূচিত হয়। ইহা ভাবিয়া এবং উভয় আখ্যানের বিচার করিয়া আমার মনে হয় পুরাণকারই কালিদাসের আখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন।২

আলোচ্য আখ্যানটি পদ্মপুরাণে এই প্রসঙ্গে উত্থিত হইয়াছে (১৯৭):— কান্যকুব্জে শরভ নামে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৈশ্য ছিলেন। বহু বৎসর অতীত হইলেও কোনো সন্তান না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাল যাপন করিতেন। একদা মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল তাঁহার গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করেন। দেবল ধ্যানবলে সন্তান না হওয়ার কারণ অবগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন৩ শরভের স্ত্রী গৌরীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন যে, যদি তিনি গর্ভিণী হন্ তাহা হইলে নানাবিধ উত্তম উপকরণে পূজা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন। পরে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইলে তিনি নিজে না গিয়া নিজের সখীদিগকে উপকরণ সামগ্রী দিয়া দেবীকে পূজা করিবার জন্য মন্দিরে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার নিজে না যাইবার এই কারণ যে, তাঁহাদের

২। পরবর্ত্তী টীকা তিনটি দ্রষ্টব্য।

৩। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (১৯৭.২৭)—"এবং চিন্তয়তস্তস্য গৃহে মুনিবরস্তদা। দেবলোঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানো বরং দাতুং সমাযযৌ।" ইহাতে সূচিত হয়, দেবল পূর্ব্বে সমস্তই জানিয়া শরভকে বর দিবার জন্য গিয়াছিলেন। আবার পরে বলা হইতেছে (৪৬—৪৭) "ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বৈশ্যবর্য্যস্য দেবলঃ। মনঃ ক্ষণং স্থিরং কৃত্বা দধ্যৌ মীলিতলোচনঃ॥ সন্ততের্দ্দম্পত্যোর্দৃষ্ট্বা প্রতিবন্ধস্য কারণম্। দেবলোঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানী বভাষে কারয়ন্ স্মৃতিম্॥" দেবল যখন পূর্ব্বেই সমস্ত জানিতেন তখন তাহা জানিবার জন্য আবার ধ্যান করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতএব দেখা যাইতেছে, এই আখ্যানলেখক পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিয়া নিজের অপটুতা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ইহাতে ইহাও সূচিত হইতে পারে, তিনি ইহা অন্যের কথা গ্রহণ করিতে গিয়াই এইরূপ করিয়া ফেলিয়াছেন। এখানে তুলনীয়—"সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্।"—রঘু ১.৭৪।

বংশে গর্ভিণীরা বাড়ীর বাহির হইতে পারেন না। সখীরা যথাবিধ পূজা দিয়া গৌরীর নিকটে ঐ বৈশ্যপত্নীর নিজে না আসিবার কারণ নিবেদন করিল। কিন্তু গৌরী ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি শাপ দিলেন যে, যেহেতু ঐ বৈশ্যপত্নী নিজে না আসিয়া, অথবা নিজের পতিকে না পাঠাইয়া অন্যের দ্বারা পূজা পাঠাইয়া দিয়াছেন এইজন্য তাঁহার গর্ভাভিলাষ নিষ্ফল হইবে।[৪] যদি তাঁহারা স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই আগমন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন, তবে তাঁহাদের পুত্র হইবে। এই শাপ সেই বৈশ্য, বা তাঁহার স্ত্রী, অথবা ইঁহার সখীগণ কেহই শুনিতে পান নি।[৫] দেবল শরভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে বৈশ্য, আপনার সন্তান না হইবার কারণ এই কথিত হইল, পূর্ব্বে যেমন বসিষ্ঠ দিলীপের সন্তান প্রতিবন্ধের কারণ বলিয়াছিলেন। সেই রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া যেমন সস্ত্রীক নন্দিনীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ গৌরীকে সন্তুষ্ট করুন।' বৈশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই রাজা দিলীপ কে, আর নন্দিনীই বা কে। দেবল ইহার উত্তরে আলোচ্য আখ্যানে দিলীপের বর্ণনা করিলেন।

৪। "দোহদোহফলঃ" (পদ্ম ১৯৩.৯৫)। বৈশ্যপত্নী গর্ভিণী হইয়াছিলেন (১৯৩.৫২); অতএব এখানে বলা উচিত ছিল গ র্ভ নিষ্ফল হইবে, কিন্তু তাহা না বলিয়া দো হ দ (গর্ভবতীর বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি উপভোগের অভিলাষ) নিষ্ফল হইবে বলা হইল। ইহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই।

৫। 'স শাপো ন ত্বয়া বৈশ্য ন চৈব তব ভার্য্যযা। শ্রুতঃ সখীভিরন্যা নো প্রসাদশ্চ ত্বয়ার্পিতঃ॥"—পদ্ম ১৯৭.৯৬। তুলনীয়ঃ—"স শাপো ন ত্বযা রাজন্ নচ সারথিনা শ্রুতঃ। নদত্যাকাশগঙ্গাযাঃ স্রোতস্যুদ্দামদিগজে॥"—রঘু ১.৭৮। এখানে দেখিতে হইবে. সেই বৈশ্য ও বৈশ্যপত্নীর শাপ শু নি বা র কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কেননা তাঁহারা কেহই গৌরীমন্দিরে যান নি। অপর পক্ষে রঘুবংশে রাজা ও সারথির শাপ শুনিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মন্দাকিনীর স্রোতে দিগ্‌গজের শব্দে তাঁহারা শুনিতে পান নাই। বৈশ্য ও তাঁহার পত্নীর যখন ঐ শাপ শুনিবার সম্ভাবনাই নাই তখন তাহা উল্লেখের কোনো আবশ্যকতা দেখা যায় না। পদ্মপুরাণের "শ্রুত" শব্দের অর্থ যদি 'জ্ঞাত' ধরা যায়, অর্থাৎ তাঁহারা কেহই সেই শাপ জানিতেন না, তাহা হইলে "জ্ঞাতঃ" লিখাই উচিত ছিল। তাই মনে হয়, পুরাণের আখ্যান-লেখক কালিদাসের কবিতাটিকেই মনে রাখিয়া নিজের শ্লোকটা লিখিয়াছেন।

এইবার আমরা উভয় আখ্যানের কতকগুলি শ্লোক পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া দিব; বাহুল্য ভয়ে অবশিষ্টগুলির কেবল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইবে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অনায়াসেই তাহা দ্বারা আলোচনা করিতে পারিবেন।

পদ্মপুরাণ	রঘুবংশ
উত্তরখণ্ড, ১৯৮তম অধ্যায়	প্রথম সর্গ
বৈবস্বতমনোর্ব্বংশে দিলীপো ভূভুজাং বরঃ। আসীৎ প্রাচীনবর্হিস্তু স্বায়ম্ভুবমনোরিব ॥ ২ ॥	বৈবস্বতমনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্। আসীন্ মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥ ১১ ॥
মগধাধিপতেঃ পুত্রী মহিষী তস্য ভূপতেঃ। সুদক্ষিণাখ্যয়া খ্যাতা শচীবাসীদ্ দিবস্পতেঃ ॥ ৪ ॥	তস্য দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না মগধবংশজা। পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসী- দধ্বরস্যেব দক্ষিণা ॥ ৩১ ॥
ইত্যালোচ্য স ভূপালো গমিষ্যন্নাশ্রমং গুরোঃ। মন্ত্রিম্বারোপয়ামাস কোশলামুক্তিকোশলাম্ ॥ ১৬ ॥[৬]	...স্বভুজাবদবতারিতা তেন ধূর্জগতো গুর্ব্বী। সচিবেষু নিচিক্ষিপে ॥ ৩৪ ॥
বৃষ্যাং নিষণ্ণমব্যগ্র- মরুন্ধত্যোপসেবিতম্। স ববন্দে গুরোঃ পাদৌ মহিষী সা চ তৎস্ত্রিয়াঃ ॥ ২৪ ॥	স দদর্শ তপোনিধিম্। অন্বাসিতমরুন্ধত্যা ॥ ৫৬ ॥ তয়োর্জগৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী ॥ ৫৭ ॥

৬। "কোশলা," স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ লক্ষণীয়।

অতিথিং তমথাভ্যর্চ্চ্য
মধুপর্কাদিভির্গুরুঃ।
অর্হৈরর্হতাং শ্রেষ্ঠো
বসিষ্ঠ ইতি পৃষ্টবান্॥ ২৫॥

তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায়
অর্হণামর্হতে চক্রুঃ॥ ৫৫॥

রাজ্যে কুশলমস্তি তে॥ ২৬॥

পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে॥ ৫৮॥

ইত্যাকর্ণ্য বসিষ্ঠস্তু
বচস্তস্য মহীপতেঃ।
উবাচ সন্ততিস্তম্ভ-
হেতুং বীক্ষ্য সমাধিনা॥ ৪৬॥

সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন
সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্॥ ৭৪॥

ত্বং পুরা রাজশার্দূল
সংসেব্য সুরনায়কম্।
মাতামিমাং বধূং স্মৃত্বা
চলিতো নিজমন্দিরম্॥ ৪৭॥

পুরা শক্রমুপস্থায়
তবোর্ব্বীং প্রতি যাস্যতঃ।
আসীৎ কল্পতরুচ্ছায়া-
মাশ্রিতা সুরভিঃ পথি॥ ৭৫॥

গচ্ছতস্ত্বরয়া তাত
সম্ভাষণোৎকণ্ঠিতস্য তে।
আসীৎ সুরতরোর্মূলে
কামধেনুঃ স্থিতা পথি॥ ৪৮।

ধর্ম্মলোপভয়াদ্ রাজ্ঞী-
মৃতুস্নাতামিমাং স্মরন্।
প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াং
তস্যাং ত্বং সাধু নাচরঃ॥ ৭৬॥

উৎপাদিতা ত্বয়া তস্যাঃ
পূজ্যাঙ্ঘ্রিরজসোঽতিরুট্।
প্রদক্ষিণনমস্কার-
সদাচারমকুর্বতা॥ ৪৯॥

সাশপৎ ত্বামতিক্রোধাৎ

অবজানাসি মাং যস্মাদ্

পুত্রো নোৎপৎস্যতে তব।
মম সন্তানশুশ্রূষাং
যাবৎ ত্বং ন করিষ্যসি ॥ ৫০ ॥

গচ্ছংস্ত্বমৃতুদানায়
ত্বরয়া সুতকামুকঃ।
তন্মনা নাশৃণোঃ শাপং
ন যন্তাক্ষনিনাদতঃ ॥ ৫১ ॥

তস্যাঃ সুতাসুতাং ধেনুং
নন্দিনীং সসুতাং মম
আরাধয়ানয়া বধ্বা
সার্দ্ধং তে দাস্যতে সুতম্ ॥ ৫২ ॥

ইত্যাক্রবতি তত্রর্ষৌ
বসিষ্ঠে সা তু নন্দিনী।...
তপোবনাৎ সমাযাতা ॥ ৫৩ ॥

তাং দৃষ্ট্বা...বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ ভূপতিং ভূয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

রাজন্ সমাগতা শ্রেয়া
স্মৃতমাত্রা শুভাবহা।
অতো বিদ্ধি সমীপস্থাং
কার্য্যসিদ্ধিমিহাত্মনঃ ॥ ৫৬ ॥

অতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য
প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা ॥ ৭৭ ॥

স শাপো ন ত্বয়া রাজন্
ন চ সারথিনা শ্রুতঃ ॥ ৭৮ ॥

সুতাং তদীয়াং সুরভেঃ
কৃত্বা প্রতিনিধিং শুচিঃ।
আরাধয় সপত্নীকঃ
প্রীতা কামদুঘা হি সা ॥ ৮১ ॥

ইতি বাদিন এবাস্য...
অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম
ধেনুরাববৃতে বনাৎ ॥ ৮২ ॥

তাং দৃষ্ট্বা তপোনিধিঃ
পুনরব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥

অদূরবর্ত্তিনীং সিদ্ধিং
রাজন্ বিগণয়াত্মনঃ।
উপস্থিতেয়ং কল্যাণী
নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ ॥ ৮৭ ॥

১২তম অধ্যায়	দ্বিতীয় সর্গ
৩	৬
	৫
অথ ভূমিপতেস্তস্য ভাবজিজ্ঞাসয়া তু সা বিবেশ নির্ভয়স্বান্তা সুশষ্পাং হিমবদ্গুহাম্ ॥ ১১ ॥	অন্যেদ্যুরাত্মানুচরস্য ভাবং জিজ্ঞাসমানা মুনিহোমধেনুঃ। গঙ্গাপ্রপাতান্তবিরূঢ়শষ্পং গৌরীগুরোর্গহ্বরমাবিবেশ ॥ ২৬॥
পশ্যতা হিমবৎসানু- শোভামথ মহীভৃতা অলক্ষিতাগমঃ সিংহো বলাজ্জগ্রাহ নন্দিনীম্ ॥ ১২ ॥	...ইত্যদ্রিশোভাপ্রহিতেক্ষণেন অলক্ষিতাভ্যুৎপতনো নৃপেণ প্রসহ্য সিংহঃ কিল তাং চকর্ষ ॥ ২৭ ॥
তদাক্রন্দিতমাকর্ণ্য তস্যাঃ স জগতীপতিঃ। হিমবৎসানুসংলগ্নাং নিজদৃষ্টিং ন্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ১৪ ॥	তদীয়মাক্রন্দিতমার্ত্তসাধো- র্গুহানিবদ্ধপ্রতিশব্দদীর্ঘম্। রশ্মিষ্বিবাদায় নগেন্দ্রসক্তাং নিবর্ত্তয়ামাস নৃপস্য দৃষ্টিম্ ॥ ২৮ ॥
১৫ — ১৮	৩০ — ৩১
তাদৃশং নৃপমালক্ষ্য জগাদ স মৃগাধিপঃ। নরবাচা ভৃশং ভূয়ো বিস্ময়ং প্রাপয়ন্নিদম্ ॥ ১৯ ॥	তং...মনুষ্যবাচা মনুবংশকেতুং। বিস্মায়য়ন্ বিস্মিতমাত্মবৃত্তৌ ......নিজগাদ সিংহঃ ॥
২০ — ২৮	৩৫—৪০
৩৬ — ৩৭	৪৩, ৫৩, ৫৫
তস্য প্রতীক্ষমাণস্য	তস্মিন্ ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানা-

সিংহপাতং সুদুঃসহম্।
পপাতোপরি পুষ্পাণাং
বৃষ্টির্মুক্তা সুরেশ্বরৈঃ ॥ ৩৯ ॥

মুৎপশ্যতঃ সিংহনিপাতমুগ্রম্।
অবাঙ্মুখস্যোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ
পপাত বিদ্যাধরহস্তমুক্তা ॥ ৬০ ॥

পুত্রোত্তিষ্ঠেতি বচনং
শ্রুত্বা রাজা স উত্থিতঃ।
জননীমিব তাং ধেনুং
দদর্শ ন মৃগাধিপম্ ॥ ৪০ ॥

উত্তিষ্ঠ বৎসেত্যমৃতায়মানং
বচো নিশম্যোত্থিতমুত্থিতঃ সন্।
দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং
গামগ্রতঃ প্রস্রবিনীং ন সিংহম্ ॥ ৬১ ॥

মায়য়া সিংহরূপিণ্যা
ত্বং ময়াসি পরীক্ষিতঃ।
মুনিপ্রভাবান্ মাং রাজন্
গ্রহীতুং ন ক্ষমোঽন্তকঃ ॥ ৪১ ॥

তং বিস্মিতং ধেনুরুবাচ সাধো
মায়াং ময়োদ্ভাব্য পরীক্ষিতোঽসি।
ঋষিপ্রভাবান্ময়ি নান্তকোঽপি
প্রভুঃ প্রহর্ত্তুং কিমুতান্যহিংস্রাঃ ॥ ৬২॥

৪২—৪৪

৬৩—৬৪

পুত্র পত্রপুটে দুগ্ধ্বা
পয়ো মম পিবেপ্সিতম্। ॥ ৪৭ ॥

দুগ্ধ্বা পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং
পুত্রোপভুঙ্ক্ষ্বেতি তমাদিদেশ ॥ ৬৫ ॥

৪৯

৬৬

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পারসীকপ্রসঙ্গ

প্রজ্ঞার বাণী

পারসীক সাহিত্যে পহ্লবী-পাজন্দ ভাষায় ম ই নী ও ই খ র্দ[1] নামে একখানি পুস্তক আছে। খ্রী. পঞ্চদশ শতাব্দীতে নের্যোসঙ্ঘ ধবল সংস্কৃত ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। E. W. West সাহেব ইংরাজী অনুবাদের সহিত উল্লিখিত মূল ও সংস্কৃত, এবং এর্বাদ তেহ্মুরস দীনশা অঙ্ক্লেসরিয়া কেবল মূল ও সংস্কৃত প্রকাশ করিয়াছেন। Sacred Books of East-নামক গ্রন্থমালায় (Vol. XXIV) West সাহেবের কেবল ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যায়। Collected Sanskrit Writings of the Parsis গ্রন্থমালায় (Part III) কেবল নের্যোসঙ্ঘের সংস্কৃত প্রকাশিত হইয়াছে।

খ র্দ শব্দ অবেস্তার খ্র তু (সংস্কৃত ক্র তু) শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ 'প্রজ্ঞা'; আর ম ই নী ও শব্দ অবেস্তার ম ই ন্যু (সংস্কৃতের ম ন্যু) শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ 'দেবতা' (spirit); ই সম্বন্ধ-বোধক বিভক্তি; অতএব ম ই নী ও ই খ র্দ শব্দের অর্থ 'প্রজ্ঞার দেবতা' বা 'প্রজ্ঞা-দেবতা'। নের্যোসঙ্ঘ ইহার অর্থ করিয়াছেন 'পরলোকীয়া বুদ্ধি'।

কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি প্রজ্ঞার বহু গুণ দেখিয়া প্রজ্ঞাদেবতার শরণাপন্ন

১। অথবা দী না ঈ ম ঈ নো গী খি র দ 'প্রজ্ঞার দেবীর অভিপ্রায়'। ইহার ঠিক নাম-সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

হন, এবং তিনিও তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলেন—'হে বন্ধু, হে স্তুতিকর, পুণ্যের দ্বারা তুমি উত্তম। তুমি আমার নিকট উন্নতি অভিলাষ কর। মজদয়াজ্ঞী (জরথুশ্ত্রীয়) উত্তম ব্যক্তিগণের সন্তোষের জন্য ইহলোকে শরীরের রক্ষার জন্য ও পরলোকে আত্মার শুদ্ধির জন্য আমি তোমার পথ-প্রদর্শিকা হইব।'

অনন্তর সেই জ্ঞানী ব্যক্তি প্রজ্ঞা দেবতাকে ক্রমান্বয়ে ৬২টি প্রশ্ন করেন, এবং তিনিও তাঁহাকে তাহাদের উত্তর প্রদান করেন।

এই প্রশ্নোত্তর অতি রমণীয়। ইহাতে জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম্মের নানা তত্ত্ব রীতি-নীতি প্রাচীনাখ্যান ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি যে অসম্পূর্ণ তাহা শেষ অংশ পড়িলেই বুঝা যায়। গ্রন্থকার কে তাহা জানা যায় না। তাঁহার সময়সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে পারা যায় না। খ্রী. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে বলিয়া কেহ-কেহ অনুমান করেন।

নিম্নে কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের ভাবানুবাদ বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যাইতেছে। এই ভাবানুবাদ সংস্কৃত ও ইংরাজী অনুবাদ হইতে করা হইয়াছে।

———

জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন—'আত্মার ক্ষতি না করিয়া কিরূপে শরীরের রক্ষা ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়? এবং শরীরের ক্ষতি না করিয়া কিরূপে আত্মার শুদ্ধি লাভ করা যায়?'

প্রজ্ঞাদেবতা উত্তর করিলেন—'তোমা হইতে যে ছোট, তুমি তাঁহাকে সমান বলিয়া মনে কর; সমানকে মহত্তর বলিয়া মনে কর, এবং মহত্তরকে অধিপতি, ও অধিপতিকে রাজা বলিয়া মনে কর।

রাজাদের ভক্ত ও আদেশকারী হইবে এবং তাঁহাদের নিকটে সত্যবাদী হইবে। সহচরগণের (অথবা সহায়কগণের) নিকট বিনীত, মধুর ও শ্রদ্ধাবান্ হইবে।

লোভ করিও না; তাহা হইলে লোভ-দৈত্য* তোমার প্রতারণা করিতে পারিবে না, ইহলোকের শুভ তোমার নিকট স্বাদহীন হইবে না, এবং পরলোকেরও শুভ অননুভূত থাকিবে না।

কোপ করিও না; কেননা যে ব্যক্তি কোপ করে সে পুণ্য কার্য্য, নমস্কার, ও আরাধনাকে ভুলিয়া যায়, এবং যে পর্য্যন্ত কোপ শান্ত না হয় ততক্ষণ সমস্ত পাপ ও সমস্ত দোষ তাহার মনে উপস্থিত হয়, এবং সে তখন অহর্মনের (অহুর মজদার প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্‌র মইন্যুর) সমান বলিয়া উক্ত হয়।

চিন্তা করিও না; কেননা যে চিন্তা করে, পরলোকের ও ইহ লোকের আনন্দ তাহার কোনো উপকার করে না, এবং তাহাতে শরীর ও আত্মা উভয়ই ক্ষীণ হয়।

কামচিন্তা করিও না, যাহাতে তোমার নিজের কার্য্য হইতে ক্ষতি ও অনুতাপ তোমার নিকট উপস্থিত না হয়।

অসৎ ঈর্ষ্যা করিও না, যাহাতে তোমার জীবন স্বাদহীন হইয়া না যায়।

লজ্জায় পাপ করিও না; কারণ শুভ (সুখ), অলঙ্কার, ঋদ্ধি, রাজ্য, ও গুণ মানুষের ইচ্ছায় বা কর্ম্মে হয় না, এই সমস্ত পূর্ব্ব নিমিত্ত (ভাগ্য), রাশি ও গ্রহচক্র, এবং সাধু পুরুষগণের ইচ্ছায় হয়।

আলস্য করিও না, যাহাতে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও পুণ্য অকৃত না থাকে।

পরীক্ষা করিয়া শীলবতী স্ত্রী করিবে। সেই স্ত্রী উত্তম শেষে যিনি অধিকতর প্রশংসনীয় হন।

বলপূর্ব্বক কাহারো ধন অপহরণ করিও না, যাহাতে তোমার নিজের সদ্‌-ব্যবসায় নিষ্ফল হইয়া না থাকে। উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের সদ্ ব্যবসায়ের দ্বারা ভক্ষণ না করিয়া অন্যের লইয়া খায়, সে মনুষ্যের মস্তক হস্তে ধারণ করিয়া তাহার মজ্জা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

অন্যের স্ত্রী হইতে নিবৃত্ত থাক; কেননা ইহাতে ধন, শরীর, ও আত্মা এই তিনই নিষ্ফল হয়।

শত্রুর সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ কর।

ইহলোকের জন্য অতি ব্যবস্থা করিও না, কারণ যে এইরূপ করে সে পরলোক বিনাশ করে।

প্রচুর ধন-সমৃদ্ধিতে উদ্ধত হইও না, কেননা শেষে এই সমস্তকেই তোমার ত্যাগ করা আবশ্যক।

রাজ্যে উদ্ধত হইত না, কেননা শেষে তোমাকে অ-রাজা হইতে হইবে।

গৌরবে ও সম্মানে উদ্ধত হইও না, কেননা পরলোকে তাহা সহায় হয় না।

মহৎ গোত্র ও বংশবৃদ্ধিতে উদ্ধত হইও না, কেননা শেষে তোমার কর্ম্মই তোমার পক্ষে থাকে।

জীবনের দ্বারা উদ্ধত হইও না, কারণ শেষে মৃত্যুই ইহার উপরে হয়, মৃতদেহের মাংস কুক্কুর ও পক্ষী খায়, আর অস্থিসমূহ ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে। ১

জ্ঞানী প্রজ্ঞাদেবতাকে প্রশ্ন করিলেন—'উত্তম কি, উদারতা না সত্য? কৃতজ্ঞতা না প্রজ্ঞা? সম্পূর্ণ মনোযোগিতা না সন্তোষ?'

প্রজ্ঞাদেবতা উত্তর করিলেন—'আত্মার জন্য উদারতা, সমস্ত লোকের জন্য সত্য, সাধুপুরুষগণের জন্য কৃতজ্ঞতা, মানুষের জন্য প্রজ্ঞা, সমস্ত কর্ম্মের জন্য মনোযোগিতা, এবং শরীরের ধারণ এবং অহর্মন ও দৈত্যগণের বিনাশের জন্য সন্তোষ উত্তম।' ৩

জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন—'দুর্বৃত্ত অহর্মনের, তাহার দৈত্যগণের, ও তাহার কুসৃষ্টিসমূহের সহিত অহুরমজদার ও তাহার প্রধান অনুচরগণের (অমেশস্পন্দসমূহের) সম্মিলন ও প্রীতি হইতে পারে কি না?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'কোনোরূপে হইতে পারে না; কারণ অহর্মন নিকৃষ্ট মিথ্যা উক্তিকে চিন্তা করে এবং ইহার কার্য্য হইতেছে ক্রোধ, দ্বেষ ও অসম্মিলন; আর অহুরমজদা ধর্ম্মকে চিন্তা করেন, ইঁহার কার্য্য পুণ্য, সাধুতা, ও সত্য। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট স্বভাব ছাড়া সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। উৎকৃষ্ট স্বভাবকে কোন উপায়ে নিকৃষ্ট করিতে পারা যায় না, আর নিকৃষ্ট স্বভাবকে

কোনো উপায়ে উৎকৃষ্ট করা যায় না। অহুরমজদা উৎকৃষ্টস্বভাব বলিয়া কোনো নিকৃষ্টতা ও অসত্যকে অনুমোদন করেন না; আর অহর্মনও নিকৃষ্টস্বভাব বলিয়া কোনো উৎকৃষ্টতা ও সত্যকে অনুমোদন করেনা। এইজন্য ইহাদের একের সহিত অন্যের সম্মিলন ও প্রীতি হইতে পারে না।' ১০

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'প্রজ্ঞা, না গুণ, না সাধুতা উত্তম?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—প্রজ্ঞার সহিত যদি সাধুতা না থাকে, তবে তাহা প্রজ্ঞা নহে। গুণের সহিত যদি প্রজ্ঞা না থাকে,' তবে তাহা গুণ নহে।' ১১

জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন—'দারিদ্র্য, ধনশালিতা, ও রাজ্য, ইহাদের মধ্যে উত্তম কি?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'সদ্‌বৃত্ততার সহিত যে দারিদ্র্য, তাহাই পরের ধনে ধনশালিতা অপেক্ষা উত্তম। রাজ্যের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, কোনো এক দ্বীপের কুরাজ্য (কুশাসন) অপেক্ষা একখানি গ্রামেরও সুরাজ্য (সুশাসন) উত্তম; কেননা সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরমজদা সৃষ্টির রক্ষার জন্য সুরাজ্য উৎপাদন করিয়াছেন; আর দুর্বৃত্ত অহর্মন সুরাজ্যের প্রতিঘাতের জন্য কুরাজ্য উৎপাদন করিয়াছে।

তাহাই সুরাজ্য যাহা জনপদকে সমৃদ্ধ করে, দুর্ব্বলগণকে নিরুপদ্রব রাখে, এবং ন্যায়, আচার, ও সত্যকে স্থাপিত রাখে। ইহা অসৎ ন্যায় ও আচারকে অপনয়ন করে, জল ও অগ্নিকে বিশুদ্ধ রাখে, ধার্ম্মিকগণের যজ্ঞকে প্রবর্ত্তমান রাখে, ও দুর্ব্বলগণের সহায় করিয়া দেয়। (ইহাতে লোকে) উত্তম মজদযজ্ঞীয় ধর্ম্মের জন্য নিজের শরীর ও জীবনকে সমর্পন করে। যদি কোনো ব্যক্তি অহুরমজদীয় পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য ইহা আদেশ দেয়; ইহা তাহাকে ধরিয়া আনে এবং পুনর্ব্বার ঐ পথে স্থাপিত করে; তাহার যে ধন থাকে তাহা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে, দরিদ্রগণকে, ও পুণ্য কার্য্যের জন্য দান করে, এবং আত্মার জন্য তাহার শরীরকে সমর্পন করে। এই

প্রকারে যে ব্যক্তি সু-রাজা হয় সে অহুরমজদার ও তাঁহার প্রধান অনুচরগণের সদৃশ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

তাহাই কুরাজ্য যাহা সত্য, যোগ্য ন্যায়, ও আচারকে বিনাশ করে, এবং যাহা বলাৎকার, অপহরণ ও অন্যায়কে আনয়ন করে। ইহা পরলোকীয় শুভকে বিনাশ করে, লোভবশত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও পুণ্যকে পীড়িত করে, পুণ্যকারী ব্যক্তিকে পুণ্যকর্ম্ম করিতে দেয় না, এবং এইরূপে তাহার ক্ষতিকর হইয়া থাকে। ইহলোকীয় সমৃদ্ধির পরিচালন, নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের পোষণ ও প্রশংসা, উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণের বিনাশ ও নিন্দা, এবং দুর্ব্বল দরিদ্রগণের উচ্ছেদ, এই সমস্তই ইহার নিজের দেহের জন্য। যে এই প্রকারে কু-রাজা হয় সে অহর্মন ও দৈত্যগণের সদৃশ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।' ১৫

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'সে কোন্ আনন্দ যাহা বিষ হইতেও নিকৃষ্টতর?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'যে ধন পাপ দ্বারা উপার্জ্জিত, তাহাতে লোক আনন্দিত হইলেও তাহার সেই আনন্দ বিষ হইতেও নিকৃষ্টতর।' ১৭

'জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—ভয়ে ও মিথ্যায় জীবনধারণ ও মরণ ইহাদের মধ্যে কোনটি নিকৃষ্টতর?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'ভয়ে ও মিথ্যায় জীবন ধারণ মরণ হইতে নিকৃষ্টতর; কেন না ইহ লোকের সুখ ও আনন্দেরই জন্য প্রত্যেকের জীবন রুচিকর হয়, কিন্তু যখন ইহলোকের সুখ ও আনন্দ থাকে না; অথচ ভয় ও মিথ্যা থাকে, তখন তাহা মরণ ও অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।'১৯

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'রাজাদের অধিকতর লাভকর ও অধিকতর হানিকর কি?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'জ্ঞানী- ও সজ্জন-গণের সহিত আলাপ করা

(প্রশ্নোত্তর করা) রাজাদের অধিকতর লাভকর ; আর খল ও দ্বিজিহ্ব[২]-গণের সহিত কথাবার্ত্তা করা (বা প্রশ্নোত্তর করা) অধিকতর ক্ষতিকর।' ২০

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'ধনীদের মধ্যে কে দরিদ্রতর, এবং দরিদ্রদের মধ্যে কে অধিকতর ধনী ?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'ধনীদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দরিদ্রতর, যে নিজের যাহা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট নয় এবং অধিক পাইবার জন্য চিন্তিত হইয়া থাকে। আর দরিদ্রের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিকতর ধনী, যে ব্যক্তি নিজের যাহা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট এবং অধিক পাইবার জন্য চিন্তিত থাকে না।' ২৫

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'নিকৃষ্টতর কে, যাহার নয়ন অন্ধ সে, না যাহার চেতনা (বা চিত্ত) অন্ধ সে ?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—যাহার নয়ন অন্ধ, তাহার যদি জ্ঞান থাকে এবং যদি সে বিদ্যা সাধন করিয়া থাকে, তবে তাহাকে সুনয়ন বলিয়া জানিতে হইবে। আর যাহার নয়ন সুন্দর, কিন্তু কোনো বিষয়ের জ্ঞান নাই, এবং কিছু শিক্ষা দিলেও যে তাহা গ্রহণ করে না, সে অন্ধ নয়ন হইতেও নিকৃষ্টতর।' ২৬

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'কোন্ রাজা, কোন্ অধিপতি, কোন্ বন্ধু, কোন্ গোত্রপতি, কোন্ স্ত্রী, কোন্ পুত্র ও কোন্ দেশ নিকৃষ্টতর ?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'সেই রাজা নিকৃষ্টতর, যে নগরকে নির্ভয় ও মনুষ্যগণকে নিরুপদ্রব করিতে পারে না। সেই অধিপতি নিকৃষ্টতর, যে কার্য্য-সামর্থ্যে বিকল, ও অনুজীবিগণের নিকট অকৃতজ্ঞ, এবং যে সেবকের সহায় হয় না ও তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করে না। সেই বন্ধু নিকৃষ্টতর, যাহাকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সেই গোত্রপতি নিকৃষ্টতর, যে ব্যাধির সময়ে সহায়

২। যাহাদের দুই জিহ্বা, অর্থাৎ যাহারা দুই কথা বলে।

হয় না। সেই স্ত্রী নিকৃষ্টতর, যাহার সহিত আনন্দে জীবন ধারণ করিতে পারা যায় না। সেই পুত্র নিকৃষ্টতর, যাহার নাম হয় না, কীর্ত্তি হয় না। এবং সেই দেশ নিকৃষ্টতর, যেখানে সুখে নির্ভয়ে ও স্থায়ী ভাবে বাস করিতে পারা যায় না ৩৪

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'কতগুলি সেইরূপ লোক আছে যাহারা ধনী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, আর কতগুলিই বা সেইরূপ লোক আছে যাহারা দরিদ্র বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'এই সমস্ত ব্যক্তি ধনী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য:—প্রথম, যে জ্ঞানপূর্ণ; দ্বিতীয়, যাহার শরীর নীরোগ ও যে নির্ভয়ে জীবন যাপন করে; তৃতীয়, নিজের যাহা আছে তাহাতে যে সন্তুষ্ট থাকে; চতুর্থ, ভাগ্য যাহার ধর্ম্মে সহায়ক; পঞ্চম, যে যজনীয় দেবগণের চক্ষে ও সজ্জনগণের জিহ্বায় সুশ্লাঘনীয়; ষষ্ঠ, মজদযাজিগণের নির্ম্মল ও উত্তম ধর্ম্মে যাহার বিশ্বাস; এবং সপ্তম, যাহার ধন সাধুতা বা সৎকার্য্যের দ্বারা উপার্জিত।

আর এই সমস্ত ব্যক্তি দরিদ্র বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য:—প্রথম, যাহার জ্ঞান নাই; দ্বিতীয়, যাহার শরীর নীরোগ নহে; তৃতীয়, যে ভয়ে ও মিথ্যায় জীবন ধারণ করে; চতুর্থ, যে নিজের শরীরের নিজে প্রভু নহে; পঞ্চম, যাহার ভাগ্য সহায়ক নহে; ষষ্ঠ, যে যজনীয় দেবগণের চক্ষে ও সজ্জনগণের জিহ্বায় শ্লাঘনীয় নহে; এবং সপ্তম, যে বৃদ্ধ অথচ যাহার পুত্র ও বংশ নাই। ৩৫

জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন—'কত উপায়ে ও কত পুণ্য কারণে লোকেরা অধিকভাবে স্বর্গে গমন করে?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'প্রথম পুণ্যকার্য্য উদারতা; দ্বিতীয়, সত্য; তৃতীয়, কৃতজ্ঞতা; চতুর্থ, সন্তোষ; পঞ্চম, সজ্জনগণের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা ও সকলের

সহিত মৈত্রী ; ষষ্ঠ, এই বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া থাকা যে, এই আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহলোকীয় ও পরলোকীয় সমস্তশুভ স্থষ্টিকর্ত্তা অহুরমজদা হইতে ; সপ্তম, এই বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া থাকা যে, সমস্ত অন্যায় ও প্রতিঘাত দুর্বৃত্ত অহর্মন হইতে ; অষ্টম, এই বিষয়ে নিশ্চয় করা যে, শবের পুনরুত্থান (resurrection) হয় ও শরীর অক্ষত থাকে ; নবম, যে আত্মার প্রীতির জন্য অতিনিকট সম্বন্ধের মধ্যে[৩] বিবাহ করে ; ···পঞ্চদশ, যে উত্তম লোকের প্রতি বাঞ্ছা করে ; ষোড়শ, যে ব্যক্তি দ্বেষ ও নিকৃষ্ট প্রীতিকে মন হইতে দূরে রাখে ; অষ্টাদশ, যে কাম চিন্তা করে না ; একোনবিংশ, যে কাহারো সহিত অমিল করে না,··· একবিংশ, যে শরীরে ক্রোধ ধারণ করে না ; দ্বাবিংশ, যে লজ্জায় পাপ করে না ; ত্রয়োবিংশ, যে আলস্যে স্বেচ্ছায় নিদ্রা করে না ; চতুর্বিংশ, অহুরমজদায় যাহার সুনিশ্চয় আছে ; পঞ্চবিংশ, যাহার স্বর্গে ও নরকে এবং স্বর্গে পুণ্যকার্য্যের ও নরকে পাপ কার্য্যের যে হিসাব হইবে তাহাতে সুনিশ্চয় থাকে ; ষড়বিংশ, যে খলতা ও ঈর্ষ্যাদৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত থাকে ; সপ্তবিংশ, যে নিজের সুখ উৎপাদন করে এবং অন্যকেও সুখ প্রদান করে ; অষ্টাবিংশ, যে সজ্জনগণের সহায় ও নিকৃষ্টগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ; একোনত্রিংশ, যে প্রতারণা ও স্বেচ্ছাচারিতা হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে ; ত্রিংশ, যে অসত্য ও মিথ্যা বলে না ; একত্রিংশ, যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইতে দৃঢ়ভাবে নিজেকে রক্ষা করে ; দ্বাত্রিংশ, যে লাভ ও কল্যাণ ভাবিয়া অন্যকে অন্যায় হইতে রক্ষা করে ; এবং ত্রয়স্ত্রিংশ, যে পীড়িতগণকে, বিবিক্তবাসিগণকে (অথবা পান্থগণকে) ও বণিগ্‌গণকে বিশ্রামস্থান প্রদান করে।'

জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাহার শক্তি বাঞ্ছনীয়তর (যোগ্যতর) ? কাহার বুদ্ধি সম্পূর্ণতর ? কাহার শীল পটুতর ? কাহার বাণী শুদ্ধতর ? কাহার মনে সাধুতা প্রভূততর ? কাহার মৈত্রী নিকৃষ্টতর ? কাহার মনে আনন্দ অল্পতর ? কাহার মন স্পৃহণীয়তর ? কাহার সহিষ্ণুতা (অথবা ভারবহন-শক্তি)

৩। যেমন খুড়তুত ভাই-বোনে বিবাহ। পারসীক সমাজে এইরূপ বিবাহ প্রশস্ত।

প্রশংসনীয়তর? কে প্রবীণ বলিয়া জ্ঞেয় নহে? তাহা কি যাহা সকলেরই সহিত সকলে করিতে পারে? তাহাই বা কি যাহা কাহারো সহিত করিতে পারা যায় না? পরস্পর কথাবার্ত্তায় কি করা উচিত? তাহারা কে যাহাদিগকে সাক্ষী করা যায় না? কাহার আজ্ঞাবর্ত্তী হওয়া উচিত? তাহা কি যাহা মনে অধিক স্মরণ ও ধারণ করা উচিত? তাহাই বা কি যাহাকে কোনো কারণে অগৌরবিত করা উচিত নহে? কে তিনি, যিনি নিজের পদে অহুরমজদার ও তাঁহার প্রধান অনুচরগণের তুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এবং তিনিই বা কে, যিনি নিজের পদে অহ্রমনের ও দৈত্যগণের তুল্য বলিয়া উক্ত হন।'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'তাঁহারই শক্তি বাঞ্ছনীয়তর, যিনি কোপ করিলে ঐ কোপকে উপশান্ত করিতে, কোনো পাপ না করিতে, এবং নিজেকে আনন্দিত করিতে সমর্থ হন। তাঁহারই বুদ্ধি সম্পূর্ণতর, যিনি নিজের আত্মাকে মুক্ত করিতে পারেন। তাঁহারই শীল পটুতর যাঁহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতারণার কারণ থাকে না। তাহারই বাণী শুদ্ধতর যে অধিকতর সত্য বলে। যে মনুষ্যের মন বিনীত তাহাতেই সাধুতা প্রভূততর। দ্বেষকারী ও হিংসকের মৈত্রী নিকৃষ্টতর। ঈর্ষ্যাকারী মনুষ্যের মনে আনন্দ অল্পতর। যে ইহলোক ত্যাগ করে ও পরলোক গ্রহণ করে এবং পুণ্যের স্বাধীন অভিলাষ করে, তাহার মন স্পৃহণীয়তর। তাহারই সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়তর, যে অহ্রমনের দৈত্য ও নিকৃষ্ট সৃষ্টি-সমূহের কৃত ও উপরি আগত অন্যায় ও প্রতিঘাতের দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা প্রতিকার করিতে পারে, এবং কোনো কারণে নিজেকে পীড়ন না করে। সেই ব্যক্তি প্রবীণ বলিয়া জ্ঞেয় নহে, যে যজনীয়গণ হইতে ভয় এবং মনুষ্যগণ হইতে লজ্জা না পায়। মিলন ও প্রীতি ইহাই সকলের সহিত করিতে পারা যায়। অমিলন ও দ্বেষ ইহা কাহারো সহিত করা উচিত নহে। পরস্পর কথা-বার্ত্তায় এই তিনটি করা উচিত—নিজের মনে, বাক্যে ও কর্ম্মে যথাক্রমে সৎ চিন্তা, সৎ উক্তি ও সৎ ক্রিয়া। এই তিন জনকে সাক্ষী করা উচিত নহে:—স্ত্রী, বালক—যাহার মনুষ্যত্ব পূর্ণ হয় নি, আর দাস। এই

সমস্ত ব্যক্তি আজ্ঞাবর্ত্তী হইবে ও শুশ্রূষা করিবেঃ—পতির নিকট স্ত্রী; পিতা, মাতা, অধিপতি, গুরু, কর্ম্মপটু, অগ্নি, (পিতার) গৃহীত পুত্র ও বিবিক্তসেবীর নিকটে শিশু। স্বামী, অধিপতি, ও কর্ম্মপটুর আদেশকারী হইবে। যজনীয় দেবতাগণকে অধিক স্মরণ করা ও কৃতজ্ঞতার সহিত মনে ধারণ করা উচিত। নিজের আত্মাকে কখনো অগৌরবিত করা বিধেয় নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত। যে ন্যায়দ্রষ্টা (বিচারক) ন্যায়কে সত্য করেন ও উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণ করেন না, তিনি নিজের পদে অহুরমজদা ও তাঁহার প্রধান অনুচরগণের তুল্য বলিয়া উক্ত হন। আর যিনি ন্যায়কে অসত্য করেন, তিনি নিজের পদে অহর্মন ও দৈত্যগণের সদৃশ বলিয়া উক্ত হন। ৪৯

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বিলাতযাত্রীর পত্র

৮

হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই চমকে উঠেচি। কাছে থেকে তোমাদের যে সান্ত্বনা করতে পারতুম এত দূর থেকে তা আর সম্ভব হয় না। তোমাদের চিঠি আসতে এবং আমার উত্তর পৌঁছতে যে দীর্ঘ সময় যাবে সেই সময়ই ধীরে ধীরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি তোমাদের শুশ্রূষা করবে। জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি আর যা বলি তার মধ্যে অন্ধকার থেকে যায় কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে, আমরা ভাগ করে দেখি। ঘরের মধ্যে আমরা আলো জ্বালি, কেননা তখনকার মত ঘরের মধ্যেই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু সেই আলো জ্বালার দ্বারা আমাদের আলোকিত ছোটঘর

আর অনালোকিত বিপুল বিশ্ব আমাদের কাছে দুই স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আমরা যাকে বলি জীবন সেও সেই আলোকিত ছোট ঘরের মত, সেই টুকুর মধ্যে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে সংহত, সেই টুকুর মধ্যে আমাদের লীলাস্থল। তার বাইরে যে অসীম সত্য আছে তাকে আমরা জীবনক্ষেত্রের বিরুদ্ধ বলে ভুল করি। কিন্তু আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবিচ্ছিন্ন যোগ, যেমন এই ঘর ও বাহির একই সত্যে বিধৃত, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই—আমরা আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ব বশত অংশমাত্রকে একান্ত করে জানচি বলেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখ্‌তে পাচ্চি। আজ যেখানে আলো জ্বলচে কাল সেখান থেকে আলো সরে যেতে পারে কিন্তু আমাদের বিশ্ব সরে যাবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল সমান ধ্রুব হয়েই থাকবে। অখণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে-সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। রাত্রে জেগে উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে সে বুঝি তার মাকে হারিয়েচে—এই সত্য টুকু শিখ্‌তে তার দেরি হয় যে আলোতেও তার মা আছে অন্ধকারেও তার মা আছে। জীবন মৃত্যু সম্বন্ধেও আমরা সেই শিশুর মত—আমরা বৃথা ভয়ে কাঁদি জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃত্যুতে সত্যকে হারাই। কিন্তু বিশ্বে প্রাণের মূর্ত্তিকে দেখ, সে মূর্ত্তি আনন্দ মূর্ত্তি। চারিদিকে তরুলতা পশুপক্ষী রূপে শব্দে গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করচে; বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দ-রূপ কি কখনই টিঁকে থাক্‌তে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো সত্য না থাক্‌ত? রাত্রে আমরা ছোট প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু পলতেই বা জ্বালাই। কিন্তু সেইটুকু শিখার মধ্যে ভয় নেই কেন? কেননা একথা নিশ্চয় জানা আছে যে, সে নিভ্‌লেও সূর্য্য কখনো নিভ্‌বেনা। বিশ্বের মধ্যে মহাপ্রাণই হচ্চে অনির্ব্বাণ সত্য, সেই জন্যেই ক্ষুদ্রপ্রাণ নিবলেও ভাবনা নেই। যা ওঁ যা হাঁ তাকে প্রাণের দৃষ্টিতে দেখছি, সেই হাঁ-কেই বিশ্বাস কর, না-কে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস কর

কুয়াসাকে না। আমাদের চারিদিকে জগৎ জুড়ে প্রাণ এই অভয়বাণী ঘোষণা করচে,-মৃত্যু কোনোমতেই সেই বাণীকে নিরুদ্ধ করতে পারচেনা। মেঘ বারেবারে এসে সূর্য্যকে যেন মুছে ফেলতে চাচ্চে কিন্তু কিছুতেই মুছতে পারছে না। মৃত্যু তেমনিই প্রাণের উপর দিয়ে চলে যাচ্চে কিন্তু প্রাণকে কখনই আচ্ছন্ন করে বিলুপ্ত করতে পারবেনা। অতএব মনকে শান্ত করে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা কর মৃত্যুকে না। যাকে ভাল বেসেচ, যাকে সত্য বলে জেনেচ সে মৃত্যুতেও সত্যই আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত কর। ইতি ২৭ আশ্বিন ১৩২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চপল্লব

নব্য ফ্রান্স

ফ্রান্স ইউরোপের চিন্তাজগতের পরিচালক। পূর্ব্বে তাহার যেমন এই গৌরব ছিল এখনও সে তাহার এই গৌরব হারায় নাই। মিঃ রবার্ট ডেল (Robert Dell) Manchester Guardian-এর সংবাদদাতা-রূপে অনেক দিন হইতে পারি নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ফ্রান্স সম্বন্ধে তাঁহার বহুদিনলব্ধ অভিজ্ঞতা একখানা পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা Current Opinion হইতে তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ফরাশী দেশে ধনের কিম্বা খেতাবের আদর বড় একটা নাই। একজন ডিউক, তাহার যদি অন্য কোন গুণ না থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র উপাধি দ্বারাই তিনি সেখানে সম্মান লাভ করিতে পারেন না। অথচ একজন বড়

শিল্পী, সাহিত্যিক, কিম্বা বৈজ্ঞানিকের নাম নাজানে তেমন লোক সে দেশে খুব অল্পই আছে। সেখানে কৌলিন্য বিদ্যা ও জ্ঞানের, ধনের কিম্বা উপাধির নয়। ভিক্‌টর্‌ হুগো কিম্বা বের্‌াঁজের (Beranger) ন্যায় লোক রাস্তায় বাহির হইলে ভিড় না ঠেলিয়া তাঁহারা চলিতে পারিতেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে কোন সাহিত্যিকের অদৃষ্টে এমন সম্মান লাভ কি কখনো ঘটিয়াছে? দেশের জনসাধারণের উপর বড় বড় লেখকদের এমন প্রতিপত্তি একমাত্র ফরাশী দেশ ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। ফরাশী দেশে রাস্তার একজন গাড়োয়ান পর্য্যন্ত কোন একজন বড় লেখককে কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইলে তাঁহার নিকট হইতে গাড়ীর ভাড়া গ্রহণ করে না, বরং তাহারা আরও বলিয়া থাকে, আঁটোল ফ্রাঁসের (Anatole Franec) মত লোককে কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে পারা তাহাদের পক্ষে সৌভাগ্য। ইংলণ্ডে আঁটোল ফ্রাঁসের মত লোক থাকিলে গাড়োয়ান তাঁহাকে বিনা ভাড়ায় কোথাও পৌঁছাইয়া দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁহার নামই হয় তো জানিত না। বড় বড় লেখক ও প্রতিভাসম্পন্ন লোকদের সমাধিস্থানকে ফরাসীরা তীর্থ স্থানের ন্যায় জ্ঞান করে, তাঁহাদের সমাধি দর্শন ও তাহার উপর ফুল ছড়াইবার জন্য দলে দলে লোক সমাধিক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতি এই যে আদর ইহা দ্বারা ফরাসী জাতি সকল দেশের লোকেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু মানুষের গুণমাত্রেরই যেমন ভাল-মন্দ দুই দিক আছে, তেমনি ফরাসী জাতিরও জ্ঞানের প্রতি এই যে অতিরিক্ত শ্রদ্ধাভক্তি ইহা একেবারে দোষ বর্জ্জিত নহে—জ্ঞানের প্রতি এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিবশতই সাহিত্য ও সাহিত্য-প্রতিভা-সম্পন্ন লোকদের সম্বন্ধে ফরাশীরা অত্যন্ত অন্ধ। সেই জন্য বড় বড় লেখকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সে দেশে অত্যন্ত বেশী।

ভেল সাহেব মনে করেন সাহিত্যের প্রতি এই যে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ইহা ফরাশী জাতির ভাবুকতার একটি কারণ। তাহারা মনে করে ভাব ও চিন্তাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারিলেই ভাব ও চিন্তার চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইল।

সেই ভাব ও চিন্তাকে কাজে লাগাইবার দিকে তাহাদের তেমন মন নাই— অন্য দেশ সে কাজ করিয়া থাকে।

তিনি বলেন, ফরাসীগণ মাথাওয়ালা (Intellectual) জাতি। তাহাদের মত এমন পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা অন্য কোন জাতির নাই চিন্তার এই স্বচ্ছতা হইতেই তাহাদের গদ্যও এরূপ স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে। ফরাসী গদ্য জগতের গদ্যসাহিত্যে অতুলনীয়। সাহিত্য-রচনায় যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন সেই কল্পনাশক্তিতেও তাহারা অদ্বিতীয়। যত বড় বড় গল্প কিম্বা উপন্যাস লেখক আছেন তাহাদের অধিকাংশই হয় ফরাসী নয় রাশিয়ান। কৌতুক নাট্য (comedy) রচনায় ও মলিয়েরের পরে অন্য কোন দেশ তাহাদের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। এক কাব্যসাহিত্যে, বিশেষভাবে নব্য কাব্যসাহিত্যে (modern poetry) তাহারা ইংলণ্ডের পিছনে পড়িয়া আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ভিক্‌টর হুগো, বদলেয়ের ভারলের মত বড় বড় কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের ফরাসী ভাষা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাষা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কবিত্ববর্জ্জিত। ইহার কারণ ফরাসী পণ্ডিতগণ ষোড়শ শতাব্দীর ভাষাকে মার্জ্জিত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন, তাহার ফলে যে সকল শব্দে প্রাচীনতার ছাপ অল্প (insufficiently classical) এবং যে সকল নূতন শব্দ ব্যবহারের দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, তাঁহারা সেই সকল শব্দকে ভাষা হইতে বর্জ্জন করেন। সেইজন্য ফরাসী ভাষায় সাহিত্য রচনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, এমন কি একজন ফরাসীর পক্ষেও ইহা নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শব্দসমূহে সমৃদ্ধ বলিয়া তাহাতে রচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তৎসত্বেও ফরাসী সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্য অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

ডেল সাহেব বলেন নব্যফ্রান্স বর্ত্তমানের ভাবুকতায় আর সন্তুষ্ট নয়। ফ্রান্সে ভলটেয়ারের যুগ ছিল reason-এর যুগ। সেই যুগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নব্যফ্রান্সের মধ্যে খুব চেষ্টা দেখা যাইতেছে। আঁটোল ফ্রান্স এই

নব চেষ্টার জন্মদাতা। তাঁহার মতে Voltaire ও Montesquien-এর যুগের ফ্রান্সই যথার্থ মহৎ ও সত্যিকার ফ্রান্স। সেইযুগের মত তেমনি নির্ভীক সত্য-সন্ধিৎসু হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে আবার জাগিয়াছে। এইজন্য যদি তাহাদিগকে সেইযুগের মত সংশয়বাদী ও এমন শাস্ত্রবিজ্ঞানের বিদ্বেষীও (cynical) হইতে হয়, তবে তাহাতেও তাহারা প্রস্তুত; কিন্তু সেইযুগেরই ন্যায় হৃদয় তাহাদের উদার, মন তাহাদের বিদ্বেষমুক্ত, ও সত্য তাহাদের জীবনের আদর্শ। বর্ত্তমান যুদ্ধের এই রক্তপাত হিংসা ক্রোধ ও বিদ্বেষের বিভীষিকায় তাহাদের ভাবুকতার মোহ ঘুচিয়া গিয়াছে। তাহাদের চিত্ত এখন বাঁর্গসের ভাবুকতায় কিম্বা নব খৃষ্ট ধর্ম্মের মোহে আর অভিভূত নহে, তাহাদের চিত্ত এখন নানা সংশয়-সন্দেহে দোলায়িত। মন তাহাদের যাহাতে সায় দেয় না এমন কিছুই তাহারা গ্রহণ করিবে না। পূর্ব্বে যে মত ও বিশ্বাস তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিয়াছিল, এখন তাহা আবার তাহারা তাহাদের মনের সঙ্গে পরখ করিয়া দেখিতেছে। এই যুদ্ধের পর তাহাদের পূর্ব্বের মত ও বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়া গিয়াছে। যাহা তাহাদের তর্ক ও যুক্তির বাহিরে এমন কিছুই তাহারা গ্রহণ করিবে না। বিশ্বাস কিম্বা ভক্তি নয়, ন্যায় ও সত্যই এখন তাহাদের জীবনের মন্ত্র।

নব্য ফ্রান্স বুঝিয়াছে যুদ্ধই বর্ত্তমানের এই অর্থকষ্ট ও নানা সমাজব্যাধির প্রধান কারণ। খৃষ্টের বাণী যে সাম্য-মৈত্রীকে জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে এতকাল অসমর্থ হইয়াছিল, বর্ত্তমানের অর্থসমস্যা হয় তো বা তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে। এই অর্থসমস্যাই বর্ত্তমান যুগের মনীষিগণের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চিন্তনীয় বিষয়। সেই সমস্যাপূরণে ফ্রান্সে হয় তো সাম্যবাদেরই (Socialism) পুনরায় জয় হইবে। —Current Opinion.

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

ভৌতিক টেলিফোন

মৃত্যুর পর মানুষ কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার কৌতূহল সকলের মনেই চিরকাল উদ্দীপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং ইহার ফলে নানারূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানা লোকে বিবিধ প্রকারের সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছে। তা ছাড়া পরলোকে উত্তীর্ণ যাত্রীর সহিত যোগ স্থাপন করিতে সকল দেশেরই মনীষীরা চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহারা নানা সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল সত্যের আবিষ্কার হইয়াছে তাহা অনেকের নিকট অকাট্য হইলেও সেগুলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সেগুলিকে বিজ্ঞানালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

সাধারণত কোন জীবিত মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া পরলোকবাসী প্রেতাত্মা মর্ত্তালোকের সহিত যোগ স্থাপন করেন। তাঁহাদের যাহা কিছু বক্তব্য এই মধ্যস্থের (medium) মুখ হইতে নির্গত হয়। সুস্থ ও সবল ব্যক্তি মধ্যস্থতার কাজ করিতে পারে না। দুর্ব্বল এবং বায়ুপ্রধান ব্যক্তিরাই ভাল মধ্যস্থ হয় যাহা হউক মধ্যস্থের পেশা গ্রহণ করিয়া বহু নরনারী তাহাদিগের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু সকল সময়েই যে প্রেতাত্মা মধ্যস্থের ঘাড়ে চাপিয়া কথা বার্ত্তা চালায় তাহা নয়। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাট্যের মৃত রাজার প্রেতাত্মার ন্যায় সশরীরেও কোনো কোনো প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া থাকে। স্বর্গগত William Stead এর "Julia" এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ Sir William Crookes-এর "Katie King" ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহারা চিরজীবনই মধ্যস্থের কার্য্য করিয়া আসিতেছে তাহারা অনেক সময়ে সাধুতা রক্ষা করিতে পারে না। ইহারা নিছক কল্পনা-বলে নানা অসম্ভব কথাকে প্রেতলোকের কথা বলিয়া চালাইয়া দিয়া শেষে ধরা পড়িয়াছে। এই সব কারণে আমরা পরলোকবাসী আত্মা ও তাহার কীর্ত্তিকলাপের ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ শুনিয়াও ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হই।

কিন্তু সম্প্রতি যে অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা কি প্রকার, এই বিষয়ের নাকি শীঘ্রই মীমাংসা হইয়া যাইবে। প্রেতাত্মার অস্তিত্ব থাকিলে আমরা ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে পারিব। বিভিন্ন স্থানের লোকের সঙ্গে আমরা যেমন telephone এর সাহায্যে ঘরে বসিয়া কথা বলিতে পারি সেইরূপে নাকি পরলোকবাসী প্রেতাত্মাদিগের সহিতও আমরা বাক্যালাপ করিতে পারিব।

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভাবক William Ada Edison-এর নাম শুনে নাই এমন লোক খুব কম আছে, অন্তত তাঁহার আবিষ্কৃত Phonograph বা Gramophone-এর সহিত সকলেই পরিচিত আছেন। ইনি ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ষ্টেসনে খবরের কাগজ ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। কেবলমাত্র নিজের ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসা ইঁহাকে বর্ত্তমানকালের এত বড় আবিষ্কর্ত্তা করিয়াছে। আজকাল সহরের ঘাটে-মাঠে সর্ব্বত্রই যে বৈদ্যুতিক দীপ দেখা যায় ইনিই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। যে সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় দ্রব্য কাঁচের গোলকের মধ্যে থাকিয়া আলোক বিকিরণ করে সেই সূক্ষ্ম অঙ্গারের সূত্র তিনিই আবিষ্কার করেন। আজকাল কে না Bioscope দেখিয়াছেন। এডিসনই ইহাকে প্রথম লোক-চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করিবার পন্থা বাহির করেন। কণ্ঠস্বরকে যন্ত্রের সাহায্যে আটকাইয়া লইয়া গিয়া দূর দেশান্তরের লোককে তাহা শুনাইলেন এডিসন সাহেব। টেলিগ্রাফেরও তিনি বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। এই এডিসন সাহেবই আবার বলিয়া বসিয়াছেন যে, তিনি এমন যন্ত্র তৈয়ার করিতেছেন যে তাহার সাহায্যে পরলোকবাসী আত্মার সহিত মর্ত্ত্যবাসী লোক কথোপকথন করিতে পারিবে।

এই যন্ত্রটির সবিশেষ সংবাদ এখনও জানা যায় নাই। তাহার বিষয়ে এডিসন সাহেব বলিয়াছেন—"আমি কিছুদিন ধরিয়া একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছি। দেখিতে

চাই ইহার সাহায্যে পরলোকবাসী আত্মার সহিত যোগাযোগ সম্ভবপর কি না। যে যন্ত্র আমি তাহাদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রস্তুত করিতেছি, ইহা যদি তাহারা ব্যবহার না করে, তাহা হইলে বুঝিব প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ যাবৎ আমাদের যে ধারণা আছে তাহা ভুল। অধিকন্তু এই যন্ত্র যদি সত্য সত্যই সফল হয়, তাহা হইলে ইহা লইয়া চারিদিকে একটি বিশেষ আন্দোলন হইবে।"

এডিসন সাহেবের এই কথা শুনিয়া অনেকের মনেই ইতিমধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এতদিন যাহারা মধ্যস্থ হইবার ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছিল তাহাদিগের পেশা লোপ পাইবে কিনা ইহা আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। অনেক পরলোকবাসী আত্মা ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া পরলোকের বিষয়ে মর্ত্ত্যবাসীকে অবগত করাইয়াছে। বিখ্যাত চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodgeএর পুত্র Raymond Lodge মধ্যস্থের সাহায্যে পরলোকের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য হয়ত অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। তাহা এইরূপ :—

আমি উপর-উপর যাহা অল্প কিছু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে মনে হয় যে এখানে কাপড়ের পরিবর্ত্তে পচা উল ব্যবহৃত হয়। আমার পোষাক সেই রকম পচা পশমের তৈরী।...আমার শরীর অনেকটা আগেকারের মত। মাঝে মঝে আমি আমার নিজের শরীর বাস্তব কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের দেহে চিমটি কাটি এবং বাস্তব বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু আমার মর্ত্ত্য শরীরে যেরূপ আঘাত লাগিত এখন সেইরূপ তীব্র আঘাত বোধ করি না। সেদিন একটি লোক আমার কাছে একটি সিগার চাহিতে আসিয়াছিল।...এখানেও laboratory আছে এবং সকল প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় অবশ্য মর্ত্ত্যজগতের ন্যায় কঠিন বস্তু হইতে কিছুই হয় না—সবই essence, ether এবং গ্যাস হইতে উৎপন্ন হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে পেশাদার মধ্যস্থগণ কিরূপ কার্য্য করে। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে আতঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে পাছে তাহাদের পেশা যায়।

কেবল ইহাদেরই নহে, ঐতিহাসিকদেরও ভয়ের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। যদি এই যন্ত্র কার্য্যকর হয় তবে যখন-তখন যে কোনো পরলোকবাসীকে ডাকিয়া তাঁহাদের সেই সময়কার যাবতীয় খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা যাইবে। ঘণ্টা বাজাইবার হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ডাক দিলেই চলিবে "আমি ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের সহিত কথা বলিতে চাই" অথবা "৩৯৯ খৃঃ পূর্ব্বের সক্রেটিসের সহিত সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।" এইরূপ কিছু বলিলেই তখনি প্রেতলোকবাসী সহস্র সহস্র বৎসরের সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া আসিবে এবং অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাস বলিতে থাকিবে। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিতে হইবে না ইচ্ছা করিলেই পরলোকগত আত্মা অথবা তাহার বন্ধু বান্ধবের সহিত বাক্যালাপ করা যাইবে।

আর অধিক কল্পনা জল্পনা করিবার আবশ্যক নাই। যদি এই অত্যদ্ভুত ভৌতিক টেলিফোন কোনদিন কার্য্যকরী হয় তাহা হইলেই সব সত্য হাতে-হাতে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। যতদিন তাহা না হইবে ততদিন পরলোক বাসী-দিগের সম্বন্ধে আমাদের যে অজ্ঞতা আছে সেই অজ্ঞতাই থাকুক, কারণ "অজ্ঞতা হইতেছে সব হইতে সূক্ষ্মতম বিজ্ঞান। ইহা বিনা শ্রমে বিনা ক্লেশে আয়ত্ত করা যায়, এবং ইহা মনকে দুঃখাভিভূত করে না।" —Nation, October, 9, 1920.

আশ্রমসংবাদ

পূজাবকাশের পর গত ১৪ই কার্ত্তিক বিদ্যালয়ের কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইয়াছে। ছুটীর মধ্যে অনেকগুলি ছাত্র আশ্রমেই ছিল, তাহাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কয়েকজন শিক্ষকও এখানে ছিলেন। বিজয়াদশমীর দিন আশ্রমবাসীদের বিনোদনার্থে সায়ংকালে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে সঙ্গীত ও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য খেলারও আয়োজন ছিল।

ছুটির মধ্যে ডাঃ তারাপুরওলা সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ল্যেদার সাহেবও এখানে পনরদিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ছাত্রগণের চিত্তবিনোদনার্থে ছুটির মধ্যে কলিকাতা হইতে ম্যাজিকলণ্ঠনের মনোজ্ঞ ছবি আনাইয়া তাহাদিগকে দেখান হইয়াছিল। ঐ ছবিগুলি একদিন বোলপুর সহরে গিয়া সেখানকার লোকদিগকে দেখানো হয়। ছবি দেখিবার জন্য সেখানে অনেক লোক আসিয়াছিল।

ডাঃ তারাপুরওলা অবকাশের পর চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনদিন দুটি বিষয় অবলম্বনে আলোচনা করেন। প্রথম বিষয়টি ছিল Instruction of the Young in the Laws of Sex. কেবল অধ্যাপকবর্গ এবং বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ তারাপুরওয়ালা নিজে ছাত্রগণের মধ্যে অনেক বৎসর এই বিষয় লইয়া কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে একখানি ছোট পুস্তিকাও লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, শিশুকাল হইতে বালকবালিকাদিগকে sex সম্বন্ধে যথারীতি শিক্ষা দিলে অনেক ভয়াবহ অভ্যাস হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা যায়। ঐ বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার ও শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য। এই পন্থা অবলম্বন করিয়া অনেকস্থানের বিদ্যালয়ে আশ্চর্য্য রকমের ফল পাওয়া গিয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল আমাদের দেশে Boys Sout Movement. অধ্যাপক ও বয়স্ক ছাত্রদিগের নিকট তিনি অতি উত্তমরূপে scouting-এর উদ্দেশ্য এবং নিয়মাবলী প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন এবং বহু বৎসর ছাত্রগণের মধ্যে কাজ করিয়া ঐ বিষয়ে যে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁহার বিশ্বাস যদি সকল দেশের ছেলেমেয়েরা Scouting এর আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐ ব্রত গ্রহণ করে, তবে ভবিষ্যতে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটির প্রারম্ভেই এণ্ড্রুজ সাহেব ডালটনগঞ্জে বিহারী-

ছাত্রগণের সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়া যাত্রা করিয়া ছিলেন। তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া আমেদাবাদ, করাচি, লাহোর দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া সম্প্রতি আশ্রমে আসিয়াছেন, এবং বিশ্বভারতীর ইংরেজি ক্লাশ নিয়মিত পড়াইতেছেন।

মিঃ গুরুদয়াল মল্লিক বি. এ. নামে করাচিনিবাসী জনৈক শ্রদ্ধাবান্ যুবক কিছুদিন এখানে থাকিয়া আশ্রমের সেবা করিবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি বিশ্বভারতীর ও বিদ্যালয়ের কয়েকটি ক্লাশে ইংরেজি পড়াইতেছেন। বলাবাহুল্য তিনি যে কয়মাস আশ্রমে থাকিবেন বিনা বেতনেই কাজ করিবেন। তিনি নিজে ফ্রেঞ্চ ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

বহুদিন হইতে আমাদের আশ্রমে একজন উপযুক্ত স্থায়ী চিকিৎসকের অভাব ছিল, সম্প্রতি তাহার পূরণ হইয়াছে। সিন্ধুদেশবাসী যুবক ডাক্তার চিমনলাল গভর্মেণ্টের কাজ ছাড়িয়া আশ্রমের কাজে যোগ দিয়াছেন। ইনি বম্বে য়ুনিভার্সিটির M.B. এবং কৃতী ছাত্র। ইনি চরকায় সূতা কাটিতে জানেন এবং ইতিমধ্যেই ২।১ জনকে শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি খুব উৎসাহের সহিত হাঁসপাতাল সংস্কারের কাজে এবং স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন।

আশ্রমে আজকাল প্রায়ই গুজরাট সিন্ধু-প্রদেশ প্রভৃতির অতিথির সমাগম হইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার ও ফ্রান্স দেশের দুইটি ভূপর্য্যটক মহিলা আশ্রম পরিদর্শনার্থে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইদিন থাকিয়া সব কাজ বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্স দেশীয় মহিলাটি আমাদের বিদ্যালয়ের ফ্রেঞ্চ ভাষার ক্লাশ দুইটি পড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদনার্থে বাল্মীকি-প্রতিভার কিয়দংশ অভিনীত হইয়াছিল।

মিঃ আধ্বানি নামক জনৈক সিন্ধুপ্রদেশবাসী বণিক কিছুদিন আমাদিগের মধ্যে বাস করিয়া গিয়াছেন। জাপানে ইঁহার ব্যবসায় ও বাসগৃহ আছে। গুরুদেব যখন জাপানে গিয়াছিলেন তখন কিছু দিন ইঁহার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী আশ্রমের অধ্যাপনার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ "আড়াই" টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্ত ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
পত্রিকাবিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadanand Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩১৭ সাল

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শান্তিনিকেতন পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হয় বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্রষ্টব্য

কলিকাতার নং ২০।বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এণ্ড কোম্পানিতে খুচরা "শান্তিনিকেতন" নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান, তাঁহারা ঐ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
(পত্রিকাবিভাগ

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা — অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল

শঙ্করের উপনিষদ্‌ভাষ্য

শঙ্করাচার্য্যের নামে যে সকল উপনিষদ্-ভাষ্য প্রচলিত আছে, সে সমস্তই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার প্রধান শঙ্করাচার্য্যের রচিত, ইহা বলিতে পারা যায় না। সাধারণত প্রসিদ্ধি আছে যে, শঙ্কর, রামানুজ, ও অন্যান্য আচার্য্যগণ প্র স্থা ন ত্র য়[1] অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, ও সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রুতির অন্তর্গত প্রধান দশ খানি উপনিষদেরও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বস্তুত এই প্রসিদ্ধি বা জনশ্রুতি সত্য নহে;

১। প্র স্থা ন শব্দের সাধারণ অর্থ 'গমন', কিন্তু এখানে যাহার দ্বারা প্রস্থান বা গমন করা যায় এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'পথ' অর্থে এই শব্দটি প্রযুক্ত হইতে পারে। বেদান্তের তিনটি প্র স্থা ন অর্থাৎ তিনটি পথ; তিন প্রস্থানে, তিন পথে বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-তত্ত্বে পৌঁছিতে অর্থাৎ তাহা জানিতে পারা যায়। যথা, শ্রু তি প্রস্থান অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রভৃতি, স্মৃতি প্রস্থান, মহাভারতাদি; আর সূত্র-

রামানুজের রচিত কোনো উপনিষদ্-ভাষ্য নাই। অথবা এই জনশ্রুতিকে এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়—প্রত্যেক আচার্য্যেরই রচিত পৃথক্-পৃথক্ উপনিষদ্-ভাষ্য না থাকিলেও, ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যায় তাঁহারা সকলেই উপনিষদের বহু শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অতএব এইরূপে উপনিষদ্-ব্যাখ্যা করায় তাঁহারা প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত শ্রুতি-প্রস্থান ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। তা এসম্বন্ধে যাহাই হউক না, শঙ্করের নামে প্রচলিত উপনিষদ্‌ভাষ্য-সমূহের কতকগুলি যে, প্রধান শঙ্করের রচিত নহে তাহা বলিবার বলবৎ প্রমাণ রহিয়াছে। নিম্নে আমরা তাহাই দেখাইতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

কেন-উপনিষদের দুইখানি ভাষ্য প্রচলিত আছে, প দ ভা ষ্য ও বা ক্য-ভা ষ্য; এবং দুইখানিই প্রধান শঙ্করের রচিত বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই ভাষ্য দুইখানির এক খানিকে প দ ভাষ্য, আর অপর খানিকে বা ক্য ভাষ্য বলিবার কারণ কি, তাহা কেহ পরিষ্কাররূপে বলিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। উভয় ভাষ্যে একই গ্রন্থকারের নাম আছে; কিন্তু একই ব্যক্তি একই গ্রন্থের কি জন্য দুইখানি ব্যাখ্যা রচনা করিবেন, ইহা বুঝা যায় না। তাই এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য বলা হইয়া থাকে যে, একই গ্রন্থকার দুই বিভিন্ন প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিবার জন্য দুই খানি ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন; একখানি প দে র ভাষ্য, আর অন্যখানি বা ক্যে র ভাষ্য। কিন্তু বস্তুত এরূপে উভয়ের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই। তা যাই হউক, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। উভয় ভাষ্যের কেবল ভাষাই যে ভিন্ন তাহা নহে, প্রদর্শিত যুক্তিও ভিন্ন। দেখা যায়, শঙ্করের প্রসিদ্ধ মতও বাক্যভাষ্যে বিভিন্ন বা বিরুদ্ধভাবে বর্ণিত

প্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র। এই তিন স্থান হইতে যাত্রা করিলে ব্রহ্ম তত্ত্বে পৌছিতে পারা যায়। অথবা প্রস্থান শব্দের সাধারণ অর্থ 'গতি' বা 'গমন' করিলেও হইতে পারে। বেদন্তের প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ বেদান্তের তিনটি গতি; শ্রুতি, স্মৃতি, ও সূত্র এই তিন গতিই অর্থাৎ এই তিনেরই গতি ব্রহ্মের দিকে, এই জন্যও এই তিন শাস্ত্রকে প্র স্থা ন ত্র য় বলা হইয়া থাকে।

হইয়াছে। পাঠকগণ কেনোপনিষদের ৪.৭ (৩২) এই স্থানের উভয় ভাষ্য মিলাইয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, ভাষ্য দুইখানি পরস্পর কত দূর বিরুদ্ধ। আলোচ্য শ্রুতিটি (৪-৭) এই :—

"উপনিষদং ভো ব্রূহীতি।
উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদম্ অব্রূমেতি ॥ ৩২ ॥

এখানকার পদভাষ্য এইরূপ :—

"উপনিষদং রহস্যং যচ্চিন্ত্যং, ভো ভগবন্, ব্রূহি, ইতি এবম্ উক্তবতি শিষ্যে আহ আচার্য্যঃ—উক্তা অভিহিতা তে তব উপনিষদ্। কা পুনঃ সেত্যাহ—ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ প র মা ত্ম ন ইয়ং তাং···উপনিষদম্ অব্রূম ইত্যুক্তামেব পরমাত্মবিদ্যাম্ উপনিষদম্ অব্রূমেত্যেবধারয়ত্যুত্তরার্থম্।"

আর বাক্যভাষ্য হইতেছে :—

"উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তায়ামপ্যুপনিষদি শিষ্যেণোক্ত আচার্য্য আহ—উক্তা তে তুভ্যম্ উপনিষদ্ অধুনা ব্রাহ্মীং বাব তে তুভ্যম্ ব্রহ্মণো ব্রা হ্ম ণ জা তে রুপনিষদম্ অব্রূম ব ক্ষ্যা ম ইত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি হি। ব্রাহ্মী নোক্তা উক্তা ত্বাত্মোপনিষদ্। তস্মান্ন ভূতাভিপ্রায়োঽব্রূমেতি শব্দঃ।"

এখানে "অব্রূম" ও "ব্রাহ্মীম্" এই পদ দুইটির ব্যাখ্যা দেখিলেই উভয় ভাষ্যের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য, পদভাষ্যের ব্যাখ্যাই যে. উৎকৃষ্টতর ও সত্য তদ্বিষয় কোনো সন্দেহ নাই।

যে-কোনো পাঠক একটু সাবধান হইয়া ভাষ্য দুইখানি মিলাইয়া দেখিবেন, তিনিই এইরূপ আরো অনেক বিরোধ ও অসামঞ্জস্য সহজেই ধরিতে পারিবেন।[২]

২। যেমন বিভিন্ন ব্যাখ্যা (কেন, ২-১-২); মূলের বিভিন্ন পাঠের গ্রহণ (২-২; এখানে পদভাষ্যে "না হ ম্" ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু বাক্যভাষ্য "না হ" পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে); ইত্যাদি।

গত বৎসর (নভেম্বর, ১৯১৯) পুণার Oriental Confarence-এর সাধারণ সংবাদে

আমার মনে হয়, শ্বেতাশ্বতরেরও ভাষ্যখানি আদিম শঙ্করাচার্য্যের নহে। ইহার রচনারীতি ও ব্যাখ্যাপদ্ধতি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্যে পুরাণ হইতে যেমন দীর্ঘ-দীর্ঘতর বচনসমূহ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, প্রধান শঙ্করের রচিত বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত কোনো ভাষ্যেই সেরূপ দেখা যায় না।

শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্যকার (১. ৮ ; আনন্দাশ্রম, ৩য় সং. পৃ. ৩০) গৌড়পাদের একটি কারিকাকে (৩. ৫) এইরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"তথাচ শুকশিষ্যো গৌড়পাদাচার্য্যঃ।"

গৌড়পাদ শঙ্করের পরম গুরু, আর গুরু হইতেছেন গোবিন্দ-ভগবৎপাদ। অতএব ইহা আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, শঙ্কর নিজের পরমগুরুর নামের পূর্ব্বে "শুকশিষ্য" বিশেষণ না দিয়া অধিকতর সম্মানসূচক কোন উপযুক্ত বিশেষ্য দিতেন, যেমন 'ভগবান্', অথবা এইরূপ অন্য কিছু। বস্তুতও অন্যত্র তিনি এইরূপই করিয়াছেন, যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১. ৪. ১০ ; আনন্দাশ্রম, ১৮৯১, পৃ. ১৬৭) শুকের গুরু ব্যাসকে উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন।[৩] অথবা তিনি কোনো বিশেষণ না দিয়াই প্রকারান্তরে গৌড়পাদকে উল্লেখ করিতেন, যেমন তিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দুইবার করিয়াছেন।[৪]

মাণ্ডূক্য উপনিষদের ভাষ্যখানিও মূল শঙ্করের নহে। এই ভাষ্যখানির আরম্ভে মঙ্গলাচরণ-রূপে দুইটি এমন নিকৃষ্ট শ্লোক আছে যাহাদিগকে প্রধান শঙ্করের রচনা বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। ভাষ্যের শেষেও ঠিক ঐ

জানা যায়, অধ্যাপক শ্রীধরশাস্ত্রী পাঠকও এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে, পদভাষ্য প্রধান শঙ্করাচার্য্যেরই রচিত; কিন্তু বাক্যভাষ্যের রচয়িতার নাম বিদ্যাশঙ্কর, ইনি পরে প্রধান শঙ্করের পীঠে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৩। "তথাচ স্মরণমনুগীতাসু ভ গ ব তো ব্যাসস্য।"

৪। "তথাচ সম্প্রদায়বিদো বদন্তি"—ব্রহ্মসূত্র, ১. ৪. ১৪ ; "অত্রোক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়-বিদ্ভিরাচার্য্যৈঃ।"—ঐ, ২. ১. ৯।

রকমেরই তিনটি শ্লোক আছে, ইহাদের শেষটিতে আবার ব্যাকরণেরও ভুল আছে।[৫] মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটিতে ছন্দোদোষও আছে।[৬]

মঙ্গলাচরণ, বিশেষত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ বহু পরবর্ত্তী কালের পুস্তকেই দেখা যায়। এক তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য ছাড়া শঙ্করের রচনা বলিয়া অসন্দিগ্ধ আর কোনো পুস্তকেই এরূপ মঙ্গলাচরণ দেখা যায় না। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য, বৃহদারণ্যক-ও ছন্দোগ্য-প্রভৃতির ভাষ্যে তেমন মঙ্গলাচরণ নাই।[৭] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-ভাষ্যের মঙ্গলাচরণের শ্লোককয়টি ভাষ্যকারের রচিত কিনা ইহাও সন্দিগ্ধ। প্রাচীন আচার্য্যগণের ন্যায় শঙ্করকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একবারে প্রতিপাদ্য বিষয়টিকেই আরম্ভ করেন। বৃহদারণ্যক ও কঠ উপনিষদের ভাষ্যে ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রবর্ত্তক আচার্য্য বা ঋষিগণকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গদ্যরূপ বাক্যে নমস্কার করা হই-য়াছে, কিন্তু বস্তুত এই ক্ষুদ্র বাক্যগুলিও মূল ভাষ্যকারের লিখিত কি না ঠিক বলা যায় না। মুদ্রিত পুস্তকগুলি অথবা ইহাদের আদর্শ-ভূত হস্তলিখিত পুঁথিগুলি সব সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের যোগ্য নহে। সাবধানে তুলনা করিয়া পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে প্রচলিত সমস্ত ভণিতা তাঁহার নিজের রচিত নহে। তিনি কখনই নিজের নাম এইরূপ লিখিতে পারেন না—"পরম-হংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ ঙ্ক র - ভ গ ব তঃ কৃতৌ।" এই সমস্ত ভণিতা নিশ্চয়ই তাঁহার নিজের ভণিতার সহিত পরে সংযোজিত হইয়াছে। উদাহরণ-

---

৫। "মজ্জোন্মজ্জচ্চ" পাঠ কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। "মজ্জন্ন্ মজ্জংশ্চ" পাঠ ধরিলে ছন্দ থাকে না। "মজ্জন্মজ্জংশ্চ" পাঠ একরূপ হইতে পারে, কিন্তু পুঁথীতে পাওয়া যায় না। আবার "নমস্থে" পাঠ কিছুতেই হইতে পারে না, "নমস্থামি" লেখা উচিত ছিল।

৬। শ্লোকটির তিন পাদ মন্দাক্রান্তা ছন্দের, আর শেষ পাদটি স্রগ্ধরার। এরূপ মিশ্রণ ছন্দ-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে।

৭। বিবেকচূড়ামণি-প্রভৃতি শঙ্করের নামে প্রচলিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিকে এখানে ধরা হয় নি। কারণ এই সমস্ত গ্রন্থকে উপযুক্তরূপে পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখা হয় নি যে, বস্তুত ইহারা প্রধান শঙ্করের কি না। বিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয় এই উভয়েরও ভাষ্য যে শঙ্করের ইহাও প্রতিপাদনীয়।

রূপে বৃহদারণ্যক- ও ছান্দোগ্য-ভাষ্যের ভণিতাগুলি উল্লেখ করিতে পারা যায়।[৮]

ইহাও বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয় যে, শঙ্করাচার্য্য কোনো স্থানে মাণ্ডূক্য উপনিষদের কোনো বচন ধরেন নি; এমন কি যেখানে তাহা ধরিলে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধি হইত এবং তাঁহার ধরা উচিতও ছিল, সেখানেও তিনি তাহা ধরেন নি; যেমন "ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্"—ছান্দোগ্যের (২. ২৩. ৩) এই বাক্যের ভাষ্যে মাণ্ডূক্যের (১) "সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব"—এই বাক্যটি তিনি অনায়াসেই ধরিতে বা উল্লেখ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নি। উভয় বাক্যের কতদূর মিল তাহা দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। অন্যান্য স্থলে দেখা যায়, শঙ্কর সদৃশ শ্রুতি উদ্ধৃত করিতে কখনো ক্লান্ত নহেন। তাই মনে হয়, যদি প্রধান শঙ্করাচার্য্য এই মাণ্ডূক্য-ভাষ্যের রচয়িতা হইতেন, তবে তিনি ছান্দোগ্য ভাষ্যের উল্লিখিত স্থানে ঐ মাণ্ডূক্য শ্রুতি নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমটা যে, ওঙ্কারেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ("উপব্যাখ্যান") তাহা সেখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। শঙ্কর যদি জানিতেন যে, ঠিক এই বিষয়েরই অপর কোনো মূল গ্রন্থ আছে,[৯] তাহা হইলে ছান্দোগ্য-ভাষ্যে নিশ্চয়ই তিনি তাহা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু করেন নি। ইহাতে মনে হয়, খুব সম্ভব

৮। বৃহদারণ্যক-ভাষ্যের যে কোনো ব্রাহ্মণের শেষটা দ্রষ্টব্য। দেখা যাইবে "ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমং (অথবা 'দ্বিতীয়ং','তৃতীয়ং' ইত্যাদি যেখানে যেরূপ হইতে পারে) ব্রাহ্মণম্" এইমাত্র ভণিতা আছে। এইরূপ যেখানে অধ্যায় শেষ হইয়াছে সেখানেও আছে—"ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যে প্রথমাধ্যয়ে ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্।" কিন্তু এখানে ঠিক ইহার পরেই যোজিত হইয়াছে—"ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।" নামের পূর্ব্বে "শ্রী" শব্দও এই ভণিতার অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিতেছে।

৯। ইহা সুপ্রসিদ্ধ যে, মাণ্ডূক্য উপনিষদে ওঙ্কারেরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; ইহার আদিতে আছে—"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরমিদং সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানম্...;" এবং শেষ হইতেছে—"এবম্ ওঙ্কার আত্মৈব, সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ।"

শঙ্করের পূর্ব্বে, অথবা তাঁহার সময়েও মূল মাণ্ডূক্য উপনিষদই ছিল না, অথবা তাহার প্রসিদ্ধি ছিল না। এ বিষয়টি "মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদকারিকা" নামে আমার এক অন্য প্রবন্ধে আরো আলোচিত হইয়াছে, পরে প্রকাশিত হইবে।

মাণ্ডূক্যভাষ্যের উপক্রমণিকায় এই পঙক্তিটি আছে :—

"রোগার্ত্তস্যেব রোগনিবৃত্তৌ স্বস্থতা তথা[১০] দুঃখাত্মকস্য আত্মনো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা।"

বেদান্তে, বিশেষত শঙ্করের দর্শনে আত্মা আনন্দময় বা আনন্দস্বরূপ, কথনো দুঃখাত্মা নহে। আত্মার যদি কোনোরূপ দুঃখের সম্বন্ধ বলিতে হইত তবে শঙ্কর নিশ্চয়ই অন্য কোনো ভাষায় বা অন্য কোনো রূপে তাহা প্রকাশ করিতেন। এই রূপ মাণ্ডূক্যকারিকার (১. ১০) "সর্ব্বদুঃখানাম্" ইহার "প্রাজ্ঞতৈজসবিশ্বলক্ষণানাম্" এই ব্যাখ্যা শঙ্করের হাত হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারে না। আবার, শঙ্করের পক্ষে ইহাও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি তাঁহার পরমার্থ তত্ত্বকে সৎ, অসৎ, সদসৎ ও অসদসৎ এই চারি রকমেরই অতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। মাণ্ডূক্যভাষ্যে (অর্থাৎ মাণ্ডূক্য উপনিষদের ও মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদকৃত কারিকার, এই উভয়েরই ভাষ্যে) এইরূপ এত অসঙ্গত ও অদ্ভুত উক্তি আছে যে, ইহার রচয়িতাকে ও আদিম শঙ্করাচার্য্যকে অভিন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আমার "মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদকারিকা "প্রবন্ধে ইহা সবিশেষ দেখান হইয়াছে।

কোনো পুস্তকের ভণিতায় কেবল শঙ্করাচার্য্যের নাম দেখিয়াই আমরা যেন

১০। এখানে এই "তথা (অথবা ঘ-ঙ-জ-ট পুঁথী অনুকারে "তথৈব," আনন্দাশ্রম, ১৯ ১১) অতিরিক্ত, এবং শঙ্কর কিছুতেই ইহা এখানে প্রয়োগ করিতে পারেন না। কিন্তু যিনিই ইহা লিখুন না, তাঁহার প্রতি ন্যায় বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে, গ্রন্থকার ইহা বস্তুত লিখেন নি, কারণ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের ভাষ্যে (ইহাও মূল শঙ্করের বলিয়া প্রচলিত) ঐ বাক্যটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে. কিন্তু ইহাতে "তথা" শব্দটি নাই। দ্রষ্টব্য—আনন্দাশ্রমের নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষৎ, পৃঃ ৩।

মনে না করি যে, তাহা আদিম শঙ্করাচার্য্যের লিখিত। কেননা শঙ্করাচার্য্য অনেক ছিলেন, এবং ইঁহারা অনেকেই বেদান্ত-সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমার দৃঢ় ধারণা, মাণ্ডূক্যভাষ্যের রচায়িতা যে, কেবল ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার আদিম শঙ্করাচার্য্য ইহাতেই ভিন্ন তাহা নহে, তিনি নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের ভাষ্যকার হইতেও ভিন্ন।

মাণ্ডূক্য ও নৃসিংহ উভয়েরই ভাষ্যে কতকগুলি সাধারণ[১১] বাক্য আছে কিন্তু মূলত তৎসমুদয় কোন্ ভাষ্য হইতে কোন্ ভাষ্যে উদ্ধৃত বা গৃহীত হইয়াছে তাহা কোনো খানিতেই উক্ত হয় নি। তথাপি ইহা বুঝা কিছুই শক্ত নহে যে, নৃসিংহ-ভাষ্যই মাণ্ডূক্য-ভাষ্য হইতে ঐ সকল বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, মাণ্ডূক্য-ভাষ্য নৃসিংহ-ভাষ্য হইতে গ্রহণ করে নি। নিম্নে তাহার কতক যুক্তি হইতেছে।

মাণ্ডূক্য ও নৃসিংহ উভয়ের ভাষ্যের উপক্রমণিকাটা[১২] প্রায়ই এক; কিন্তু তাহা হইলেও মাণ্ডূক্যের ভাষ্যে এই উপক্রমণিকাটা কিঞ্চিৎ সঙ্গততর ও সুসম্বদ্ধতর বোধ হয়। নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয়ের ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাখ্যেয় উপনিষদের সম্বন্ধ, অভিধেয় (প্রতিপাদ্য বিষয়) ও প্রয়োজনের উল্লেখ বিষয়ে যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অনাবশ্যক, তাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না—যদিও মাণ্ডূক্য উপনিষদের (ও তাহার করিকার) সম্বন্ধে ঐরূপ উল্লেখের কিঞ্চিৎ

১১। (ক) "কথং পুনরোঙ্কারনির্ণয়ঃ……পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনপাদশব্দঃ।"—মাণ্ডূক্য (আনন্দাশ্রম ১৯০০) পৃ০ ৯—১৪=নৃসিংহ (আনন্দাশ্রম ১৮৯৬) পৃঃ ৪৪—৪৫।

(খ) "এষ হি স্বরূপাবস্থঃ……ভূতানামেষ এব।"—মাণ্ডূক্য. পৃ০ ২৪=নৃসিংহ পৃ০ ৪৮।

(গ) সর্ব্বেষু কারণেষবিশষেঽপি…… প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি শ্রুতেঃ।"—মাণ্ডূক্য. পৃ. ২৭—৩০=নৃসিংহ. পৃ০ ৪৮—৪৯।

উভয় ভাষ্যের প্রারম্ভও দ্রষ্টব্য।

১২। বেদান্তার্থ সারসংগ্রহভূতমিদং প্রকরণচতুষ্টয়ম্……অতএব ন পৃথক্ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনানি বক্তব্যানি। যান্যেব তু বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনানি যান্যেবেহ ভবিতুমর্হন্তি তথাপি প্রকরণ ব্যাচিখ্যাসুনা সংক্ষেপতো বক্তব্যানি।"—মাণ্ডূক্য পৃ-৫।

সার্থকতা দেখা যায়। আবার, নৃসিংহ-ভাষ্যে "সংক্ষেপতঃ" শব্দটিরও প্রয়োগ উপযুক্ত হয় নাই, মাণ্ডূক্য-ভাষ্যে কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে।

মাণ্ডূক্য-ভাষ্যে কোনো স্থলেই নৃসিংহের অথবা ইহার ভাষ্যের নাম করা হয় নি; অপর পক্ষে নৃসিংহ-ভাষ্যে কেবল মাণ্ডূক্য উপনিষদেরই নাম করা হয় নি[১৩]; ইহাতে মাণ্ডূক্য-ভাষ্যেরও মতের সহিত নিজ মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।[১৪] মাণ্ডূক্য-ভাষ্যে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, নৃসিংহ-ভাষ্যে স্থানে-স্থানে তাহা হইতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়া তাহার কারণও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।[১৫] যদি উভয়ই ভাষ্য এক জনের হইত তাহা হইলে মাণ্ডূক্য ভাষ্যে নৃসিংহ বা ইহার ভাষ্য নিশ্চয়ই উল্লিখিত হইত; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় নি।

দেখা যায়, নৃসিংহ-ভাষ্যকার মাণ্ডূক্যের গৌড়পাদ-করিকাকে মূল মাণ্ডূক্যেরই অংশবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বস্তুত যে, তাহা স্বতন্ত্র পুস্তক তাহা তিনি বলেন নি। গৌড়পাদকারিকা যে, মাণ্ডূক্য-মূলক স্বতন্ত্র গ্রন্থ তাহা সকলেই জানেন। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার "মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়-পাদ-কারিকা" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। নৃসিংহ-ভাষ্য হইতে মাণ্ডূক্য-ভাষ্য এবিষয়ে ভিন্ন; ইহাতে মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ ও গৌড়পাদকারিকাকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। মাণ্ডূক্য ও নৃসিংহের কয়েকটি পাঠের বিচার-প্রসঙ্গে নৃসিংহ-ভাষ্যের নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য :—

"অত ঊর্দ্ধ মাণ্ডূক্যে উক্ত এবার্থে শ্লোকান্ পঠিত্বা তৃতীয়ঃ পাদঃ,
এতস্মিংস্তাপনীয়ের তু তান্ বিহায় তুরীয়ঃ পাদঃ।" নৃসিংহ, ৪৮পৃঃ।

"অতএব পৃথক্ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানি ন বক্তব্যানি। যান্যেব তু উপনিষৎসম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি তান্যেব উপনিষদ্ব্যাচিখ্যাসুনা সংক্ষেপতো বক্তব্যানি।" মাণ্ডূক্য. পৃ. ৩।

১৩। নৃসিংহভাষ্য. পৃ ৪৬, চার বার; পৃ. ৪৮, একবার।

১৪। নৃসিংহ. পৃ. ৪৬—"নন্বেবং সপ্তাঙ্গানি…মাণ্ডূক্যোপনিষৎপ্রণববিদ্যায়াং ব্যাখ্যাতম্।" "ননু যথা মাণ্ডূক্যে বৈশ্বানরশব্দসামর্থ্যাৎ…ব্যাখ্যাতম্।" পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলি দ্রষ্টব্য।

১৫। "সপ্তাঙ্গ" ও "একোনবিংশতিমুখ" শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, মাণ্ডূক্য. পৃ. ১৫; নৃসিংহ. পৃ. ৪৫।

'ইহার পর মাণ্ডূক্যে এই বিষয়ে (কতক) শ্লোক পাঠ করিয়া তৃতীয় পাদ (উক্ত হইয়াছে), কিন্তু এই তাপনীয়ে সেই সমস্ত (শ্লোক) বর্জ্জন করিয়া চতুর্থ পাদ (উক্ত হইয়াছে) ।'

এই শ্লোকগুলি গৌড়পাদের কারিকা ভিন্ন কিছুই নহে ("বহিষ্প্রাজ্ঞো বিভুর্বিশ্বঃ ......" ইত্যাদি)। মনে হয়, কারিকাগুলির পাতনিকা-স্বরূপ যে ক্ষুদ্র বাক্যগুলি ("অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি") আছে, (মাণ্ডূক্য. পৃ ২৫, ৪৬, ৫৭, ৬১), তৎসমুদয়কে নৃসিংহ-ভাষ্যকার মূল মাণ্ডূক্যেরই অন্তর্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন।[১৬] কিন্তু ইহা সহজেই প্রতিপাদন করিতে পারা যায় যে, ঐ ক্ষুদ্রবাক্যগুলি কারিকাকারের অর্থাৎ গৌড়পাদের অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির। এখানে ইহা উল্লেখ করিতে করিতে পারা যায় যে, মাণ্ডূক্য-ভাষ্য অথবা তাহার টীকার কোনো-কোনো পুঁথীতে (খ, গ, ঠ, আনন্দাশ্রম) ঐ বাক্যগুলিকে বার্ত্তিককারেরই বলিয়া ধরা হইয়াছে—"অথ বার্ত্তিককারোক্তং বাক্যম্—অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।" বার্ত্তিককার এখানে গৌড়পাদ ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

নৃসিংহ পরবর্ত্তী উপনিষৎসমূহের অন্তর্গত। ইহা একখানি বেদান্তমিশ্রিত তান্ত্রিক উপনিষৎ। ইহার ভাষ্যকার অন্তত আর একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা। ইহার নাম প্র প ঞ্চা গ ম শা স্ত্র অথবা প্র প ঞ্চ সা র। তিনি এই উভয় নামেই এই গ্রন্থখানিকে নৃসিংহ-ভাষ্যে ধরিয়াছেন, এবং স্পষ্টই বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজের রচনা (নৃসিংহ. পৃ ৩০, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৫১, ৬১)। এই প্রপঞ্চ-সার এখনো পাওয়া যায়, এবং ইহার সংস্করণও অনেক হইয়াছে। নৃসিংহভাষ্যে ইহা হইতে ছয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ইহার সবগুলিই প্রচলিত প্রপঞ্চসারে পাওয়া যায়।[১৭] নৃসিংহভাষ্যে তান্ত্রিকতার বেশ গন্ধ আছে, কিন্তু মাণ্ডূক্য-ভাষ্যে ইহার কোনো স্পর্শও নাই।

১৬। "মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদকারিকা" প্রবন্ধে এ বিষয় আরো ভাল করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

১৭। (ক) নৃসিংহ পৃ-৬০, হৃদয়ং বুদ্ধিগম্যত্বাৎ...," —প্রপঞ্চ-(বাণীবিলাস প্রেস), পৃ-৬৪, ৬৭।

আমি পরে দেখাইব নৃসিংহভাষ্যে ব্যাকরণদোষ কত গুরুতর; মাণ্ডূক্য-ভাষ্যেও ব্যাকরণদোষ আছে, কিন্তু সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধে নৃসিংহভাষ্যকারই প্রধান বলিতে হইবে। ইনি যে নিজেই কেবল ব্যকরণে ভুল করেন তাহা নহে, অন্যকৃত ভুলও দেখিতে পান না। উদাহরণ-স্বরূপে নিম্নলিখিত পদটি উদ্ধৃত করিতে পারা যায়, ইহা উভয়ই ভাষ্যে আছে (নৃসিংহ. পৃ.৯, মাণ্ডূক্য. পৃ.৯)—

"আত্মা পরমার্থঃ সন্ প্রাণাদিবিকল্পস্যাস্পদঃ।"

'আস্পদ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, ইহা পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইতে পারে না। নৃসিংহভাষ্যকার ইহা অন্ধের ন্যায় উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছেন, এবং পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাঁহার পক্ষে ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে।

উভয় ভাষ্যের ভাষা ও রীতি বিভিন্ন, এবং নৃসিংহভাষ্য অপেক্ষা মাণ্ডূক্য-ভাষ্যের ঐ উভয়ই উৎকৃষ্টতর। যে সকল বাক্য উভয়ই উপনিষদে আছে, দেখা যায়, নৃসিংহভাষ্যে তাহাদের যে ব্যখ্যা করা হইয়াছে তাহা জোর করিয়া এবং অত্যন্ত কষ্টকল্পিত; অপর পক্ষে মাণ্ডূক্যভাষ্যের ব্যাখ্যা সেরূপ নহে।

নৃসিংহভাষ্যকারের ব্যাকরণ-ভুলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হইতেছে। এই শব্দগুলি নৃসিংহভাষ্যকারের অপর গ্রন্থ প্রপঞ্চসার হইতে গ্রহণ করা হইয়াছেঃ—

(১) হু নে ৎ (জু হু য়া ৎ স্থলে[১৮], অন্যত্র ইহাও প্রযুক্ত হইধাছে, ১৮-৬) ৭-৬২, ৬৬; ১৭-৫।[১৯]

(খ) নৃসিংহ. পৃ. ৩৩, "তুঙ্গার্থত্বাচ্ছিরোহঙ্গস্য···"=প্রপঞ্চ. পৃ.৬৪, ৬.৮।

(গ) নৃসিংহ. পৃ. ৩৫, শিখা তেজঃ সমুদ্দিষ্টং···,"=প্রপঞ্চ, পৃ. ৬৪, ৬.৯।

(ঘ) নৃসিংহ. পৃ. ৩৭, "কবচগ্রহ ইত্যস্মাদ্···," প্রপঞ্চ. পৃ. ৬৪, ৬.১০।

(ঙ) নৃসিংহ. পৃ. ৫১, "ভূপদান্তু ব্যাহৃতয়ঃ··,"=প্রপঞ্চ. পৃ. ৪১৭, ৩৮.৭-৯।

(চ) নৃসিংহ. পৃ. ৬১. "অস্ত্রাসাদিকৌ ধাতু ··,"=প্রপঞ্চ. পৃ. ৬৪, ৬-১২।
এখানে বলা আবশ্যক উভয় গ্রন্থের পাঠের মধ্যে কিছু-কিছু পার্থক্য আছে।

১৮। অন্যত্রও এইরূপ 'স্থলে' শব্দ বুঝিতে হইবে।

(২) প্রো ক্ত্বা (প্রো চ্য) ১৭-১১, ১২ ; ১৯-১০, ১১।

(৩) বী প্স য়ি ত্বা (বী প্স্য, ১৭-১৪) ১৭-১৩।

(৪) স ঙ্গ চ্ছে ৎ (স ঙ্গ চ্ছে ত) ১৭-৩০।

(৫) অ থো হ ধো ম ধ্য (অ থো অ ধো০) ১৭-৩৩।

(৬) ল ভে ৎ (ল ভে ত) ১৭-৩৮।

(৭) ক ম ল জ তে (ক ম ল জ ত ব) ৩৩-৪।

(৮) বি দ্যো ত দ্ (বি দ্যো ত মা ন) ১৮-৪।

(৯) দ্যো ত দ্ (দ্যো ত মা ন) ২০-৪৬।

(১০) বি ভ্রা জ ৎ (বি ভ্রা জ মা ন) ১-৮।

(১১) লি হ তাং (লী ঢা ম্) ৭-১৪।

(১২) জ প্যা ৎ (জ পে ৎ) ৮-২০।

(১৩) জ নি ত্রী ম্ (জ ন য়ি ত্রীম্) ২-৫।

(১৪) ম ন্ত্রা ণি ১৯ (ম ন্ত্রা ন্) ১-২০।

(১৫) লো ণ২১ (ল ব ণ) ৭-৬৪, ৬৫।

(১৬) অ চ্যু ত কা মি নি (০ কা মি নী) ২০-৪৪।

(১৭) সূ ক্ষ্ম স র স্বতি (০ স র স্ব তী) ২০-১৪৪।

ছন্দোদোষও প্রপঞ্চসারে অত্যন্ত অধিক। গ্রন্থকার ছন্দে, বিশেষত স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত-প্রভৃতি দীর্ঘ ছন্দে যতি রক্ষা করিতে নিতান্ত অসমর্থ। তাঁহার আর্যাগুলিও অনেক স্থানে বিশুদ্ধ নহে। দ্রষ্টব্য — ৪. ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭.৭৯, ৮৩।

এইরূপে নিরাপদে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, প্রধান শঙ্করাচার্য্যকে নৃসিংহ-

---

১৯। এই শব্দে প্রাকৃত-প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়, এবং ইহার প্রয়োগ অনেক তান্ত্রিক পুস্তকে আছে।

২০। তুলঃ— আ স্প দঃ (আ স্প দ ম্), পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

২১। স্পষ্টতই প্রাকৃত শব্দ।

ভাষ্য ও প্রপঞ্চাগমশাস্ত্র বা প্রপঞ্চসারের জন্য অভিযুক্ত করিতে পারা যায় না। এবং ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মাণ্ডূক্য- ও নৃসিংহ-ভাষ্যের রচয়িতা ভিন্ন-ভিন্ন এবং প্রধান শঙ্করাচার্য্য মাণ্ডূক্য ভাষ্যের রচয়িতা হইতে পারেন না।

মাণ্ডূক্য- ও নৃসিংহ-ভাষ্যের রচয়িতাদের অভেদ সম্বন্ধে নৃসিংহ-ভাষ্য হইতে নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তি কেহ উল্লেখ করিতে পারেন—

(১) "নন্বেবং······বাক্যদ্বয়ং মাণ্ডূক্যোপনিষৎপ্রণব-বিস্তারাং (মাণ্ডূক্য. পৃ. ১৪) ব্যাখ্যাতম্, তথাত্রাপি কস্মান্ন ব্যাখ্যায়তে।"

(২) নন্বু যথা······মাণ্ডূক্যে (পৃ. ১৭-১৮)······ব্যাখ্যাতং, তথাত্রাপি ব্যাখ্যায়তাম্।"

নৃসিংহ. পৃ. ৪৬।

এখানে তর্ক করা যাইতে পারে, প্রথম বাক্যে (১) 'ব্যাখাতং' ও 'ব্যাখ্যায়তে' এবং দ্বিতীয় বাক্যে (২)'ব্যাখ্যাতং' ও 'ব্যাখ্যায়তাম্' এই উভয় ক্রিয়ার কর্তা একই ব্যক্তি, এবং ইহা সেই নৃসিংহভাষ্যকারকেই বুঝাইতেছে, এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, উভয় উপনিষদের ভাষ্যকার একই। কিন্তু ইহাও ঠিক ঐরূপেই বলিতে পারা যায় যে, ঐ উভয় ক্রিয়ার কর্ত্তাকে যদি ভিন্ন-ভিন্ন বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলেও অন্বয়ে কোন দোষ হইতে পারে না। এবং ইহাই হইলে ঐ বাক্য দুইটির এই-রূপ অর্থ হয় যে, (১) ঐ বাক্যটিকে (অন্যে অর্থাৎ মাণ্ডূক্যভাষ্যকার) যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আপনি এখানে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন না কেন? অথবা (২) আপনি এখানেও সেইরূপ ব্যাখ্যা করুন। উভয় ভাষ্যকারের অভেদ-সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধ প্রমাণ থাকায় আলোচ্য বাক্য দুইটির অন্য আর কোনো অর্থই সঙ্গত হয় না।

"তস্মিন্নপি কিয়ান্ পাঠভেদস্তদ্‌ব্যাখ্যানাবসারে দর্শিত এব।"

নৃসিংহ. পৃ. ৪৮।

—ইহাও মাণ্ডূক্যসম্বন্ধে নহে, কারণ তাহাতে কোনো পাঠভেদ নাই। বস্তুত

ইহা নৃসিংহের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। কেননা, ইহাতে একটু পূর্ব্বেই (পৃ. ৪৬) [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে এই বুঝা যায় যে, উপনিষদ্-ভাষ্য-সমূহের অন্তত তিন জন ভিন্ন-ভিন্ন রচয়িতা আছেন এবং ইঁহারা সকলেই শঙ্করাচার্য্য এই সাধারণ নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ও শ্রেষ্ঠ হইতেছেন ব্রহ্মসূত্র, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ও গীতা-প্রভৃতির ভাষ্যকার; দ্বিতীয় মাণ্ডূক্যের ভাষ্যকার এবং তৃতীয় নৃসিংহের ভাষ্যকার।

যদিও ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কেন-উপনিষদের বাক্যভাষ্য-কার ও শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্যকার প্রধান শঙ্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, তথাপি আমি ইহা এখন বলিতে পারিতেছি না যে, কেনের বাক্যভাষ্যকারও শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্যকার পরস্পর ভিন্ন কি না, অথবা মাণ্ডূক্য ও নৃসিংহের ভাষ্যকারদেরও মধ্যে কাহারো সহিত তাহাদের (কেনের বাক্যভাষ্যকার ও শ্বেতাশ্বতারের ভাষ্যকারের) মধ্যে কাহারো অভেদ আছে কি না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

——•——

দেশীয় তত্ত্ববিদ্যার সাগরমন্থন

আমার এবারকার এই প্রবন্ধে আমাদের দেশীয় দর্শনশাস্ত্রের মোটমোট সিদ্ধান্তগুলির একটি সহজশোভন ডালি সাজাইয়া সত্যান্বেষী সজ্জনগণের মনশ্চক্ষুর গোচরে নিবেদন করিব মনে করিয়াছি। আমার এই উদ্দেশ্যটি সুচারুরূপে যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে আমাদের দেশীয় দর্শনারণ্যের মধ্য হইতে কাঁটা খোঁচা বর্জ্জিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানগুলি বাছিয়া বাছিয়া তথাকার সারবান্ এবং ফলবান্ বৃক্ষসকল হইতে মহোপকারী ফল সকলের আহরণ কার্য্যে এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অধুনাতন কালের ডারুইন-পন্থী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা জীবজগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি শ্লাঘান্বিত মনে করেন। উঁহারা মনে করেন যে, এত প্রভূত বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ ঐক্যের বন্ধন যে সম্ভব হইতে পারে ইহা পূর্ব্বতন কালের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্বপ্নেও জানিতেন না। ইঁহাদের মনে জীবজগতের গোড়ার ঐক্যটি নিতান্তই একটা অধুনাতন কালের যুগ-উল্টানিয়া নূতন আবিষ্কার। বহুধা বিচিত্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মৌলিক ঐক্যান্বেষণ-পথের এইটুকু পর্য্যন্ত আসিয়াই নব্যতম যুগের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা চলৎশক্তি রহিত হইয়া থামিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিরা কিন্তু ওরূপ একটা আপেক্ষিক ঐক্যতত্ত্বকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া সর্ব্বজগতের আদ্যন্তব্যাপী মহৎ হইতেও মহত্তর, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং ধ্রুব হইতেও ধ্রুবতর ঐক্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। বেদান্তদর্শন তাঁহাদের সেই অপরাহত সত্যান্বেষণের সুপরিপক্ক ফল। ডারুইনের চেলারা জানেন না যে, ডারুইন্ জীবজগতের ঐক্যান্বেষণ পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে

জীবজন্তুদিগের ভেদরহস্যের দ্বার উদঘাটনের একটি গোড়া'র রহস্য খুঁজিয়া পাইয়া যাহার নাম তিনি দিয়াছিলেন "Struggle for existence";—ধরিতে গেলে এটা একটা অনেক কালের পুরাতন সামগ্রী। তার সাক্ষী—ডারুইনের ঐ সাধের সংজ্ঞা বচনটির ("Struggle for existence "—এই বচনটির) গোড়ার কথাটা আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে অনেক কাল পূর্ব্বে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া চোকা হইয়াছে এইরূপ যে, Struggle এর অর্থাৎ ছটফটানির গোড়া'র বনিয়াদ হ'চ্চে রজোগুণ, আর, "existence এর" কিনা সত্তার গোড়া'র বনিয়াদ হচ্চে সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণের পরিস্ফুটনই রজোগুণের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের মতে রজোগুণের কার্য্যকারিতা শুদ্ধ কেবল পৃথিবীস্থ জীব শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; তাহা সমস্ত সৃষ্টির সমস্ত কার্য্যের গোড়ার প্রবর্ত্তক; আর, সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণের বিকাশ সমস্ত কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য। সত্ত্ব শব্দের অর্থ নানা স্থানে নানারূপ :— (১)সত্ত্বশব্দের শব্দমূলক অর্থ সত্তা (existence); (২) সত্ত্বশব্দের সাংখ্যসম্মত অর্থ প্রকাশরূপী এবং আনন্দরূপী প্রকৃতির মূল উপাদান; (৩) যোগ শাস্ত্রে সত্ত্বশব্দের একতম অর্থ চিত্ত অন্তঃকরণ এবং বুদ্ধির সার সর্ব্বস্ব; (৪) কাব্যসাহিত্যে সত্ত্বশব্দের অর্থ প্রাণী বা জীব। এতগুলি অর্থের গোড়া ঘেঁসিয়া একটিমাত্র শব্দ অবিচলিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—সেশব্দটি হ'চ্চে সত্ত্ব। সত্ত্বশব্দের এতগুলি এই যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ—সকলই কি স্ব স্ব প্রধান? কাহারো সঙ্গে কাহারো কি কোনো সম্পর্ক নাই? এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, জ্ঞান এবং আনন্দ এই দুইটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার ন্যূনাধিক পরিমাণে উহাদের সকলের মধ্যেই স্পষ্টাকারে জানান্ দিতেছে। তার সাক্ষী—জ্ঞান এবং আনন্দ ব্যতিরেকে সত্তা অসত্তা হইয়া যায়, প্রকাশ অপ্রকাশ হইয়া যায়, বুদ্ধি এবং চিত্ত অবোধ এবং অচেতন হইয়া যায়; জীব জড় হইয়া যায়। অতএব সত্ত্ব-শব্দের অই যে অতগুলি অর্থ—সমস্তই একেরই মূর্ত্তিভেদ বই আর কিছুই না। সর্ব্বপ্রথমে সত্ত্বশব্দের স্থূলতম অর্থটা আলোচনা ক্ষেত্রে অবতারণা করা যাক্—জীব অর্থটা।

সমস্ত সৃষ্টি আগা গোড়া যদি জড়সৃষ্টি মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত হইত—তবে সে সৃষ্টি হওয়া এবং না হওয়া দুইই নিক্তির ওজনে সমান হইত। জীব সৃষ্টিই প্রকৃত সৃষ্টি;—গীতাতে তাই জীবজগৎ ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে, জড় জগৎ অপরা প্রকৃতি—জীব জগৎ পরা প্রকৃতি। জীব জগৎ না থাকিলে জড় জগতের কোনো অর্থই হয় না—চেতন পদার্থ না থাকিলে অচেতন পদার্থের কোনো অর্থই হয় না—জ্ঞান না থাকিলে সত্তার কোনো অর্থই হয় না, আনন্দ না থাকিলে প্রাণের কোনো অর্থই হয় না। আর সেই কারণেই জীব সত্তার পরিস্ফুটনের জন্য রজোগুণের ছট্‌ফটানি নিতান্তই একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় গোড়ার সূত্র বলিয়া সকল শাস্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে বলে যে, জ্ঞান এবং আনন্দের অভাবে সারা সৃষ্টি যাহাতে সমূলে ব্যর্থ না হয়—এই উদ্দেশে রজোগুণ সর্ব্বপ্রথমে জীব সত্তার পরিস্ফুটন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। রজোগুণের সবেমাত্র প্রথম উদ্যমের কার্য্যকারিতায় যখন নানা প্রকার জীবের একমাত্র অঙ্কুর অব্যক্ত প্রকৃতির গর্ভ হইতে অথবা, যাহা একই কথা অপ্রকাশের অন্ধকার হইতে প্রকাশের আলোকে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং তাহার কিছুকাল পরে সেই জীবাঙ্কুর হইতে নানা দিকে নানা জীবশাখা অহং-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতে থাকে, তখন সেই জীবশাখাগণ জ্ঞান এবং আনন্দের শৈশবসুলভ অপরিপক্কতা নিবন্ধন অবিদ্যা বা মোহের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ হওয়া গতিকে মূলের সহিত এবং তাহাদের স্বজাতীয় শাখাবর্গের সহিত তাহাদের যে কোনো প্রকার সম্পর্ক আছে—একথাটি তাহাদের নবোন্মেষিত জ্ঞানে আদবেই স্থান পায় না। আর, সেইজন্য তাহারা শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার আশু-প্রয়োজনীয় অভাব পূরণের জন্যই প্রতিনিয়ত ব্যস্ত সমস্ত হয়। এই সময়ে প্রকৃতির নবপ্রসূত সন্তান-সন্ততিগণের একমাত্র কার্য্য হয় আহার নিদ্রার সম্ভোগ দ্বারা স্ব স্ব অন্নময়-কোষকে পরিপুষ্ট করা। ইহার পরে জীবেরা ক্রমশই উত্তরোত্তর অধিকাধিক পরিমাণে জ্ঞান এবং আনন্দের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জ্ঞান এবং আনন্দের সমুচিত মাত্রা পরিস্ফুটনের সময় উপস্থিত

না হওয়াতে মাঝ পথে জীবগণ সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্যের প্রতি অন্ধ হইয়া দুর্দান্ত ভাবে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা এবং বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হয় ; আর সেই সূত্রে অজ্ঞান এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে জ্ঞান ধর্ম্ম আনন্দ প্রভৃতির, এক কথায় সত্ত্বগুণের, বিকাশ কিয়ৎকালের মতো নানাপ্রকার বাধা বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়া ম্রিয়মাণ ভাব ধারণ করে। এইরূপ দুর্দৈবের অবস্থায় যথা যথা সময়ে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া সত্ত্বগুণের বিকাশকে ভয়ানক ভয়ানক বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর করিয়া দ্যা'ন। তখন সেই দৈবী শক্তির অমোঘ প্রসাদে মনুষ্যের অন্তর্নিগূঢ় আত্মশক্তি মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া নূতন জ্ঞানের নূতন জীবনের এবং নূতন আনন্দের উৎস লোকসমাজে উন্মুক্ত করিয়া দ্যায়। গীতায় তাই উক্ত হইয়াছে

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহং॥"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হয়, তখন তখন আমি আপনাকে সৃষ্টিত মূর্ত্তিমান্ করি।

এইরূপ রজোগুণের কার্য্যকারিতায় সত্ত্বগুণের বিকাশ যখন চরম সীমায় উপনীত হয়, তখনকার সেই চরম অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের অভিপ্রায় কিরূপ, ইহার পরে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পারসীক প্রসঙ্গ

প্রজ্ঞার বাণী

২

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'শীতলতর কি, উষ্ণতরই বা কি? অধিকতর প্রকাশ কি, অধিকতর অন্ধকারই বা কি? সম্পূর্ণতর কি, রিক্ততরই বা কি? কোন্ শেষ নিষ্ফলতর? তাহা কি যাহাতে কাহারো তৃপ্তি হয় না? তাহা কি যাহা কেহ অপহরণ করিতে পারে না? তাহা কি যাহা মূল্য দ্বারা কিনিতে পারা যায় না? তাহা কি যাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়? তাহাই বা কি যাহাতে কেহই সন্তুষ্ট হয় না? সেই কাম (কাম্য বস্তু) কি যাহা স্বামী অহুরমজদা মনুষ্যগণের জন্ম অভিলাষ করেন? সেই কামই বা কি যাহাকে দুর্বৃত্ত অহর্মন মনুষ্যগণের জন্ম অভিলাষ করিয়া থাকে? ইহলোকের শেষ কি, পরলোকেরই বা শেষ কি?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'মুক্তাত্মাদের হৃদয় উষ্ণতর-আর দুর্বৃত্তদের হৃদয় শীতলতর। ধর্ম্ম (বা উত্তম ভক্তি) অধিকতর প্রকাশ, আর দুর্বৃত্ততা অধিকতর অন্ধকার। যজনীয় দেবগণের যে আশা ও রক্ষা তাহাই সম্পূর্ণতর আর দৈত্যগণের আশা ও রক্ষা রিক্ততর। যে ইহলোকের ব্যবস্থা ও পরলোকের বিনাশ করে তাহার শেষ নিস্ফলতর। জ্ঞানে কেহ তৃপ্ত হয় না (অর্থাৎ লোকে উত্তরোত্তর আরো জ্ঞান চাহিতে থাকে)। বিদ্যা ও জ্ঞানকে কেহ অপহরণ করিতে পারে না। বুদ্ধি ও স্মৃতিকে (কর্ত্তব্য বিষয়ে সর্ব্বদা স্মরণশীলতা) কেহ

মূল্য দ্বারা ক্রয় করিতে পারে না। প্রজ্ঞা দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়। জড়তা ও দুর্বুদ্ধিতে কেহ সন্তুষ্ট হয় না।

'স্বামী অহুরমজদা মনুষ্যগণের জন্য এই কাম অভিলাষ করেন যে,"ইহারা আমাকে ভাল করিয়া জানুক, কেননা যাহারা আমাকে ভাল করিয়া জানে তাহারা সকলেই আমার নিকটে আগমন করে এবং আমার সন্তোষের জন্য চেষ্টা করে।" আর অহর্মন মনুষ্যগণের জন্য এই কাম অভিলাষ করে যে "ইহারা যেন আমাকে না জানে, কেননা আমি দুর্বৃত্ত, আমাকে যে জানে সে আর পরে আমার কার্য্যে থাকে না, ইহা হইতে আমার কোনো লাভ ও সাহায্য হয় না।"

'আর যে তুমি ইহলোক ও পরলোকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহার উত্তর এই যে, ইহলোকের শেষ হইতেছে মৃত্যু ও অপ্রকটভাব, আর পরলোকের শেষ হইতেছে এই যে, মুক্তাত্মাদের আত্মা অজর অমর অপ্রতিহত পূর্ণশ্রীসম্পন্ন ও সম্পূর্ণানন্দ হইয়া চিরকালের জন্য যজনীয় দেবগণ, অহুরমজদার প্রধান অনুচরগণ, ও রক্ষক দেবগণের সহিত অবস্থান করে। আর যে আত্মা দুর্বৃত্ত তাহা নরকে চিরকাল নিগ্রহ ও ছেদন দুঃখ অনুভব করে, এবং এই শাস্তি ছাড়া দৈত্যদানবগণের সহিত অবস্থান করিয়া সে গুরুতর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহবাসে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' ৪০

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'মনুষ্য কয় প্রকার?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর দিলেন—'মনুষ্য তিন প্রকার; এক মনুষ্য, এক অর্দ্ধ-মনুষ্য, আর এক অর্দ্ধ-দৈত্য।'

'সেই মনুষ্য, যাহার অহুরমজদার সৃষ্টিকারিতায়, অহর্মনের ধ্বংসকারিতায়, শবের পুনরুত্থানে, (জীবের) পর জন্মে, এবং ইহলোকীয় ও পরলোকীয় অন্যান্য শুভ ও অশুভ সমূহে নিশ্চয় আছে; যাহার নিশ্চয় আছে যে, ইহাদের (শুভাশুভসমূহের) মূল হইতেছে অহুরমজদা ও অহর্মন; যাহার মজদয়াজীদের বিশুদ্ধ ও উত্তম ধর্ম্মে

বিশ্বাস আছে; এবং যে বিভিন্ন মতে বিশ্বাস করে না বা তাহা শ্রবণ করে না।

সেই অর্দ্ধ-মনুষ্য, যে নিজের রুচি বা ইচ্ছা বা নিজের বুদ্ধি অথবা স্বেচ্ছাচারিতায় ইহলোকের ও পরলোকের জন্য কার্য্য করে; এবং যে অহুরমজদার ইচ্ছায় ও অহর্মনের ইচ্ছায় যে কার্য্য হয় তাহাও করিয়া থাকে।

আর সেই হইতেছে অর্দ্ধ-দৈত্য, যাহার কেবল নাম ও জন্মই মানুষের, কিন্তু সমস্ত কার্য্যই দ্বিপদ দৈত্যের সমান; যে ইহলোক জানে না, পরলোক জানে না; যে পুণ্য জানে না, পাপ জানে না; যে স্বর্গ জানে না, নরক জানে না; এবং যে আত্মাকে যে হিসাব দিতে হইবে তাহা জানে না।'৪২

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'অহর্মন মনুষ্যগণের কোন্ অত্যাচারকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর মনে করে?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'অহর্মন যে, মনুষ্যের স্ত্রী, পুত্র, বা জীবনকে অপহরণ করে, তাহাতে সে মনে করে না যে, তাহার কোনো ক্ষতি করিয়াছে; কিন্তু যখন কেবল তাহার আত্মাকে অপহরণ পরে, তখনই সে মনে করে যে, সে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতি করিয়াছে।'৪৬

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'সেই জিনিস কি যাহা সমস্ত সম্পদের শ্রেষ্ঠ? তাহা কি যাহা যা-কিছু সমস্ত পদার্থেরই উপরে? এবং তাহাই বা কি যাহা হইতে কেহই পলাইতে পারে না?'

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন—'উত্তম প্রজ্ঞা এই দুই লোকের সমস্ত সম্পদের শ্রেষ্ঠ। ভাগ্যই এই যাহা কিছু আছে সেই সমস্তেরই উপরে। কালের * নিকট হইতে কেহ পলায়ন করিতে পারে না।'৪৭

---

* অথবা 'বায়ু.' ইহা দৈত্য বিশেষ, মৃত্যুর পরে আত্মাকে বহন করিয়া যায়।

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—'কোন্ মনুষ্য উৎকৃষ্টতর, কোন্ মনুষ্যই বা নিকৃষ্টতর ?'

প্রজ্ঞাদেবী বলিলেন—'যে উত্তম ব্যক্তিগণের সহিত কার্য্য করে, এবং লোকেরা যাহার উত্তম নাম ও শ্লাঘা করিয়া থাকে,সেই মনুষ্য উৎকৃষ্টতর। আর যাহার কার্য্য নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত,আর লোকে যাহার নিন্দা ও নিকৃষ্টতা কীর্ত্তন করে, সেই মনুষ্য নিকৃষ্টতর। কারণ, উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি উত্তমের সহিত সংসর্গ করে সে উত্তম হয়, আর যে নিকৃষ্টের সহিত মিলিত হয় সে নিকৃষ্ট হইয়া যায়, যেমন বায়ু যদি দুর্গন্ধকে স্পর্শ করে তবে তাহা দুর্গন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু যদি সুগন্ধ স্পর্শ করে তবে তাহাও সুগন্ধি হইয়া থাকে।'[৬০]

জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন—'পুণ্যসমূহের মধ্যে কোন্ পুণ্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, উত্তম, মূল্যবান্, ও লাভকর, যাহার অনুষ্ঠানে কোনো কষ্ট ও ব্যয় নাই ?'

প্রজ্ঞাদেবী বলিলেন—'সকলেরই মঙ্গল অভিলাষ করা ও সকলের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া, ইহাই সমস্ত পুণ্যের মধ্যে মহৎ, উত্তম, মূল্যবান্ ও লাভকর, এবং ইহার অনুষ্ঠানে কোনো কষ্ট ও ব্যয় নাই।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ

তন্ত্রের পঞ্চমকার লইয়া সাধন সুপ্রসিদ্ধ। যাহা দ্বারা প্রত্যক্ষতই মানুষের পতন দেখা যায়, কিরূপে তাহাতে উন্নতি হইতে পারে, এই প্রশ্ন সহজেই চিত্তে উদিত হইয়া থাকে। তান্ত্রিকেরাও যে, ইহা না ভাবিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা দেখিয়াছেন, ভোগে আসক্তি না গেলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু মানুষ সাধারণত ভোগেই আসক্ত; তাহাকে ভোগ ত্যাগ করিতে বলিলে ইচ্ছা করিলেও সে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না, অসক্তিটা এতই প্রবল। তাঁহারা আরো ভাবিয়াছেন, ভোগটা একবারে পরিত্যাজ্য নহে, ভোগ করিতে হইবে, অথচ মুক্তিকেও পাওয়া চাই। তাই তাঁহারা ভোগেরই মধ্য দিয়া মুক্তিতে যাইবার উপায় চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহারা লোকস্থিতি ও অন্যান্য ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়া বলেন যে, যেখানে ভোগ আছে সেখানে মুক্তি নাই, আবার যেখানে মুক্তি আছে সেখানে ভোগ নাই; কিন্তু তাঁহাদের মতে ভোগ ও মুক্তি উভয়ই আছে :—

"যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো
যত্রাস্তি মক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরীপূজনতৎপরাণাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥" আনন্দস্তোত্র।

'যেখানে ভোগ সেখানে মোক্ষ নাই, আবার যেখানে মোক্ষ সেখানে ভোগ নাই; কিন্তু যাঁহারা শ্রীসুন্দরীর (ত্রিপুরসুন্দরীর) পূজায় তৎপর, ভোগ ও মোক্ষ তাঁহাদের করস্থিতই থাকে।

কিন্তু কিরূপে ইহা হইতে পারে, ইহার যুক্তি কি, তাহা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্তত আমি যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে ইহা দেখিতে পাই নি। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু বলা হইয়াছে।

বেদপন্থীর ধর্ম্মের ন্যায় উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম্মেও তান্ত্রিকতা প্রচুর ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা অনেকই জানেন। ত থা গ ত গু হ্য ক[১] নামে একখানি বৌদ্ধ তন্ত্র আছে; রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার বিবরণ দিয়াছেন,[২] ইহাতে বুঝা যায় তান্ত্রিক

১। ইহার অপর নাম গু হ্য স ম ঘ (গু হ্য স ঙ্ঘ? অথবা গু হ্য সং গ্র হ?

২। Skt. Bud Lit, Nepal, pp, 261-264. পুস্তকখানি এখনো মুদ্রিত হয় নি, ইহার পুঁথীও দেখিবার সুযোগ আমি এখনো পাই নি।

ত থা গ ত গু হ্য ক সম্বন্ধে এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন (Perface to Catuhsatika, Memoirs, ASB, Vol III, No 8, p, 451), চন্দ্রকীর্ত্তি মধ্যমক-কারিকার টীকায় যে ত থা গ ত গু হ্য ক ধরিয়াছেন তাহা তা ন্ত্রি ক স হ জি য়া স ম্প্র দা য়ে র গ্রন্থ। কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রী মহাশয় খুব সম্ভব রাজেন্দ্রলাল মিত্র-বর্ণিত উল্লিখিত তথাগতগুহ্যককে মনে করিয়াই এই কথা লিখিয়াছেন। বস্তুত মাধ্যমিকবৃত্তিতে (Bibli. Bud, pp. 361-363, 366, 539), শিক্ষাসমুচ্চয়ে (Bibli. Bud, pp, 7, 158, 242, 274, 357),ও বোধি-চর্য্যাবতারপঞ্জিকায় (Bibli. Ind. pp, 123, 493) যে ত থা গ ত গু হ্য ক সূ ত্র (তথাগতগুহ্যক নহে) ধৃত হইয়াছে, ইহা ভিন্ন গ্রন্থ। ঐ সমস্ত পুস্তকে উদ্ধৃত অংশসমূহ আলোচনা করিলে ও রাজেন্দ্রলালমিত্র-বর্ণিত পুস্তকের সহিত তৎসমুদয় তুলনা করিলে কিছুতেই মনে হয় না যে, ঐ উভয়গ্রন্থ এক হইতে পারে। মহাব্যুৎপত্তিতে (Mamomris, A S B Vol. I, No, I, Mahavyutpatti, Part I, p. 81, § LIX, 38), ত থা গ তা চি ন্ত্য গু হ্য নি র্দে শ নামে যে গ্রন্থ ধরা হইয়াছে, ইহা ও মাধ্যমিকবৃত্তি-প্রভৃতিতে ধৃত তথাগতগুহ্যকসূত্র একই বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। চীনা অনুবাদ দেখিয়া ইহাই প্রতীত হয়।

সাধন কতদূর বীভৎস হইতে পারে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঐ বিবরণ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।[৩] কিরূপে তাদৃশ বিষয়োপভোগের দ্বারা পরমার্থ লাভ হইতে পারে, তাহা চি ত্ত শু দ্ধি প্র ক র ণ[৪] নামে একখানি এই জাতির বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতেই নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তি লিখিত হইতেছে।

ইঁহাদের প্রথম কথাটা এই যে, সাধারণ লোকে যে সকল দারুণ কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে যদি সেই সমস্ত কর্ম্মকে উপযুক্ত কৌশলে অনুষ্ঠান

দ্রষ্টব্য C. Bendall's Note. শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ. ২৭৪। তথাগতগুহ্যকসূত্র হইতেছে ললিত বিস্তরপ্রভৃতি ৯খানি ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম গ্রন্থের অন্যতম। ইহাতে রাজেন্দ্রলাল-বর্ণিত তথাগতগুহ্যকের ন্যায় বীভৎস তান্ত্রিকতা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষত রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে উদ্ধৃত ভণিতায় পুস্তকখানির নাম গু হ্য স ম য দেখা যায়, ত থা গ ত গু হ্য ক নহে। শেষোক্ত নামটি কোথায় পাওয়া গেল রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহা নির্দ্দেশ করেন নি। এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান অনাবশ্যক।

৩। এ সম্বন্ধে সুভাষিতসংগ্রহও (C. Bendall : pp. 37-40) দ্রষ্টব্য।

৪। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন (JASB ; 1898, Part I. pp. 178-184)। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত অংশকে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়াছেন ; কিন্তু বস্তুত উল্লিখিত সুভাষিতসংগ্রহে চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণের যতগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রকাশিত অংশে তাহাদের সবগুলি পাওয়া যায় না। আর্য্যদেবের (খ্রী. ২য় শতাব্দী) নাম উদীচ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে অতিপ্রসিদ্ধ, ইঁহার উক্তি অনেক পুস্তকে অতি প্রামাণিক ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহার চ তুঃ শ তি কা নামে আর একখানি বৌদ্ধদর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ (খণ্ডিত) প্রকাশ করিয়াছেন (Memoirs, A S B, Vol. III, No. 8, pp. 449-514)।

করা হয় তো তাহাদেরই দ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে।[৫] কি প্রকারে ইহা সম্ভব হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, পাপে বন্ধন ও পুণ্যে মুক্তি হয় সত্য, কিন্তু কোন্‌টা কিরূপে পাপ বা পুণ্য ইহা ঠিক করিতে হইবে। পাপ-পুণ্য কিসে হয়, তাহার মূল কি ? মন, চিত্ত বা আশয়ই হইতেছে পাপ-পুণ্যের কারণ। চিত্ত যদি দুষ্ট অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা দূষিত হয় তবে সেই দুষ্ট চিত্ত দ্বারা যে কাজ করা যায় তাহাতেই পাপ হয়; কিন্তু চিত্ত যদি নির্ম্মল থাকে তাহা হইলে সেই চিত্ত দ্বারা ঐ একই কাজ করিলে তাহাতে পাপ হয় না হয় তো বরং পুণ্যই হইতে পারে। কোনো ভিক্ষু নিজের পিতাকে কোনো কার্য্যে যাইতে বলেন, পিতা গমন করিয়া কারণবিশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হন; সেই ভিক্ষু ইহাতে পিতৃহত্যার পাপে পাপী হয় না। কোনো এক অর্হতের গলায় কোনো পীড়া হওয়ায় তিনি নিজের পরিচারক ভিক্ষুকে গলাটা মলিয়া দিবার জন্য বলেন, পরিচারক ভিক্ষু ঐরূপ করিলে অর্হতের প্রাণবিয়োগ হয়, ইহাতে ঐ ভিক্ষুর কোনো দোষ হয় না। বিনয়ে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, চিত্ত যদি দুষ্ট না থাকে তবে কোনো দোষ হয় নি—"ন দোষোঽদুষ্টচেতসাম্।" কেহ যদি সংস্কার করিবার ইচ্ছা করিয়া কোনো স্তূপ খনন করে, তবে সেই স্তূপখননে তাহার কোনো দোষ হয় না, বরং পুণ্যরাশিই হইয়া থাকে। অতএব পাপ-পুণ্যের ব্যবস্থার মূল হইতেছে আশয় বা চিত্ত। আগমে ইহা বলা হইয়াছে, এবং সেই জন্যই যাহাদের চিত্ত নির্ম্মল, তাহাদের কোনো দোষ হয় না।[৬]

৫। "যেন যেন হি বধ্যন্তে জন্তবো রৌদ্রকর্ম্মণা।
সোপায়েন তু তেনৈব মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥"

সুভাষিতসংগ্রহে (p. 37) চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে ইহাই প্রথম, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকে ইহা নাই।

৬। চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণের উল্লিখিত সংস্করণ অত্যন্ত অশুদ্ধ, কোনোরূপ পাঠের পরিবর্ত্তন না করিয়া নিম্নে এই প্রসঙ্গের মূল শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত হইল :—

পাপ-পুণ্যের ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইল তাহা অতি যুক্তিযুক্ত, ইহাতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাতেও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই হিংসাশ্রিত হইলেও ধর্ম্মযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই জন্যই দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে অপক্ষপাতী বিচারকের দোষ হয় না। ব্রণচ্ছেদন করিবার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে শল্যকর্ত্তা চিকিৎসকের দোষ হয় না। বিষয়োপভোগ সম্বন্ধেও এইরূপ, যদি নির্ম্মল চিত্তে কৌশলপূর্ব্বক বিষয় উপভোগ করা যায় তাহা হইলে বিষয় হইতে মুক্তিলাভই হয়, তাহাতে লিপ্ত হইতে হয় না।[৭] এ সম্বন্ধে তাঁহারা একটা দৃষ্টান্ত এইরূপ দিয়াছেন :—"যে

"স্বপিতা ভিক্ষুণাদিষ্টঃ শীঘ্রং গচ্ছতি প্রেরিতম্।
আয়ুষ্য চ মৃতে তস্মিন্নানন্তর্য্যেণ গৃহ্যতে ॥ ১০ ॥
স্বয়ানেনার্হতাদিষ্টঃ স্বগলং পরিপীড়িতম্।
উপস্থায়কভিক্ষুঃ স মৃতে তস্মিন্ন দোষভাক্ ॥ ১১ ॥
অঙ্গসঙ্গীনি চান্যাত্ত মায়য়ন্ দোষমশ্নুতে।
ইত্যুক্তং বিনয়ে যস্মান্ন দোষোঽদুষ্টচেতসাম্ ॥ ১২ ॥
ন তু পথদানে দোষস্তৎসংস্কারধিয়া মতম্।
কেবলং পুণ্যরাশিঃ স্যাদুত্থানকর্ম্মকারিণাম্ ॥ ১৩ ॥
* * * *
তস্মাদাশয়মূলা হি পাপকর্ম্মব্যবস্থিতিঃ।
ইত্যুক্তমাগমে যস্মান্নাপত্তিঃ শুভচেতসাম্ ॥ ১৫ ॥

১৫শ শ্লোকে "পাপকর্ম্ম"-স্থলে সুভাষিতসংগ্রহে "পাপপুণ্য"-পাঠ আছে, এবং ইহাই সুন্দর।

৭। "ভুঞ্জানো বিষয়ান্ যোগান্ মুচ্যতে ন তু লিপ্যতে,"—চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ,১৩ ইহা সুভাষিতসংগ্রহ-ধৃত পাঠ ; শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ—"……মুচ্যতে ন চলিষ্যতি।" তুলঃ—"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥" গীতা, ২, ৬৪।

ব্যক্তি বিষয়ে তত্ত্ব জানেন, তিনি যদি বিষ পান করেন, তাহা হইলে তিনি যে কেবল বিষেরই দোষ হইতে মুক্ত থাকেন তাহা নহে, রোগও হইতে মুক্ত হন।"[৮]

এ সম্বন্ধে তাঁহাদের গোড়ায় আর একটি কথা এই। বৌদ্ধগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় (যোগাচার) আছেন, ইঁহাদের মতে বাহ্য বস্তুর কোন সত্তা নাই। বাহিরে যাহা কিছু দেখা শুনা যায় সমস্তই চিত্তের কল্পনামাত্র। আর এক সম্প্রদায় (মাধ্যমিক) আছেন, তাঁহারা বলেন, বস্তুত চিত্তেরও কোন সত্তা নাই, সমস্তই শূন্য। কোনো বস্তুর উৎপত্তিও নাই ধ্বংসও নাই; কোনো বস্তুর কোনো স্বভাব বলিয়া কিছুই নাই, সবই নিঃস্বভাব। আত্মা বলিয়াও কিছু নাই, আত্মীয় বলিয়াও কিছু নাই, সবই অনাত্মা সবই শূন্য। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের ভোগের দ্বারা সাধন এই উভয়ই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা বলেন—"এই জগৎ তো মায়া, মরুমরিচীকা গন্ধর্ব্বনগর ও স্বপ্নের ন্যায়। যে ব্যক্তি এইরূপ দেখিতে পায় সে কিরূপে কি ভোগ করে?"[৯]

তাঁহারা আরো বলেন—"যাহারা অতত্ত্বদর্শী তাঁহারা মনে করেন, সংসার আছে নির্ব্বাণ আছে; কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা সংসার বা নির্ব্বাণ কিছুই মনে করেন না। চিত্তের বিবিধ কল্পনারূপ মহাকুম্ভীরেই সংসারসমুদ্রে মানুষকে টানিয়া ফেলে; কিন্তু যে সমস্ত মহাত্মার বিবিধ কল্পনা নাই, তাঁহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। বস্তুত শরীরে বিষ প্রবেশ না করিলেও অজ্ঞ ব্যক্তি যদি মনে করে যে, শরীরে বিষ ঢুকিয়াছে, তবে সে এই বিষয়ের ভয়ে, শরীরে সত্য-সত্যই বিষ ঢুকিলে যেমন পীড়া হয়, সেইরূপ পীড়া অনুভব করে; পরে কোনো সকরুণ ব্যক্তি আসিয়া তাহার

৮। "যথা হি বিষতত্ত্বজ্ঞো বিষমালোক্য (ড্য?) ভক্ষয়ন্।
কেবলং মুচ্যতে নাসৌ রোগমুক্তস্তু জায়তে॥"১৭॥

ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত "ভুঞ্জানো বিষয়ান্" ইত্যাদির সহিত অন্বিত।

৯। "মায়ামরীচিগন্ধর্ব্বনগরস্বপ্নসন্নিভম্।
জগৎ সর্ব্বং সমালোক্য কিং কথং কেন ভুজ্যতে॥ ১৮॥

এই ভয়কে দূর করিয়া দেন। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন অন্য বস্তুর রঙে রঙিন হইয়া উঠে, চিত্তরত্নও সেইরূপ কল্পনার রঙে রঙিন হইয়া পড়ে। চিত্ত রত্ন যদি কল্পনার রঙ হইতে তফাতে থাকে তবে তাহার অনুৎপন্ন স্বাভাবিক রূপ অনাবিল ও নির্ম্মল থাকে। অতএব চিত্তকে নির্ম্মল করিবার জন্য নিজের অধিদেবতার সহিত যোগযুক্ত হইয়া অল্পবুদ্ধিরা যাহা নিন্দাও করে তাহাও যত্ন পূর্ব্বক করিবে।"[১০]

এইরূপে স্ত্রীসম্ভোগের উপদেশ[১১] দিয়া কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহারা এতাদৃশ বিষয়ভোগকে সমর্থন করিয়া বলেন—

"যেমন কোনো গারুড়িক বিষবৈদ্য নিজের গরুড়কে ধ্যান করিয়া কোনো রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট বিষ পান করে, আর তাহা দ্বারা রোগীকে নির্ব্বিষ করিয়া দেয়, অথচ নিজেও সেই বিষে অভিভূত হয় না, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতিকেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তিকে বিষ স্পর্শ করে, বিষেরই দ্বারা তাহাকে নির্ব্বিষ করিতে পারা যায়। কানে জল ঢুকিলে যেমন তাহাতে জলই ঢালিয়া তাহা বাহির করা হয়; অথবা পায়ে কাঁটা লাগিলে যেমন কাঁটাই দিয়া তাহা বাহির করা হয়, সেইরূপ মনীষীরা রাগেরই (বিষয়াসক্তিরই) দ্বারা রাগকে নষ্ট করিয়া থাকেন। রজক যেমন মলই দিয়া বস্ত্রকে নির্ম্মল করিয়া থাকে, বিজ্ঞ-ব্যক্তিও সেইরূপ মলই দিয়া আত্মাকে নির্ম্মল করিবেন। ধূলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে যেমন দর্পণ পরিষ্কার হইয়া উঠে, বিজ্ঞগণ-সেবিত দোষসমূহও সেইরূপ দোষ নাশক হইয়া থাকে। লৌহপিণ্ডকে জলে ফেলিলে তাহা ডুবিয়াই যায়, কিন্তু

১০। দ্রষ্টব্য—শ্লোক ২৪-২৯। ২৯শ শ্লোকটি এইরূপ :—

"তত্তদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং যদ্ যদ্ বালৈ (:) বিগর্হিতম্।
স্বাধিদৈবতযোগেন চিত্তনির্ম্মলকারণাৎ ॥"

সুভাষিতসংগ্রহ-ধৃত পাঠ।

১১। "রাগাগ্নি বিষসম্বদ্ধা যোগিনা শুদ্ধ চেতসা।
কামিতাঃ খলু কামিন্তঃ কামলোকফলাবহাঃ ॥"৩০

সুভাষিত সংগ্রহ-ধৃত পাঠ।

তাহাকে যদি পাত্র (অর্থাৎ কোনো উপযুক্ত পাত্র) করা যায় তাহা হইলে তাহা নিজেও জল তরিয়া যাইতে পারে, আর অন্য পদার্থকেও তরাইয়া দেয় ; সেইরূপ প্রজ্ঞা দ্বারা উপায় করিয়া চিত্তকে যদি যোগ্য করা যায়, তাহা হইলে সেই চিত্ত দ্বারা ভোগ উপভোগ করিয়া মানুষ নিজেও মুক্ত হয়, আর অন্যকেও মুক্ত করে। দুর্বুদ্ধিরা যে কাম উপভোগ করে, সে কাম বন্ধনেরই কারণ হয় ; কিন্তু বিজ্ঞেরা উপভোগ করিলে সেই কামই মোক্ষের সাধন হয়। প্রসিদ্ধ আছে দুধ বিষ বিনাশ করে, কিন্তু সাপ সেই দুধ পান করিলে তাহা তাহার বিষ বাড়াইয়া থাকে ; বিজ্ঞ ও অজ্ঞের কামোপভোগও এইরূপ। নিপুণ হংস যেমন জল মিশ্রিত দুগ্ধকে পান করিতে পারে, পণ্ডিত ব্যক্তিও সেইরূপ সবিষ বিষয়সমূহ ভোগ করেন, অথচ মুক্ত হইয়া থাকেন। যথাবিধি পান করিলে বিষও অমৃত হয়, কিন্তু অযথাবিধি খাইলে ঘৃতাদিও বিষ হইয়া থাকে। ঘৃত, মধু, ও মাংস একত্র যুক্ত হইলে বিষ হয়, কিন্তু যদি যথাবিধি সেবন করা যায় তবে তাহাই উৎকৃষ্ট রসায়ন হইয়া থাকে। পারদের সঙ্গে ঘর্ষণ করিলে তাম্র যেমন নির্দোষ কাঞ্চন হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ক্লেশসমূহও (অর্থাৎ কামোপভোগাদিও) সেইরূপ কল্যাণের জন্য হইয়া থাকে।[১২]

১২। যথা—"খগরুড়ং ধ্যাত্বা গারুড়িকো বিষং পিবন্।
করোতি নির্বিষং সাধ্যং ন বিষেণাভিভূয়তে ॥ ৩৫ ॥
বিষাক্রান্তো যথা কশ্চিদ্ বিষেণৈব তু নির্বিষঃ ॥ ৩৬ ॥
কর্ণাজ্জলং জলেনৈব কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।
রাগেণৈব তথা রাগমুদ্ধরন্তি মনীষিণঃ ॥ ৩৭ ॥
যথৈব রজকো বস্ত্রং মলেনৈব তু নির্ম্মলম্।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাত্মানং মলেনৈব তু নির্ম্মলম্ ॥ ৩৮ ॥
যথা ভবতি সংশুদ্ধো রজোনির্ঘৃষ্টদর্পণঃ।
সেবিতস্তু তথা বিজ্ঞৈর্দোষো দোষবিনাশনঃ ॥ ৩৯ ॥
লৌহপিণ্ডো জলে ক্ষিপ্তো মজ্জত্যেব তু কেবলম্।

চিত্ত বিশুদ্ধি প্রকরণ আলোচনা করিলে জানা যায় বৌদ্ধগণের এই স্ত্রী-মদ্য-মাংস লইয়া সাধন মহাযানের অন্তর্গত ম ন্ত্র বা দে র মধ্যে প্রচলিত এই মন্ত্রবাদ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আর সমস্ত বাদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র বাদ গ্রহণ করা উচিত, কেন না মন্ত্রের এরূপ মাহাত্ম্য যে, ইহাতে, অত্যন্ত সুখাসক্ত ব্যক্তিও সিদ্ধি লাভ করে :—

"সর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য মন্ত্রবাদং সমাচরেৎ।
পশ্য মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং সৌখ্যদেবোঽপি সিধ্যতি॥" ১২০

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পাত্রীকৃতং তদেবান্যং তারয়েৎ, তরতি স্বয়ম্॥ ৪০॥
তদ্বৎ পাত্রীকৃতং চিত্তং প্রজ্ঞোপায়বিধানতঃ।
ভুঞ্জানো মুচ্যতে কামং মোচয়ত্যপরানপি॥ ৪১॥
দুর্বিজ্ঞৈঃ সেবিতঃ কামঃ কামো ভবতি বন্ধনম্।
স এব সেবিতো বিজ্ঞৈঃ কামো মোক্ষপ্রসাধকঃ॥ ৪২॥
প্রসিদ্ধং সহসালোক্য ক্ষারং (ক্ষীরং ?) বিষবিনাশনম্।
তদেব ফণিভিঃ পীতং সুতরাং বিষবর্দ্ধনম্॥ ৪৩॥
জলে ক্ষীরং যথাবিষ্টং হংসঃ পিবতি পণ্ডিতঃ।
সবিষান্ বিষয়াংস্তদ্বদ্ ভুক্তমুক্তশ্চ পণ্ডিতঃ॥ ৪৪॥
যথৈব বিধিবদ্ ভুক্তং বিষমপ্যমৃতায়তে।
দুর্ভুক্তং ঘৃতপূরাদি বালানাম্ভ বিষায়তে॥ ৪৫॥
ঘৃতঞ্চ মধুসংযুক্তং সমাংসং বিষতাং ব্রজেৎ।
তদেব বিধিবদ্ভুক্তমুৎকৃষ্টং তু রসায়নম্॥ ৫০॥
রসস্পৃষ্টং যথা তাম্রং নির্দোষ-কাঞ্চনং ভবেৎ।
জ্ঞানবিদস্তথা সম্যক্ ক্লেশাঃ কল্যাণকারকাঃ॥ ৫১॥

শিশুদের গণিতশিক্ষা

আজকাল অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিশুদের গণিতশিক্ষা সন্তোষজনক হইতেছে না, চারিদিকে এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছে। শিশুদের মন কেন যে, গণিতের প্রতি প্রতিদিন বিমুখ হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ তাহারা তাহাতে আনন্দ পাইতেছে না। এ তো জানা কথা যে, শিশুরা যাহাতে আনন্দ পায় না, তাহাতে তাহারা মনোনিবেশও করিতে পারে না। জীবনের অধিকাংশ জিনিসই তাহারা খেলার চোখে দেখে; এবং যে মুহূর্ত্তে তাহারা এই কথাটি বুঝিতে পারে যে, গণিতশাস্ত্রটি ক্রীড়াবর্জ্জিত কতকগুলি শুষ্ক বস্তুহীন ফাঁকা সংখ্যা বই আর কিছুই না, সেই মুহূর্ত্তে তাহারা কোন উপায়ে এই নীরস, অর্থহীন বিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়।

এখন কথা হইতেছে এই যে, অঙ্ক কষাইতে-কষাইতে শিক্ষার সঙ্গে এই আনন্দটুকু দেওয়া যায় কেমন করিয়া, সেইটাই ভাবিবার বিষয়। অঙ্কশাস্ত্রকে যদি কোন উপায়ে সহজ ও সরস করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই শিশুদের মন আপনা হতেই সেইদিকে যাইবে, এবং খুসি হইয়া তাহারা উহা শিখিতে চাহিবে। কারণ যাহা সহজে শেখান যায়, তাহাই তাহারা শিখিতে চাহে। শিশুদের ধারণা-শক্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকিতে পারে না, সেই জন্যই কোন দুরূহ বিষয়ে তাহারা কিছুতেই মন দিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা হয়, তাহাতে এই সত্যটি কাজে খাটান হয় না, এবং তার ফলে গণিতের শ্রেণীটি নিতান্ত আনন্দহীন হইয়া উঠিয়াছে।

গণিত অধ্যাপনা-কালে আমরা গোড়ার কথাটাই ভুলিয়া যাই যে, শিশুর পক্ষে গণিতশিক্ষার অর্থ হইতেছে তাহাকে গণনা করিতে শেখান। প্রথমেই যখন তাহাকে সরল ধারাপাত হইতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি নিছক সংখ্যাবাচক রাশি-গুলি মুখস্থ করিতে বলা হয় তখন সেই গুলি তাহার কাছে সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন ও দুর্বোধ বলিয়া বিরক্তির কারণ হইয়া উঠে। পাঁচ বলিতে সে কিছুই বুঝিতে পারে না. কারণ পাঁচ সে চোখে দেখিতে পায় না, এবং সেইজন্ত পাঁচ সম্বন্ধে ধারণা করা তাহার পক্ষে শক্ত। কিন্তু যেমনি বলা যায় পাঁচটি কমলালেবু, কিংবা পাঁচটি পয়সা অথবা পাঁচটি আঙুল, অমনি পাঁচ বলিতে কি বুঝায় তাহা তাহার কাছে দিবালোকের স্তায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। গোড়া হইতেই শিশুকে বার বার নানাস্থলে উদাহরণ দিয়া সংখ্যা বাচক বস্তুশূন্ত (abstract) পাঁচকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে মূর্ত্তিমান (Concrete) করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে।

এখন দেখা যা'ক সাধারণত গুরুমহাশয়েরা কি করিয়া গণিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক দুঃখ পাইয়া শিশু একক হইতে দশক এবং দশক হইতে শতকে আসিয়া পৌছিল, তাহার পর যতই একের পিঠে শূন্ত চাপিতে থাকে ততই তাহার বুদ্ধির ঘটটি কমিতে কমিতে অবশেষে একেবারেই শূন্ত হইয়া পড়ে। লক্ষ কোটির ঘর ডিঙাইয়া যখন শিশুটি খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, মহাপদ্ম, শঙ্কু, জলধি প্রভৃতির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তখন এই অঙ্কশাস্ত্রের অগাধ জলধির মধ্যে পড়িয়া বেচারী হাবুডুবু খাইতে থাকে। যাহা প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জীবনে সে দেখিতে পায় না তাহার কাছে তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগসংক্রান্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক কাষ্ঠফলকে লিখিয়া দিয়া তাহাদিগকে কষিতে বলিলে শিক্ষকের নিজের যথেষ্ট সুবিধা হয়, তাঁহার অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়; কিন্তু শিশুর নিকট এরূপ শিক্ষার কোন অর্থই নাই, সে যে ইহাকে শিক্ষকের একটা জুলুম ও জবরদস্তি মনে করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ক্লাসে ছাত্রদের বার-বার প্রশ্ন করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহারা যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। দুই আর দুই চার হয়, এই সত্যটি

সহজ; কিন্তু শিশুকে হাতে কলমে যদি ইহা দেখাইয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে ইহার মধ্যে কোন অর্থই খুঁজিয়া পায় না। প্রশ্ন দেওয়া হইল—পনরটি পয়সা যদি তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিই, তাহা হইলে তোমরা প্রত্যেকে কটা করিয়া পাইবে? কেহ বলিল গুণ করিতে হইবে, কেহ বলিল যোগ, কেহ বলিল বিয়োগ। ইহা হইতে সুস্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যোগ-বিয়োগই বা কাহাকে বলে, আর গুণ-ভাগই বা কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে তাহাদের কোনই বোধ জন্মে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল ছাত্রদিগকেই যদি বড়-বড় গুণ-ভাগের অঙ্ক দেওয়া যায়, উহা তাহারা অতি অনায়াসে নির্ভুল করিয়া কষিয়া আনিবে। তাহারা আঙুল গুণিয়া অথবা নামতার সাহায্যে এই যে যন্ত্রের ন্যায় অঙ্ক কষিতেছে, ইহাতে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ তো হইতেই পারে না, উৎকর্ষ লাভ দূরের কথা। তাহাদের মনে এই অর্থহীন বৃহৎ সংখ্যাগুলির আবর্জ্জনা এতই জমিয়া উঠে যে, সেই গুলির চাপে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশই খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

আমেরিকা ও জার্ম্মেণিতে শিক্ষাবিভাগের বড় বড় পরিচালকগণ এসম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছেন এবং তাহাতে কতকটা সফলতাও লাভ করিয়াছেন। অঙ্ক যে খেলা একথাটি তাঁহারা শিশুদের বুঝাইবার জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন সেগুলি সমস্তই ব্যয় সাধ্য ও সেই কারণে আমাদের পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু তাঁহারা গণিত শিক্ষার মধ্যে কোথায় গলদ্ সেটা ধরিতে পারিয়াছেন, এবং তাঁহাদের শিক্ষা প্রণালীর গোড়ার কথাটি উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তাঁহারা গণিত শিক্ষাকে ব্যাবহারিক জীবনের অত্যাবশ্যক ব্যাপারের সহিত যোগযুক্ত করিয়া কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সহজ ও সত্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে। "এরা ক্লাসে একটা খেলার মত করে—সেটা হচ্চে Banking। তাতে পুরোপুরি ব্যাঙ্কের কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। চেকবই, ভাউচার, হিসাবি পত্র সবই আছে। ছেলেদের কারো বা চিনির ব্যাবসা, কারো বা চামড়ার। সেই উপলক্ষে ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের লেনাদেনা এবং তার

লাভ লোকসান ও সুদের হিসাব ঠিক দস্তুর মত রাখতে হচ্চে। এতে অঙ্ক জিনিষটাকে এরা গোড়া থেকেই সত্যভাবে দেখতে পায়। ছেলেরা খুব আমোদের সঙ্গে এই খেলা খেল্‌ছে।"

চিকাগোর একটি ভালো বিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাটি বেশ সহজ এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে Banking খেলা না হ'ক, দোকান-খেলা চালাবার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমটা এটা গড়িয়া তুলিতে নিশ্চয়ই একটু ভাবিতে এবং খাটিতে হয় কিন্তু তার পরে কলের মত চলিতে থাকে। কেননা কোন নূতন প্রণালীকে গড়িয়া তুলিতে হইলে খুঁটিনাটি অতি ধৈর্য্যের সহিত চিন্তা করিতে হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, "অঙ্ক জিনিষটা কি এবং তার ভুল জিনিষটা যে কেবল নম্বর কাটার জিনিষ নয়, সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ, এটা খেলাচ্ছলে ছেলেদের দেখিয়ে দিলে সেটা ওদের মনে গাঁথা হইয়া যায়। ছোট-ছোট কাপড়ের বস্তায় বালি পুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে পারে—অবশ্য খাতাপত্র ঠিক দস্তুর মত রাখ্‌তে শিখাতে হয়। আতার বীচি তেঁতুলের বীচি দিয়ে টাকা পয়সা চালান যাইতে পারে—কাগজ কেটে কতকগুলি নোটও তৈরি করে নিতে পারা যায় এতে শিশুদের আমোদও হবে শিক্ষাও হবে।"

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র।

জড় ও জীব

রসায়ন শাস্ত্রের পুঁথি খুঁজিলে অনেক জটিল পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের চেয়ে জটিল পদার্থ বোধ করি মানুষের দেহে বর্ত্তমান। এই জটিল মানবদেহ কি রকমে উৎপন্ন হইল, আধুনিক বিজ্ঞানে তাহার ধারা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। এখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে, সৃষ্টির যে মূল পদার্থকে আমরা ইলেক্ট্রন বলি, তাহাই ধাপে ধাপে অভিব্যক্ত হইয়া মানবদেহ উৎপন্ন করিয়াছে।

এত বড় একটা কথা বোধ করি কুড়ি বৎসর আগেও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই। তখনকার কথা ছিল জৈব বস্তু লইয়া। বৈজ্ঞানিকরা সেই সময়ে বলিতেন, অতি-ক্ষুদ্র এক-কোষ জীবই ক্রমোন্নত হইয়া বহু ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত প্রাণীর উৎপত্তি করিয়াছে। অসাড় ও মৃত জড় পদার্থের সহিত যে জীব-অভিব্যক্তির কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা কি প্রকারে সেই সম্বন্ধ ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাহারই একটু আভাস মাত্র দিব।

যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, জড় মাত্রেরই জটিলতার দিকে যাইবার একটা স্বভাবিক চেষ্টা আছে। যে রাসায়নিক দ্রব্যের সংগঠন কিছু পূর্ব্বে সরল ছিল যদি অনুকূল অবস্থা পায় তবে তাহা জটিল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই জটিলতায় একটা সীমা আছে। সেই সীমায় উপস্থিত হইলে, তাহা আবার পূর্ব্বের সরল অবস্থা পাইবার জন্য চেষ্টা করে কিংবা নিজের সংগঠন ঠিক রাখিয়া প্রকারান্তরে মিলিয়া-মিশিয়া নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়। আমরা পদার্থের এই চরম জটিল অবস্থাকে রসায়নের ভাষায় অসাম্য ভাব অর্থাৎ Instability বলি। পাঠক ইহা রেডিয়ম্ নামক মূল পদার্থে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। ইলেক্ট্রনের সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে যখন রেডিয়মের পরমাণু অত্যন্ত জটিল ও ভারি হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহা আর সাম্য অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া আপনা হইতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

যাহা এপর্য্যন্ত বলা গেল, তাহা পরমাণু-সম্বন্ধে। কিন্তু এই বিচিত্র জগৎ কেবল পরমাণুর সংযোগ-বিযোগেই সৃষ্ট হয় নাই। পরমাণুর সংযোগে যে সব অণুর উৎপত্তি হয়, তাহাদের মিলনেই সৃষ্টির অভিব্যক্তি। এক প্রকার অণুর সহিত অন্য প্রকারের এক বা বহু অণুর মিলনে যে শক্তির উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। লবণ জাতীয় পদার্থ (salts) যখন জলের অণু টানিয়া লইয়া দানা বাঁধে তখন যে তাপের উৎপত্তি করে তাহা নিতান্ত অল্প নয়। এখানে লবণের অণু সাম্যভাবেই থাকে এবং জলের অণুও বিকৃত হয় না, অথচ উভয়ের

মিলনে প্রচুর শক্তির বিকাশ পায়। লবণ পাদর্থ হইতে আর এক ধাপ উপরে উঠিয়া জটিল কলয়ড্ (Colloid) বস্তুর অণুর মিলনের কথা বিচার করিলে ঐ ব্যাপারটা আরো সুস্পষ্ট নজরে পড়ে। এখানে সিলিকা বা ফেরিফ্ অকসাইডের প্রত্যেক অণু পঞ্চাশ ষাইটি অণুর সহিত মিলিয়া যায়। তাপালোক প্রভৃতিতে উন্মুক্ত রাখিলে এই প্রকার যে শক্তির লীলা দেখা যায় তাহা সকলেরি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সব বস্তু সাম্যভাবাপন্ন নয়। কিন্তু অসাম্য অবস্থাতেই সেগুলি নূতন নূতন জটিলতর পদার্থের সৃষ্টি করে।

জড় হইতে কি রকমে জীবের উৎপত্তি হইল রসায়নবিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে তাহার ইঙ্গিত পাইয়াছেন। হঠাৎ একদিন হাত-পা বা লেজওয়ালা প্রাণী বা ফুলপাতা-ওয়ালা উদ্ভিদ্ পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল, একথা কোনো বৈজ্ঞানিকই আজকাল বলেন না। জীবাণুর মত সূক্ষ্মতম জীবকণাকেও তাঁহারা পৃথিবীর প্রথম জীব বলিয়া স্বীকার করেন না। পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে যে অঙ্গারক বাষ্প, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন প্রভৃতি পদার্থ আছে, তাহা লইয়া যখন পূর্ব্বোক্ত কলয়ড্ বস্তুর মত বহু পদার্থ শক্তির খেলা দেখাইয়াছিল তখনি জীবসৃষ্টির আরম্ভ। এই সময়ে এ সব বস্তু এখনকার জৈব পদার্থের ন্যায়ই সূর্য্যের তাপ-আলো গ্রহণ করিত এবং দেহের রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিত। নিকৃষ্টতম জীবকে এখন যেমন বাহিরের তাপ-আলোক প্রভৃতির উত্তেজনায় দেহের পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায় ইহা প্রায় সেই রকমেরই ব্যাপার। আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, পৃথিবীর আদিম জীব এই মাটিপাথর প্রভৃতি অজৈব বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা কখনই অন্য গ্রহ-নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসে নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে প্রক্রিয়ার কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে জড় বস্তু হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, এখন তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখানো যায় কিনা। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার উত্তরে বলেন, জীবের জন্ম কালে পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল তখন বাতাসের অঙ্গারক বাষ্প নাইট্রোজন হাইড্রোজন এবং জলের সহিত

মিলিয়া নানাজাতীয় কলয়ড পদার্থের অণুতে বিচিত্র রাসায়নিক ক্রিয়া দেখাইতে পারিত তাহার পুনরাভিনয় এখন সুসাধ্য নয়।

সূর্য্যে প্রচুর লৌহ আছে। সূর্য্য হইতে যখন পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তখন তাহার বাষ্পময় দেহে অনেক লৌহ চলিয়া আসিয়াছিল। সেই লৌহই এখন পৃথিবীর মাটিপাথরকে নানা রঙে রঞ্জিত রাখিয়াছে এবং তাহাই প্রাণিদেহের রক্তস্রোতে আজও প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং আদিম কালে লৌহই জীবসৃষ্টির প্রধান অবলম্বন ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। লৌহজাত লবণ পদার্থ যখন কলয়ড অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন অঙ্গারক বাষ্প মিশাইয়া জিনিষটাকে সূর্য্যের আলোতে ফেলিয়া রাখিলে ফরমালডিহাউড (Formaldehyde) নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই পদার্থটি সম্পূর্ণ জৈব বস্তু। গাছের সবুজ পাতা সূর্য্যের আলোক শুষিয়া লইয়া দেহের ভিতরে নূতন নূতন জৈব বস্তুর সৃষ্টি করে। এই ক্রিয়াটিকে পূর্ব্বের অনুরূপ বলা যায় না কি? সুতরাং সূর্য্যালোকের শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করা একমাত্র জৈব পদার্থেরই ধর্ম্ম বলা যায় না। অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীতে জড় হইতে জীবের উৎপত্তির আয়োজন চলিতেছিল তখন এই প্রকারে জড়ই জীববৎ আচরণ করিয়া জীবের পর্য্যায়ে আসিয়াছিল।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পঞ্চপল্লব

শৈশবে শিক্ষা

বড় হইলে যে সব বিদ্যা মানুষের কাজে লাগে, শিশুকে শৈশব হইতেই তাহা শিখাইবার অভ্যাস শিশুশিক্ষার বর্ত্তমান মূলমন্ত্র। লিখিতে পড়িতে পারিলে সংসারে একটু সুবিধা হইবে, সুতরাং শিশুকে তাহার খেলাধূলা ছাড়াইয়া ফিট্ ফাট্ সভ্য করিয়া 'ক, খ, ১, ২,' পড়াইতে আরম্ভ করিতে মানুষের একটুও দ্বিধা হয় না। পাঁচ বছরের মেয়ের পুতুল লইয়া 'গিন্নী, গিন্নী' খেলায় সময় নষ্ট হয়, না—তখন 'ক, খ, ১, ২,' পড়িয়া সময় নষ্ট হয়, এই সমস্যার মীমাংসা করা শিক্ষা-জগতের আধুনিক চেষ্টা।

জন ডিউই (John Dewey) বর্ত্তমান শিক্ষা-জগতে একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ডিউই বলেন, নূতনকে পুরাতন করিয়া লওয়াই মনের স্বাভাবিক গতি, কিন্তু আমরা গোড়াতেই মনে করিয়া লই যেন বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক বিরাগ আছে। এই ভুল ধারণা লইয়াই শিক্ষাগুরুরা অত্যন্ত শশব্যস্ত —তাঁহারা অতিসাবধানে অতিশীঘ্র ফল পাইবার জন্য অতি শৈশবকাল হইতেই মানুষকে শিক্ষার পেটেন্ট ঔষধ প্রত্যহ একাধিক বার সেবন করিতে উপদেশ দেন। পরিণামে, মানুষ শিক্ষার প্রতিই বিরক্ত হইয়া উঠে। জোর করিয়া অসময়ে গিলাইয়া দেওয়ার-ফলে ক্ষুধা একেবারে মরিয়া যায়, শিক্ষার অগ্নিমান্দ্য ঘটে।

রুশো বলেন, যে, "শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বোত্তম নিয়ম এই যে, সময় বাঁচাইতে চেষ্টা করিও না, সময় একটু নষ্ট হউক্। মানুষ যদি ভুমিষ্ঠ হইয়াই হঠাৎ একদিন বুদ্ধিমান হইতে পারিত, তবে আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর সমর্থন করা যাইত, কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি (natural growth) দেখিয়া শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আজকাল, বর্ত্তমানকে নিষ্ঠুরভাবে সুদূর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পায়ে বলি দেওয়া হইতেছে।

শিশুকে শ্রদ্ধা কর, তাড়াতাড়ি তাহার শিশুকালের খেলাধূলা ছাড়াইতে যাইও না। শৈশবের খেলাধূলায় সময় নষ্ট হয় না। স্ফূর্ত্তিতে সমস্ত দিন লাফালাফিতে দৌড়াদৌড়িতে কি কম কাজ হয়? বড় হইয়া জীবনে সে আর কোন দিন এত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাজ করিবে না। কোন মানুষ, পাছে সময় নষ্ট হয় বলিয়া যদি রাত্রে ঘুম বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে কি আমরা খুব বুদ্ধিমান মনে করি?

ফল পাকিতে সময় লাগে। অধীর হইয়া অসময়ে পাকাইতে চেষ্টা করিলে ফলেরই ক্ষতি হয়। শৈশবের যে সব প্রয়োজনীয় ক্রীড়া, আমোদ—তাহা ছাড়াইয়া শিশুকে অন্য কিছুতে লইয়া গেলে শিশুর স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির পথেই অন্তরায় সৃষ্ট হইবে। 'উন্নতি, উন্নতি' করিয়া আমরা এত অধীর হই যে তাহাতে উন্নতির স্বাভাবিক প্রণালীর কথা আমরা ভুলিয়া যাই।

মানসিক উন্নতি শরীরের উন্নতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টাই শিশুর প্রধান কাজ—কেবল শরীরটি কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখাই আত্মরক্ষা নহে। প্রতি নিয়তই উন্নতিশীল জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকার চেষ্টাই আত্মরক্ষা। সুতরাং বয়স্ক লোকের কাছে শিশুর যে কাজ নিরর্থক বলিয়া মনে হয়, বস্তুত পক্ষে তাহা দ্বারাই শিশু এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং নিজের ক্ষমতার সীমা কতখানি তাহা বুঝিতে পারে। এই পরিচিত হওয়ার চেষ্টাই আত্মরক্ষার চেষ্টা, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাহারও আসন খানি পাতিয়া লইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

মানুষ নিজে যখন বড় হইয়া একবার সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া যায়, তখন শিশুর ভাঙ্গাচোরা, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবার অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা সে ভুলিয়া যায়। জগতে পুঁথির চেয়ে হাত, পা, চোখই মানুষের প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগুরু। সেই সব গুরুর শিক্ষার হাত এড়াইয়া আমরা যেই বাহিরের সাহায্যের উপর শিক্ষার ভার অর্পণ করি, তখনই আমরা স্বাবলম্বনের আদর্শের উল্টা কাজ করি—বইএ কি লেখে, অমুকে কি বলে, শৈশব হইতেই এই রকম মনের ভাব লইয়া আমরা শিক্ষা সুরু করি। শিশু যদি শৈশবের কয়েকটা বছর বস্তু-জগতে বেশ স্বাধীনভাবে সমস্ত জিনিস নাড়িয়া চাড়িয়া, জানিয়া-শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে, তবে তাহার অনুসন্ধিৎসা ও স্বাধীন যুক্তিশক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ হয়। হাত, পা নাড়াচাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনও যথেষ্ট নাড়াচাড়া পাইয়া সজাগ হইয়া উঠে। এই সহজ সত্যকথাটি আমরা বুঝিতে পারিনা, বরং আমরা মনে করি হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে 'জড়ভরত' করিতে পারিলেই মন জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে এই রকম মতামত লইয়া আমেরিকায় কতকগুলি শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে মিসেস্ জন্‌সন্ নাম্নী জনৈক মহিলার Albama নগরে স্থাপিত Fairhope বিদ্যালয়টির দৃষ্টান্ত ডিউই সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

মিসেস্ জনসন মনে করেন যে ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাহারো পড়াশুনার কোন প্রয়োজন নাই—এ কয়েক বৎসর সকলে যাবতীয় পদার্থের পরস্পরের যোগাযোগ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করুক। শিশু এই প্রকারে নানা পদার্থের পরিচয় পাইতে পাইতে সব জিনিষ জানিবার পক্ষে পুস্তকের সহায়তা যে কতখানি দরকার তাহা সে ক্রমশ বুঝিতে পারে এবং তখন সে ইচ্ছা করিয়াই পড়িতে বসে। ক্ষুধা পাইলে সে যেমন শত অক্ষমতা সত্ত্বেও আগ্রহের সঙ্গে ভাণ্ডার ঘরের আলমারির উপর উঠিতে চেষ্টা করে, তেমনি মনের ক্ষুধাটি যথার্থভাবে জাগাইয়া দিতে

পারিলেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতি তাহার সলোভ দৃষ্টিও অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়।

শিশুদের ভাল বা মন্দের কোঠায় ফেলা যায় না—কোন্ কাজটা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না, সুতরাং অন্যায় কাজ করিলে তাহাদিগকে তিরস্কার করা নির্ব্বুদ্ধিতা। তবে, তাহার কোন্ কাজে লোকে খুসী হইবে, কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট হইবে, তাহা তাহাকে মৃদুভাবে জানাইয়া দেওয়া উচিত। তুমি যে এই কাজটা করিলে, ইহাতে তোমার খেলার সঙ্গীর বড় অসুবিধা হইবে, এই কথাটা শিশুকে একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলে ভবিষ্যতের জন্য সে সাবধান হইতে চেষ্টা করে।

অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত Fairhope বিদ্যালয়ে শিশুছাত্রদের কোন পাঠ মুখস্থ লওয়া হয় না—ছাত্রেরা পুস্তক খুলিয়া নিজেরা পড়িয়া যায় এবং অধ্যাপকের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে—বিচিত্র সংবাদ ও আনন্দ লাভ করিয়া তাহারা নূতন নূতন পুস্তক পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়াম, প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ, হাতের কাজ, ইন্দ্রিয়বোধচর্চ্চা (Sense-Culture) প্রভৃতি আরো নানা রকম শিক্ষা খেলার ভিতর দিয়াই দেওয়া হয়। ছেলেদের গল্প ও অভিনয়ও হইয়া থাকে।

শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ খুব নিকট বলিয়া এই বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের নানা রকম ব্যবস্থা আছে—সে ব্যায়াম সাধারণ বিদ্যালয়ের মত 'one, two,' করিয়া খানিকটা একঘেঁয়ে উঠা বসাঁর বৈঠক করা নয়—তাহা সম্পূর্ণ নূতন রকমের। ভোরে খানিকটা সময় ছেলেদের একটা মাঠে লইয়া যাওয়া হয়—সেখানে ব্যায়া-মের নানা রকম ব্যবস্থা আছে। ছেলেরা স্বেচ্ছামত কেহ বা ঘোড়ায় চড়িতেছে, কেহ বা বার (Bar) করিতেছে, কেহ বা দৌড়াইতেছে, কেহ বা একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁশের দিকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেছে। তাহারা মাঠে প্রবেশ করিয়াই ইচ্ছামত এক একটা দলে ভাগ হইয়া পড়ে—অধ্যাপক কাহাকেও বাধা দেন না, সকলকেই উৎসাহ দেন এবং সাহায্য করেন।

শিশুরা পাশের কোন বাগানে গিয়া নানা রকম গাছপালা, কীটপতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করে। তাহারা স্বাধীনভাবে সমস্ত দেখিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা অধ্যাপক মহাশয় করিয়া দেন। মৌমাছি কেমন করিয়া এক ফুল হইতে আর এক ফুলে রেণু বহন করিয়া লইতেছে তাহা তাহারা বহুক্ষণ ধরিয়া কত আগ্রহের সঙ্গে দেখে। বিদ্যালয়ের মধ্যেই শিশুরা বাগান করে, বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া বড় গাছ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন কত যত্ন ও চেষ্টার যে প্রয়োজন, তাহা অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে তাহারা লক্ষ্য করে।

খেলার ছল করিয়া শিশুদের নানা রকম হাতের কাজ শিখাইয়া দেওয়া হয়। ছবিআঁকা, মূর্ত্তিগড়া, ছুতারের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, রান্নার কাজ তাহারা একদল খুব তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলে। তাহারা কেহ স্বেচ্ছামত কাগজের মাদুর বুনিতেছে, কেহ বা কাগজ বা কাঠের খেলনা প্রস্তুত করিতেছে। আর, যাহারা একটু অকেজো-প্রকৃতির, তাহারা কাজ না করুক, কাজকে শ্রদ্ধা করিতে শেখে।

ছেলেরা নিজেরা কোন গল্পের বই পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করে। অভিনয়-যোগ্য কোন ভাল বই পড়িয়া তাহারা খুব উৎসাহের সঙ্গে অভিনয় করে। গল্প ও অভিনয়ের দ্বারা শিশুদের চিত্ত প্রথম সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ৮।৯ বছর বয়স পর্য্যন্ত বই পড়িতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া এই সব গল্প, অভিনয় শুনিয়া শিশুরা পড়িতে শিখিতে নিজেরাই চায় এবং বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে।

গণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি শিশুদের প্রথমেই শ্লেট বা কাগজে না করাইয়া খেলাচ্ছলে মুখে মুখে আশে পাশের নানান্ জিনিষের সাহায্যে শেখানো হয়।

ইন্দ্রিয়গুলি যাহাতে নির্জীব না হইয়া পড়ে তাহার জন্য বিদ্যালয়ে বিচিত্র খেলার আয়োজন আছে। একদল খুব ছোট ছেলে চুপ করিয়া ক্লাশে বসিয়া আছে—তাহাদের মধ্যে একটি ছেলে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের নানা জায়গায়

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অন্য ছেলেরা চক্ষু বুজিয়া সেই ছেলেটি কখন কোথায় যাইতেছে বলিবে। গলার বিকৃত আওয়াজও শুনিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া কে কথা বলিতেছে জানাইতে হইবে। কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের নাম বলিতে হইবে।

Fairhope বিদ্যালয়ের শিশুরা শৈশবাবধি খেলাচ্ছলে হাতের কাজ এত শেখে যে, ৭।৮ বছরের ছেলে বেশ সহজেই ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্র-তন্ত্র নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারে। মিসেস্ জনসন বলেন যে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছেলে যেমন হাতের কাজও করিতে শেখে তেমনি তাহাদের পড়াশুনার প্রতিও একটা স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে।

শিশুকাল হইতে যে মানুষ এই রকম সহজভাবে বাড়িয়া উঠে, তাহার মন প্রাণ নিত্য জাগ্রত। আর, যাহারা পাঁচ বছর বয়স হইতেই খেলাধূলা ছাড়িয়া 'বোধোদয়' আরম্ভ করে, তাহাদের অধিকাংশই চক্ষু থাকিতেও অন্ধ—তাহারা বিনা সন্দেহে শতাব্দীর বোঝা নিঃশব্দে স্কন্ধে বহিয়া জীবনের পথটা কোন রকমে কাটাইয়া দেয়—রহস্যময় জগতে তাহাদের প্রশ্ন ও আবিষ্কার করিবার মত কিছুই নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ডষ্ট ভৃস্কি

রুষ সাহিত্যিক ডষ্টভ্‌স্‌কির কন্যা তাঁহার পিতার জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন। Times-এর Literary Supplement-এ তাহার একটি আলোচনা বাহির হইয়াছে। আমরা ডষ্টভস্‌কির ভক্ত-পাঠকদের জন্য নিম্নে তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

অতি প্রাচীন বংশে ডষ্টভ্‌স্কির জন্ম হয়। কিন্তু টলষ্টয়, লারমনটভ (Lermon

(av) প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিকের ন্যায় তিনিও খাঁটি রাশিয়ান নহেন। পূর্ব্ব-পুরুষের লুথিয়ানার ক্ষুদ্র অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—এই অভিজাতবংশের অধিকাংশ নরওয়ে হইতে আসিয়া লুথিয়ানাতে বসবাস করিতেছিলেন। ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দিতে ডষ্টভ্স্কিবংশ লুথিয়ানা হইতে উইক্রেইনে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতা মাইকেল্ মস্কোনগরে সৈনিকবিভাগে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—অবশেষে সেই নগরেই বড় একটি হাঁসপাতালের ভার-প্রাপ্ত হইয়া তথায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল—অর্থও তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই অর্থে তিনি মস্কোনগরের নিকটে জমিদারিও ক্রয় করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার খামখেয়ালী আচরণ ও অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া প্রজাবর্গ তাঁহার প্রাণহত্যা করিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিল। এই সময়কার পারিবারিক ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ডষ্টভ্স্কিপরিবারভুক্ত প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে মস্তিষ্কবিকারগ্রস্ত ছিলেন—এই মস্তিষ্কবিকারের ফলে তাঁহারা হয় মদ্যপানে, নয় জুয়া খেলায়, নয় অর্থ পিপাসায় বাতিকগ্রস্তের (monomauiac) অতিমাত্রায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডষ্টভ্স্কি নিজে মৃগীরোগে (Epileptic) আক্রান্ত ছিলেন। এক সময় তিনি জুয়াখেলায় এমন আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার আশা সকলে ত্যাগ করিয়াছিল।

২৮বৎসর বয়সে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তিনি ধৃত হন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। যখন তাঁহাকে বধ্যভূমিতে আনা হইল এবং অদূরে রাজ সৈনিক যখন তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, ঠিক সেই সময়ে একজন রাজপুরুষ দ্রুত অশ্বারোহণে তাঁহার ক্ষমাপত্র লইয়া তথায় প্রবেশ করিল। একটু দেরী হইলেই তাঁহার প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ ভূমিতে লুন্ঠিত হইত। সেস্থান হইতে ৪বৎসরের জন্য তিনি সাইবেরিয়ায় নির্ব্বা-সিত হন। তথা হইতে মুক্তি পাইয়া, সেই সময়কার কথা তিনি তাঁহার ভাই মাইকেল্‌কে লিখিয়াছিলেন—টোবল্স্কের কয়েদিদের সহিত আমার পরিচয়

হইয়াছে ; ওমস্কে আমি তাহাদের সহিত চার বৎসর একসঙ্গে বাস করিয়াছি। তাহারা রুক্ষ কর্কশ উগ্র ; ধনীদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ অপরিসীম, সুবিধা পাইলে তাহারা যেন আমাদের আস্ত গিলিয়া খায় ; আমাদের সকলকেই তাহারা শত্রু বলিয়া মনে করে। আমাদের দেখিলেই তাহাদের রুদ্ধ সঞ্চিত ক্রোধ আমাদের উপর বর্ষণ করে—'তোমরা ধনীরা এতদিন তোমাদের লৌহচঞ্চুদ্বারা আমাদের ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া খাইবার চেষ্টা করিয়াছ ;—সুদিনে আমাদের কথা তোমাদের মনেও আসে নাই ; সকল রকমে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছ আজ বিপদে পড়িয়া আমাদের নিকট ভাই সাজিয়া আসিয়াছ।'

সেই চিঠিতেই তিনি অন্যস্থানে লিখিয়াছেন—"আমি তাহাদের মত হইয়া এতকাল এইসকল কয়েদির সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াছি—তাই আমার বিশ্বাস আমি তাহাদের খুব ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি। কত চোর, ডাকাত, ভবঘুরের জীবনের গভীর অন্তর-রহস্য আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—তাহাদের সহিত পরিচয়ে আমি রুসিয়ার দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত জনসাধারণের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি—আমি তাহাদের যেমন জানিয়াছি এমন আর কেহই তাহাদের জানে নাই।"

ইহার পর হইতেই তাঁহার পূর্ব্বের মত ও বিশ্বাসের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। রুশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি দেশের শিক্ষিত ও নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত আর একমত হইতে পারেন নাই—তিনি মনে করিতেন তাহারা ভুলপথ অবলম্বন করিয়াছে। সমস্ত দেশের প্রাণ সুদূর অতীত হইতে জার ও চার্চ্চকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—এই পূর্ব্বসংস্কার দেশ হইতে দূর করিলে রাশিয়ার প্রাণধর্ম্মকেই বিনষ্ট করা হইবে। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ ছিল।

সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত জীবন যাপন কালেই তাঁহার এক বন্ধুর বিধবা পত্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁহার এই বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই—প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়-

বার বিবাহে তিনি বেশ সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। প্রথম বিবাহের কোন সন্তানাদি ছিল না কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুসময়ে তাঁহার পূর্ব্ব বিবাহের একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এই সন্তানটি সর্ব্ববিষয়ে অকর্ম্মণ্য অনুপযুক্ত হইলেও, কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি তাহাকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার ভাই মাইকেলেরও মৃত্যু হয়—ভাইয়ের নিরাশ্রয় পরিবারের প্রতিপালনের ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়—তাছাড়া মৃত্যুসময়ে মাইকেলের অনেক ঋণ ছিল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি সেই ঋণ শোধ করিবার ভারও গ্রহণ করিলেন। অথচ সেই সময়ে তাঁহার অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। উত্তমর্ণগণের তাড়ায়একসময় তিনি দেশ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যথেষ্ট ধন মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ স্বামী ও আদর্শ পিতা ছিলেন—। সন্তানের নৈতিক জীবনের উন্নতি ও তাহাদিগকে কাব্যানুরাগী করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের যখন ৬।৭ বৎসর তখনই সিলারের 'রবার' (Robbers) নামক গ্রন্থ তাহাদের পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

ডষ্টভস্কির গ্রন্থ যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহারা সকলেই জানেন তিনি কেমন বিকার গ্রস্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোকের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত নায়ক-নায়িকাগণের চরিত্রের নৈতিক আদর্শ বড়ই শিথিল। ঘোর অরাজকতার দিনে রাসিয়ার যুবকদের মধ্যে নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শের একান্ত অভাব হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাহার নায়কনায়িকার জীবনের সহিত তাহার নিজের জীবনের কোন সাদৃশ্য নাই। তাহার নায়িকারা স্বামীদের পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রণয়ীদের সহিত জীবন যাপন করে; আর তিনি নিজে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর অধঃপতনে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছিলেন, তিনি তাহার মুখদর্শনও করেন নাই। তাহার নায়কেরা অপব্যয়ী, মুঠামুঠা অর্থ জানালা দিয়া রাস্তায় ছড়ায় আর তিনি নিজে ভাইয়ের ঋণশোধের জন্য দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতেন, একটি পয়সাও অপব্যবহার করিতেন না। তাহার নায়ক নায়িকারা স্বামী স্ত্রী মাতাপিতার কর্ত্তব্যে উদাসীন, আর, তিনি নিজে যেমন আদর্শস্বামী,

তেমনি আদর্শ পিতা স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের কোথাও তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটে নাই। দেশের প্রতি দেশবাসীর প্রতি তাঁহার নায়ক নায়িকারা মোটেই কর্ত্তব্যপরায়ণ নহে আর তিনি নিজে দেশকে, দেশবাসীকে, দেশের ধর্ম্ম নিজের স্নেহজাতিকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন।

শোভনতা ও পারিপাট্যের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য অনুরাগ ছিল—সামান্য এক টুকরা কাগজও তিনি যেখানে-সেখানে এলোমেলোভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পারিতেন না, যেখানে যে জিনিষটি রাখিলে সুন্দর শোভন হয় সে জিনিষটি সেখানে তিনি সাজাইয়া রাখিতেন।

তাঁহার জীবন অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। একবার তিনি তাহার নিজের ঘরে লেখাপড়ায় ব্যস্ত আছেন এমন সময় বাড়ির দাসী আসিয়া সংবাদ দিল একটি রমণী তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক—তাহার মুখ ঘোমটায় আবৃত নাম বলিতেও তিনি অনিচ্ছুক। তিনি তখনই তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন—। রমণীটি গৃহে প্রবেশ করিলে ডষ্টভ্স্কি তাঁহাকে তাঁহার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীটি এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া মুখের ঘোমটা তুলিয়া তাহার মুখের দিকে উগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া পুনরায় তাহাকে তাহার নাম ও প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার রমণী চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"কি তুমি আমাকে চেন না?" ইহাতে তিনি আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখুন আমার সময়ের মূল্য আছে—আমি বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না। আপনার প্রয়োজন কি বলুন।'

রমণীটি এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তীব্র উগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"এ আমাকে চিনে না!" এই বলিয়া ধীর পাদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রমণীটি চলিয়া গেলে তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি যেন তাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন। মনে করিতে করিতে বহুদিন পূর্ব্বেকার জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "তাইত এযে পলিন্!"

'পলিন্' তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী ছিল। দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্বে সেন্টপিটার্সবার্গে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে। সে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল। ডষ্টভস্কি ব্যতীত তাহার আরও একজন প্রণয়ী ছিল। তাহাকে লইয়া দুই প্রণয়ীতে অনেক দ্বন্দ্ব বিরোধ এমনকি প্রাণহত্যার চেষ্টা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অবশেষে ডষ্টভস্কির পুস্তকে 'রাস্কলনিকভ্' (Raskolnikov) চরিত্র প্রকাশিত হইলে 'পলিন্' ক্রুদ্ধ হইয়া ডষ্টভস্কিকে বলিলেন যে 'রাস্কলনিকভ্' চরিত্রে তিনি রুষিয়ার ছাত্রসমাজের কুৎসা প্রচার করিয়াছেন। সেই হইতেই দুইজনের মধ্যে সম্বন্ধ রহিত হইল। 'পলিনের' চরিত্র ডষ্টভস্কির অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একাধিক পুস্তকে তিনি তাহার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাহার অঙ্কিত লিসা, আগ্লেইয়, গ্রুসেনকা 'পলিন্, চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া, সেই 'পলিন্'কে আজ তিনি চিনিতে পারিলেন না।

পলিন্‌কে তিনি বিশেষরূপেই জানিতেন তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন 'পলিন্' তাহার এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবে না। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার সন্তানদের একা ঘরের বাহির হইতে দেন নাই—তাহার ভয় ছিল ক্রুদ্ধ হইয়া পলিন্ হয় তো তাহার সন্তানদের কোন অনিষ্ট করিবে। কিন্তু মনস্তত্ববিদ্ ডষ্টভস্কি এখানে একটু ভুল বুঝিয়াছিলেন। 'পলিন্'কে ইহার পর আর দেখা যায় নাই।

শ্রীভেজেশচন্দ্র সেন

———•———

বৈচিত্র্য

যদি কোনো কিছুকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া মানি, সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি তবে তাহা আমাদিগকে করিতেই হইবে, তা তাহার আপাত পরিণাম ভাল-মন্দ যা হয় হইবে তাহা তাকাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই, বা তাহাতে আমাদের কোনো অধিকার নাই; অন্যথা কর্ত্তব্য আমাদের করা হইবে না, ধর্ম্ম আমাদের পালন করা হইবে না, ধর্ম্মের কথা তাহা হইলে আমাদের না বলাই ভাল। কিন্তু ইহা সত্য, ধর্ম্ম না হইলে আমরা দাঁড়াইতেই পারিব না। আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে কি? অধর্ম্ম কয়দিন টিকে? ধর্ম্মপালনে তো ক্লেশ হইবেই; কিন্তু এই ক্লেশের পরিণাম কল্যাণ। ধর্ম্ম কখনো অকল্যাণ হইতে পারে না, যাহা অকল্যাণ তাহা ধর্ম্ম নহে। তাই, যদি কল্যাণ লাভ করিতেই হয়, ধর্ম্ম পালনের উপস্থিত ক্লেশ আমাদিগকে সহিতে হইবে। আবার যদি এই কল্যাণই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ হয় তবে ইহার অর্জ্জনে ক্লেশও মহান্‌ই হইবে; তথাপি এই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ পাইতে হইলে ইহা না সহিলে উপায় নাই।

*
* *

যদি কোনো রোগীর শরীরে অস্ত্রপ্রয়োগ নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে, আর সেও নিজে ইহা বুঝিতে পারে যে, ইহা ভিন্ন তাহার কল্যাণ লাভের কোনো উপায় নাই, তথাপি সে অস্ত্রপ্রয়োগের আপাত যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া তাহাতে অনেক সময়ে সম্মত হয় না; কিন্তু যখন অস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই, তখন তাহাকে তাহা যেরূপেই হউক সহ্য করিতেই হইবে, অন্যথা স্বাস্থ্যের কল্যাণ লাভ করিতে সে কখনই পারিবে না।

*
* *

এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যদিও তাহারা বাহিরের, এবং দেহের সহিত তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই, তথাপি খাদ্য-পের প্রভৃতির আকারে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা বেশ মিশিয়া যায়, দেহের নিজেরই মতো হইয়া যায় তাহাতে তাহার উপকার বৈ অপকার হয় না। সে ঐ সব জিনিসকে ভাল বাসিয়া আদর করিয়া নিজের মধ্যে টানিয়া লয়; বরং তাহাদিগকে না পাইলেই অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু আর কতকগুলি জিনিস আছে, যে-কোনো রূপেই হউক না, শরীরের মধ্যে ঢুকিলেও তাহারা মিশ খায় না, শরীরের সহিত তাহাদের এমনি একটা অবনিবনাও সম্বন্ধ আছে, ঐ জিনিসগুলির এমনি একটা প্রতিকূল স্বভাব আছে যাহাতে কিছুতেই তাহা তাহাদিগকে নিজের মধ্যে করিয়া লইতে পারে না। নিজে তাহারা বাহির হইতে না চাহিলেও শরীর তাহাদিগকে ক্রমাগতই বাহির করিবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ তাহারা বাহির হইয়া না পড়ে ইহার কষ্টের সীমা থাকে না। তখন অন্য কিছু উপভোগ করা দূরে, তাহার সত্তা পর্য্যন্ত লোপ হইতে আরম্ভ করে, প্রাণবিচ্ছেদ হয়। শরীরের এই যে নিজের প্রতিকূলে বিরোধী পদার্থসমূহকে বহিষ্কৃত করিয়া নিজের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যলাভের চেষ্টা, ইহা ঐ পদার্থগুলির প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু শরীরের পক্ষে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা করা তাহার একটুও অন্যায় নহে, সে যে ইহা না করিয়া বাঁচিতেই পারে না।

*
* *

নির্দ্দোষ মৃগশিশু মনের আনন্দে যেমন ইচ্ছা বনের মধ্যে ঘাস-পাতা যা পায় খাইয়া-দাইয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়, কারো কোনো অপকার করে না; তার পেটের জন্য যতটুকু যা দরকার তাহাই লইয়া সে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু হঠাৎ পেছন হইতে ব্যাধ আসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়ে, ইহা তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধে, সে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ধড়ফড় করে, ছটফট করে। কিন্তু ব্যাধের তাহা সয় না, সে তাহাতে আরো রাগিয়া উঠে, না হয় আমোদ পায়, বা ঠাট্টা করিয়া থাকে। ব্যাধ কি করে সে কি তাহা বুঝে?

*
* *

আমরা দুঃখ চাই না সত্য, কিন্তু দুঃখ নানা মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট আসিবেই। এবং যেরূপে হউক আমাদিগকে ইহা সহ্য করিতেই হইবে—যদি আমরা কল্যাণ পাইতে চাই। কল্যাণ আনন্দেরই আকারে আসিবে, ইহার নিয়ম নাই; ইহা সৌরূপেও আসিতে পারে, আবার দুঃখেরও রূপে আসিতে পারে; কিন্তু দুঃখের রূপে আসিলেও তাহা যে কল্যাণ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই কল্যাণকামীকে দুঃখ সহ্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়াই থাকিতে হইবে।

***

দাঁড়িরা দাঁড় টানে, মাঝি হাল ধরিয়া গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া নৌকা চালাইয়া লইয়া যায়। মাঝির হাল সামান্য একটু নড়িলে নৌকার মুখ দ্রুতবেগে অত্যন্ত ঘুরিয়া যায়, দাঁড়িরা তখন বহু চেষ্টা করিলেও নৌকাকে সোজা করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তাই প্রবল স্রোত ও তরঙ্গের মধ্য দিয়া লক্ষ্যস্থানে নিরাপদে যাইতে হইলে, খুব মজবুত মাঝি থাকা আবশ্যক, হাল যেন তাহার দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া একটুও নড়িতে-চড়িতে না পারে। অন্যথা কেবল যাত্রীদেরই নহে, দাঁড়ি মাল্লাদের সঙ্গে-সঙ্গে মাঝিরও নিজের বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। মাঝিকে তাই বড় শক্ত হইয়া কড়া হাতে তার হাল খানা ধরিয়া রাখিতে হয়। মাঝি যদি মূলের এই কথাটা ভুলিতে আরম্ভ করে, তবে সে জোর করিয়া মাঝিগিরি করিতে পারে, কিন্তু সে ক্রমে-ক্রমে একদিন সর্ব্বনাশ আনিয়া ফেলে। তাই সে যখন দেখিতে পায় যে, আর সে স্থির হইয়া দৃঢ় হইয়া হাল ধরিতে পারে না, তখনই তাহার একবারে সে কাজটা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; অথবা যদি তার প্রথমেই এইরূপ যোগ্যতা না হইয়া থাকে, তবে মাঝিগিরিটা গ্রহণ না করাই উচিত ছিল। কথায় ও কাজে নৌকা চালান এক কথা নহে। সব শুদ্ধ মরিয়া যাওয়ার কি কোনো ফল আছে?

***

আশ্রম-সংবাদ

৭ই পৌষের উৎসবের পর হইতে বিদ্যালয়ের নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। আগামী বৎসরের কার্য্য পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ সর্ব্বাধ্যক্ষ ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সর্ব্বাধ্যক্ষ—শ্রীজগদানন্দ রায়

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ—

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য—বিশ্বভারতী

শ্রী সি. এফ্. এণ্ড্রুজ—অর্থ বিভাগ

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার—শিক্ষাবিভাগ

শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ—ছাত্রপরিচালনা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর—পূর্ত্তবিভাগ

আশ্রম-সম্মিলনীর নূতন বৎসরের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন নিম্নলিখিত মত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীমান্ ধীরানন্দ রায়

সহকারী সম্পাদক—শ্রীমান্ প্রসূনকুমার সেন

প্রতিনিধি—শ্রীমান্ মলয়কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান্ অনিলকুমার দাশগুপ্ত

প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের ভার বিভাগ করিয়া লইবেন।

শ্রীযুক্ত সরদেশমুখ নামীয় জনৈক মহারাষ্ট্রীয় যুবক সম্প্রতি এখানে কিছুদিন থাকিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যে সাহায্য করিবার বাসনা করিয়াছেন। তিনি বোম্বে

উইলসন কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন—ও ওকালতি পড়িতে-ছিলেন কিন্তু অসহকারিতার জন্ত তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকাবাসী—বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বণিক শ্রীযুক্ত আনন্দসিং সপরিবারে আসিয়া আশ্রমে সপ্তাহকাল কাটাইয়া গিয়াছেন। এণ্ড্রুজ সাহেব পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভ্রমণকালীন ইঁহার বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুইটি আমেরিকীয় পরিব্রাজক আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন। একজন ডাক্তার অপরজন educationist এবং থিওজফিষ্ট প্রচারক। আমেরিকার নূতন শিক্ষান্দোলনের সহিত ইঁহার যোগ থাকায় তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে একদিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে ঐ বিষয়ে কথা বলিয়াও অনেকে আনন্দলাভ করিয়াছেন।

পাটনা নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী লাল নামক জনৈক যুবক নির্জ্জন ধ্যান ধারণা করিবার মানসে আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন।

নূতন ডাক্তার চিমনলাল বিশেষ উৎসাহের সহিত ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের মধ্যে চরখায় সূতা কাটা প্রচলিত করিবার কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে অনেক ছাত্র এবং কয়েকজন অধ্যাপক বিশেষ পারদর্শিতার সহিত চরখায় সূতা কাটিতে পারেন। কয়েকজন মহিলাও উৎসাহের সহিত শিখিতেছেন। সাঁওতাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও চরখায় সূতা কাটিতে শিখিতেছে।

ভারতবর্ষের ভিতরের ও বাহিরের নানাস্থান হইতে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুস্ সাহেবের নিকট আহ্বান আসিতেছে। কিছুদিন আগে আলিগড় কলেজের পাঠ্যবিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার জন্ত তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিতে না ফিরিতে পুণানগরীর ছাত্রসম্মিলনের সভাপতি হইবার আমন্ত্রণ আসিতেই তথায় গিয়াছেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী বিদ্যালয়-সংলগ্ন সমবায় ভাণ্ডারের পরিচালকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আশ্রমে আসিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৷০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন
পত্রিকাবিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadanand Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা পৌষ, ১৩২৭ সাল

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কেহ শান্তিনিকেতনের নমুনা চাহিলে দয়া করিয়া খামে পাঁচ আনার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিবেন। ভি. পি, ডাকে নমুনা পাঠান হয় না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্রষ্টব্য

কলিকাতায় নং ২০।বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এণ্ড কোম্পানিতে খুচরা "শান্তিনিকেতন" নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁহারা ঐ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
(পত্রিকাবিভাগ)
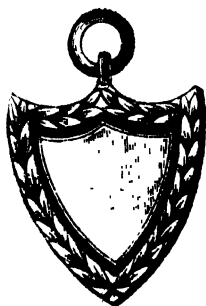
শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা পৌষ, ১৩২৭ সাল

যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব

মানুষ বলে, যা ভাল আমি তাই চাই। আমরা এইমাত্র প্রর্থনা করিলাম —"যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব," যাহা ভাল তাহাই আমাদের নিকট প্রেরণ কর! কিন্তু এই ভালকে পাইতে চাহিয়া সে বস্তুত কি পাইতে চায় তাহা সে সব সময় ভাল করিয়া তলাইয়া ভাবিয়া দেখে না; সে যে কি ভয়ঙ্কর প্রর্থনা করে সেদিকে তাহার কোনো লক্ষ্যই থাকে না। সে ভালকে পাইতে চাহিয়া সাধারণত ইহাই পাইবার আশা করে যে, তাহাকে যাহা ভাল লাগে, যাহাতে তাহার সুখ-সুবিধা হয়, যাহাতে তাহার কোনো বাধা-বিপদ্ না হয়, যাহাতে তাহার কোনোরূপ দুঃখ-কষ্ট না হয়, তাহাই যেন তাহার নিকট আসে। ভাল পাইতে চাহিয়া মানুষ এইরূপই একটা সুখ-ভোগের আশা করে। কিন্তু এই ভাল যে, সব সময়ে সুখের কোমল আকারেই উপস্থিত হয় তাহা নহে; হইতে পারে কথনো তাহা আনন্দ-মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়, কিন্তু অপর সময়ে তাহার মূর্ত্তি হয় রুদ্র, অতিরুদ্র। মানুষ এই

রুদ্রতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, অস্থির হইয়া পড়ে; সে মনে করে, তৃষাতুর হইয়া চাহিয়াছিলাম জল, কিন্তু হায়! আসিয়া পড়িল বজ্র! কিন্তু বস্তুত তাহা বজ্র নহে, বজ্রের মূর্ত্তিতে জলই তাহার নিকট উপস্থিত হয়।

যাহা সত্য তাহাই ভাল। তাই আমরা যখন ভাল চাই তখন বস্তুত সত্যকেই চাহিয়া থাকি, অথবা সত্যকেই আমাদের চাওয়া আবশ্যক। কিন্তু সত্যকে চাওয়া যত সোজা, তাহাকে পাওয়া তত সোজা নহে। তথাপি তাহা চাহিতেই হইবে, তা না হইলে যে, আমাদের ভাল হইবেই না; আর ভাল না চাহিয়াও তো আমরা পারি না, ইহা যে আমাদের অন্তরের প্রার্থনা, জীবের যে ইহা স্বভাব, স্বভাবকে অতিক্রম করিবে কে? পাগল ছাড়া দুনিয়ার এমন কে আছে যে, ভালকে চায় না? তাই ভালকে চাহিয়া যাহা সত্য তাহাই পাইতে হইবে, তা তাহা যেরূপেই হউক।

মানুষের বড়-বড় ফোঁড়া হয়, সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাতর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে, 'ওগো, আমায় ভাল কর, ভাল কর!' শল্যকর্ত্তা চিকিৎসক আসিয়া বলেন, অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, অন্যথা ভাল হইবে না। রোগী ভয় পাইয়া বলিয়া বসে, না, সে অস্ত্র করিতে দিবে না; কিন্তু তাহাকে ভাল করিতেই হইবে। চিকিৎসক ভাবিয়া দেখেন; তার পর ধরিয়া হউক, বাঁধিয়া হউক, অথবা অন্য যে উপায়ে হউক অস্ত্র না করিয়া ছাড়েন না; ক্ষত ক্রমশ শুকাইয়া যায়, রোগী আনন্দ পায়, সে বলিয়া উঠে 'আমি ভাল হইয়াছি।' রোগীর এই সত্য সুস্থতা অতিরুদ্র মূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাহাকে তাহা সহিতেই হয়, তা যেরূপেই হউক না কেন। চিকিৎসক অস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া কোনো রূপে যন্ত্রণার সাময়িক উপশম করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু রোগী তাহাতে সত্য সুস্থতা পাইত না।

তাই, যখন আমরা প্রার্থনা করি "যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব"—'যাহা ভদ্র কল্যাণ, তাহা আমাদের নিকট প্রেরণ কর,' তখন প্রকারান্তরে সেই কল্যাণের বিধাতার নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা করা হয় যে, যদি আবশ্যক হয়, বাধা-বিপদ্ দুঃখ-কষ্ট

জ্বালা-যন্ত্রণা আমাদের নিকট প্রেরণ কর; এবং ইহাই সূচনা করা হয় যে, যাহা সত্য যাহা কল্যাণ তাহার জন্য ঐসমস্তই সহ্য করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। অন্যথা যে যাহা লইতে পারে না, সে যদি তাহারই জন্য প্রার্থনা করে, তবে তাহার সে প্রার্থনা কি প্রার্থনা? অথবা, যাহা ভাল তাহাই দাও এই বলিয়া সে প্রার্থনাই বা করে কেমন করিয়া?

কল্যাণ না হইলে যখন আমরা বাঁচিতেই পারি না, যখন ইহা আমাদিগকে পাইতেই হইবে, তখন রুদ্র মূর্ত্তিতেও আসিলে তাহার বিভীষিকায় পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। বীরের ন্যায় তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। সেই সত্যে সেই কল্যাণে যদি বস্তুত নিষ্ঠা থাকে, তবে ঐ বিভীষিকা অতিক্রম করিবার শক্তির অভাব হইবে না। সত্যনিষ্ঠার কল্যাণনিষ্ঠার এমনই এক গুণ আছে, এবং বার-বার ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, ইহাতে অসীম শক্তির আবির্ভাব হয় যাহার নিকট কোনোরূপ শারীরিক শক্তি ঘেসিতেই পারে না; ইহাতে লোক ভয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়; সে "অভয়ং গতো ভবতি," অভয় প্রাপ্ত হয়। তখন বজ্রের আঘাত তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, সে বিজয়ী হইয়া সত্যের কল্যাণের দ্বারে উপস্থিত হইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে।

মানুষ যখন কল্যাণের বিধাতার নিকট গিয়া চায় যে 'যাহা ভাল তাহাই দাও,' তখন তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল তিনি তাহাই দিবেন। মানুষের চোখে যাহা ভাল তিনি তাহাই দিবেন ইহা হয় না; কেননা তাঁহার চোখে ও মানুষের চোখে অনেক তফাৎ। মানুষের চোখ আছে, দেখিবার শক্তি আছে, সে চিন্তাও করিতে পারে, এ সবই সত্য, কিন্তু তথাপি যাহা দেখিবার ভাবিবার সে তাহা যথাযথ দেখিতে ভাবিতে পারে না। সে দেখে এক, তাহাকে ভাবে আর এক; সে বিষকে অমৃত, আর অমৃতকে বিষ ভাবিয়া বসিয়া থাকে। স্বার্থের অভিমানের রাগের দ্বেষের মোহের আবরণে-আবরণে তাহার চিত্ত ও দৃষ্টি এত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, আর তাহাতে বস্তুর যথার্থ ছাপটা গিয়া পড়িতে পারে না; আয়নায় মাটি-কাদা মাখাইয়া রাখিলে অতি উজ্জ্বল হইলেও সূর্য্যের প্রকাশ তাহাতে পড়ে

না। এ অবস্থায় সে কেমন করিয়া ঠিকঠাক দেখিবে-বুঝিবে যে, কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ। কিন্তু তথাপি নিজের মত করিয়া সে একটা ভাল বুঝিয়া লয়, তাহাই ধরিয়া সে চলে, আর অন্যকেও সঙ্গে ডাকিয়া লয়, এবং পরিশেষে সব সমেত বিনাশে উপস্থিত হয়।

এই স্বার্থ, দম্ভ, রাগ, দ্বেষ ও মোহের আবরণে মানুষ সবই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ড-খণ্ড করিয়া দেখে, অখণ্ড বিশ্ব তাহার নিকটে প্রতিভাসিত হয় না। তাই সে যাহাকে দেখিতে পায় না, তার ভাল-মন্দও কিছুই ভাবিতে পারে না। সে তাহার নিজের কল্পিত এ বর্ণ ও বর্ণ, এ জাতি সে জাতি, এই দেশ ঐ দেশ,—এইরূপ আরো কত-শত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ড-খণ্ড ভাগ-বিভাগ করিয়া ইহাদেরই মধ্যে কোনো একটির ভিতরে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহারই কথা দিন-রাত ভাবে, ইহাই তাহার সর্ব্বস্ব মনে হয়, এবং ইহার বাহিরেও যে, আর কিছু আছে, বা থাকিতে পারে, তাহা তাহার মনেও হয় না। সে ইহাতেই নিজেকে ধন্য মনে করে। তাই সে যখন ভাল চায়, তখন উহারই ভাল চায়। কিন্তু যাঁহার নিকটে সে ভাল চায় তিনি জানেন যে, সে যে ভালকে চাহিতেছে, সে ভাল বস্তুত ভাল নহে, সে কল্যাণ কল্যাণই নহে। আর যাঁহারা সেই কল্যাণদাতার অনুগ্রহে তাঁহারই দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখিতে পারেন, তাঁহারাও বলেন, ঐ ক্ষুদ্র কল্যাণ কল্যাণ নহে, বিশ্বের কল্যাণই কল্যাণ। তাই তাঁহারা তাঁহার নিকটে বলেন—"স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য, বরং ন যাচে,"—'হে প্রভু, বিশ্বের কল্যাণ হউক, আমি নিজের জন্য কিছু চাই না।'

ঐ স্বার্থ, দম্ভ, রাগ, দ্বেষ ও মোহ মানুষকে সত্য কল্যাণ দেখিতে দেয় না; তাই যতক্ষণ তাহাদের উচ্ছেদ না হয় ও তাহাতে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া না উঠে, ততক্ষণ তাহাকে দেখাও যায় না, আর তাহা উপস্থিত হইলেও, কোনো রূপেই তাহাকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বা সামর্থ্যও হয় না। তাই আমরা ঐ কল্যাণ চাহিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়া থাকি—

"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।"

'হে বিশ্বের প্রেরণকর্ত্তা, হে দেব, আমাদের সমস্ত দুরিতকে

অপনয়ন কর!'

তারপর প্রার্থনা করি—

"যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।"

'যাহা কল্যাণ, তাহা আমাদের নিকট প্রেরণ কর!'

প্রথমে আমাদের পাপগুলিকে দূর করিয়া দাও, অজ্ঞানের নিবিড় আবরণকে অপনয়ন করিয়া দাও, চিত্তের সমস্ত মলিনতা অপগত হউক, সত্যদর্শনের কল্যাণ-দর্শনের যোগ্যতা লাভ হউক; তারপর, হে পরমাত্মন্, যাহা কল্যাণ, পরম কল্যাণ, তাহা তুমি আমাদিগকে প্রদান কর! জানি আমি সেই কল্যাণ আনন্দরূপে আমার নিকটে আসিতে পারে; যদি তাহাই হয়, তবে আমি আবার প্রার্থনা করিব, যেন আমি সেই আনন্দকে সহ্য করিতে পারি! আনন্দ আনন্দ হইলেও তাহাকে সহ্য করা বড় সহজ নহে; সে মোহ আনিয়া চৈতন্য অপহরণ করিয়া ক্রমে-ক্রমে কোথায় কোন্ এক গভীর গর্ত্তে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিতে পারে, বলা যায় না। আর যদি সেই সত্য সেই কল্যাণ দুঃখের রুদ্রমূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, হে রুদ্র, হে ভীষণ, হে ভীষণ হইতে ভীষণতর, ঐ রৌদ্র মূর্ত্তিরই মধ্যে তোমার সেই শান্ত ও শিব মূর্ত্তিকে যেন দর্শন করিতে পারি, আমি যেন সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে বরণ করিয়া লইতে পারি, ভ্রমেও যেন প্রত্যাখ্যান করিয়া না ফেলি! ঐ রুদ্রমূর্ত্তিই তো আমার চিত্তকে জ্বালাইয়া-জ্বালাইয়া পোড়াইয়া-পোড়াইয়া সোনার মত উজ্জ্বল আর লোহার মত সুদৃঢ় করিয়া তুলিবে। তখনি তো, হে বিশ্বপ্রকাশ, তোমার কল্যাণের প্রকাশ আমার নিকটে স্ফুট হইতেও স্ফুটতর হইয়া উঠিবে। তখনি তো সেই সত্য সেই কল্যাণ নিজের স্বাভাবিক আনন্দমূর্ত্তিতে আমার অনুভবের বিষয় হইবে। হে শঙ্কর, হে সমস্ত কল্যাণের আকর, তুমি এই সত্য কল্যাণের দিকে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর! আমরা যেন অতিপাণ্ডিত্যে পরিণাম চিন্তায় না বসিয়া বীরের ন্যায় নির্ভীক হৃদয়ে ইহার দিকে যাত্রা আরম্ভ করিতে পারি! অসত্য কখনো কল্যাণ নয় সত্য কখনো অকল্যাণ নহে, এবং কল্যাণও কখনো ভয়ের বিষয় নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বৌদ্ধদর্শন

আত্মতত্ত্ব

[আজ আমরা এ সম্বন্ধে আর্য্যদেবের কয়েকটি কথা প্রকাশ করিব। কথিত আছে ইনি নাগার্জ্জুনের শিষ্য হইয়া ছিলেন; তদনুসারে বলিতে পারা যায়, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। চ তুঃ শ তি কা নামে ইঁহার একখানি গ্রন্থ আছে; ইহা অতি-প্রামাণিক, চন্দ্রকীর্ত্তি ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন এবং মধ্যমককারিকার ব্যাখ্যায় ইহা হইতে চারিটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত টীকার সহিত ইহা প্রকাশ করিয়াছেন (Memoirs of the ASB., VOl. III, NO 8. pp 449—514)। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ইহা খণ্ডিত। এলোমেলো ভাবে ইহার কয়েক খানি মাত্র পাতা পাইয়া তাহা হইতে তিনি বহু পরিশ্রমে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্যে-মধ্যে পাতা না থাকায় বা যতটুকু আছে তাহাও অসম্পূর্ণ বা যথাযথ স্থানে সংলগ্ন না হওয়ায় অনেক বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা ইঁহাতে পাওয়া যায় না। আলোচ্য আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়াছে। নবম প্রকরণের শেষে ও দশম প্রকরণে ইহা আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু এই আলোচনার আদি ও অন্ত খণ্ডিত। তবুও যতটুকু পারা যায়, চন্দ্রকীর্ত্তির টীকার সহিত নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইতেছে।

মাধ্যমিকদর্শনের সর্ব্বশূন্যতাবাদ প্রসিদ্ধ। লোকব্যবহারে 'এ জিনিস,' 'ও জিনিস,' এইরূপে বস্তুর একটা সত্তা দেখা যায় বটে, কিন্তু পরমার্থত সবাই শূন্য। ইহাই যদি হয়, তবে বলা উচিত, মুক্তাবস্থায় মুক্তাত্মারও অভাব হইয়া থাকে। আর মাধ্যমিকরা বস্তুত ইহা বলেনও, তাঁহারা নির্ব্বাণকে পরমার্থত সমস্তেরই ক্ষয় বা ধ্বংস বা অভাব বলিয়া থাকেন। ইহাই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—]

চতুঃশতিকা

নবম ও দশম প্রকরণ

কারিকা ২২২—২৩৮

২২২

বরং এই লৌকিকই বিষয় ভাল, কিন্তু পরমার্থ কোনো রূপেই ভাল নহে; কারণ লৌকিকে (তবুও) কিছু আছে, কিন্তু পরমার্থে কিছুই নাই।

'যে ব্যক্তি আত্মকাম (আত্মাকে চায়, আত্মার হিত চায়), সে চক্ষু থাকিলে চক্ষুর পীড়া হওয়ার আশঙ্কা আছে এই ভাবিয়া চক্ষু দুইটি উৎপাটিত না করিয়া তাহার পীড়ারই উচ্ছেদ করে। এইরূপ যে ব্যক্তি সংসারদুঃখে উদ্বিগ্ন, তাহার ঐ দুঃখেরই ত্যাগ প্রশংসনীয়, সকলেরই অভাব করা প্রশংসনীয় নহে। যদি সমস্ত বস্তুরই অভাব করা হয় তাহা হইলে সুখেরও অভাব হয় বলিতে হইবে; কিন্তু যদি সুখের অভাব হয় তাহা হইলে তাহাতে বস্তুত আত্মার কোনো উপকার করা হয় না। অতএব লৌকিকই বিষয় বরং ভাল। কেননা লৌকিক হিসাবে তবুও আপনারা কিছু আছে বলিয়া স্বীকার করেন, যেমন প্রতীত্যসমুৎপাদ ধরিয়া আপনারা ('ইহা এই পদার্থ', 'উহা ঐ পদার্থ' এইরূপ) কিছু জানাইয়া থাকেন। আবার তীর্থিকেরা যাহা অতথ্যভাবে আরোপ করিয়া থাকে তাহা, এবং বস্তুর স্বভাব বলিয়া যে একটা কিছু আছে, ইহা, এই উভয়কেই আপনারা স্বীকার করেন না।[১] আপনারা এরূপও বলেন, যে কর্ম্ম ফল দেয় নি তাহা অতীত কর্ম্ম,

১। মাধ্যমিক মতে স্ব ভা ব বলিয়া কিছু নাই. সমস্তই:নিঃ স্ব ভা ব। আমরা বলিতে পারি না যে, বীজের একটা কিছু স্বভাব আছে। বীজ যে ভাবে যে অবস্থায় থাকে তাহাই যদি তাহার স্ব ভা ব হয়, তাহা হইলে বীজ হইতে অঙ্কুর হইতে পারে না, কেননা যাহা স্বভাব তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বীজ কিছুতেই নিজের স্বভাব হইতে চ্যুত হইতে পারে না। মধ্যমকবৃত্তিতে এ সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহার ফল ভবিষ্যতে হইবে ; আবার, 'এই সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান' ;—লৌকিক হিসাবে এই সব আপনাদের আছে। ইহা ছাড়া (পরমার্থত) আপনাদের কিছু নাই।তাই লৌকিক বরং ভাল—যেখানে সমস্তের অভাব নাই ; কিন্তু পারমাথিক কোনো রূপেই ভাল নয় কেননা তাহাতে আত্মারও সর্ব্বপ্রকারে অভাব হইয়া থাকে।

(সিদ্ধান্তী) ইহাতে বলিতেছেন:—আত্মা নামে যদি কিছু স্বরূপত থাকে, তবে তাহার নির্ব্বাণে সর্ব্বপ্রকার উচ্ছেদ হইতে পারে। যে ব্যক্তি—

'আমি নাই, আমি হইব না ! আমার কিছু নাই, এবং হইবে না !'

এইরূপে ভীত হয় তাহার নিকটে একথা হইতে পারে যে,—

"বরং এই লৌকিকই বিষয় ভাল কিন্তু পরমার্থ কোনো রূপেই ভাল নহে কারণ লৌকিকে (তবুও) কিছু আছে, কিন্তু পরমার্থে কিছুই নাই।"

কিন্তু আত্মা নামে স্বরূপত কিছু সম্ভবপর নহে। যদি হয়, তবে হয় তাহা নিয়মত স্ত্রী, পুরুষ, বা নপুংসক হইবে ; কেননা, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু কল্পনা করিতে পারা যায় না। তীর্থিকেরা দ্বিবিধ আত্মা কল্পনা করিয়া থাকেন, অন্তরাত্মা ও বহিরাত্মা। ইহাদের মধ্যে অন্তরাত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, ইহা শরীররূপ গৃহের অভ্যন্তরে থাকে, এবং শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিকে বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে পরিচালনা করে। লোকে ইহা অহঙ্কারের কারণ, এবং ইহা কুশলাকুশল-প্রভৃতি কর্ম্মের ফল-ভোক্তা।

ভিন্ন-ভিন্ন শাস্ত্রে ইহাকে আরো ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর বহিরাত্মা হইতেছে দেহেন্দ্রিয়ের সমষ্টি ; যেন ইহা অন্তরাত্মার অপকারী।[২] এখন এই যে অন্তরাত্মা ইহাকে যদি স্ত্রীরূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, জন্মান্তরে তাহাকে একমাত্র স্ত্রীরূপেই জন্মিতে হইবে, পুরুষ বা নপুংসক হইয়া সে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না ; ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার উপায়

২। "অন্তরাত্মনো অপকারীর", এই মূল পাঠ বিশুদ্ধ নহে ; "অন্তরাত্মন উপকারীর" পাঠ হইলে অর্থ সুলঙ্গিত হয় বহিরাত্মা অন্তরাত্মার যেন উপকারক সহায়ক।

তাহার নাই ; কেননা নিজের যাহা স্বরূপ (বা স্বভাব) তাহাকে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না।[৩] কিন্তু ইহা এইরূপ দেখা যায় না, কেননা ইহার ব্যত্যয়ই জানা যায়। বিশেষত স্ত্রীত্ব-প্রভৃতি আত্মার গুণ নহে। পুরুষত্ব ও ক্লীবত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপে—

২২৩

অন্তরাত্মা যখন স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, ও নপুংসকও নয়, তখন তোমার যে, 'আমি পুরুষ' এই ভাব, তাহার একমাত্র হেতু অজ্ঞান।

('আমি পুরুষ', এখানে) 'পুরুষ' শব্দটি দ্বারা স্ত্রী ও নপুংসককেও বুঝিতে হইবে। 'আমি পুরুষ' 'আমি স্ত্রী' 'আমি নপুংসক' এই সমস্তই কেবল অজ্ঞানে হইয়া থাকে। বস্তুতত্ত্ব বিচার করিয়া দেখিলে ঐ রকম যখন সিদ্ধ হয় না, তখন অজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো কারণ এখানে কল্পনা করা যায় না। রজ্জুর স্বরূপ ভাল করিয়া না জানিলে যেমন তাহাতে সর্পের আরোপ করা হয়, ইহাও সেইরূপ ; ইহাই অভিপ্রায়। অতএব ইহা স্থির হইল যে, অন্তরাত্মায় এই যে স্ত্রীত্ব-প্রভৃতি কল্পনা, তাহা বস্তুতত্ত্ব অনুসারে নহে।

এইরূপ হইতে পারে, কেহ বলিবেন যে, (অন্তরাত্মার সম্বন্ধে এই স্ত্রীত্বাদি কল্পনা যুক্তিযুক্ত না হইলেও) বহিরাত্মার সম্বন্ধে তো তাহা ঠিক হইতে পারে। কিরূপে ? আকাশ মহাভূতের অন্তর্গত হইতে পারে না,[৪] তাই মহাভূত হইতেছে (পৃথিবী প্রভৃতি) মোট চারিটি। যাঁহাদের মতে পাঁচটি ভূত, তাঁহারাও, আকাশ শরীরের আরম্ভক (অর্থাৎ উপাদান) হইতে পারে না বলিয়া অবশিষ্ট চারিটিমাত্র ভূতকে শরীরের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই মহাভূতসমূহে

৩। বলা বাহুল্য যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মাধ্যমিকেরা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা ন তা ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

৪। বৌদ্ধমত ইহাই।

স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব, বা নপুংসকত্ব স্বরূপত থাকে না ; যদি থাকে, তবে তদনুরোধে সমস্ত শরীরেরই নিয়মত কোনো একটি লিঙ্গ থাকিবে, এবং কললেও[৫] স্ত্রীত্বাদি লিঙ্গ বুঝা যাইবে ইহা বলিতে হয়, কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না। অতএব—

২২৪

যখন সমস্ত ভূতেরই মধ্যে স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব, ও নপুংসকত্ব নাই, তখন কিরূপে সেই সমস্ত ভূত হইতে তৎসমুদয় হইতে পারে ?

স্বরূপত যাহাতে কোনো লিঙ্গ নাই এইরূপ মহাভূতসমূহ হইতে দেহের যে স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব, ও নপুংসকত্ব সম্ভব হইবে তাহার কি কারণ আছে? (কোনো কারণ নাই)। অতএব এইরূপে রহিয়াত্মারও স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব ও নপুংসকত্বের কোনো যোগ না থাকায় 'আমি স্ত্রী,' 'আমি পুরুষ,' 'আমি নপুংসক,' এই যে আপনার কল্পনা, তাহার কারণ অজ্ঞান।—ইহাই অভিপ্রায়। খট্টার স্তন নাই, এবং বৃক্ষেরও (শ্মশ্রুরূপ) লোম নাই, তথাপি যাঁহারা অন্যপ্রকারে খট্টাকে স্ত্রীলিঙ্গ ও বৃক্ষকে পুংলিঙ্গ বলেন, তাঁহাদের তাহা কল্পনামাত্র, এ কল্পনার নিষেধ আমরা করিতেছি না।

(পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—) (ভাল, আপনিই বা ইহার কিরূপে সমাধান করেন?) এ দোষপ্রসঙ্গ তো আমাদের উভয়েরই পক্ষে সমান।

(সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—) না; এরূপ মনে করিবেন না। আমার মতে পদার্থসমূহ নিঃস্বভাব (স্বভাব বলিয়া ইহাদের কিছু নাই), ইহারা প্রতীত্যসমুৎপাদের[৬] নিয়মে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিঃস্বভাব বলিয়াই বিশেষ-বিশেষ কারণে পদার্থের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, যেমন চিত্রপুরুষ ও মায়াস্ত্রী-প্রভৃতির রূপের

৫। ভ্রূণ যখন প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন সেই প্রথম অবস্থায় তাহাকে ক ল ল বলা হইয়া থাকে।

৬। এ বিষয়টি বৌদ্ধদর্শনের মূল, দুই-এক কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার ইচ্ছা আছে, আত্মতত্ত্বের আলোচনা শেষ করিয়া উহাই পরে সবিশেষ আলোচনা করিব।

পরিবর্তন হয়।[৭] অতএব আমাদের পক্ষে কোনো দোষ নাই। কিন্তু যাঁহারা বস্তুকে স্ব-স্বভাব বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে স্বভাবানুসারেই স্ত্রীআদির মধ্যে কোন একটি বিশেষ লিঙ্গ নিয়মতই স্থির থাকিবে, কেননা স্বভাবের কখনো অন্য প্রকার সম্ভবপর নহে। অতএব এইরূপে 'আমি পুরুষ' ইত্যাদি কেবল মোহমূলক বলিয়া তাদৃশ-লিঙ্গযুক্ত আত্মার স্বরূপত কোন অস্তিত্ব নাই।

আবার, আত্মা যদি অহঙ্কারের (অর্থাৎ 'অহম্' বা 'আমি' এই বুদ্ধির) আলম্বন হয়, তবে তাহা সকলেরই অহঙ্কারের আলম্বন হইবে। এই লোকে অগ্নির স্বভাব হইতেছে উষ্ণতা, (সকলেরই নিকটে ইহার এই উষ্ণতা প্রকাশ পায়,) কাহারো নিকটে অনুষ্ণতার বোধ হয় না; এইরূপ আত্মা যদি স্বরূপত থাকে, তবে তাহা সকলেরই আত্মা, এবং সকলেরই অহঙ্কারের আলম্বন হইবে; কিন্তু বস্তুত ইহা সেরূপ হয় না; কারণ—

২২৫

যাহা তোমার আত্মা, তাহা আমার আত্মা নহে; অতএব নিয়মত তাহা আত্মা হইতে পারে না।

যাহা তোমার আত্মা, তোমার অহঙ্কারের বিষয় এবং তোমার আত্মস্নেহের বিষয়, তাহা আমার আত্মা নহে, কেননা তাহা আমার অহঙ্কারের বিষয় নহে, এবং আমার আত্মস্নেহেরও বিষয় নহে। যেহেতু ইহা এইরূপ সেই জন্য তাহা নিয়মত তাহা (আত্মা) নহে। এবং যাহা নিয়মত আত্মা নহে তাহা স্বভাবত নাই। অতএব অসৎ (অলীক) বিষয়ে আত্মার যে এই আরোপ, ইহা পরিত্যাগ কর। বলিতে পার, যদি আত্মা নাই তবে এই যে অহঙ্কার, ও এই যে আত্মস্নেহ, তাহা কোথায় হইয়া থাকে? (আচার্য্য আর্য্যদেব ইহার উত্তরে) বলিতেছেন:—

৭। চিত্রপুরুষ অর্থাৎ বহুরূপী, বহুরূপীর রূপ বিশেষ-বিশেষ পরিচ্ছদ-হেতু পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়; অথবা চিত্রাঙ্কিত পুরুষ, বিভিন্ন-বিভিন্ন বর্ণপাতে তাহার রূপের পরিবর্তন হইতে পারে। মায়া বা ইন্দ্রজালে যে স্ত্রী দেখা যায়, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ-পরিবর্তন হইয়া থাকে।

ওহে, অনিত্য পদার্থসমূহে কল্পনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উপবর্ণিত ন্যায় অনুসারে স্কন্ধব্যতিরিক্ত স্বরূপসিদ্ধ আত্মার সর্ব্বপ্রকারে অভাব-হেতু, রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই অনিত্য পদার্থসমূহে আত্মা এই কল্পনা হয়; অর্থাৎ আত্মা, সত্ত্ব, জীব, জন্তু এইরূপ অসদ্ভূত পদার্থের আরোপ করা হয়। যেমন ইন্ধনকে গ্রহণ করিয়া অগ্নি এই একটা সংজ্ঞা করা হয়, সেইরূপ স্কন্ধসমূহকে গ্রহণ করিয়া আত্মা বলা হয়। সেই আত্মাকে স্কন্ধসমষ্টি হইতে, অথবা পৃথক্-পৃথক্ পাঁচটি স্কন্ধ হইতে অন্য কি অনন্য ইহা নিরূপণ করিতে গেলে বুঝা যায় যে, তাহা স্বরূপত নাই; কেবল ঐ পঞ্চ স্কন্ধকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে একটা সংজ্ঞা দ্বারা কল্পনা করা হয়। এইরূপে অনিত্য সংসার-সমূহে আত্মার কল্পনা হয়, ইহা স্থির হইল।

(পূর্ব্বপক্ষী) এখানে বলেন—আত্মা স্বভাবত আছে, কেননা তাহাই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ। আত্মা যদি না থাকে তবে শুভ বা অশুভ কার্য্য করিয়া কে তাহার ফল অনুভব করিবে? সেই তো শুভ বা অশুভ কার্য্য করিয়া বিবিধ জাতি, গতি, ও যোনি প্রভৃতির ভেদে বিভিন্ন লোকত্রয়ে (কামলোকে, রূপ-লোকে ও অরূপলোকে) নিজের কর্ম্মের অনুরূপ অনন্তপ্রকার সুখ-দুঃখ-ফলোপ-ভোগের জন্য জন্মপ্রবাহ প্রাপ্ত হয়। সেই কর্ত্তা ও সেই অনুভবিতা, সেই হত হয়, সেই অধর্ম্ম কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়, এবং সেই মুক্ত হয়। অতএব আত্মা স্বরূপত আছে।

(সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—) আচ্ছা, এই যে ভিন্ন-ভিন্ন জন্মরূপ পরিবর্ত্তন, তাহাতে আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন দেহগত বিকার প্রাপ্ত হয় কি না? যদি না হয়, তবে এই অকিঞ্চিৎকর আত্ম-কল্পনার ফল কি? আর যদি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তোমার মতে নিয়মতই—

৮। মূলে ছাপা হইয়াছে "নয়নিত্যেষ্বভাবেষু," কিন্তু বস্তুত পাঠ হইবে "নবনিত্যেষু ভাবেষু।"

২২৬

পুরুষ জন্মে-জন্মে দেহের ন্যায় বিকার প্রাপ্ত হয়;
এবং তাহা হইলে

দেহের অন্তে সে অন্য হইয়া যায়, এবং তাহাতে তাহার নিত্যতা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

দেহের একদেশ যেমন দেহের বিকারকে অনুসরণ করে এবং সেজন্য তাহা দেহ হইতে অন্য নহে; সেইরূপ আত্মা যদি দেহের বিকারকে অনুসরণ করে তবে তাহা দেহ হইতে অন্য নহে। এবং তাহা নিত্যও নহে, কেননা তাহা দেহ হইতে ভিন্ন নহে।......৯

অতএব (সাংখ্যমতে) মহত্তত্ত্ব-প্রভৃতি এই যে বিকার, ইহার প্রবৃত্তি একবারেই নিষ্ফল। তাই দেখা যাইতেছে, (সাংখ্য) শাস্ত্রে ইহাদের প্রক্রিয়া প্রণয়ন করিবার শ্রম ব্যর্থই হইয়াছে। যদি (বলা) হয়—'পুরুষ হইতেছে চৈতন্যশক্তিস্বরূপ, চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে তাহার বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয়। চৈতন্যবৃত্তির অভিব্যক্তি হেতু পুরুষ উপভোক্তা হয়, সে বিষয়োপভোগরূপ ক্রিয়ায় বিষয়কে জানে।১০ এই যে তাহার বিষয়োপভোগ তাহা চৈতন্যবৃত্তিরূপ ক্রিয়া। এই ক্রিয়া চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিনা সম্ভব হয় না। অতএব বিকারসমূহের (সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়সমূহও বিকারেরই মধ্যে) ব্যর্থতা কোথায়?' (ইহার উত্তর) বলা হইতেছে—পুরুষের বিষয়োপভোগ যদি চৈতন্যবৃত্তিরূপ ক্রিয়া হয়, তাহা

৯। ইহার পর দেড় পঙ্‌ক্তির পরে ২৩২ তম কারিকা পর্য্যন্ত মূল কারিকা ও টীকা উভয়ই খণ্ডিত। ইহার পরে যে টীকা পাওয়া যায় (পৃঃ ৪৮৮) তাহার প্রারম্ভ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, তাহাতে সাংখ্যসম্মত আত্মবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। যাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে তাহা বাদে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতেই আমরা আবার আরম্ভ করিতেছি।

১০ এস্থানের পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না; আমি পড়িতে চাই—"...বুদ্ধ্যভিব্যক্তিঃ,... ক্রিয়াভিনির্বৃত্ত্যা...।" মুদ্রিত পাঠ—"...বুদ্ধ্যভিব্যক্তেঃ...ক্রিয়াভিনিবৃত্ত্যা... ।"

হইলে ক্রিয়ার ধর্ম্মকে তাহা অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না। ক্রিয়ার ধর্ম্ম কি? ইহাই ইহার ধর্ম্ম যে, ইহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং নিজে চঞ্চল। ইহা এইরূপই, কারণ—

২০৩

ক্রিয়া যেমন (নিজের) বিনাশ পর্য্যন্ত চঞ্চল, সেইরূপ (নিজের) বিনাশ পর্য্যন্ত চঞ্চল কোনো দ্রব্য নাই।

ক্রিয়া হইতেছে দ্রব্যের ব্যাপার, এই ক্রিয়া উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত চঞ্চল, অস্থির। যেমন, বাতাস যদি না উঠে তাহা হইলে কোনো ক্রিয়ার আরম্ভ না হওয়ায় বৃক্ষাদি অবিচলিত ভাবে থাকে; কিন্তু বাতাস বা অন্য কারণে তাহাদের যে কম্পন ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাহা নিজের বিনাশ পর্য্যন্ত চঞ্চলতা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারে না (তাহা চঞ্চলই থাকে)। যেহেতু ইহা এইরূপ হয়

সেই জন্য 'পুরুষ আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই' ইহা যুক্তিযুক্ত হয় না।

চলনক্রিয়া (অর্থাৎ কম্পন ক্রিয়া) আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব অবস্থায় বৃক্ষাদি যেমন বৃক্ষাদিরূপ দ্রব্যস্বরূপে উপলব্ধ হয়, পুরুষ (আত্মা) সেরূপ নহে; কেননা তাহা কেবল চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাহা (চৈতন্য) হইতে ভিন্ন নহে। আবার ইহাও কল্পনা করিতে পারা যায় না যে, আত্মা চৈতন্যরহিত হইয়াও থাকে, কারণ চৈতন্য দ্রব্য নহে। অতএব 'পুরুষ (আত্মা) আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই', ইহা যুক্তিযুক্ত হয় না।[১১] (যখন চৈতন্যশক্তি আছে, তখন পুরুষও আছে, এইরূপ) চৈতন্যশক্তির সদ্ভাব দ্বারা যে, পুরুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়, তাহাও যুক্তিযুক্ত

১১। অপর পক্ষে বৃক্ষাদির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, বৃক্ষাদি আছে কিন্তু তাহার কম্পনাদি ক্রিয়া নাই।

নহে; কারণ নিরাধার শক্তি থাকিতে পারে না।[১২] যেমন চৈতন্যবৃত্তির ব্যতিরিক্ত পুরুষ সম্ভব হয় না, সেইরূপ শক্তি থাকিলেও চৈতন্যশক্তিমাত্র হইতে ব্যতিরিক্ত পুরুষ থাকিতে পারে না।[১৩] এইরূপে নিরাশ্রয় শক্তি নাই, এবং শক্তি না থাকায় তোমাদের এ কল্পনাটাও অযুক্ত যে, (চৈতন্যবৃত্তির অভি-)ব্যক্তিতে শক্তির উপযোগিতা থাকায় চক্ষু-প্রভৃতি (বিকারেরও তাহাতে) উপযোগিতা আছে। অতএব ইহা স্থির যে,

চৈতন্য যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে (তাহার অভিব্যক্তির) কারণ মিথ্যা।

আর যদি এই পুরুষ চৈতন্য-অভিব্যক্তির পূর্ব্বে চৈতন্যশক্তিরূপ হয়, তাহা হইলে—

২৫৪

চেতনা ধাতু অন্যত্র, আর চেতনা অন্যত্র দৃষ্ট হয়; এই জন্য লৌহের দ্রবত্বের ন্যায় পুরুষ বিকার প্রাপ্ত হয়।

চৈতন্যের যদি দুইরূপ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে (বলিতে হয়), চেতনা ধাতু অর্থাৎ চেতনাবীজ—চেতনাশক্তি চেতনা হইতে অন্যত্র অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে তোমা-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, আর চেতনাও চেতনাশক্তি হইতে অন্যত্র অর্থাৎ পৃথগ্-ভাবে (দৃষ্ট হয়)। যেখানে চেতনাশক্তি থাকে, চেতনাও ঠিক সেইখানেই থাকে। এ সম্বন্ধে (আচার্য্য) "লৌহের দ্রবত্বের ন্যায়" বলিয়া দৃষ্টান্ত দিতেছেন,—লৌহ দ্রবত্ব-

---

১২। চৈতন্য হইতে তাহার শক্তি যদি ভিন্ন হইত, এবং চৈতন্যে যদি পৃথক কিছু শক্তি নামে থাকিত, তাহা হইলে ঐ শক্তির দ্বারা পুরুষের সত্তা বুঝা যাইতে পারিত. কিন্তু বস্তুত শক্তির কোনো আধার নাই; চৈতন্য ও শক্তি বস্তুত একই।

১৩। কম্পনাদি ক্রিয়া হইতে বৃক্ষাদি যেমন ভিন্ন, চৈতন্য বা চৈতন্য-শক্তি হইতে পুরুষ সেরূপ ভিন্ন নহে।

ভাব প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহা ঠিক একই দেশে বা স্থানে থাকে, বীজ ও অঙ্কুরের সেইরূপ সমানদেশতা নাই অর্থাৎ তাহারা একস্থানে থাকে না, কারণ সেখানে আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষের (আত্মার) সমানদেশতা আছে; কারণ তাহার আবির্ভাব-তিরোভাব নাই। এই জন্য আচার্য্য লোহের দ্রবত্ব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছেন। পুরুষ চৈতন্যশক্তি হইতে পৃথগ্-ভাবে ব্যক্ত হয় না, কেননা ইহা তাহা হইতে অনন্য। অতএব পুরুষ যদি শক্তিরূপ হয়, ও এইরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে

এই জন্য লোহের দ্রবত্বের ন্যায় পুরুষ বিকার প্রাপ্ত হয়।

আর বিকার প্রাপ্ত হইলেই আত্মা লোহের ন্যায় নিত্য হইতে পারে না, ইহা সিদ্ধ হইল।

অন্যেরা বলেন—আমাদের মতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নহে। তবে কি?

২৩৫

চৈতন্য কেবল মনে আছে, আর পুরুষ (আত্মা) আকাশের ন্যায়।

আত্মা প্রাণিসমূহের প্রতিশরীরে আকাশের ন্যায় ব্যাপক; তাহার চেতনা কেবল মনে সংযুক্ত, এবং ইহা সর্ব্বশরীরের ব্যাপিনী নহে। মন আত্মার পরমাণু-মাত্র প্রদেশে সংযুক্ত রহিয়াছে। সেই মনের সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষ (আত্মা) তাহার অভিন্ন প্রদেশে (অর্থাৎ মন যে স্থানে থাকে সেই স্থানে) চৈতন্য উৎপাদন করে। অতএব পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ বলা গিয়াছে, আত্মার পক্ষে তাহাদের কোনো অবসর নাই।

(এ সম্বন্ধে আমরা) বলি—যেহেতু আপনারা আকাশের ন্যায় মহান্ আত্মার কেবলমাত্র মনে চৈতন্য স্বীকার করেন,

সেই জন্যই তাহার স্বরূপ অচৈতন্যের ন্যায় দেখা যায় বলিতে হইবে)।

এরূপ হইলে পুরুষ (আত্মা) অচেতন হইয়া পড়ে; কারণ ইহা বলা যুক্তি-যুক্ত হয় না যে, কেবলমাত্র পরিমাণু-পরমাণস্থানে[১৪] চেতনার যোগে পুরুষ সচেতন হয়; পরমাণু-পরিমাণ লবণের সম্পর্কে গঙ্গা বা হ্রদের জলকে সলবণ (লোণা) বলিয়া সম্ভবনা করা যায় না। আবার আত্মা হইতেছে দ্রব্য, আর চৈতন্য (বা চেতনা) হইতেছে গুণ; এই দ্রব্য ও গুণের পরস্পর ভেদ থাকায় (অর্থাৎ দ্রব্য ও গুণ পরস্পর ভিন্ন হওয়ায়) পুরুষকে অচেতন বলিতে হয়। আর যাহা অচেতন, ঘটের ন্যায় তাহাকে আত্মা বলিয়া কল্পনা করা ন্যায্য নহে। অতএব আত্মার যুক্তি নাই। যদি প্রতিজীবেই এই আত্মা সর্ব্বগত (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) হয় তাহা হইলে (জিজ্ঞাসা করি)—

২৩৬

'অমি' (আত্মা) যদি সর্ব্বব্যাপী হয়, তবে যে ব্যক্তি পর (তোমা হইতে অন্য), সে তোমার 'আমি' হয় না কেন?

উদ্ভাবক কল্পনার বলে আমি যদি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হই, তাহা হইলে অপর জীবেও আমার আত্মা থাকায়, আমাতে আমার যেমন অহঙ্কার ('অহম্' অর্থাৎ 'আমি' এই বুদ্ধি) হয়, তাহাতেও আমার সেইরূপ অহঙ্কার উৎপন্ন হওয়া উচিত। ইহা (আত্মা) যে সর্ব্বগত, তাহা এইরূপেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে যে, আমার যেমন আমার আত্মাতে অহঙ্কার হয়, অন্যেরও সেইরূপ আমার আত্মাতে অহঙ্কার হইবে। পরের শরীরে পরের আত্মা আমার আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখে বলিয়া সেখানে আমার অহঙ্কার হয় না, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ পরের আত্মার স্থানে আমার আত্মার অভাব নাই,—যেহেতু তোমরা স্বীকার করিয়া থাক যে, সমস্ত আত্মাই ব্যাপক; অতএব যখন উভয়েরই আত্মা একই দেশে থাকে, তখন অন্যের আত্মা আমার আত্মাকে আবরণ করিতে পারে না। ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য (আচার্য্য) বলিতেছেন—

১৪। নৈয়ায়িকমতে মনের পরিমাণ অণু।

তাহারই দ্বারা তাহার আবরণ যুক্তিযুক্ত নহে।

যখন উভয়ই আত্মা একই দেশে থাকে, তখন, নিজের আত্মা নিজের আত্মাকে যেমন আবরণ করিতে পারে না, (পরেরও আত্মা সেইরূপ আমার আত্মাকে আবরণ করিতে পারে না)। অতএব পরেরও আত্মাতে আমার অহঙ্কার হওয়া উচিত; কিন্তু বস্তুত এরূপ হয় না। অতএব ব্যাপক আত্মা নাই।

এইরূপে (পূর্ব্বোক্ত) উভয়ই মতে আত্মার অস্তিত্ব যে যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া (আচার্য্য) ইহাই প্রতিপাদন করিতে যাইতেছেন যে, (সত্ত্ব, রজ, ও তম) এই গুণত্রয় সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের স্বরূপও যুক্তিযুক্ত নহে:—

২৬৭

যাঁহাদের মতে গুণসমূহের কর্ত্তৃত্ব আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই, তাঁহাদের ও উন্মত্তের মধ্যে কোনো ভেদ নাই।

সত্ত্ব, রজ, ও তম, এই তিন গুণ, ইহাদের সাম্যাবস্থা হইতেছে প্রধান, প্রসবাবস্থা, প্রকৃতি। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অচেতন হইলেও পুরুষের জ্ঞাত-বিষয়-ভোগে ঔৎসুক্য হেতু তাহার সহিত অভেদ প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র বিকারসমূহকে প্রসব করে। তাহার ক্রম এই:—প্রকৃতি হইতে মহান্। মহান্ হইতেছে বুদ্ধির অপর নাম। মহান্ হইতে অহঙ্কার। অহঙ্কার ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, যথা বাক্, পাণি, পাদ পায়ু, ও উপস্থ; এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়-স্বরূপ মন উৎপন্ন হয়। রাজস অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র, আর এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। তামস অহঙ্কার পূর্ব্বোক্ত উভয় অহঙ্কারের প্রবর্ত্তক।[১৫] এইরূপে (ইন্দ্রিয়াদি) সমস্ত বিকার পদার্থ প্রকৃতিরই

১৫। এখানকার প্রক্রিয়ায় একটু গোলমাল হইয়াছে। বস্তুত সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে সাত্ত্বিক

বিকার হওয়ায় (সত্ত্ব, রজ, ও তম) এই গুণত্রয় প্রবর্ত্তক। এই প্রকারে যে সকল বাদীদের মতে গুণসমূহের কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই, বস্তুতত্ত্ব-বিচক্ষণেরা দেখেন যে, তাঁহাদের ও উন্মত্তদের মধ্যে কিছু ভেদ নাই। উন্মত্তদের জ্ঞান বিপর্য্যস্ত (উল্‌টো), তাহারা বিপর্য্যস্ত জ্ঞানে (বস্তুতত্ত্ব) যথাযথ ভাবে জানিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবে অবধারণ করে, ও অসৎ পদার্থের প্রলাপ করে; আর সাঙ্খ্যবাদীও সেইরূপ; ইনি (নিজের) শাস্ত্র অনুসারে অচেতন গুণসমূহের কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়া যেরূপে বিষয় ব্যবস্থাপিত করেন তাহা বুঝেন না, বিপরীত অবধারণ করেন, এবং অসৎ বিষয়ের প্রলাপ করেন। অতএব ইনি উন্মত্তের সমান। ইঁহার মতে পুরুষ অকর্ত্তা, অথচ ভোক্তা; আর গুণসমূহ কর্ত্তা, কিন্তু ভোক্তা নহে। ইনি এইরূপে গুণসমূহের যুক্তিহীন কর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব প্রতি-পাদন করিয়া নিজের অত্যন্ত অযোগ্যতা প্রকাশ করেন। (আচার্য্য) ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—

২৩৮

গুণসমূহ গৃহপ্রভৃতিকে সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত করিতে জানে, কিন্তু তাহাদিগকে ভোগ করিতে জানে না, ইহা অপেক্ষা অযুক্ত কথা আর কি আছে?

এই মত যুক্তিবিরুদ্ধ ও লোকেরও অসম্মত, এই জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক-তর অযুক্ত মত আর নাই, ইহাই অভিপ্রায়। এইরূপে গুণসমূহের কর্তৃত্ব যুক্তি-যুক্ত নহে।

আর যাঁহার মতে আত্মাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা ও তাহার ফল-ভোক্তা, তাঁহার মতে আত্মা নিত্য হইতে পারে না। কারণ ক্রিয়াবান্ নিত্য হয় না। এই

অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়, তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র (এবং ইহা হইতে পঞ্চভূত হয়), আর রাজস অহঙ্কার সাত্ত্বিক ও তামসিক অহঙ্কারের প্রবর্ত্তক।

লোকে যে করে সেই কর্ত্তা, ক্রিয়া-নিমিত্তই তাহার কর্ত্তৃত্ব। কেহ কিছু না করিয়া বিনা কারণেই কর্ত্তা হইতে পারে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।[১৬]......

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

—o—

১৬। এ স্থানে আর পাঁচটিমাত্র শব্দের পর পুস্তক খণ্ডিত, আরব্ধ বিচার শেষ হয় নি।

বিলাতযাত্রীর পত্র

১

NEW YORK

Nov. 17, 1920.

My friend, your letters are like weekly wages to me which I rightly earn by what I am doing here for your sake. But you must know that the idea which has drawn us round Shantiniketan is not a static one —it is growing and we must keep up with it. When I left you to start for Europe I was labouring under the delusion that my mission was to build an Indian University in which Indian cultures would be represented in all their variety. But when I came to the continental Europe and fully realised that I had been accepted by the Western people as one of themselves I realised that my mission was the mission of the present age—it was to make the meeting of the East and West fruitful in truth. I felt that the call of Shatiniketan was the invitation of India to the rest of the World. A picture needs its background for

its meaning and every people must have its background of larger humanity. What we suffer from in India is our isolation, we have not our place in the world at large, therefore we cannot realise ourselves in our greatness ; we quarrel for our share of small favours of desteny and the air of our country is poisoned with mutual jealousy and distrust. We must find our infinite perspective, must know that we belong to the great future and to the Universe of Man. India becomes unreal when it is merely India to us and nothing more, she is true only in the eternal humanity. Therefore in India let Shantiniketan belong to all the world, let her transcend there the limitatian of her geographical fact. I have appealed to the people of America to help me to found in my country an International University. Our education should fit us to receive the message of our age. The new age has dawned—and the seat has to be made ready for the Guest who comes with the morning. When the hermit guest announced himself at the door of Shakuntala she heard him not—and the curse was uttered that she would be forsaken. Our Great Guest has aunounced Himself and the air is thrilled but men are still busy in planning fights. But let us in the East at the obscure corner of the world show by our preparations that we have heard the voice. There will be no end of men in our country who will

be busy with Indian politics—but we are not of them. We belong to the brothers who have wakened all over the world and who are making ready for the pilgrimage to greet the New-born.

The idea is great. I accept it, I fully belive in it, it is leading me on in an unknown path—yet how ludicrously small we are—the petty complications of our daily life, how insignificant and yet how obstructive! We have our path across the mountains, but rubbish heaps made of daily refuse of life, lying scattered on our path, cause trouble and delay and produce fatigue. But the sun is shining overhead, and God's blessing is in my heart, the call is clear and the help is waiting by roadside.

১০

Nov 30. 1920

It is a great responsibility we are taking—the carrying out of this idea of an International University where students from East and West are to meet and work together. There are occasions when it terrifies me—but then the assurance comes to my mind that it is not we, the idividual, who are to bear this responsibility, but it belongs to the age itself, and it will come to its fulfilment, not because we are strong and worthy, but because it is true. I am often reminded of my Gitanjali poem

in which the woman speaks how she found God's sword when she had been seeking for a petal from God's flower garland. All through my life I have been seeking for such a petal and I stand puzzled at the sight of the gift waiting for me. This gift has not been my choice, but my God has chosen me for this gift. And how I say to myself, that we prove our worthiness for God's gift of responsiblity by acceptance of it and not by success or anything else. The past has been for men, the future is for Man. Those men are still fighting for the possession of this world—the din and the clash are deafening, the air is obscured with the dust rising from the trampled earth; standing in the heart of this struggle we have to build a seat for the one God revealed in all human races. We may be mocked and pushed away by the crowd but the fact will remain and invisibly grow into truth that we have believed. I was born a poet, and it is difficult for me to suffer to be rudely hustled in my path by busymen who have no leisure for ideas—I am not an athlete, I donot belong to an arena; the stare of the curious crowd scorches my soul, and yet, I, of all persons, am called upon to force my way into the thick of the Western public with a mission for which I have never been trained. What is impossible has to be done by individuals

who are incapable. Truth fashions its own arrows out of reeds that are light and frail.

১১

Dec. 13, 1920.

Our seventh Paush is near at hand. I cannot tell you how my heart is thirsting to join you in your festival. I am trying to console myself with the thought that something very big and great is going to be the out-come of the effort I am making. But deep in my heart I know that simplicity of life and endeavour makes for real happiness. When we realise in some measure our ideal of perfection in our work it matters very little what its dimension is. Our trust in bigness very often betrays our want of faith in truth. The Kingdom of the Earth boasts of the magnitude of its possessions, but the Kingdom of Heaven is content with the depth of its self-realisation. There are institutions which have for their object some external success. But Shantiniketan is there for giving us opportunity to realise ourselves in truth. This can never be done through big funds, but through dedication of our life in love. In this country I live in the dungeon of the Castle of Bigness —my heart is starved,—day and night I dream of Shantiniketan which blossoms like a flower

in the atmosphere of the unbounded freedom of simplicity. I know how truly great it is when I view it from this land of Arithmetical multitude. Here I feel every day what a terrible nightmare it is for human soul, this burden of the monster Arithmetic of number. It incessantly drives its victims and yet leads them to nowhere. It raises storms of battle which are for sowing broadcast the seeds of future conflict. Yet these people are proud of the mere enormity of their barrenness, as the giant reptiles of the primitive earth were proud of their hypertrophied tails which did not save them from doom of destruction. I long to leave all this, totally reject its unreality, take the next steamer I can get and run back to my Shantiniketan and serve it with my life and love as long as I live. That life which I dedicate to it, if it is true, will make it live and never the fat money bags. The true wisdom is there which can spurn the greed for result and is only concerned in the expression of truth. The Wisdom found its utterance in India— but there is imminent danger of its being drowned in the flood of noise which the votaries of success is bellowing forth in the prosperous West. Away from this turmoil, from this dark tower of unreality, from this dance of death trampling sweet flowers of life under its tread. My prayer is growing every day more and more intense :—

"অসতোমা সদ্‌গময়"
"যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।"

১২

Yesterday some Shantiniketan photographs came by chance into my hands. I felt as if I was suddenly wakened up from a Brobdingnagian nightmare. I sang to myself "আমাদের শান্তিনিকেতন" It is আমাদের because it has not been manufactured by machine, —It is truth itself—the truth which loves to be simple because it is great. Truth is beautiful like our own women. She never strains to add her inches by carrying extravagance under her feet....... Happiness is not in success, not in bigness, but in truth. What makes me feel so sad in this country is the fact that the people here do not know that they are not happy. They are proud, like the sandy desert which is proud of its glitter. This Sahara is mighty big but my mind turns its back to it and sings:

"I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made;
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey bee,
And live alone in the bee-loud glade."

In the modern time, with all its facilities of communication, the access to Innisfree has become most difficult. Central Africa opens its secret to the inquisitive man, and also north Pole and south Pole —but the road to Innisfree lies an eternal mystery. Yet I belong to that "Isle of Innisfree," its true name is Shantiniketan. But when I leave it and cross over to the western shore I feel occasionally frightened lest I should lose my path back to it. Ah, but how sweet is our shal avenue, the breath of autumn in our sheuli groves, the rainy evening resonant with music in Dinu's absurd little room :

And I shall have some peace there, for peace
comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning to
where the cricket sings ;
There midnight all a glimmer, and noon a
purple glow,
And evening full of the linnet's wings.

Rabindranath Tagore.

বিশ্বভারতী

দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ

১৩২৬ সাল, ৮ই পৌষ হইতে ১৩২৭ সাল, ৭ই পৌষ পর্য্যন্ত।

১৩২৫ সালের ৮ই পৌষ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়, এবং গত ১৩২৬ সালের ১৮ই আষাঢ়ে নিয়মানুসারে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। তাই ঠিক বলিতে গেলে এখন বিশ্বভারতীর উল্লেখযোগ্য কার্য্যের মোট দেড় বৎসর হইল। প্রথম ছয় মাসের বিবরণ গত বৎসর আশ্রমের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম, আজ অবশিষ্ট এক বৎসরের বিববরণ আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি।

বিভাগ—এবারেও ইহার তিনটি বিভাগ ছিল, যথা—

(ক) সাহিত্য বিভাগ,

(খ) কলা বিভাগ, ও

(গ) সঙ্গীত বিভাগ।

শিক্ষণীয় বিষয়

এই সমস্ত বিভাগে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলিতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল :—

(ক) সাহিত্য বিভাগ

১। সংস্কৃত

কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার

২। পালি

সাহিত্য, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান

৩। প্রাকৃত—সাহিত্য, ব্যাকরণ

৪। ইংরাজী সাহিত্য

৫। ফরাসী ভাষা

৬। জর্ম্মান ভাষা

৭। বাঙ্‌লা সাহিত্য

(খ) কলা বিভাগ

১। অঙ্কন ও কল্পনা

(গ) সঙ্গীত বিভাগ

১। বাদ্য

২। গান

বিশ্বভারতীতে সম্প্রতি যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ছাত্র উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া একদিকে হিন্দী, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাটী, সিংহলী ও মৈথিলী, এবং অন্যদিকে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিখাইতে পারা যায়।

অধ্যাপক

আলোচ্য বর্ষে চৌদ্দজন অধ্যাপক অধ্যাপনা করিয়াছেন, ইঁহাদের নাম ও অধ্যাপনার বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) সাহিত্য বিভাগ

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর মিশ্র ... সংস্কৃত পাণিনীয় ব্যাকরণ ও কাব্য।

২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ... সংস্কৃত কাব্য

৩। শ্রীযুক্ত বিনায়ক গোবিন্দ শরদেশ মুখ ... "

৪। সদ্ধর্ম্মবাগীশ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির ... পালি সাহিত্য, বৌদ্ধদর্শন ও মনোবিজ্ঞান।

৫। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ··· পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত অলঙ্কার

৬। " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ··· ইংরেজী ও বাঙ্‌লা সাহিত্য

৭। " সি. এফ্. এনড্রুজ ··· ইংরাজী সাহিত্য

৮। " গুরুদয়াল মল্লিক ··· ইংরাজী সাহিত্য

৯। " এইচ্. পি. মরিস ··· ফরাসী ভাষা

১০। " নরসিংভাই পাটেল ···জর্ম্মান ভাষা

(খ) কলাবিভাগ

১১। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

(গ) সঙ্গীত বিভাগ

১২। শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী ··· বীণা, মৃদঙ্গ ও হিন্দী গান

১৩। " দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ··· বাঙ্‌লা গান

১৪। " নকুলেশ্বর গোস্বামী ··· এসরাজ ও গান

ইহা ছাড়া সাহিত্য বিভাগে হরিদ্বার-গুরুকুলের স্নাতক শ্রীযুক্ত ভুদেব বিদ্যালঙ্কার কিছুদিন হিন্দী অধ্যাপনা করিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়েরা কলাবিভাগের শিক্ষাদানে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

দেশ বা প্রদেশ হিসাবে অধ্যাপকগণকে এইরূপ ভাগ করিতে পারা যায়:—

সিংহলী—১

মৈথিলী—১

গুজরাটী—১

ইংরাজ—১

পারসী—১

সিন্ধী—১

মারাঠী—২

বাঙালী—৬

বক্তা

আলোচ্যবর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশ্বভারতীতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ব্যাখ্যান করিয়াছেন :—

১। Prof. Founcher … ফরাসী কম্বোডিয়ায় ভারতীয় কীর্ত্তি (আলোক চিত্র সহ)

২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ… প্রাচীন সমুদ্রযান (৩০, ১২. ১৯.)

৩। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় … বৌদ্ধদর্শন (৮. ২. ২০.)

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তেজাসিংহ …Message of Guru Govind (15-2-20)

৫। " প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ … Relativity (১৬-১১-২৬)

৬। " মহম্মদ্ শহীদুল্লাহ … (১) ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা (৩০-১১-২৬)

(২) বাঙ্গলা ভাষা তত্ত্ব (২-১২-২৬)

৭। ডাক্তার তারাপুরয়ালা … (১) Tower of Silence (১-১২-২৬)

(২) Instruction of the young in the Laws of Sex (২২-৭-২৭)

(৩) Boys Scout movement (২৪-৭-২৭)

৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ আয়ার… দক্ষিণ ভারতের নৃতত্ত্বের একদেশ (আলোক চিত্র সহিত) (ফাল্গুন ১৩২৬)।

৯। শ্রীযুক্ত ভূদেব বিদ্যালঙ্কার … হিন্দীভাষা (৪।৫টি) (১৫-৭-২০)

ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে অন্যূন মোট ৬৫ জন ছাত্র ও ছাত্রীকে ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগে ও বিশেষ-বিশেষ বিষয়শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে ইহা সবিশেষে লিখিত হইল :—

(ক) সাহিত্যবিভাগে—৩১

১। সংস্কৃতে—১৪

২। পালিতে—৩

৩। প্রাকৃতে—১

৪। ইংরাজী সাহিত্যে—৪

৫। ফরাসী ভাষায়—৭

৬। জর্ম্মান ভাষায়—২

(খ) কলাবিভাগে—১২

১। ছাত্র—৬

২। ছাত্রী—৬

(গ) সঙ্গীত বিভাগে—২২

১। ছাত্র—১২

২। ছাত্রী—১০

এই সমস্ত ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই আশ্রমের বিদ্যালয়ের অধ্যাপক; ইঁহারা বিদ্যালয়-বিভাগে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অধ্যাপনা করেন, আর বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নও করেন। অবশিষ্ট ছাত্রের মধ্যে সাহিত্য বিভাগে, আমাদের আশ্রম হইতেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর গত বৎসর একটি ছাত্র ভর্ত্তি হয়, এবার তাহার দ্বিতীয় বর্ষ সম্পন্ন হইল। এই বিভাগে আশ্রমেরই আরও একটি বালকের দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইয়াছে। গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আশ্রমের একটি বালক আলোচ্য বর্ষে সঙ্গীত বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়িয়া গুজরাট হইতে একটি বালক সাহিত্য বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছে। কলাবিভাগে আশ্রমের বিদ্যালয়ের দুইটি বালক ভর্ত্তি হইয়াছে এবং স্থানান্তর হইতে আরো তিনটি বালক ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ছাত্রীরা সকলেই আশ্রমবাসিগণের পরিবারভুক্ত।

অধ্যাপক, ছাত্র ও ছাত্রীগণকে ছাড়িয়া দিলে আলোচ্য বর্ষে বিশ্বভারতীর ছাত্র সংখ্যা ৯।

সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে—

মারাঠি—১

গুজরাটি—১

তৈলঙ্গী—১

সিন্ধী—১

পারসী—১

বাঙালী—৬০

পারসী ছাত্রটি কিছুদিন হইতে আর এখানে পড়ে না।

অল্প দিনের মধ্যে বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও অধ্যাপকের আনন্দের সহিত একত্র বাস ও অধ্যয়ন-অধ্যাপন-আলোচনা বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সিদ্ধিকে যেন সুস্পষ্ট ভাবে সূচিত করিতেছে।

বিশ্বভারতীর পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভাগেরই কার্য্য ক্রমশই অগ্রসর হইয়াছে। সাহিত্য বিভাগে ছাত্রগণকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। তাহাদের নিজ-নিজ ক্ষুধা অনুসারে কেহ কেহ তাহার অতিরিক্ত বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং সে বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। ফলে দেখা গিয়াছে একই সময়ে স্থানান্তরে যাহা পড়ান হয় তাহা হইতে এখানে অনেক বেশী পড়ান হইয়াছে। ছাত্রদের কেহ কেহ পুস্তকালয়ের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছে। লক্ষ্য করা যায় কাহারো-কাহারো হৃদয়ে বিদ্যার অনুরাগ ঢুকিয়াছে, জ্ঞানের পিপিসা জাগিয়াছে।

কলাবিভাগের কার্য্য সবিশেষ প্রশংসনীয় ও সন্তোষপ্রদ; ইহা দেখিয়া আমাদের বহু আশা হইয়াছে। এবার চিত্রকলা ও শিল্পকলা আলোচনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই এবার কতকগুলি নূতন চিত্র আঁকিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া হইল। এই সমস্ত চিত্র প্রাচ্য শিল্পসমিতিতে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহাদের অধিকাংশ প্রশংশিত হইয়াছে। কোনো-কোনো চিত্র বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। কংগ্রেসের সময়ে যে চিত্র-প্রদর্শনী হইবে, তাহাতেও কতক চিত্র পাঠান হইয়াছে।

চিত্রের তালিকা

(১) অধ্যাপক

১। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

১। কুরুক্ষেত্র

২। আয়োজন

২। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

১। কুণাল

২। রাসলীলা (বড়)

৩। „ (ছোট)

৪। আপদ্ বিদায়

৫। ঊষা

৬। ময়ূর

৭। মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রি কালে।

(২) ছাত্র

১। শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১। লক্ষ্মী

২। সে কোন বনের হরিণ

৩। কাগজের নৌকা

৪। পদ্মায় সন্ধ্যা

৫। দুপুরের আহার

৬। ওহে নবীন অতিথি তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন

৭। চাঁদের আলো।

৩। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ

১। নূপুর

২। ভজন

৩। পুষ্পচয়ন

৪। রাখাল বালক

৫। প্রতীক্ষায়

২। শ্রীহীরাচাঁদ দুগার

১। চাহনি

২। সঙ্গীতের সম্মোহনী

৩। দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।

৪। জননী

৫। পদ্মাবতী

৩। শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্ম্মা

১। গোধূলি

২। পদ্মচরণ

৩। সারঙ্গী

৪। শারদ শ্রী

৫। অবলম্বন

কলাবিভাগের পুস্তকাগারে কতকগুলি নূতন নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই পুস্তকশালায় নন্দলাল বাবু, অসিত বাবু ও সুরেন বাবু কিছু কিছু পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

কলাবিভাগের চিত্রশালায় নন্দলাল বাবু, সুরেন্দ্র বাবু, শৈলেন্দ্রনাথ দে আমাদের পূর্ব্বছাত্র ওয়াডিয়ার, বর্ত্তমান ছাত্র হীরাচাঁদ এক একখানি চিত্র উপহার দিয়াছেন।

সঙ্গীতবিভাগের কার্য্য অতি সন্তোষপ্রদভাবে অগ্রসর হইয়াছে। এই বিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রভৃত উদ্যম ও উৎসাহে সুশৃঙ্খল-ভাবে ইহা পরিচালনা করিয়াছেন। এ বৎসর হিন্দীগানের ছাত্রগণ ভৈরব, ভৈরবী

টোড়ী, আসোয়ারী, ইত্যাদি অনেক রাগ রাগিনী অভ্যাস করিয়াছে। ছাত্রেরা যে সমস্ত গান শিখিয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলেরই স্বরলিপি লেখান হইয়াছে। মৃদঙ্গ, তবলা ও বীণার ছাত্রেরাও উন্নতি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যে সকল ছাত্র বাঙলা গান ও শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর গোস্বামীর নিকটে যাহারা এসরাজ শিক্ষা করে তাহাদেরও উন্নতি প্রশংসনীয় ও সন্তোষপ্রদ।

প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণে আমি জানাইয়াছিলাম বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন নূতন পুস্তক রচনা করিতে, অনুবাদ করিতে, বা প্রাচীন পুস্তক সংস্করণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর মিশ্র মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের শব্দসূচী শেষ করিয়াছেন, এবং শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক ইত্যাদি রচিত ব্রহ্মসূত্রের যত ভাষ্য আছে, সেই সমস্ত ভাষ্য আলোচনা করিয়া ব্রহ্মসূত্রসমূহের একটি নূতন সংস্করণ করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে কেবল ছাপাখানায় পাঠাইবার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করা বাকী আছে। লঘুকৌমুদীর বঙ্গানুবাদ হইয়াছে। অভিধর্ম্মার সংগ্রহের সংস্কৃত ও বাঙলা অনুবাদ কিঞ্চিদ্ অগ্রসর হইয়াছে। যাঁহাদের হাতে এই সমস্ত কাজ রহিয়াছে, অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় আশানুরূপ তাহা অগ্রসর হইতে পারে নাই, কিন্তু ইহা যে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।

আশ্রমের শান্তিনিকেতন পত্রিকাখানি এবৎসর হইতে গুরুদেবের ইচ্ছায় বিশ্বভারতীর মাসিক পত্রিকারূপে গণ্য করা হইয়াছে। বিশ্বভারতীর অনেক আলোচনা ইহাতে প্রকাশ হয়, স্থানান্তরেও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে।

বিশ্বভারতীর আয়-ব্যয়ের হিসাব কার্য্যের সুবিধার জন্য পৃথক না রাখিয়া মূল আশ্রমেরই হিসাবের মধ্যে রাখা হইয়াছে, তাই সে সম্বন্ধে পৃথক আমার কিছু বলিবার নাই।

গত বৎসর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবুর স্থানান্তরে গমনহেতু বিয়োগের কথা জানাইয়াছিলাম, আজ আবার আপনাদিগকে জানাইতে আনন্দিত হইতেছি যে তিনি পূর্ব্বে যেমন আমাদেরই ছিলেন, এখনো আবার সেইরূপই হইয়াছেন।

আমি এইবার বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মহাশয়গণের প্রত্যেককেই তাঁহাদের উদ্যম উৎসাহ পরিশ্রম পরামর্শ ও অধ্যাপনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে শুভাগমন করিয়া শিক্ষাপ্রদ ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা অতি কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের সংস্পর্শে আমরা কত উপকার পাইয়াছি বলিতে পারি না। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যাঁহারা আমাদিগকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটিমাত্র কর্ত্তব্য আছে; শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেবের কথা বলিব না, কিন্তু শ্রীযুক্ত মরিস, শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সরদেশ মুখ মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিয়া আমি বিরত হইতে পারি না; তাঁহাদের হৃদয় উদার, ও লক্ষ্য মহৎ। তাঁহারা কেবলমাত্র তাহাদের অনুরাগ বশত বিশ্বভারতীর সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিশ্বভারতীর ইহা অতি শুভলক্ষণ বলিয়া আমার মনে হয়। দেশ দেশান্তরের বিদ্বানেরা যখন এইরূপে আসিয়া সমবেত হইবেন, বিশ্বভারতী যাহা করিতে চায় তখনই তাহা সম্পূর্ণ হইবে।

বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন ৮ই পৌষ ১৩২৭	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ

আশ্রমের বার্ষিক বিবরণ

সন ১৩২৬, ৮ই পৌষ হইতে সন ১৩২৭, ৭ই পৌষ পর্য্যন্ত

আলোচ্য বর্ষে মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আশ্রমের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। হঠাৎ পীড়িত হইয়া তিনি স্থানান্তরে গমন করিলে গত ভাদ্রের ১১ই তারিখে সর্ব্বাধ্যক্ষতার গুরুভার অস্থায়িভাবে আমার উপরে ন্যস্ত করা হয়। সহকর্ম্মী মহাশয় দিগের অনুরোধে ইহা আনন্দেই গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন ভাবি নাই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই অযোগ্য ব্যক্তিকে ইহা বহন করিতে হইবে। অসুস্থতানিবন্ধন ক্ষিতিমোহন বাবু গত আশ্বিনে সর্ব্বাধ্যক্ষতার পদ ত্যাগ করিলে তাহাই ঘটিল। অল্প কয়েক মাস ঐ পদে থাকিলেও, তাহার কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি না। আমার অক্ষমতার জন্য নানা ত্রুটি ঘটিয়াছে, এবং অনেক কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি নাই। আমার মাননীয় সহকর্ম্মীরা সময়োচিত পরামার্শ দিয়া এবং বহুকার্য্যে অযাচিতভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে কোন গতিকে চালাইয়া লইয়াছেন মাত্র। বৎসরের শেষ প্রতিবেদনে আমি সেই বন্ধুগণকে এবং সাহায্যকারীদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গত বৈশাখ মাসের শেষ হইতে পূজনীয় গুরুদেব ও শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ আশ্রমে অনুপস্থিত আছেন। গুরুদেব সম্প্রতি এক পত্রে লিখিয়াছেন—"আশ্রমের ভিতরকার কাজ তোমরা সম্পূর্ণ আপনারা গ্রহণ কর, আমার কাজ বাইরের জগতের সঙ্গে আশ্রমের যোগ স্থাপন করা। শান্তিনিকেতনে য়ুরোপীয় ছাত্রদের

স্থান শীঘ্রই দরকার হবে। শান্তিনিকেতন থেকে দূরে এসে দূরের মানুষকে শান্তিনিকেতনের নিকটের মানুষ করবার এই যে ভার নিয়েচি এ ব্যর্থ হবে না, —কারণ এতে তপস্যা আছে—এই তপস্যার মস্ত তাপ হচ্ছে বিরহের তাপ। আশ্রমের জন্য প্রতিদিনই মন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে—সেই উৎকণ্ঠার দুঃখই আমার পূজার নৈবেদ্য।” গুরুদেবের পত্রের এই অংশটুকু হইতে আশ্রমের ফিরিবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতার কথা আমার বেশ বুঝিতে পারি। অদ্যকার শুভদিনে তিনি অনুপস্থিত। তিনি যে মহা কামনা হৃদয়ে লইয়া আশ্রমের “বিরহ তাপ” সহ্য করিতেছেন, তাহা পূর্ণ হউক—আজ ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি।

গত বৎসর আশ্রম-বালক সুধীরকুমার মিত্র এবং প্রাক্তন ছাত্র সর্ব্বেশ-চন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। সর্ব্বেশ শিশুকাল হইতেই আশ্রমে বর্দ্ধিত। সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেবল কয়েক মাসের জন্য আশ্রম হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। তার পরে এই দুর্ঘটনা। তাহার শান্ত স্বভাব নির্ভীকতা এবং ক্লেশসহিষ্ণুতার কথা আজও আমাদের মনে জাগরূক আছে। সুধীরকুমার কয়েক মাস মাত্র আশ্রমে ছিল। তাহার সৌম্য মূর্ত্তি ও মধুর চরিত্র আশ্রমবাসী সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা

গত বৎসর শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোপাল ঘোষ জগদানন্দ রায় এবং সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। তাহা ছাড়া আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সভার সভ্য ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন বাবু ভাণ্ডার ও পাকশালা, জগদানন্দ বাবু বাগান ও মুদ্রণ বিভাগ, রথীন্দ্রনাথ কারখানা ও পূর্ত্ত, সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাপরিচালনায় এবং গৌরগোপাল ছাত্রপরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই নিজের কর্ত্তব্য সুন্দর-রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বৈশাখের শেষে শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা

করিলে এবং আশ্বিন মাসে ক্ষিতিমোহন বাবু সর্ব্বাধ্যক্ষতার পদ ত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত এনড্রুজ ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় ঐ দুইস্থানে দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কাজ করিয়াছেন।

অধ্যাপক

গত বৎসরের শেষে বৃত্তিভোগী অধ্যাপকের সংখ্যা ২১ জন ছিল। ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত এনড্রুজ, এইচ পি মরিস, গুরুদয়াল মল্লিক, নরসিংভাই পাটেল, ভূদেব বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়াছেন।

গত বৎসরে কয়েক জন পুরাতন অধ্যাপক নানা কারণে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায় এবং প্রমদা-রঞ্জন ঘোষ মহাশয়দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল আশ্রমের সেবা করিয়া তাঁহারা কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইয়াছেন। তা ছাড়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং গুজরাটি শিক্ষক শ্রীযুক্ত মূলজীভাই পাটেল মহাশয় অল্প কয়েক মাস আশ্রমের সেবা করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আজ আমাদের সেই সমস্ত অধ্যাপকের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অধ্যাপকদিগের অবসরগ্রহণে যে সকল স্থান শূন্য হইয়াছিল, শ্রীমান্ বিভূতি-ভূষণ গুপ্ত, সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ নন্দী, ভুবনেশ্বর নাগ এই কয়েকটি আশ্রমেরই প্রাক্তন ছাত্র তাহা পূরণ করিয়াছেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রাক্তন ছাত্রের সংখ্যা এখন ৭ জন। তা ছাড়া অন্যান্য বিভাগে আরো ছয় জন প্রাক্তন ছাত্র নানাভাবে আশ্রমের সেবা করিতেছেন। ইহা একটি শুভ লক্ষণ।

ছাত্র

গত বৎসরের শেষে আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ছিল ১৬২। ইহার মধ্যে আশ্রমের অধ্যাপক প্রভৃতির ১৯ জন বালক এবং ১৮ বালিকা মোট ৩৭ জন বিনাব্যয়ে আশ্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের আহার্য্য-ব্যয় আশ্রমকে দিতে হয় নাই, সুতরাং ১৬২ জনের মধ্য হইতে এই ৩৭ জনকে বাদ দিলে যে ১২৫ অবশিষ্ট

থাকে তাহাই আশ্রমের নিয়মিত ছাত্রের সংখ্যা। ইহাদের মধ্যে সাত জন অবৈতনিক ছাত্র। আশ্রম হইতেই ইহারা বিনাব্যয়ে আহারাদি পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ১৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী যে-যে প্রদেশ হইতে আসিয়াছে তাহার একটি তালিকা দিতেছি—

			ছাত্র	ছাত্রী
গুজরাট্	...	...	১১	২ জন
সিন্ধু	...	...	২	
কচ্ছ	...	...	৪	
বোম্বাই	...	...	৪	
ব্রহ্মদেশ	...	...	২	
সিংহল	...	...	২	
নেপাল	...	...	১	
মহীশূর	...	...	১	
খাসিয়া	...	...	১	
বেহার	...	...	৪	
যুক্তপ্রদেশ	...	...	৩	
জয়পুর রাজ্য	...	...	২	
বঙ্গদেশ	...	...	১০৭	১৬

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে যে সকল ছাত্র ও ছাত্রী আসিয়াছে, তাহারও একটি তালিকা দেওয়া হইল ;—

			ছাত্র	ছাত্রী
কলিকাতা	...	...	১৬	১
ঢাকা	...	...	১৩	২

২৪-পরগণা ...	...	১২	৩
হাওড়া ...	...	৫	২
শ্রীহট্ট ...	...	৭	
মুরসিদাবাদ ...	...	১	
বগুড়া ...	...	১	
নদীয়া ...	...	৭	১
রাজসাহী ...	...	৪	
ত্রিপুরা ...	...	১৩	
যশোহর ...	...	১	
বাঁকুড়া ...	...	৪	
বর্দ্ধমান ...	...	৩	
বীরভূম ...	...	৩	৩
বরিশাল ...	...	৬	৪
ফরিদপুর ...	...	১	
হুগলী ...	...	৩	
দিনাজপুর ...	...	১	
মালদহ ...	...	৩	
ময়মানসিংহ	...	২	

সঙ্গীত

শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত শিক্ষাদানের কাজ সুন্দর-ভাবে চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অক্লান্তভাবে গুরুদেবের গান এবং এস্রাজ শিক্ষা দিয়াছেন। আশ্রমের আনন্দের একটা প্রধান দিক্ ইঁহাদের দ্বারাই সুরক্ষিত হইয়াছিল। তা'ছাড়া শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর গোস্বামী

মহাশয়, শ্রীমান্ অনাদিকুমার দস্তিদার এবং শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন মহাশয়গণ অতি যত্নে বালকবালিকাগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন। মৃদঙ্গ, তবলা প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রের শিক্ষাদান-কার্য্যও বেশ চলিয়াছিল।

বীণাচার্য্য শ্রীযুক্ত সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় গত বৎসর আশ্রমে থাকিয়া বীণা শিক্ষা দিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত চৈত্র মাসের পর তিনি আর আশ্রমে আসিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় পিঠাপুরম্ নামক স্থানে ঐ বীণাচার্য্যের নিকটে স্বয়ং গিয়া পাঠ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আশ্রমে বীণারও চর্চ্চা চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বাহাদুরের প্রেরিত বুদ্ধিমন্ত সিংহের পরিচালনায় গত মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আশ্রম-বালকেরা মৃদঙ্গের তালের সঙ্গে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটির পর হইতে ইহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল।

চিত্র

আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান চিত্রকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় আশ্রমের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিয়াছেন। তা'ছাড়া বিখ্যাত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়েরাও গত বৎসর নিয়মিতভাবে চিত্রবিভাগের পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় চিত্রবিভাগ সুন্দররূপে চলিয়াছিল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন চিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

অতিথি

গত বৎসরে অনেক বিশিষ্ট অতিথি আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডাক্তার তাবাপুরওয়ালা, বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লেদার সাহেব ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মহম্মদ্ শহিদুল্লাহ, মহাত্মা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মাহাত্মা গান্ধী কয়েকদিন সপরিবারে আশ্রমে অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। তা'ছাড়া মোওলানা সওকতআলি মহাশয়ও আশ্রমে আসিয়া-

ছিলেন। বরোদা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শিক্ষাসংস্কারক মোতিভাই আমিন, করাচির অন্যতম প্রধান সওদাগর আধ্বানি মহাশয়, রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয় এবং মিস্ পিটারসন্ প্রভৃতি অনেক য়ুরোপীয় ও মর্কিন পুরুষ ও মহিলাকে আমরা অতিথি-রূপে পাইয়াছিলাম। তা'ছাড়া বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর এবং জেলা মেজিষ্ট্রেট্ সাহেব আশ্রমে আসিয়াছিলেন।

গত বৎসরে পাকশালা হইতে ২৬০৬ বেলা অতিথিরা আহার পাইয়াছেন। অর্থাৎ গত ১২ মাসে ১৩০৩ জন অতিথি এক দিনের জন্য বিনাব্যয়ে আহারাদি করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৪ জন অতিথি ছিলেন। ইহাতে গত বৎসর ৪৯৭।৵৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তা'ছাড়া দেশীয় এবং বিদেশীয় বিশিষ্ট অতিথি-দিগের আহার্য্য-ব্যবস্থায় এবং অতিথিশালার ভৃত্যদের বেতনে আরো ৪২৩।৵৯ টাকা খরচ হইয়াছে। সুতরাং গত বৎসর কেবল আতিথ্য-বিভাগে ব্যয়ের পরিমাণ ৯২১৵০ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দানসাহায্য

গত বৎসর আমরা যাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দানসাহায্য পাইয়াছি সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি :—

শ্রীযুক্ত মভলঙ্কার (আমেদাবাদ) ... ১২৫০৲

" জাহাঙ্গীর পেটিট্ (বোম্বাই) ... ১৫০০৲

শ্রীমতী বাসুমতী সেন

ধীমন্তরাও পণ্ডিত (আমেদাবাদ) ... ২১০০৲

শ্রীযুক্ত আবদুল্ রসুল্ (বোম্বাই) ... ১০০০৲

" কেশবজীলালজী (গুজ্‌রাট্) ... ৫০০৲

" শিবপ্রসাদ গুপ্ত (কাশী) ... ৫০০৲

" জে, দাভে (সুরাট্) ... ৫০০৲

" সুরাজ্ মল্ নাগুমল্ ... ২৫০৲

" কিকুভাই দেশাই (সুরাট)	...	২৫২৲
" আনন্দজী (পঞ্জাব)	...	১০০৲
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	...	৫০৲
শ্রীযুক্ত ষ্টোকস্	...	৫০৲
" জি, এম, যক্সি	...	৫২৲
" ডাক্তার রাওজি (সুরাট)	...	১০০০৲
" সয়েদ্ হোসেন ইমাম্	...	৫০০৲
" রামদেব চক্সি	...	১০০৲
সুরাট শিশুমণ্ডলী	...	৫১৲

তা'ছাড়া শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সিন্ধু প্রদেশ, বোম্বাই, আমেদাবাদ্, নদীয়াদ্ প্রভৃতি স্থান হইতে খুচরা দানে ৬৪১০৲ টাকা আশ্রমকে দিয়াছেন এবং কয়েকজন দাতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মোট ১২০৲ টাকা আশ্রমে পাঠাইয়াছেন। আজ সমস্ত দাতৃ-বর্গকে আশ্রমের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গুরুদেবের পুস্তক বিক্রয়াদি হইতে, নোবেল প্রাইজের সুদ হইতে ১১,১৫৭ টাকা পওয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া তিনি গত বৎসরে ৮৭৯৭৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আমরা ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে প্রতি বৎসর একহাজার টাকা দানসাহায্য পাইয়া আসিতেছি। গত বৎসরেও তাহা পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর দেব মাণিক্য বাহাদুরের এই দাক্ষিণ্যে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

সমগ্র দানের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় আমরা গত বৎসরে ২৪,৮৫২৷০ টাকা সাহায্য পাইয়াছি।

গুরুদেব বিদেশে গমন করিলে আশ্রমের বন্ধু শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ মহাশয় যে রকম অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিঃস্বার্থভাবে নানা দিকে সাহায্য করিয়াছেন তাহা আজ

বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জীবন আশ্রমের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া আছে যে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিলে তাহা আমাদের নিজের লোকের মুখে নিতান্ত অশোভন হইবে মনে করি।

কৃষি

শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এবং সন্তোষকুমার মিত্র সুরুলের কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ভাল ধানের জমি ১২ বিঘা আবাদ হইয়াছিল। তা ছাড়া সুরুল ডাঙার পশ্চিম মাঠে ৭ বিঘা নূতন জমির আবাদ ছিল। মোট ১৯ বিঘায় গত বৎসরে ৭৩ মণ ধান এবং ৫৸৹ কাহন খড় পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত বাজার দরে ঐ খড় ও ধানের মূল্য ৩১০৲ টাকা আন্দাজ হয়। তা'ছাড়া তরকারি গুড় ইত্যাদিতে ১৯৭৲ টাকা এবং সুরুলের খেজুর গাছ হইতে গত দুই মাসে যে গুড় হইয়াছে তাহার মূল্য আনুমানিক ৫০৲ আমরা পাইয়াছি। সুতরাং সুরুলের কৃষি হইতে মোট ৫৫৭৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত কিছু চানা বাদাম, অরহর, আখ এবং আলু পাওয়া যাইবে। ইহার মূল্য অনুমান করা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু গত বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ২২২৯৲। ইহার মধ্যে কিছু টাকা নূতন জমি কৃষিযোগ্য করিতে, সুরুলের বাড়ীর ভিতরকার জমির জঙ্গল কাটিতে, এবং লেবু গাছ পুঁতিতে ব্যয় হইয়াছে। তা'ছাড়া সাবরের কৃষি ক্ষেত্র দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগকের যাওয়া-আসার খরচ এবং ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থানাদির সংস্কারের খরচ উক্ত ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

আশ্রমের কৃষি ও উদ্যান

তালতড়ীর রাস্তার পার্শ্বে আশ্রমের নিকটে ১৫ বিঘা নূতন জমি গতপূর্ব্ব বৎসর হইতে ভাঙা হইতেছে। তন্মধ্যে গত বৎসরে কেবল ৪ বিঘা মাত্র জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছিল। তা' ছাড়া আশ্রমের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে ৪ বিঘা ভাল জমি ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতেও ধানের আবাদ হইয়াছিল। এই মোট আট

বিঘা জমি হইতে ত্রিশ মণ আন্দাজ ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান আনুমাণিক মূল্য এক শত টাকা হইবে।

আশ্রমের পূর্ব্বদিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে যে বৃহৎ নেবু বাগান হইয়াছে, তাহার কার্য্য চলিতেছে, এবং এই বাগানের পূর্ব্ব গায়ে কাঁটালের বাগান পত্তন করা হইয়াছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে কাঁটালের চারাগুলির বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া আশ্রমের ভিতরে এবং আশ্রমের নিকটবর্ত্তী সদর রাস্তার ধারে অনেক নূতন গাছ রোপণ করা হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে গত বৎসরে মোট ১১৭৯৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আশ্রম সংলগ্ন সব্‌জি বাগান হইতে গত বৎসর ১৭২৲ টাকার ফসল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু খরচ হইয়াছে ৩৮১৲ টাকা। বেগুন টমাটো প্রভৃতি সব্‌জি বাগান হইতে এখনো পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু অন্য বৎসরের তুলনায় ফসলের পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইয়াছে।

স্কুলের গোশালা

স্কুলের গোশালা হইতে গত বৎসরে ১০৩৯ টাকার দুগ্ধ ঘৃতাদি এবং আনুমাণিক ৫০৲ মূল্যের সার পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং গোশালার আয় মোট ১০৮৯৲ টাকা মাত্র। কিন্তু খরচ হইয়াছে মোট ২১৪০৲ টাকা। ইহার মধ্যে আনুমানিক ৫০০৲ টাকা নূতন গোশালা-নির্ম্মাণে ব্যয় হইয়াছে।

আশ্রম পুস্তকালয়

গত বৎসর আশ্রম পুস্তকালয়ে ২১২৩ খানি নূতন পুস্তক আসিয়াছে। এখন মোট পুস্তক সংখ্যা দশ হাজারের উপর। ইংরাজি, ফরাসী, হিন্দী, গুজরাটি মারহাটি প্রভৃতি ভাষায় পরিচালিত প্রায় ৯০ খানি সাময়িক পত্র পুস্তকালয়ে আসিয়া থাকে। যে সকল পুস্তক বাঁধানো ছিল না গত ১২ মাস ধরিয়া সেগুলি ভাল করিয়া বাঁধানো হইয়াছে। গত বৎসরে কেবল লাইব্রেরীতে ২৪১৫৸৶০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

মহীশূর, হায়দারাবাদ, কোচিন, বরোদা এবং ত্রিবাঙ্কুর দরবার হইতে আমরা অনেক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার-স্বরূপে পাইয়াছি। স্বর্গীয় রাজবল্লভ মিত্র, প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস্, ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয়, ডাক্তার তারাপুরওয়ালা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। তা ছাড়া বহু গ্রন্থকার তাঁহাদের পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র আমাদের লাইব্রেরীতে পাঠাইয়াছেন। আজ এই সকল উপহারদাতাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং রোহিনী বাবু লাইব্রেরীর পুস্তকাদির শ্রেণীবিভাগ অতি যত্নের সহিত করিয়াছেন।

হাঁসপাতাল

গত বৎসরে আশ্রম হাঁসপাতালে মোট ৪০২২ জন রোগী ঔষধ পাইয়াছে। কেবল আশ্রমের বালক অধ্যাপক ভৃত্যাদি লইয়া এই সংখ্যা নয়, আশ্রমের বাহিরের অনেক রোগী ঔষধাদি গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ১১ জন রোগী হাঁসপাতালে আসিয়াছিল। গত ১২ মাসের মধ্যে আশ্বিন মাসে ৭০৬ জন রোগী ছিল, ইহাই রোগীর সর্ব্বোচ্চ মাসিক সংখ্যা। খোস ছাড়া পান বসন্ত বা অন্য কোনো সংক্রামক ব্যাধি আশ্রমে দেখা দেয় নাই। রোগের মধ্যে জ্বরই বেশি ছিল।

গত পৌষ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় আশ্রমে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন বাবু সময়ে সময়ে হোমিওপাথি মতে চিকিৎসা করিয়াছেন। গত আশ্বিন মাসের শেষ হইতে সিন্ধুদেশনিবাসী পরম উৎসাহী ডাক্তার চিমনলাল আশ্রমে চিকিৎসা করিতেছেন। আশ্রমের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। তাঁহার আগমনে চিকিৎসা-বিভাগের অনেক ত্রুটির ক্রমে সংশোধন হইতেছে।

হাঁসপাতালের কমপাউণ্ডার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার রায় মহাশয় গত বৎসরে অতি যত্ন পুর্ব্বক হাঁসপাতালের রোগীদের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্য্যা করিয়াছেন।

নূতন হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য আমরা গত পূর্ব্ব বৎসরে ৫০০০ টাকা দান পাইয়াছিলাম। পূজনীয় গুরুদেব ও শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা করায় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার সুবিধা হয় নাই। কিন্তু হাঁসপাতালের প্ল্যান প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার জন্য যে সকল দরজা জানালার প্রয়োজন তাহার কিয়দংশ প্রস্তুত হইয়া আছে।

গত বৎসরে হাঁসপাতাল বিভাগে মোট ২৬৮৪৶ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং প্রতি ছাত্রের নির্দ্দিষ্ট বেতন হইতে মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে সাহায্য গ্রহণ করায়১৪০৬৷৹ টাকা হিসাবে জমা হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা

গত বৈশাখ হইতে এই পত্রিকা বর্দ্ধিতায়তনে বর্ষিক ২৷৷৹ টাকা মূল্যে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও জগদানন্দ রায় মহাশয়দ্বয় কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল গবেষণা করিতেছেন তাহার অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে প্রকাশিত হইতেছে। তা ছাড়া বিশ্বভারতীর এবং আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণও ইহাতে লিখিতেছেন। গত অগ্রহায়ণ মাসের শেষে গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৩২০।

গত বৎসরের প্রথম ছয় মাসে পত্রিকার হিসাবে ৮৫৬৲ টাকা জমা এবং ৯৩৪৲ টাকা খরচ হইয়াছে। পত্রিকার বৎসর শেষ হইতে ছয় মাস বাকি এই সময়ের মধ্যে আমরা নূতন গ্রাহক অধিক আশা করিতে পারি না অথচ প্রতিমাসে অন্ততঃ ১২৫ টাকা হিসাবে খরচ করিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে শান্তিনিকতন পত্রিকার জন্য ছয় সাত শত টাকা লোকসান দিতে হইবে।

ছাপাখানা

ছাপাখানা আশ্রমের অন্তর্গত না হইলেও, ইহার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইতেছে। গত বৈশাখ মাস হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত আট মাসে ২০৩০৶ ব্যয় হইয়াছে। জমার হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ২২৪৯৲ টাকা জমা আছে, তা ছাড়া ৬০০৲ টাকা আমানত হিসাবে জমা রহিয়াছে। এই ছয় শত টাকা পরি

শোধ করিতে হইবে। কিন্তু গত আট মাসে যে পুস্তকাদি ছাপা হইয়াছে তাহার বিল সম্পূর্ণ আদায় হয় নাই। আদায় হইলে ১১৩৫৸৵০ টাকা আদায়ের হিসাবে জমা হইবে। সুতরাং ছাপাখানার আয় ব্যয় এপর্য্যন্ত প্রায় সমানই আছে বলিতে হয়।

গত আট মাসে ঘরে-বাইরে, নানাচিন্তা, কাব্যমালা, প্রবন্ধমালা, দুনিয়ার দেনা এবং শান্তিনিকিকেতন পত্রিকার আট সংখ্যা ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকখানি পুস্তিকা জমিদারী সেরেস্তার ফারম্ ইত্যাদি অনেক খুচরা কাজ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ও সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের তত্ত্বাবধানে ছাপাখানার কাজ চলিয়াছিল।

পূর্ত্ত বিভাগ

গত বৎসরে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়গণ এই বিভাগ পরিচালনা করিয়াছিলেন। মোট ১৫৩০৭৷৴৩ টাকা এই বিভাগ হইতে ব্যয় হইয়াছে। মধ্য হইতে নূতন পাকা ছাত্রাবাস নির্ম্মাণে ১২৩১৬৶৩, নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কারে ১৪৪৷৴১০, তিনটি নূতন ইন্দারা প্রস্তুতে ১৬২৫৴৯, ঘর মেরামতে ১২২১৷৷৶৯ ব্যয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা করিলে একক সুরেন্দ্র বাবু বহুশ্রমে এই বিভাগ সুচারুরূপে পরিচালন করিয়াছিলেন।

ছাত্রচালনা

বিশেষ দক্ষতার সহিত গত বৎসরে শ্রীমান্ গৌরগোপাল ঘোষ ছাত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। আশ্রম-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীমান্ সাধকচন্দ্র নন্দী এবং অনাদিকুমার দস্তিদার উভয়েই ছাত্রপরিচালনার বিশেষ সহায্য করিয়াছেন। ছাত্রদের ব্যবহারে মোটের উপরে কোনো ত্রুটি ছিল না। তাহারা নিজেরাই নিজেদের চালনা করিয়াছে—কোনো অধ্যাপককে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ

করিতে হয় নাই। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র, গিরিজাভূষণ, প্রফুল্ল, লালমোহন, মন্মথ, প্রদ্যুন্ন ও বিভাস কৃতিত্বের সহিত অধিনায়কতা করিয়াছেন।

শিশুসাহিত্য সভা, বড় সাহিত্য সভা অমবস্থা পূর্ণিমা সম্মিলন প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিল। কিন্তু বালকদিগের হস্তলিখিত মাসিক পত্রগুলি নিয়মিতভাবে চলে নাই।

ক্রীড়াদি ভালই চলিয়াছিল। সি, এম, এস্, বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্, Y. M. C. A. এর ছাত্রেরা আশ্রমে আসিয়া আমাদের বালকদিগের সহিত ম্যাচ্ খেলিয়াছিলেন—অধিকাংশ খেলাতে আশ্রম বালকগণ জয়লাভ করিয়াছিল।

ছাত্রদের সাঁওতাল বিদ্যালয় ও প্রসাদ বিদ্যালয়ও ভাল চলিয়াছিল। ছয় জন ছাত্র প্রতিদিন অপরাহ্নে সাঁওতাল বিদ্যালয়ে পড়াইতে গিয়াছে এবং প্রসাদ বিদ্যালয়ে একজন করিয়া গিয়াছে। শেষোক্ত বিদ্যালয়ে একজন বেতনভোগী শিক্ষক আছেন, এজন্য অধিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই।

আয়ব্যয়

গতবৎসরে ছাত্র বেতনে ৩০,১৬৯৲, প্রবেশিকায় ১৮২৯৲ নোবেল প্রাইজের সুদে ৭,১৭৭৸৴১ পুস্তক বিক্রয়ে ৩, ৯৭৮৴৬, শান্তিনিকেতনের বৃত্তিতে ২৪০০, বিবিধদানে ২৪,৮৫২৷০, ইহা ছাড়া খোরাকী আদায়ে ১৯৬৬৲, বাগিচা কৃষি ইত্যাদির আয়ও আছে। সুতরাং মোট আয়ের পরিমাণ ১১৬,৪৮৮৷৴৩ হয়, তা'ছাড়া সমবায় ভাণ্ডার ইত্যাদির জমাখরচী টাকা ১৪,৩৯৬৷৷৩ পাই টাকা বিদ্যালয়ের, তহবিলে ১০৪৭৯৶২ পাই টাকা জমা ছিল। ইহাতে মোট জমার পরিমাণ ১০৩৯৮৪৸৴৬ পাই হয়।

ব্যয়ের হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—অধ্যাপক মহশয়দের বৃত্তিতে ১৭৮৬৩৲, আহার্য্য খাতে পাকশালা বিভাগের বেতনাদি সহ ৩০৪৬০৷৷৴৯, ছাত্রাবাস খাতে ভৃত্যগণের বেতন ইত্যাদিতে ৩৬৬০৷৴০, অতিথিবিভাগে ৯২১৶০, পূর্ত্তবিভাগে ১৫,৩০৭৷৴৩ পাই, সুরুলও গোশালায় ২৯৫০৲, লেবুবাগানে ও সুরুল প্রভৃতির চাষে ৩,৮০০৲, চিকিৎসায় ২৬৮৪৴০, লাইব্রেরীতে ৪,৪১৫৲, নূতন জমি ও সম্পত্তি

খরিদে ১১৮৪৲, ষ্টেট্ খাতে ৩০৫৲, ধার শোধ ৭৭০৲ টাকা, বিবিধখাতে ৭৫০৲ টাকা খরচ হইয়াছে, সুতরাং মোট খরচের পরিমাণ ৮১,২০৯।৵৩ হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্ব্বোক্ত জমাখরচ হইতে বৎসরের শেষে ২২,৭৭৫।৶৩ পাই মজুত থাকে। এই টাকার অধিকাংশই কারখানা, ছাপাখানা, অধ্যাপকদিগের গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতিতে ধারস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, কার্য্যসমাপনান্তে বিল দাখিল করিলে এই ধার উক্ত বিভাগ সকল পরিশোধ করিবে।

পাকশালা

গত বৎসরে পৌষ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত শ্রীমান গোবিন্দ চন্দ্র চৌধুরী পাকশালার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, বৎসরের অবশিষ্ট কালে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর নাগ মহাশয় তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। কর্ম্ম সুশৃঙ্খলায় চলিয়াছিল।

গত বৎসর পাকশালা বিভাগে মোট যে ৩০৪৬০॥৶৯ টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার মধ্যে ১৮০১০।৩ পাই সাধারণ আহার খরচে, ৪৫৬৯॥৵৬ জলখাবারে খরচ হইয়াছে।

গত বৎসরে বালকদিগের জন্য গড়ে মাসিক ৪৫মণ করিয়া দুগ্ধ পাওয়া গিয়াছে। নিতান্ত শিশুদিগকে কিছু অধিক দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ত্রিশজন শিশু ছাত্র শ্রীমতী কমলা দেবীর তত্ত্বাবধানে পৃথকভাবে দুই বেলা আহার করিয়াছিল। তিনি আশ্রম-শিশুদের জন্যে যে যত্ন করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীজগদানন্দ রায়

আশ্রমসংবাদ

শান্তিনিকেতন আশ্রমের একোনত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব

৭ই পৌষের উৎসব এ বৎসরও সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৭ই পৌষে মহর্ষিদেব ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত শান্তিনিকেতন আশ্রম উৎসর্গ করেন সেই সময়ে প্রতিবৎসর একটি মেলার ব্যবস্থা করিবার ভার ট্রষ্টীগণের উপরি ন্যস্ত করিয়া দিয়া যান। সাধক ভক্তগণ যেমন আশ্রমে বাস করিয়া নির্জ্জনে সাধনা করিবার সুবিধা উপভোগ করিবেন, তেমনি স্থানীয় সাধারণ লোকেরা বৎসরান্তে একবার মিলিত হইয়া আমোদপ্রমোদ করিবে, এই দুই ইচ্ছা মহর্ষিদেবের মনে ছিল। এবৎসরে মেলায় দোকান-পাট সুশৃঙ্খলার সহিত বসাইবার জন্য আগে হইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাত্রা, গান, ও আতস-বাজি ছিল। তা ছাড়া সাঁওতালের নাচ, তীর দিয়া লক্ষ্যভেদ প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর ও চিত্র-বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ মেলার মধ্যেই একটি চিত্রপ্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। ছাত্রদের অঙ্কিত অনেক ছবি বিক্রীত হইয়াছিল। আশ্রমের ছাত্রদিগকে লইয়া চরখায় সূতা কাটা দেখাইবার জন্য আশ্রমের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত চিমনলাল মহাশয় বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। আশ্রমের সমবায়ভাণ্ডার হইতে মেলাস্থানে একটি দোকান খোলা হইয়াছিল। কেনা-বেচা হইয়াছিল অনেক।

ঐ দিবস প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে আশ্রম-বৈতালিকগণ আশ্রম

প্রদক্ষিণ করিয়া "দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধপ্রীতি" ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতটি গান করিয়া সুপ্ত আশ্রমবাসীকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছিল। মন্দিরের স্থায়ী গায়ক শ্রীশ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েকজন কীর্ত্তনিয়ার সহিত চারিদিক ঘুরিয়া কীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন। প্রাতে মন্দিরের ঘণ্টা বাজিলে ও সকলে সমবেত হইলে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী "স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে" ইত্যাদি গান করেন। গানের পর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উদ্বোধন করিয়া তাঁহার উপদেশ পাঠ করেন, তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। আশ্রমের বালকেরা মন্দিরে ৭টি গান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মন্দিরে উপাসনা করেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একোনবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ তারিখে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবার ইহার উনিশ বৎসর পূর্ণ হইল। ৭ই পৌষ তারিখে আর একটি উৎসব আছে বলিয়া বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক উৎসব তাহার পর দিবস ৮ই পৌষ করা হয়।

এবার বেনারস হিন্দু-বশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক: শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সভার অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় বিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদন পাঠ করেন, তাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বভারতীর প্রতিবেদন পাঠ করিয়া ইহার উদ্দেশ্য অতি সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন। ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিবেদন করেন যে, আশ্রমের আদর্শ বাহিরেও প্রচার ও বিস্তার করার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বিদ্যালয়ের মূলগত আদর্শ এবং গুরুদেবের প্রচারিত আদর্শ যে কি, তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম আমরা প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিব। সভা প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী হইয়াছিল কিন্তু সমস্ত কার্য্যই এমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে; কেহই ক্লান্তি বোধ করেন নাই।

মধ্যাহ্নের পর বালকদিগের ক্রীড়াপ্রদর্শনী যথারীতি হইয়াছিল। আগত প্রাক্তন ছাত্রগণের মধ্যে কেহ-কেহ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান ছাত্রদিগের নিকটে পারিয়া উঠেন নাই।

সন্ধ্যায় সকলের বিনোদনের জন্য "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনীত হইয়াছিল। দিনু বাবু বৈকুণ্ঠের অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। কেদার, অবিনাশ, তিনকড়ি ও ঈশানের ভূমিকা যথাক্রমে অনিলকুমার মিত্র, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশি ও সরোজরঞ্জন চৌধুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৯ই পৌষ পরলোকগত আশ্রমবাসীদিগের স্মরণার্থে সভা হয়। সেই সভায় শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় সভাপতি হইয়াছিলেন। ঐ দিন বৈকালে প্রাক্তন ছাত্রদিগের সহিত বর্ত্তমান ছাত্রগণ ফুটবল খেলিয়াছিলেন; খেলায় কোনো পক্ষই জয়লাভ করিতে পারেন নাই। সন্ধ্যায় "বৈকুণ্ঠের খাতা" পুনরায় অভিনীত হইয়াছিল। প্রাক্তনছাত্রগণ তাহাদিগের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে টাকা তুলিবার জন্য এ দিন অভিনয় দেখার টিকিট করিয়াছিলেন। তাহার মূল্য দুই আনার বেশি ছিল না, তবে অনেকে স্বেচ্ছাক্রমে বেশি দিয়াছিলেন। টিকিট বিক্রয় করিয়া ৩৫৸৴৹ আদায় হইয়াছিল, তাহা ঐ তহবিলে জমা দেওয়া হইয়াছে।

১০ই পৌষ খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব মন্দিরে এই মহাত্মার সম্বন্ধে কিছু-কিছু বলিয়াছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় আশ্রমসন্মিলনীর এক-বিশেষ অধিবেশন হয়; অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রধানত প্রাক্তন ছাত্রগণের সহিত বর্ত্তমান ছাত্রদিগের আলাপপরিচয় এবং আশ্রমের ভাল মন্দ অবস্থা লইয়া আলোচনা হয়। এবার প্রাক্তন ছাত্রদের সংখ্যা বেশী হয় নাই; প্রায় ২৫ জন মাত্র আসিয়াছিলেন। অন্যান্য বার অপেক্ষা এবার প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রগণ পরস্পর আলাপ-পরিচয়ের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন।

১৩ই পৌষ কলিকাতার Y. M. C. A. College Branch এর ক্রিকেট-খেলোয়াড়গণ আশ্রম দেখিতে ও খেলিতে আসিয়াছিলেন। খেলায় তাঁহারা জয়লাভ

করেন। আশ্রমে ফুটবল যেরূপ আদৃত হইয়াছে, ক্রিকেট সেরূপ হয় নাই।

১৪ই পৌষ হইতে ২১পৌষ পর্য্যন্ত সাতদিন পর্য্যটনের জন্য ছুটি ছিল। ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের সহিত কয়েকটি দল করিয়া কেহ কেহ দূরে, কেহ কেহ বা নিকটে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন কেঁদুলীতে জয়দেবের মেলা উপলক্ষেও কেহ কেহ গিয়াছিলেন।

বৎসরের প্রারম্ভে অনেক নূতন ছাত্র আসিতেছে। ইহার মধ্যে একটি খ্রীষ্টান ও একটি মুসলমান বালক ভর্ত্তি হইয়াছে।

অতিথি সমাগমের বিরাম নাই। গুজরাট ও মান্দ্রাজ হইতে অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন।

আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ার এক বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুক্ সাহেব তাঁহার পিতা ও ভগিনীর সহিত আশ্রমে আসিয়া প্রায় বিশ দিন বাস করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কএকটি বর্গকে ইঁহারা কয়েকদিন পড়াইয়াছিলেন কুক্ সাহেব যে বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন সেই বিদ্যালয়ের নিয়ম এই যে সাত বছর কাজ করিবার পর এক বছর ছুটি পাওয়া যায়। এই সময়টা শিক্ষকগণ কোনো বিশেষ বিদ্যালয়ে বিশেষ কোনো জ্ঞান আহরণে কিংবা দেশ পর্য্যটনে ব্যয় করিতে পারেন, অন্য কর্ম্মে নয়। ইনি দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। জাপান ও চীনে কয়েকমাস কাটাইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ইঁহারা কয়েকটি বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহারা আশ্রমের সব দেখিয়া শুনিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন।

"To the Nation" পুস্তক-রচয়িতা (এই বইয়ের ভূমিকা গুরুদেব লিখিয়া দিয়াছেন) চিন্তাশীল ভাবুক ও সাধক পল রিশার্ড (Paul Richard) কয়েকদিন হইল আশ্রমে আসিয়াছেন। ইনি ফ্রান্সদেশীয়, পণ্ডিচেরি ও চন্দননগর ইঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। ইনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আশ্রম (International Asram) প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যস্ত আছেন। এখানেকিছুদিন থাকিবার

ইচ্ছা আছে। ইঁহার সাহায্য পাইয়া ফ্রেঞ্চ শ্রেণীগুলি বিশেষ লাভবান্ হইতেছে।

গুরুদেবের খবর

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে গুরুদেব পিয়ার্সন্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা গিয়াছেন। League of Political Education নামক একটি সম্মিলনীর আমন্ত্রণে নিয়ুইয়র্কে তাঁহার তিনটি বক্তৃতা দিবার কথা আছে। ঐ সহরে পঁহুছিবার পর হইতে তথাকার Quaker সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। যতদিন নিয়ুইয়র্কে ছিলেন প্রতি রবিবারে তাঁহাদের উপাসনা স্থানে গমন করিতেন। ঐ বিষয়ে গুরুদেব লিখিয়াছেন :—

A friend of mine, who is taking active interest in my cause, is a Quaker and he takes me every sunday morning to Quakers' meetings ; there in the silence of meditation I am able to find the eternal perspective of truth where vision of external success dwindles away its infinitesimal minuteness. What is needed of me is sacrifice. Our payment is for success, our sucrifice is for truth. If the spirit of my sacrifice is pure in the quality then its reward will be more than can be counted and proved. And let my gift to my country and to the world be my life of sacrifice and not dollars. But my earnest request to you is to keep your minds high above politics. The problem of this new age is to help to build the world anew. Let us accept that great task. Shantiniketan is to make accommodation for the workers from all parts of the world. All other works

can wait.—We must make room for Man, the Guest of the age, and let not the nation obsturct His path. I am afraid lest the cry of our own sufferings and humiliation should drown the announcement of His coming. For His sake we shall set aside our grievances and shall say that whatever may happen to us let His cause triumph, for the future is His.

১০ই নবেম্বর ব্রুক্লীন সহরে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আগ্রহের সহিত একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিল।

১২ই নবেম্বর তিনি ফিলাডেলফিয়ার নিকট ব্রীনমার সহরে মহিলাদিগের কলেজে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি The Village Mystics of Bengal শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন।

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা প্রতি-বৎসর বিশেষ উৎসাহ এবং আগ্রহের সহিত সম্পন্ন হয়। গত ১৩ই নবেম্বর প্রিন্সটন ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেইরূপ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। তদ্দর্শনার্থে ৫০০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। গুরুদেব সেইদিন প্রিন্সটনে থাকায় তিনিও ঐ খেলা দেখিতে গিয়াছিলেন।

১৬ই নবেম্বর গুরুদেব নিয়ুইয়র্ক সহরে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। বলা-বাহুল্য তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকারণ্য হইয়াছিল এবং আগ্রহের সহিত সকলে প্রবন্ধ শুনিয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হওয়ামাত্র দলে দলে শ্রোতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

ইতি মধ্যে একদিন তিনি নিয়ুইয়র্ক সহরের City College এ গিয়াছিলেন। সেখানে ২০০০ ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে শতকরা ৭০ জন সন্ধ্যায় এবং ছুটির সময়ে নানাপ্রকারের কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের ভরণ পোষণ করে। তাহাদিগের সাপ্তাহিক সম্মিলনীতে গুরুদেব

উপস্থিত হইয়া প্রায় ৪০ মিনিট কাল তাহাদিগকে কিছু বলিয়াছিলেন। দুই সহস্র আমেরিকীয় যুবক স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধা এবং আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিয়াছিল।

সেইদিন বিকালে তিনি আর একটি ছোট বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন। সেখানে ৫০টি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। তাহাদিগের নিকট তিনি The Crescent Moon (শিশু) হইতে কয়েকটি কবিতা পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের কথা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগের নিকট আমাদের এখানকার নানা ঋতুর নানা উৎসবের কথা, ঝড় জলের মধ্যে মনের আনন্দে ভ্রমণের কথা প্রভৃতি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার এই সব কথা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়াছিল।

মহিলাদিগের Wellesley College এ তিনি একদিন গমন করিয়াছিলেন যে সকলছাত্রী তাঁহার রচিত:The King of the Dark Chamber (রাজা) পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়িতে ছিল তাহাদিগকে তিনি সেই সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। তৎপরে প্রায় চারিশত বালিকার নিকট Crescent Moon ও Gitanjali হইতে কতকগুলি ইংরেজি কবিতা, বাংলা কবিতা, ও সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা করিয়াছিলেন কিন্তু, তাহার বিশদ বিবরণ না পাওয়ায় কিছু প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

বিসর্জ্জন ও ডাকঘর অভিনয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই সব অভিনয়ে বিনা পয়সায় ভূমিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন
পত্রিকাবিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadanand Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩২৭ সাল

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"শান্তিনিকেতন" পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হয় বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্রষ্টব্য

কলিকাতায় নং ২০বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এণ্ড কোম্পানীতে খুচরা "শান্তিনিকেতন" নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁহারা ঐ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
(পত্রিকাবিভাগ)

৺

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা — মাঘ, ১৩২৭ সাল

বৌদ্ধদর্শন

আত্মতত্ত্ব

[শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার একখানি অতিপ্রসিদ্ধ ও উপাদেয় গ্রন্থ। প্রজ্ঞাকরমতির লিখিত বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকা নামে ইহার একখানি উৎকৃষ্ট টীকা আছে। Louis De La Vallee Poussin সাহেব এই উভয়ই গ্রন্থ একত্র প্রকাশ করিয়াছেন (Asiatic Society of Bengal)। বোধিচর্য্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদে (৫৮শ কারিকা হইতে) বিশেষভাবে আত্মার খণ্ডন করা হইয়াছে। আজ নিম্নে তাহা হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে, বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকা হইতেও কতক উদ্ধৃত হইবে।

আলোচ্য বিষয়টি সেখানে এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে—বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে শূন্যতা ভাবনা করা আবশ্যক। কিন্তু শূন্যতার কথায় চিত্তে ভয়ের উদ্রেক হওয়ায় লোকে তাহা করিতে পারে না। ইহারই উত্তরে আচার্য্য শান্তিদেব বলিতেছেন (৯.৫৬)—"যাহাতে দুঃখ হয় তাহা হইতে ভয় উৎপন্ন হউক, কিন্তু শূন্যতা যখন দুঃখকে শান্তই করিয়া থাকে, তখন তাহা হইতে ভয় হয়

কেন?" যাহারা অ-তত্ত্ববিদ্ তাহারা আত্মাকে কল্পনা করায় 'অহম্' 'আমি' এই অহঙ্কার হইতেই তো তাহাদের ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা যখন কাল্পনিক, এবং সেইজন্যই অসৎ, তখন অহঙ্কার বা 'অহং'-বুদ্ধিরও বস্তুত কোনো আশ্রয় বা বিষয় নাই। তাহা না থাকায় ভয়ও হইতে পারে না। ইহাই আচার্য্য দেখাইতেছেন—]

৫৭

যাহা-তাহা হইতে ভয় হয় হউক,— যদি 'আমি' বলিয়া একটা কিছু থাকে, কিন্তু যদি 'আমিই' নাই, তখন ভয় হইবে কাহার?

অন্যত্রও ইহাই উক্ত হইয়াছে—

"'আমি নাই,' 'আমি থাকিব না,' 'আমার কিছু থাকিবে না'—এ ভয় বালকের, মূর্খের হয়, কিন্তু পণ্ডিতের ইহাতে ভবক্ষয়ই হইয়া থাকে।"

'অহং' বুদ্ধির বিষয় যে কেবল কল্পনামাত্র, এবং সেই জন্যই অসৎ, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে :—

৫৮-৬০

আমি সর্ব্বপ্রকারেই দন্ত, কেশ, বা নখ নহি; আমি অস্থি নহি, শোণিত নহি; আমি শিঙ্ঘান (পোঁটা), শ্লেষ্মা, পূয, বা ক্লেদ নহি, বসা নহি, স্বেদও নহি, মেদও নহি, অথবা অন্ত্রসমূহও নহি, বা সূক্ষ্ম অন্ত্রসমূহও নহি; আমি মল বা মূত্র নহি, মাংস বা স্নায়ু নহি; আমি তেজ নহি, বায়ু নহি; ইন্দ্রিয়সমূহ নহি, এবং ছয় বিজ্ঞানও[১] নহি।

'সর্ব্বপ্রকারে' অর্থাৎ প্রত্যেকে বা সমষ্টিভাবে (অর্থাৎ একটি দন্তও আমি নহি, অথবা দন্তকেশনখ-প্রভৃতির সমষ্টিও আমি নহি)। বিচার করিলে দেখা

১। চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবি., ঘ্রাণবি., জিহ্বাবি, কায়বি, ও মনোবি।

যায় যে, দন্তপ্রভৃতির সমষ্টিই শরীর। এই শরীরের প্রত্যেকটি পদার্থ 'অহং'-বুদ্ধির বেদ্য অর্থাৎ বিষয় নহে, কেননা তাহাদের প্রত্যেকটিতে 'অহং'-বুদ্ধি হয় না। আমাদের প্রতিপক্ষবাদীদেরও মতে কেশ-প্রভৃতির এক-একটি 'অহং'-বুদ্ধির বেদ্য নহে। তাহাদের সমষ্টিও তো (বস্তুত) কেবল তাহারাই (তাহারা ভিন্ন অন্য কিছু নহে)। তাহাদের সমষ্টির মধ্যে (তাহাদের হইতে অন্য আর) একটা কিছু আছে ইহা সম্ভব হয় না। এরূপ একটা পদার্থের অস্তিত্বকে পরে আমরা খণ্ডন করিব।২ অনেক পদার্থ সম্মিলিত হইলেও তাহারা এক বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। অনেকে এক-বুদ্ধি অভ্রান্তও হইতে পারে না। আর ভ্রান্তির দ্বারা তত্ত্বের ব্যবস্থাও হয় না। অতএব এই যে 'অহং' বা 'আমি' বুদ্ধি, ইহার কোনো অর্থ (বিষয়) নাই, ইহা কল্পনা মাত্র, ইহাই দেখা যাইতেছে।...

কেহ এখানে বলিতে পারেন—কেশ-প্রভৃতির কিছুই যদি 'অহং'-বুদ্ধির বিষয় না হয়, তাহা হইলে 'অহং'-বুদ্ধিকে নির্বিষয় বলিতে পারা যায়; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, 'অহং' বুদ্ধিকে একেবারে নির্বিষয় বলিতে পারা যায় না; কেননা, নৈয়ায়িক প্রভৃতি বলেন, অভ্যন্তরে ব্যাপারবান্ অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ পুরুষই 'অহং'-বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে।

ইহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ 'গৌর, কৃশ, ও দীর্ঘ আমি যাইতেছি,'—ইত্যাদি রূপেই 'অহং'-বুদ্ধির বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা আত্মাকে এই প্রকার (অর্থাৎ গৌর, কৃশ ইত্যাদি) ইচ্ছা করেন না। আবার অন্য প্রকার জ্ঞানের দ্বারা অন্যের গ্রহণও যুক্তিযুক্ত হয় না।

টীকাকার প্রজ্ঞাকারমতি এই স্থানে নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক, সাঙ্খ্য, বৈদান্তিক ও অন্যান্য আত্মবাদীর (পুদ্গলবাদীর) মত উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'অহং'-বুদ্ধির কোনো বিষয় নাই, তাহা কল্পনামাত্র।

সাঙ্খ্যপ্রভৃতির মতে আত্মা চিৎ- বা জ্ঞান-স্বরূপ; নিম্নে ইহাই খণ্ডিত হইতেছে। বিচার্য্য কথাটা এই—যাঁহারা বলেন আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহাদের মতে বলিতে হয়, এই যে শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান

২। অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বী বলিয়া পৃথক্ কোনো পদার্থ আছে, ইহা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত হয়, বৌদ্ধদর্শনে নহে, বৌদ্ধদর্শন এই মত খণ্ডনই করে।

ইত্যাদি বিষয়-জ্ঞান, ইহাই আত্মা। কিন্তু বস্তুত ইহা বলিতে পারা যায় না, এবং সেই জন্যই আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বা চৈতন্যস্বরূপ ইহা বলা ঠিক নহে। আচার্য্য শান্তিদেব ইহাই বলিতেছেন—

শব্দজ্ঞান যদি (আত্মা) হয়, তাহা হইলে শব্দ সর্ব্বদাই গৃহীত হইবে।

আত্মা যদি শব্দজ্ঞান-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে, আত্মা নিত্য বলিয়া সেই শব্দজ্ঞানকেও নিত্য হইতে হইবে; এবং তাহা হইলে, শব্দ থাকুক বা নাই থাকুক, সর্ব্বদাই শব্দকে গ্রহণ করা যাইবে। আর যদি ইহা না হয়, তবে আত্মা নিত্য হইতে পারে না।

আচ্ছা, যদি তাহাই হয়? (তবে তাহার উত্তর এই—)

যাহা দ্বারা জ্ঞানকে নির্দ্দিষ্ট করা যায়, সেই জ্ঞেয় বিষয় যদি না থাকে, তবে (জ্ঞান) কি জানে?

জ্ঞান নিত্য উপস্থিত আছে. কিন্তু শব্দ সাময়িক বলিয়া সর্ব্বদা তাহার সত্তার অভিব্যক্তি হয় না;—ইহাই যদি হয়, তবে, শব্দ যখন থাকে না, তখন শব্দরূপ জ্ঞেয় বিষয় না থাকায়, জ্ঞান কাহাকে জানে? জ্ঞেয় শব্দকে না জানিলে শব্দজ্ঞান কিরূপে হইবে? জ্ঞেয় বিষয়কে জানে বলিয়াই তো জ্ঞান, জ্ঞেয় বিষয়কে যদি না-ই জানে, তবে তাহা কিরূপে জ্ঞান হইতে পারে? ইহাই বলিতেছেন—

যে জানে না সেও যদি জ্ঞান হয়, তবে কাষ্ঠও জ্ঞান হইতে পারে।

যাহা বিষয়কে জানে না, তাহাও যদি জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়, তবে (স্পষ্টত) অজ্ঞান-স্বভাব কাষ্ঠও জ্ঞান হইতে পারে; ইহা এমন কোনো অপরাধ করে নি যাহাতে জ্ঞান হইতে পারিবে না। কিন্তু বস্তুত ইহা এরূপ হয় না। অতএব জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানের অভাব হেতু কাষ্ঠ যেমন জ্ঞান হয় না, তেমনি জ্ঞেয় বিষয়কে না জানিলে জ্ঞানও জ্ঞান হইতে পারে না। ইহাই (আচার্য্য) বলিতেছেন—

৩। অর্থাৎ শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান, ইত্যাদি রূপে বিশেষভাবে জ্ঞানকে প্রকাশ করা যায়।

৬২

সেই জন্য ইহাই নিশ্চয় যে, জ্ঞেয় (বিষয়) যাহার সন্নিহিত থাকে না, এরূপ জ্ঞান নাই।

'সেইজন্য' অর্থাৎ যেহেতু বিষয়হীন জ্ঞান হয় না সেই জন্য। 'জ্ঞেয় যাহার সন্নিহিত থাকে না' ইহার অর্থ এই যে, যাহার গ্রাহ্য বিষয় যোগ্য (অর্থাৎ উপযুক্ত) দেশে থাকে না।

আবার শব্দজ্ঞানই যদি আত্মা হয়, আত্মা যদি শব্দজ্ঞান-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে, এই কারণেই তাহা রূপ গ্রহণ করিতে পারে না (যাহা শব্দজ্ঞান-স্বরূপ তাহা আবার রূপজ্ঞান-স্বরূপ কি প্রকারে হইবে?), কিন্তু বস্তুত ইহা এরূপ নহে, কেননা তাহাই (যেমন শব্দ গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ) রূপকেও গ্রহণ করে, ইহা আপনারা ইচ্ছা করেন। আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন:—

তাহাই (যদি) রূপকে জানে, তবে তখন শ্রবণও করে না কেন?

যদি আপনারা মনে করেন যে, সেই শব্দজ্ঞানই রূপকে জানে, তাহা হইলে তাহা তখন শ্রবণও করে না কেন? অর্থাৎ রূপ গ্রহণ করিবার সময়ে শব্দকেও গ্রহণ করে না কেন?—(আপনার মতে শব্দজ্ঞান যেমন রূপকে গ্রহণ করায় রূপজ্ঞান-স্বরূপ হয়, সেইরূপ রূপজ্ঞানেরও শব্দজ্ঞান-স্বরূপ হওয়া উচিত)।

যদি শব্দ অসন্নিহিত থাকায় (তাহার গ্রহণ হয় না), তাহা হইলে সেই জ্ঞানও অসৎ।

যে শব্দ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, অসন্নিধান হেতু তাহার গ্রহণ হয় না—এইরূপ যদি আপনারা বলেন, তাহা হইলে সেই জ্ঞানও অসৎ অর্থাৎ শব্দ অসন্নিহিত থাকায় শব্দজ্ঞানও অসৎ, শব্দজ্ঞানও তখন নাই।

কথাটা হইতেছে এই—শব্দজ্ঞানও যদি রূপকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঠিক ঐ সময়েই রূপজ্ঞানেরও শব্দকে গ্রহণ করা উচিত। যদি একথা বলা যায় যে, যখন রূপের গ্রহণ হয়, তখন

শব্দ অসন্নিহিত থাকায় শব্দের গ্রহণ হয় না, তবে তাহার ইহাই উত্তর যে, তাহা হইলে মূল শব্দজ্ঞানটাই হইতে পারিল না—যে শব্দজ্ঞান রূপকেও গ্রহণ করে বলা হইতেছে (৬৩শ কারিকার প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য)।

শব্দজ্ঞান যে, বস্তুত রূপজ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না, ইহাই আচার্য্য বলিতেছেন—

৬৪

যাহা শব্দগ্রহণ-স্বরূপ তাহা রূপগ্রহণ-স্বরূপ কিরূপে হইবে ?

যাহা শব্দের 'গ্রহণস্বরূপ' অর্থাৎ গ্রহণস্বভাব, অর্থাৎ শব্দগ্রাহক, তাহা—সেই জ্ঞান রূপগ্রহণাত্মক কিরূপে হইবে? কোনো রূপে হইতে পারে না। যাহা নিরংশ, যাহার কোনো অংশ নাই, তাহার দ্বিবিধ রূপ থাকিতে পারে না।

এখানে কেহ বলিতে পারেন, যেমন কোনো এক ব্যক্তি কাহারো সম্বন্ধে পিতা, আবার কাহারো সম্বন্ধে পুত্র হয়, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও একের (একই জ্ঞানের) দুই রূপ হইবে। ইহাই আশঙ্কা করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন—

একই ব্যক্তি পিতা ও পুত্র বলিয়া কল্পিত হয়, কিন্তু তত্ত্বত তাহা নহে।

কল্পনা করা যায় যে, একই ব্যক্তি পিতা অর্থাৎ জনক, এবং সে-ই পুত্র অর্থাৎ জন্য। ইহা কল্পনা দ্বারা ব্যবস্থা করা হয়, পরমার্থত নহে। একই স্বভাবকে কল্পনা দ্বারা নাম আরোপ করিয়া উভয়াত্মক বলিয়া ব্যবহার করা হয়।…একই বস্তুর যদি দুইটি বাস্তব রূপ ঘটাইতে পারা যায়, তবে ঐ যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা কোনোরূপেই সঙ্গত হয় না। দুইটিরূপ ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ায় বস্তুও ভিন্ন-ভিন্ন দুইটি হইয়া পড়ে। অতএব একই বস্তু বস্তুত দ্বিরূপ হয় না। একই বস্তুর দুইরূপ হওয়া কাল্পনিক, এবং সেই জন্যই তাহা আলোচ্য বিষয়ের অনুপযোগী।

(একই ব্যক্তির সম্বন্ধে পিতা ও পুত্র এই উভয়) ব্যপদেশ যে পারমার্থিক নহে, (সাংখ্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া) আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

৬৫

যেহেতু সত্ত্ব, রজ, ও তম পিতাও নহে পুত্রও নহে।

(আপনি সাঙ্খ্যবাদী,) আপনি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আপনার সাঙ্খ্য-মতে সত্ত্ব, রজ, ও তম, সম্মিলিত এই তিন গুণই জগৎ। এই সমস্ত গুণের, ব্যষ্টি ভাবেই হউক বা সমষ্টি ভাবেই হউক, নিজের নিজের এক-একটি স্বভাব আছে। সেই স্বভাবানুসারে ইহারা পিতাও নহে পুত্রও নহে, কেবলমাত্র গুণ। পুত্রাবস্থায় যে সত্ত্ব, রজ, ও তম গুণ থাকে, জনকাবস্থাতেও তাহারাই থাকে, তাই পূর্ব্বকালে ও পরকালে তাহাদের স্বভাবের কোনো বিশেষ বা ভেদ দেখা যায় না। অতএব এই যে পিতা-পুত্র ব্যবহার তাহা কাল্পনিক।

যদি বলা যায়, যখন রূপ গ্রহণ করা হয়, তখন সেই একই রূপজ্ঞান শব্দকেও গ্রহণ করে বলিয়া শব্দজ্ঞান-স্বরূপও হইয়া থাকে,—একই জ্ঞান রূপজ্ঞান ও শব্দজ্ঞান এই উভয়-জ্ঞান স্বরূপ হয়; তাহা হইলে, সেই জ্ঞানের এই রূপেই উপলব্ধি হওয়া উচিত (একই জ্ঞানের রূপজ্ঞানাত্মক ও শব্দজ্ঞানাত্মক এই উভয়ই ভাবে উপলব্ধি হওয়া উচিত), কিন্তু বস্তুত সেরূপ উপলব্ধি হয় না। অতএব তাহা (রূপজ্ঞান) শব্দজ্ঞানাত্মক নহে। ইহাই আচার্য্য বলিতেছেন—

কিন্তু তাহার শব্দগ্রহণযুক্ত স্বভাব দেখা যায় না।

'শব্দগ্রহণযুক্ত' অর্থাৎ শব্দগ্রহণসম্বদ্ধ। রূপগ্রাহক জ্ঞানের এইরূপ স্বভাব দেখা যায় না, প্রতীতির বিষয় হয় না। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, সেই সময়ে তাহা (রূপগ্রাহক জ্ঞান অর্থাৎ রূপজ্ঞান) শব্দজ্ঞানস্বরূপ হয় না।

কেহ (কোনো পূর্ব্বপক্ষী) এখানে এইরূপ তর্ক করিতে পারেন, যদিও তাহা (অর্থাৎ রূপজ্ঞান শব্দজ্ঞান-ভাবে) প্রতীতির বিষয় হয় না, তবুও তাহা (বস্তুত) তাহাই। (সিদ্ধান্তী ইহাতে বলেন, ভাল, তাহাই যদি হয়), তবে রূপগ্রহণ কিরূপে হইয়া থাকে ? (পূর্ব্বপক্ষী ইহার উত্তরে) বলিতেছেন—

৬৬

তাহাই অন্য রূপে (রূপকে গ্রহণ করে), ঠিক নটের মত।

(সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ইহাতে)

সেও অশাশ্বত হয়।

'তাহাই' অর্থাৎ শব্দজ্ঞান। অন্য 'রূপে' অর্থাৎ স্বভাবে। তাহাই রূপগ্রহণ স্বভাবের দ্বারা 'রূপকে গ্রহণ করে'—ইহাই মূলের অবশিষ্ট বাক্যাংশ। কি প্রকারে সে রূপকে গ্রহণ করে? নটের ন্যায়। যেমন নাট্য সময়ে রঙ্গভূমিস্থিত একই নট নানারূপে অবতরণ করে, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ।[৪] অতএব এখানে কোনো দোষ নাই। (সিদ্ধান্তী) এখানে বলিতেছেন—'(ইহাতে) সেও (আত্মাও) অশাশ্বত' অর্থাৎ অনিত্য হয়; কারণ সে পূর্ব্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর (অর্থাৎ স্বভাবান্তর) গ্রহণ করে। পূর্ব্ব ও পর এই উভয়ই কালে নট একস্বভাব, ইহা বলা যায় না, কারণ তাহার বিবিধরূপের (স্বভাবের) সম্বন্ধ দেখা যায়। অন্যথা ইহাই বলিতে হয় যে, তাহার (আত্মার বা নটের) স্বভাব দুইটি, এবং উভয়ই স্বভাব একই সময়ে তাহাতে থাকে; কিন্তু বস্তুত ইহা এইরূপ হয় না।[৫]

কেহ বলিতে পারেন,(বস্তুর যাহা) ভা ব, (তাহা) সেই (একই) থাকে; কিন্তু ইহার স্ব ভা ব অন্য-অন্য, এবং ইহা উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়; ইহা হইলে আর কোনো দোষ থাকে না। আচার্য্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

৪। অর্থাৎ শব্দজ্ঞানস্বরূপ আত্মা রূপজ্ঞানরূপ স্বভাবের দ্বারা রূপকে গ্রহণ করে, গন্ধজ্ঞানরূপ স্বভাবের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, ইত্যাদি।

৫। বস্তুর যদি স্বভাব থাকে তবে তাহা এক, এবং সর্ব্বদা তাহাই থাকে। বস্তুর স্বভাব দুই হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ দুই স্বভাবই যুগপৎ থাকে, কারণ যাহা স্বভাব তাহা বস্তুতে সব সময়ে থাকিবেই, বস্তু স্বভাবচ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না।

সে-ই যদি অন্যস্বভাব হয়, তবে তাহার এই ঐক্য অপূর্ব্ব !

'সে-ই' অর্থাৎ আত্মাই বা নটই। 'অন্যস্বভাব' অপরস্বভাব (পূর্ব্বে তাহার যে স্বভাব ছিল, তাহা হইতে যদি তাহার ভিন্ন স্বভাব হয়)। 'তবে তাহার এই ঐক্য অপূর্ব্ব,' তাহার এই এইপ্রকার ঐক্য 'অপূর্ব্ব' অদৃষ্টপূর্ব্ব। 'তাহার এই ঐক্য' অর্থাৎ 'তাহার' ঐ ভাবের অপর স্বভাব উৎপন্ন হইলেও 'ঐক্য' অর্থাৎ অভিন্নাত্মকতা, অভিন্নস্বরূপতা। '(ইহা) সে-ই' এইরূপ বলিয়া তত্ত্ব (তৎস্বরূপতা) কথিত হইয়া থাকে, আর '(ইহা) অন্যস্বভাব' এইরূপে তাহারই (সেই বস্তুরই) অন্যত্ব (ভেদ) উক্ত হইয়া থাকে। ইহারা দুইটি (তত্ত্ব বা তৎস্বরূপতা ও অন্যত্ব বা অন্যস্বভাবতা) পরস্পর বিরুদ্ধ, এবং সেই জন্য একই বস্তুর এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম যুক্তিযুক্ত হয় না। আরও, (এই যে) ভা ব, (ইহা) স্ব ভা ব হইতে অন্য নহে। সেই জন্যই ইহা বলিতে পারা যায় না যে, স্ব ভা বে র উৎপত্তি ও নিরোধ হইলেও ভা বে র উৎপত্তি ও নিরোধ হয় না। আর ভাব হইতে অভিন্ন স্বভাবের উৎপত্তি ও নিরোধে ভাব যে, ঠিক সেই অবস্থাতেই থাকে, ইহাও যুক্তি-যুক্ত হয় না ; কারণ, যদি তাহাই হয়, তবে ভাব হইতে স্বভাব যে অভিন্ন তাহা সংঘটিত হয় না। আর যদি বা ভাব ও স্বভাবের ভেদই (স্বীকার করা) হয়, তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ সিদ্ধ (প্রমাণিত) হয় না।

এখানে কেহ বলিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত দোষপ্রসঙ্গ তখনই হইতে পারে যদি আত্মার এই উভয়রূপ সত্য হয়। (আত্মার উভয়ই রূপ যদি সত্য নহে), তবে কি ? ইহার নিজের যে রূপ আছে তাহা ছাড়া অপর রূপ সত্য নহে। এবং এই প্রকারেই পূর্ব্বোক্ত দোষ-প্রসঙ্গ হয় না।

(সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর হৃদয়ের) এই অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

৬৭

(আত্মার) অন্য রূপ যদি অসত্য, তবে বল তাহার নিজের রূপটি কি ?

'অন্য রূপ' অর্থাৎ স্ফটিক প্রস্তরের (অর্থাৎ তাহাতে প্রতিফলিত লৌহিত্যাদির) ন্যায় বিষয়ের সংসর্গে যে রূপ তাহা যদি 'অসত্য' অস্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে তাহার নিজ রূপটি বল। 'নিজ' অর্থাৎ স্বাভাবিক। 'তাহার' আত্মার, 'রূপ' তত্ত্ব। তাহার অন্য (স্বাভাবিক) রূপ যদি থাকে, তবে তাহা কি?

জ্ঞানত্বই যদি তাহা হয়?

(আচার্য্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন—)

জ্ঞানত্বই যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সমস্ত লোকেরই ঐক্য প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

(পূর্ব্বে শব্দজ্ঞান, পরে রূপজ্ঞান, এখানে) পূর্ব্ব ও পর উভয় কালে অনুগামী যে জ্ঞানত্ব তাহাই যদি (আত্মার) নিজ রূপ হয়, তাহা হইলে অপর আর বলিবার কি আছে, ইহাতে যে দোষ হয় তাহা এই যে,—পূর্ব্বে ও পরে জ্ঞানের ভিন্ন-ভিন্ন আকার থাকিলেও স্ফটিকের ন্যায় (অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন রূপ প্রতিফলিত হইলেও স্ফটিক যেমন এক, সেইরূপ) যদি জ্ঞানকে এক বলা যায়, তাহা হইলে সমস্ত ব্যক্তি-কেই এক বলিতে হয়। শব্দজ্ঞান ও রূপজ্ঞান ইহারা বিভিন্নাকার বলিয়া পরস্পর বিভিন্ন হইলেও যেমন তাহাদিগকে এক বলা হইতেছে, সেইরূপ সমস্ত ব্যক্তি-কেই এক বলা উচিত, বস্তুত তাহাদের ভেদ থাকিলেও (আপনাদের মত অনুসরণ করিলে) তাহাদের কোনো ভেদ দেখা যায় না। ইহাতে আরো দোষপ্রসঙ্গ হয়; তাহা হইলে—

৬৮

চেতন ও অচেতনের ঐক্য হইয়া পড়ে, কেননা অস্তিত্ব তাহাদের উভয়েরই সমান।

যদি কোনো অবান্তর ভেদহেতু পরিত্যাগ করিয়া কোনো একটা আকার লইয়াই ঐক্য ধরা হয়, তাহা হইলে, যদিও চেতনা পুরুষের ধর্ম্ম, আর অচেতনা প্রকৃতি-প্রভৃতির ধর্ম্ম, তবুও চেতন ও অচেতনকে এক বস্তু বলিয়া ধরিতে হয়, কারণ অস্তিত্ব

তাহাদের উভয়েরই সমান (চেতনের যেমন অস্তিত্ব আছে, অচেতনেরও তাহা তেমনই আছে)। যদি বলা যায়, বস্তুর ভেদ থাকিলেও সাদৃশ্য-নিবন্ধন তাহার ঐক্য তো ধরাই যায়; ইহাতে তো আমাদের ইষ্টসিদ্ধিই হয়, (ক্ষতি কোথায়?) তবে তাহারা উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—:

বিশেষ যদি মিথ্যা হয়, তবে সাদৃশ্যের আশ্রয় কি?

যদি অনিয়মে সমস্ত বস্তুরই 'বিশেষ' অর্থাৎ ভেদ 'মিথ্যা' অসত্য হয়, আর নিজ রূপ সত্য হয়, 'তবে সাদৃশ্যের আশ্রয় কে?'—কাহাকে আশ্রয় করিয়া সাদৃশ্যের ব্যবস্থা হয়? কেননা, বিশেষ থাকিলেই কিঞ্চিন্মাত্র সাধর্ম্ম্য লইয়া সাদৃশ্য ধরা হইয়া থাকে। বিশেষ যদি না থাকে তবে বস্তুটি এ ক ই হইয়া যায়, স দৃ শ হয় না। গো ও গবয় ইহাদের মধ্যে যদি কোনো বিশেষ অনুভূত না হয়, তবে গবয় গো স দৃ শ না হইয়া গো-ই হইয়া যায়। অতএব (বলিতে হয়) বিশেষই সাদৃশ্যের আশ্রয়। সেই বিশেষ যখন পরমার্থিক নহে, তখন লোকসমূহের অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তু-সমূহের সাদৃশ্যের অর্থাৎ সমানাকারতার আশ্রয় বা নিবন্ধন (আধার) কে? অতএব আপনার মতে তাহাদের বাস্তবই ঐক্য আসিয়া পড়ে, সাদৃশ্য-হেতুক ঐক্য নহে। অতএব কিরূপে আপনাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়? কিরূপে আপনারা বলেন যে, আপনাদের এই মতে কোনো দোষ নাই?

আত্মা যে চেতন বা চিৎস্বরূপ হইতে পারে না, তাহা এইরূপে প্রতিপাদিত হইল। এখন যাঁহাদের মতে আত্মা অচেতন তাঁহাদেরও মত যে ঠিক নহে, তাহাই প্রতিপাদিত হইবে। ইহা আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

পারসীকপ্রসঙ্গ

পরলোক

পারসীকগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যু হইলে জীব তিন অহোরাত্র এই পৃথিবীতেই থাকে, তা এই জীব ধার্ম্মিকই হউক, আর পাপীই হউক।[১] জীব এই কয় দিন সংকারের জন্য লইয়া যাইবার পূর্ব্বে নিজের ত্যক্ত মৃতদেহের মস্তক যে স্থানে থাকে সেই স্থানে উপবেশন করে। ধার্ম্মিক জীব এই সময়ে এক মঙ্গল গাথা[২] গাহিতে থাকে, আর বলে—'অহুর মজ্‌দা যাহার মনোরথ পূর্ণ করেন, সেই সুখী, সেই সুখী!' এই সময়ে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। অপর পক্ষে, পাপী জীব দুঃখের গাথা[৩] গাহিয়া অনুতাপ করে—'হে অহুর মজ্‌দা, কোন্ স্থানে আমি গমন করিব! কাহার নিকটে প্রার্থনা করিতে যাইব!' বলা বাহুল্য, এই সময়ে ইহাকে বিষম দুঃখ অনুভব করিতে হয়। তৃতীয় রাত্রির প্রভাতে, উষার আগমনে, ও সূর্য্যের উদয়ে ধার্ম্মিক জীবের মনে হয়, যেন তখন দক্ষিণ দিক্[৪] হইতে মৃদু মধুর সুরভি বায়ু বহিতেছে, আর সে যেন তাহা

১। Darmesteter বলিয়াছেন (SBE. Vol. IV. p. 218) দৈত্যেরা মৃত ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দেয় ("Daevas cut off his eye sight."), কিন্তু মূলে (বেন্দী. ১৯ ৮') ইহার কিছুই নাই। ইঁহার অনুবাদ ঠিক হয় নাই, এস্থলে বরং Haug সাহেবের অনুবাদ ভাল (Essays on the Religin of Parsis, Popular ed. p. 254).

২। উশ তা ব ই তী গাথা. যস্ন, ৪৩.১।

৩। কাঁম্ গাথা, যস্ন, ৪৬.১।

৪। পারসীক শাস্ত্রে স্বর্গ দক্ষিণে, আর নরক উত্তরে; কিন্তু বেদপন্থীর শাস্ত্রে ইহা বিপরীত, অর্থাৎ দক্ষিণে নরক, ও উত্তরে স্বর্গ।

সেবন করিতেছে। তাহার মনে হয়, কোথা হইতে সেই বায়ু আগমন করিতেছে। অপর পক্ষে, পাপী জীবের নিকট ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে; সে যেন মনে করে, উত্তর দিক্ হইতে অতিজঘন্য দুর্গন্ধপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, আর তাহাকে তাহা সেবন করিতে হইতেছে। সে ভাবে, কোথা হইতে ঐ বায়ু আসিতেছে। তখন অধর্ম্মিক জীবকে বী জ রে ষ (সংস্কৃত বি হ র্ষ)[৫] নামে এক দৈত্য বন্ধন করিয়া লইয়া যায়।[৬] অনন্তর ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক উভয়ই জীব একই সাধারণ পথ দিয়া চি ন্ব ৎ সে তু র নিকট উপস্থিত হয়; বিশেষের মধ্যে এই যে, ধার্ম্মিক জীব নিজেই এখানে আসে, আর অধার্ম্মিক জীবকে বীজরেষ বাঁধিয়া লইয়া আসে।

এখানে এই চি ন্ব ৎ সে তু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। চি ন্ব ৎ সে তু অন্তর মজদার নির্ম্মিত। অবেস্তার ভাষায় ইহার সম্পূর্ণ নাম চি ন্ব ৎ পে রে তু। চি ন্ব ৎ শব্দটি অবেস্তা ও সংস্কৃতের চি ধাতুর ('সম্মিলিত হওয়া,' 'চয়ন বা সংগ্রহ করা') উত্তর অ ৎ প্রত্যয়ে উৎপন্ন। ইহা হইতে ইহার আক্ষরিক অর্থ হয় 'যে সম্মিলিত হয়।' আর পে রে তু হইতেছে সংস্কৃত পৃ ধাতু বা অবেস্তা প র্ ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় করিয়া (Jacksons' Avesta Grammer § 790.

৫। অবে. বী = সং. বি; অবে. জ রে ষ = সং. হ র্ষ; 'যে জীবকে হ র্ষ বি হী নঃ অর্থাৎ দুঃখিত করে।' Reichelt প্রভৃতি বলিয়াছেন 'যে টানিয়া লইয়া যায় ('one who drags away')। অন্যান্য দৈত্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে (বুন্দ. ২৮-১৮) ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে. ইনি মৃত্যুর পর ঐ তিন দিন জীবকে পীড়ন করেন, ও ভয় দেখান। ইনি নরকের দ্বারে উপবেশন করিয়া থাকেন, এবং মৃত পাপী জীবকে বন্ধন করিয়া প্রথমে চিন্বৎ সেতুর (ইহার বিবরণ পরে উক্ত হইতেছে) নিকটে ও তাহার পর নরকে লইয়া যান।

৬। ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, প্রত্যেক জীবের গলায় এক-একখানি পাশ থাকে, তবে মৃত্যু হইলে ধার্ম্মিক জীবের গলা হইতে তাহা খুলিয়া পড়ে, আর অধার্ম্মিক জীবকে তাহারই দ্বারা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মূল অবেস্তায় ইহা নাই, সেখানে (বেন্দী. ১৯.২৯) কেবল এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, বীজরেষ বদ্ধ আত্মাকে লইয়া যায় ("বীজরেষো...উর্বানেম্ ব স্তে ম্ বাধয়েইতি।" অবে. ব স্ত = স. বদ্ধ

Whitney, § 1161)। সংস্কৃতে ইহাকে পৃতু শব্দে অনুবাদ করিতে পারা যায়। ইহার অর্থ হয় 'যাহার দ্বারা পার হওয়া যায়,' অর্থাৎ 'সেতু'। তুল;— সিংহলী পালম, 'সেতু'। অতএব বলিতে পারা যায়, মৃত্যুর পর সম্মিলিত অর্থাৎ সমাগত জীবগণ যাহা দ্বারা (নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুসারে স্বর্গে বা নরকে) যায়, সেই সেতুর নাম চিন্বৎপেরেতু।[৭] জীবেরা এখানে নিজ-নিজ ভাল-মন্দ কর্ম্মের ফল আশা করিয়া উপস্থিত হয়। বিচার তাহাদের এখানেই হইয়া যায়, বিচার না হইলে কেহই ইহা (এই সেতুকে) পার হইতে পারে না। যাহারা ধার্ম্মিক, জরথুশত্র তাহাদিগকে তাহাদের এই সেতু পার হওয়ায় সাহায্য করেন, কিন্তু অধার্ম্মিকেরা নিজ-নিজ পাপ কার্য্যের চিন্তায় এখানে কম্পিত হইতে থাকে। এই সেতু রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি কুকুর আছে,[৮] ধার্ম্মিকগণের সেতু পার হইয়া স্বর্গগমনে ইহারা সহায় হয়, কিন্তু পাপীরা ইহাদের কোনো সাহায্যই পায় না। পরবর্ত্তী পহ্লবীলিখিত পুস্তকসমূহের বিবরণে জান যায় যে, এই সেতু পৃথিবীর মধ্য-স্থলে (অর্থাৎ ইরানবেজে) অবস্থিত ও শতমানুষ-পরিমাণ উচ্চ। ইহা চকাৎ-ই-দাইতিক অর্থাৎ 'ন্যায়শিখর'-নামক পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার দুই প্রান্তের একটি আলবুর্জ পর্ব্বতের উত্তর ধারে ও অপর প্রান্তটি ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণে।[৯]

৭। ইংরাজীতে লেখকগণ বিবিধরূপে ইহা প্রকাশ থাকেন। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিই অনুসরণ করিয়া লিখেন 'The Birdge of the Gatharer'। ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক জীবের স্বর্গে বা নরকে গমনের মীমাংসা এই খানেই হইয়া থাকে, ইহাই ধরিয়া কেহ-কেহ বলেন 'The Judge's Bridge'; আবার কেহ বলেন 'The Bridge of Judgement. অধার্ম্মিকের পাপের শাস্তি এখানেই হইয়া থাকে, এইজন্য কেহ কেহ বলেন 'The Punishing Bridge'. আবার কেহ-কেহ বলেন, 'The Bridge of Seperator, কারণ অহুর মজদা এই স্থানেই পুণ্যকে পাপ হইতে তফাৎ করেন। এইরূপ আরো নাম হইয়াছে।

৮। পরলোকের পথ-রক্ষক কুকুরের কথা দেবপন্থীরও শাস্ত্রে আছে:—"যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ, চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ॥"—ঋগ্বেদ ১০. ১৪. ১১, ১২।

৯। দ্রষ্টব্য Dhalla: Zoroastrian Theology, p 273; Reichlet: Avesta Reader, pp. 151—152 বুন্দ. ১২৭; কিন্তু পহ্লবী দেন্দী. (Haug's Essay, p. 387

ধার্ম্মিক জীব যখন ইহার উপর দিয়া গমন করে তখন ইহা বিস্তারে প্রায় ৮৪ হাত হয় (মইনো.২০.১২৩), কিন্তু যদি কোনো অধার্ম্মিক জীব গমন করে তবে তাহা সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ও ক্ষুরের ধারার ন্যায় তীব্র হইয়া যায়, এবং সে তাহা হইতে নরকে পতিত হয়।[১০]

এইস্থানে জীবের শুভ বা অশুভ কর্ম্ম (দ এ না) স্ত্রী মূর্ত্তিতে জীবের নিকটে উপস্থিত হয়; ধার্ম্মিক জীবের নিকট অতি সুন্দর রূপে, আর অধার্ম্মিক জীবের নিকট অতি কুৎসিত রূপে।

পহ্লবী গ্রন্থে (মইনো.২.১২৭ ইত্যাদি) উক্ত হইয়াছে, ধার্ম্মিক জীব তাঁহাকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কে; তিনি উত্তর করেন যে, তিনি কোনো স্ত্রীলোক নহেন, তিনি তাহারই পুণ্য, কারণ যাহা উত্তম তাহাই সে চিন্তা করিয়াছিল, তাহাই বলিয়াছিল, এবং তাহাই অনুষ্ঠান করিয়াছিল। অপর পক্ষে অধার্ম্মিক জীবও ঐ কুৎসিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ঐরূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনি হইতেছেন বস্তুত তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, কারণ যাহা মন্দ তাহাই সে চিত্তে ভাবিয়াছিল, তাহাই বাক্যে প্রকাশ করিয়াছিল, এবং তাহাই কার্য্যে অনুষ্ঠান করিয়াছিল। সেই নারীমূর্ত্তি ধার্ম্মিককে চিন্বৎ সেতুতে গমন করান। অনন্তর সে ক্রমশ স্বর্গের নিম্ন ভাগ হইতে সর্ব্বোচ্চ ভাগে উপস্থিত হয়।

গাথায় বা অবেস্তার সর্ব্বপ্রাচীন অংশে একটিমাত্র স্বর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু পরে ইহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। দেখা যায় স্বর্গের চারিটি ক্রমিক ভাগ আছে, প্রথম হু ম ত (সং. সু ম ত), অর্থাৎ সৎচিন্তা, বা সৎচিন্তার স্থান; দ্বিতীয়

দিনকা. ৯.২০.৩) দেখিয়া মনে হয়, এক প্রান্ত চকাৎ-ই-দাইতিকে ও অপর প্রান্ত আলবুর্জে (অবেস্তার হ র বে রে জ ই তি)।

১০। দিনকা ৯২০.৩। এইরূপ পর লোকের কথা হিন্দু (ছান্দোগ্য, ৮.৪.১-২ ; বৃহদা. ৪.৪.২২) মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি বিবিধ জাতির মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য—Encyclopœdia of Religion and Ethics, Vol 2, p. 852-853. Max Muller's Theosophy or Psychological Religion, Lrecture VI (The Eschatology of the Avesta), pp. 177 ff

হু খ্ ত (স্ক্থ=সু+উক্থ, অর্থাৎ সূক্ত=সু+উক্ত), অর্থাৎ সৎ উক্তি অথবা সৎ উক্তির স্থল; তৃতীয় হ্বরেশ্ত (সু বৃ চ়=সুকৃত), অর্থাৎ সৎ ক্রিয়া, বা সৎ ক্রিয়ার স্থল; আর চতুর্থটি হইতেছে গরোন্মান অথবা গরোদেমান (গিরো নিমান, গিরোধামন্); ইহার আক্ষরিক অর্থ 'স্তুতির গৃহ।' ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বর্গ। ইহাকে অনল্র রওচঙ্হ (অনগ্র রোচস্) অর্থাৎ 'অসীম জ্যোতি' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সাধারণত স্বর্গকে বহিশ্ত অঙ্হু (বসিষ্ঠ অসু) অর্থাৎ 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোক' বলা হইয়া থাকে। অবেস্তার বহিশ্ত হইতেই ফারসীতে স্বর্গকে বেহশ্ত বলা হয়। অপর পক্ষে নরককে বলা হয় অচিশ্ত অঙ্হু (অকিষ্ঠ অসু) অর্থাৎ 'সর্ব্বনিকৃষ্ট লোক'। স্বর্গ ধার্ম্মিকগণের সুখময় স্থান, অহুর মজদা এখানে নিজের সচিবগণের সহিত বিরাজ করেন, এবং ধার্ম্মিক জীবেরা নিজ নিজ ধর্ম্ম কার্য্যের বলে এখানে আগমন করিয়া থাকে।

গাথায় স্বর্গের ন্যায় নরকও একটি দেখা যায়, কিন্তু পরবর্ত্তী অবেস্তায় স্বর্গের ন্যায় নরকও চারিটি উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ইহাদের ভাগও ঠিক স্বর্গের মত। এই নরকগুলি পূর্ব্বোক্ত চারিটি স্বর্গের ঠিক বিপরীত; যথা, প্রথম নরক দুশ্মত (দুর্ম্মত) অর্থাৎ দুশ্চিন্তা, বা দুশ্চিন্তার স্থান; দ্বিতীয় দুঝ্উখ্ত (দুরুক্ত) অর্থাৎ দুরুক্তি, বা দুরুক্তির স্থান; তৃতীয় দুঝ্বরেশ্ত (দুর্বৃ চ় =দুষ্কৃত) অর্থাৎ দুষ্ক্রিয়া, বা দুষ্ক্রিয়ার স্থান। চতুর্থটির বিশেষ নাম নাই। নরককে স্বর্গেরই ঠিক বিপরীত ভাবে অনল্র তেমঙ্হ (অনগ্র তমস্) 'অসীম অন্ধকার' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সাধারণত নরককে দুঝ্ অঙ্হু (দুর্ অসু) 'দুর্লোক,' অথবা অচিশ্ত অঙ্হু (অকিষ্ঠ অসু) 'সর্ব্ব নিকৃষ্ট লোক' বলা হইয়া থাকে। ইহা অতি ভয়ানক ও অতি দুর্গন্ধপূর্ণ।

জীব পুণ্যের ফলে স্বর্গে ও পাপের ফলে নরকে যায়; কিন্তু যদি কাহারো পাপ পুণ্য উভয়ই সমান-সমান হয় তবে তাহার স্থান কোথায়? গাথার পরবর্ত্তী অবেস্তায় (ঘেন্দী, ১৯, ৩৬; যশ্ত, ১, ৩০) দেখা যায়, সর্ব্বোত্তম স্বর্গের

(গ রো স্মা ন) সহিত ম স্মা ন গা তু নামে আর একটি স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে। পহ্লবী শাস্ত্রে ইহাকে 'নিত্য সুখের স্থান' (হ মে শ ক্ সু ৎ গা স) বলিয়া বর্ণনা করা হয় হয়। পণ্ডিতেরা বলেন এই স্থানেই ঐ সকল জীব মরণের পর আসে।১০

সেই কর্ম্মরূপা নারী ধার্ম্মিক জীবকে চিন্বৎ সেতুর উপর ও সেখানে হইতে যজনীয় দেবগণের (ম ই ন্যু য জ ত = ম ন্যু য জ ত) নিকটে উপস্থাপিত করেন। সেখানে বো হু ম ন১১ নিজের হিরণ্ময় সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া সেই জীবকে বলিয়া উঠেন 'তুমি কিরূপে নশ্বর লোক হইতে অনশ্বর লোকে আগত হইলে?'১২

১০। Dhalla: Zoroastrian Theology. pp. 58, 179.

১১। সাধারণত বলা হয় ব হ্ম ন, অবেস্তায় মূল রূপ বো হু ম ন ঙ্ হ, সংস্কৃত ব সু ম ন স্। ইনি সমস্ত যজত অর্থাৎ যজনীয় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ও অহুর মজ্দার শ্রেষ্ঠ সচিব, অহুর মজদার পরেই ইঁহার স্থান। ইনি প্রজ্ঞা ও শান্তির অধিদেবতা। বস্তুত উত্তম (ব সু) মনকেই পুরুষধর্ম্মারোপে (personification) ঐরূপ বলা হয়। অহুর মজদার সাত জন সচিব আছেন। অবেস্তায় ইঁহাদিগকে অ মে ষ স্পে ন্ত (অ মে ষ = অ ম র্ত্ত, আর স্পে ন্ত অবেস্তায় বৃদ্ধি-অর্থক স্প ন্, স্পি, সংস্কৃত শ্বি ধাতু হইতে) অর্থাৎ 'বৃদ্ধিপ্রদ বা পবিত্র অমর্ত্ত অর্থাৎ অমর' বলা হয়। অহুর মজদার ন্যায় তাঁহার নিত্য বিরোধী অ ঙ্ র ম ই ন্যু বা অহ্রিমনেরও ঠিক সাত জন সচিব দৈত্য (দ এ ব = দে ব) আছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে ঠিক বো হু ম ন্ নে র বিপরীত ও বিরোধী অ ক ম ন ঙ্ হ (অ ক ম ন স্) অর্থাৎ 'মন্দ মন।'

১২। বেন্দী ১৯.৩১। কিন্তু যশ্তে (২২.১৬—১৭, ৩৪—৩৬) দেখা যায়, পূর্ব্বাগত ধার্ম্মিক জীবগণের মধ্যে কোনো একজন এই নবাগত জীবকে ঐরূপ প্রশ্ন করে।—অহুর মজদা তাহা শুনিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে, এই জীব এইমাত্র অতি দুঃখের স্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে এ প্রশ্ন করিও না; যাহারা সৎ চিন্তা সৎ উক্তি ও সৎ ক্রিয়া করিয়া থাকে, এইরূপ নরনারীর যাহা উপযুক্ত খাদ্য তাহাই সে এখানে লাভ করুক। অপর পক্ষে নবাগত অধার্ম্মিক জীবকে দেখিয়া পূর্ব্বাগত অধার্ম্মিক জীবের কোনো একজন ঠিক ঐরূপেই জিজ্ঞাসা করে, কিরূপে সে আসিল, এবং অঙ্রমইন্যু ঐ প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়া যাহারা অসৎ চিন্তা, অসৎ উক্তি, ও অসৎ ক্রিয়া করিয়া থাকে, এইরূপ নর নারীর উপযুক্ত বিষ ও বিষময় দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য দিবার আদেশ করেন।

অনন্তর ধার্ম্মিক জীবেরা অহুর মজদার ও তাঁহার সচিব দেবগণের হিরণ্ময় সিংহাসনের দিকে ও সর্ব্বোত্তম স্বর্গের (গ রো ন্মা ন) দিকে অগ্রসর হয়। এখানে অহুর মজদা ও তাঁহার সচিবগণ বাস করেন। মৃত ধার্ম্মিক নরেরা এই স্থানেই সমবেত হন, এবং অহুর মজদায় দুত (অ স্ত) ন ই র্যো স ঙ্ হ (ন রা শং স) তাঁহাদের সহিত এখানে থাকেন।

অপর পক্ষে অধার্ম্মিকেরা ব্যাঘ্রের নিকটে মেষীর ন্যায় অতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, ও নরকে গিয়া নানাবিধ দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ভোগ করে। দৈত্যেরা তাহাদিগকে অতি জঘন্য ও দুর্গন্ধ খাদ্য খাইতে দেয়। অহুর মজদার নিকট হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহাদের এত যন্ত্রণা এই মনে করিয়া তাহারা বড় কষ্ট অনুভব করে।

গাথায় (যস্ন ৩০-১১, ৩১-২০) দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্ব্বৃত্তগণের ক্লেশ 'দীর্ঘ' (দ রে গ) কাল ধরিয়া থাকে, তাহাদের 'দীর্ঘজীবনকাল অন্ধকারের' ("দরেগেম্ আয়ু তেমেঙ্হো"=দীর্ঘম্ আয়ু (স্) তমসঃ) থাকে, এবং তাহাদের খাদ্য অতি জঘন্য হয়। অন্যত্র (যস্ন, ৪৬.১১) উক্ত হইয়াছে তাহাদের শরীর চিরকাল দৈত্যের গৃহে থাকে।[১৩]

কিন্তু এই সমস্ত জীবের যে কখনো উদ্ধার হইবে না, বা অনন্তকাল ধরিয়া যে, তাহাদিগকে নরকভোগ করিতে হইবে, তাহা নহে। পহ্লবী শাস্ত্রসমূহে দেখা যায়, অহুর মজদা অতি অধম পাপীকেও স্থায়িভাবে দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যের হাতে থাকিতে দেন না। জগৎ যতদিন পুনর্ব্বার নূতন না হয়, তাহাদের এই দুঃখ ততদিন পর্য্যন্ত। পহ্লবী শাস্ত্রসমূহে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে, যখন জগৎ আবার নূতন হইবার পূর্ব্বে মৃত ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সমস্ত জীবই তাহাদের নিজ-নিজ দেহ লাভ করে। যদিও মৃত্যুর পর তাহাদের দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি অহুর মজদার পক্ষে নিজ অদ্ভুত অসীম শক্তির প্রভাবে তাহাদের এই নূতন দেহ নির্ম্মাণ করা একটুও অসাধ্য নহে (বুন্দ. ৩০.৪ ইত্যাদি); কেননা যাহা একদিন ছিল না তাহা

১৩। "যবোই বীস্পাই দ্রুজো দেমানাই অস্তয়ো (যবায় বিশ্বায় দ্রুহো ধাম(ম্)নে অস্তয়ঃ)।

করা অপেক্ষা যাহা একদিন ছিল তাহা করা অনেক সহজ। অনন্তর সমস্ত জীবই একত্র সমবেত হয়, তাহারা নিজ-নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে ও চিনিতে পারে, তাহারা নিজ-নিজ সুখ-দুঃখের কথা বর্ণনা করে, ও ধার্ম্মিকেরা পাপীদের জন্য, আর পাপীরা নিজেদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। অনন্তর তাহাদের শেষ বিচার হয়, বিচারক স্বয়ং অহুর মজদা। বিচারের ফলে পাপীদিগকে আবার তিন রাত্রি নরকে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই সময়ে আকাশ হইতে একটি উল্কা (বা ধূমকেতু) পতিত হইয়া পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া সমস্ত ধাতু ও খনিজ পদার্থকে গলাইয়া দেয়। এই গলিত ধাতু নদীর আকার ধারণ করে, এবং সমস্ত জীবকে ইহা পার হইতে হয়। ধার্ম্মিকেরা উহা পার হইবার সময় মনে করে, যেন তাহারা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের উপর বিচরণ করিতেছে। আর পাপীদের তাহাতে পূর্ব্বে অনুভূত সমস্ত কষ্ট হইতে অধিকতর তীব্র দুঃখের অনুভব হয়। পাপীদের পাপ ইহাতে দগ্ধ হইয়া যায়, তাহারা পরিশুদ্ধ হয়, তাহারা তখন নিত্য সুখের যোগ্যতা লাভ করে ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠে। জীবেরা তখন নিত্য দেহ লাভ করে এবং সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ হয়। যাহারা পূর্ণবয়সে মৃত হইয়াছিল তাহাদের আকার হয় চল্লিশ বৎসরের পুরুষের ন্যায়, আর অল্প বয়সে মৃত ব্যক্তিরা পনের বৎসরের বালকের ন্যায় হয়। স্বামী-স্ত্রী-পুত্র সকলেই এক সঙ্গে বাস করে, কিন্তু সন্তান-সন্ততি কিছু উৎপন্ন হয় না। তাহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না, কোনো রূপ ক্ষয় বা মরণ থাকে না। কোনো রূপ কষ্টও থাকে না, কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্রই তাহাদের শরীরকে আঘাত করিতে পারে না। তাহাদের সকলেরই নিকট নিত্য সুখের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এই সময়ে অহুরমজদা ও অংগ্রমইন্যুর সচিব বা অনুচরগণের শেষ যুদ্ধের সমাপ্ত হয়, সু ও কু এই উভয়ের দ্বন্দ্বের অবসান হয়, সু য়ের জয় ও কু য়ের পরাজয় হয়, অহুরমজদার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবেরা তখন সকলেই একমত হইয়া অহুর মজদার ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া তাঁহারই সহিত বাস করে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

শিশুর স্বাধীনতা

নিজের দেশের শাসনপ্রণালী নিজের হাতে লইয়া মানুষ ভাবে যে স্বাধীনতার চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু একটু তলাইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, স্বাধীন দেশের মানুষও প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত পরাধীন হইতে পারে। স্বাধীন দেশেরও মানুষের ঐশ্বর্য্যের সুখশান্তিতে লালিত-পালিত হইয়া অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া উঠা অসম্ভব নয়। একজন ধনী ব্যক্তির দশবারটি ভৃত্য আছে—পথে, ঘাটে, আহারে-বিহারে ধনী লোকটির অন্তত একজন ভৃত্য না হইলে চলে না। ভৃত্যেরা নিজেদের উদরের তাড়নায় বাধ্য হইয়া ধনীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাহারা ধনীলোকটিরও স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে। ধনী ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আরামের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে ভৃত্যদের কাছে অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। জুতার ফিতা বাঁধিতে, বা ছাতি ধরিতে যে লোকের অন্যের উপর নির্ভর না করিলে চলে না, সে লোক স্বাধীন দেশে কেবল বাস করিলে কি হইবে? পরাধীন দেশেও তাহার মত অধীন হয় ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

অতএব সভ্যতার বৃদ্ধি ও সংশোধনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃত স্বাধীনতা কি তাহারও পরিচয়ের আবশ্যক হইবে। ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ শুধু নিজের দেশ স্বাধীন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে না। কি করিয়া সে ব্যক্তিগত জীবনেও স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিবে, তাহার প্রতি তাহার সবিশেষ মনোযোগ থাকিবে।

এই ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ গড়িবার ভার রহিয়াছে মাতা পিতা ও শিক্ষকদের

উপর। কিন্তু ইঁহারা অনেকে এখনও শিশুদিগকে ভবিষ্যৎ যুগের উপযোগী করিবার উদ্যোগ করিতেছেন না। শিক্ষা-জগতের বিপ্লবের বার্ত্তা পৃথিবীর চারিধার হইতেই এক এক জন মনীষী ঘোষণা করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও তেমন কাজ আরম্ভ হয় নাই। ইটালীর পরম বিদুষী মেরিয়া মন্তেসরি এই ভবিষ্যতের মানুষ গড়িবার জন্য আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কারের আয়োজন করিয়াছেন।

তিনি বলেন, বর্ত্তমান কালের শিশু-শিক্ষাপ্রণালী মানুষের প্রকৃত স্বাধীন হইবার পথে যথেষ্ট অন্তরায় হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, শিক্ষক ও পিতা-মাতা সকলেরই মনের ধারণা যে, শিশুর শরীরের চাঞ্চল্য কমাইয়া তাহাকে কোন রকমে স্থাণু করিলেই বুঝি তাহার মনের উন্নতি হইবে। কিন্তু মন্তেসরি এই ধারণাটি ভ্রান্ত মনে করেন। তিনি তাঁহার নিজের মতানুযায়ী শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কিরূপে ভবিষ্যৎ যুগের প্রকৃত স্বাধীন মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা দেখাইয়াছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

মন্তেসরির শিশুবিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব বড় বেশী। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিজের ব্যক্তিত্বকে খুব বেশী করিয়া জাগাইয়া রাখিলে চলিবে না। তিনি শিশুদের প্রত্যেক কাজ-কর্ম্ম খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিবেন—সদাচঞ্চল শিশুদের মধ্যে তিনি নিশ্চল দ্রষ্টার ন্যায় থাকিবেন। শিক্ষক যদি শিশুর কোন কাজ হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেন, তবে তাহাতে তাহার শিশু চিত্তের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে। শিশুর স্বতস্ফূর্ত্ত (spontaneous) কোন কাজে হঠাৎ বাধা দিতে নাই, কেন না সেই সমস্ত কাজের ভিতর দিয়া শিশু তখন জগৎকে জানিয়া-শুনিয়া নিজের জীবনের বিশেষ ধারার সৃজন করিতে সচেষ্ট। তবে শিক্ষককে মাঝে মাঝে শিশুর কাজে হয়ত বাধা দিতে হইতে পারে। শিশু যখন অন্যান্য সহপাঠীদের অসুবিধাজনক কোন কাজ করে তখন তাহার সে কাজে বাধা দিতেই হইবে। বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকার্য্যে অভ্যস্ত শিক্ষকেরা প্রায়ই যে, শিশুর কাজে অনর্থক বাধা দেন, তাহার কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত মেরিয়া মন্তেসরি উল্লেখ করিয়াছেন।

মন্তেসরির বিদ্যালয়ের একটি বালিকা একদিন কতকগুলি ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া নিজে একটা চেয়ারে বসিয়া স্কুলের এক জায়গায় হঠাৎ 'মাষ্টার,-ছাত্র' খেলা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মেয়েটি খেলাচ্ছলে তাহাদের কতকগুলি কবিতাও আবৃত্তি করাইতেছে। শিক্ষক আসিয়া হঠাৎ ইহাদের খেলা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেই বিদ্যালয়ের আর একটি শিশু হঠাৎ একদিন কি মনে করিয়া একটা টেবিল ধরিয়া টানিতে লাগিল, শিশুটি-কে শিক্ষক আসিয়া গোলমালের ভয়ে তৎক্ষণাৎ শান্ত করিলেন।

শিশুটি কিন্তু এযাবৎ কেমন জড়-ভরতের মত থাকিত। তাহার মনে ইচ্ছা বলিয়া যে, কোন একটা জিনিষ আছে তাহা বুঝা যাইত না, সকলে তাহাকে পাগল ভাবিত। কিন্তু এই টেবিল সরানোর কাজেই প্রথম তাহাকে একটা উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে দেখা গেল। শিশুটি তখন হইতে দিন-দিন উন্নতি করিতে লাগিল। শিক্ষকমহাশয়ের শিশুর এই কাজটি বন্ধ করিয়া দেওয়া সুসঙ্গত হয় নাই।

মন্তেসরির বিদ্যালয়ে আর একদিন কতকগুলি ছেলে-মেয়ে একটা জলের টবে কয়েকটা পুতুল ভাসাইয়া চারিদিকে খুব ভিড় করিয়া মজা দেখিতেছিল। পিছনে একটি আড়াই বছরের ছেলে বারাবার চেষ্টা করিয়াও ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। এমন সময় কাছেই একটা চেয়ার দেখিয়া সে সেইটা আনিতে ছুটিয়া চলিল। তখন তাহার মুখখানি আশা ও আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় শিক্ষক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া উপরে উঠাইয়া পুতুল দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু শিশুটির মুখের মধ্যে আর সেই পূর্ব্বের আশা ও আনন্দের ভাব দেখা গেল না। বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া সে যে, নিজের একটা কাজ করিবে, ইহাই তাহার মনে আশা ও আনন্দ আনিয়া ছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে বুঝিল যে, পৃথিবীতে অন্য সকলে তাহার কাজ করিয়া দিবে, নিজে সে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিবে।

শিক্ষকেরা এই রকম অনাবশ্যক বাধা দেওয়াতে শিশুরা মনে করে যে, চুপ চাপ

জড়-ভরতের মত হইয়া থাকাই বুঝি ভাল ছেলের লক্ষণ। কিন্তু সেই রকম ভাল ছেলে না হইলে পৃথিবীর উপকার, বৈ অপকার হইবে না। শিশুর যে সব কাজে অন্যের অপকার ও অসুবিধা হয়, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া ধীরে-ধীরে নিরস্ত করাইতে হইবে, কিন্তু অন্য সমস্ত কাজ সে অবাধ ভাবে করিতে পারিলে তাহার মনে স্বাধীনতার ভাব সহজে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে।

মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিবার পর হইতেই শিশুর অধীনতার বন্ধন ধীরে-ধীরে একটি-একটি করিয়া মুক্ত হইতে থাকে। ক্রমশ সে আহার-সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছামত খাইতে চায়, কিন্তু তখনও তাহার আরো অনেক কাজে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। তখনও চলা ফিরা উঠা-বসা, স্নান করা, কাপড় পরা ইত্যাদি সকল বিষয়েই শিশু অন্যের সাহায্যের ভিখারী। কিন্তু তাহার এই ভিখারীর ভাব যদি সমস্ত জীবন ধরিয়াই চলে, তবে তাহার ন্যায় বিড়ম্বনা আর কি আছে? তাই সন্তান ৩।৪ বছরের বড় হইলেই যাহাতে নিজের কাজ যতটা সম্ভব নিজেই করিতে পারে, তাহার প্রতি পিতা-মাতা দৃষ্টি ও যত্ন রাখিবেন। কেমন করিয়া খাইতে হয়, তাহা শিশুকে প্রথমে কোন রকমে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তার পর মাতার আহার করার সময়েও শিশু যাহাতে তাঁহার আহারের পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করে, তাহাও দেখিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক কাজ তিন-চার বৎসর বয়স হইতেই নিজে করিতে পারিলে শিশুর আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়।

বর্ত্তমান কালে শিশুর স্বায়ত্ত শাসনের প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। নিজের কাজ নিজের হাতে করাই যে প্রকৃত স্বাধীনতা, এ আদর্শ এখনও আমাদের দেশে তেমন শ্রদ্ধা পায় নাই। শৈশব হইতেই মানুষ যদি এই আদর্শের মধ্যে প্রতিপালিত হইতে পারে, তবে তাহার মত সৌভাগ্য কয় জনের আছে?

শিশু যখন এই রকম স্বাধীনতার আদর্শের মধ্যে বাড়িয়া উঠে, তখনও কি পৃথিবীতে তাহার আর অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—সব দিকের সব প্রয়োজন মিটাইতে হয়ত মানুষের পক্ষে

একে বারে আত্মনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীনতাকামী মানুষ প্রতি-মুহূর্ত্তে তাহার বাহিরের প্রতি মুখাপেক্ষিতা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে চেষ্টা করিবেন। একজন দার্শনিকের দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা ত্যাগ করিয়া রন্ধন ও অন্যান্য কার্য্য করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পাচকের আকস্মিক অভাবে যদি দার্শনিকের দক্ষিণ হস্তের কার্য্যের অসুবিধা ঘটে, তবে কি তাঁহাকে নিজের অজ্ঞতার জন্য দুঃখ ও লজ্জা পাইতে হইবে না?

শৈশব হইতেই মানুষ যদি এইরূপ আত্মনির্ভরতার শিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক ভার লঘু হয়। অনতিদূর ভবিষ্যতে এমন দিন কি আসিতে পারে না, যখন মানুষ অর্থের জন্য আর অন্য মানুষের দাসত্ব স্বীকার করিবে না? অর্থের লোভে বা বন্ধনে কোন মানুষ আর অন্য মানুষের কোন কাজে সাহায্য করিবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ থাকাই বর্ব্বরতা বলিয়া গণ্য হইবে। সেই অত্যুজ্জল ভবিষ্যতের প্রকৃত স্বাধীন মানুষ গড়িবার উদ্যোগ পৃথিবীর নানাস্থানে নানা ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশেরও অন্তত এক দল লোককে শিশুদের শৈশব হইতেই স্বাধীন আত্মনির্ভর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানের আবর্ত্তের মধ্যে সকলে ডুবিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে আমাদের লজ্জা ও দুঃখের সীমা থাকিবে না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দশমিক অনুসারে বাঙলা-পুস্তক

বিভাগ প্রণালী।

(প্রথম বিভাগ)

০০ বাঙলা (সাধারণ)

১০ দর্শন

২০ ধর্ম্ম

৩০ সমাজতত্ত্ব

৪০ ভাষাতত্ত্ব

৫০ বিজ্ঞান

৬০ ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প

৭০ সুকুমার শিল্পকলা

৮০ সাহিত্য

৯০ ইতিহাস, জীবনী ও ভূবৃত্তান্ত

প্রত্যেক বিষয়কে এইরূপ ৯টি ভাগে বিভক্ত করা যায়

·১ দার্শনিক ব্যাখ্যা

·২ সংক্ষিপ্ত সার বা চুম্বক

·৩ কোষ বা অভিধান

·৪ পুস্তিকা, প্রবন্ধ

·৫ পত্রিকা

·৬ পরিষদাদির প্রতিবেদন

·৭

·৮ Bibliography বা সাহিত্য

·৯ বিষয়ের ইতিহাস

(দ্বিতীয় বিভাগ)

০০ বাঙলা (সাধারণ)
- ০১ গ্রন্থ তালিকা
- ০২ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা
- ০৩ বিশ্বকোষ
- ০৪ পুস্তিকা
- ০৫ সাধারণ পত্রিকা
- ০৬ পরিষদ, সমিতির প্রতিবেদন
- ০৭ সংবাদপত্র
- ০৮ (বিশেষ সংগ্রহ)
- ০৯ পুঁথি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

১০ দর্শন
- ১১ দর্শন
- ১২ হিন্দু দর্শন
- ১৩ বৌদ্ধ দর্শন
- ১৪ জৈন দর্শন
- ১৫ মনস্তত্ব
- ১৬ ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্র
- ১৭ শীল ধর্ম্ম
- ১৮ প্রাচীন দার্শনিক
- ১৯ পাশ্চাত্য দার্শনিক

২০ ধর্ম্ম
- ২১ ধর্ম্মতত্ব
- ২২ হিন্দু ধর্ম্ম
- ২৩ বৌদ্ধ জৈন
- ২৪ আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়
- ২৫ খৃষ্টীয়
- ২৬ মুসলমান
- ২৭ অন্যান্য ধর্ম্ম
- ২৮ সংস্কার, আচার, ব্রত
- ২৯ পৌরাণিক কাহিনী

৩০ সমাজ বিজ্ঞান
- ৩১ আদম সুমারী
- ৩২ রাষ্ট্রনীতি
- ৩৩ অর্থনীতি
- ৩৪ ব্যবহার নীতি ও আইন
- ৩৫ শাসননীতি
- ৩৬ প্রতিষ্ঠানাদির ইতিহাস
- ৩৭ শিক্ষা
- ৩৮ জাতিতত্ব
- ৩৯ নৃ-তত্ব

৪০ ভাষাতত্ত্ব
- ৪১ বর্ণতত্ব
- ৪২ পদ নির্ণয়, ধাতু পাঠ
- ৪৩ শব্দকোষ, অভিধান
- ৪৪ ধ্বনি বিচার
- ৪৫ ব্যাকরণ

৪৬ ছন্দ, অলঙ্কার
৪৭ প্রাদেশিক ভাষা
৪৮ বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক
৪৯ অন্যান্য ভাষা

৫০ বিজ্ঞান
৫১ গণিত
৫২ জ্যোতিষ
৫৩ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
৫৪ রসায়ন শাস্ত্র
৫৫ ভূতত্ব
৫৬ জীবপ্রত্ন-তত্ব
৫৭ জীবতত্ব
৫৮ উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৫৯ প্রাণী বিজ্ঞান

৬০ ব্যবহারিক বিজ্ঞান
৬১ চিকিৎসা শাস্ত্র
৬২ ইঞ্জিনীয়ারিং
৬৩ কৃষি বিজ্ঞান
৬৪ গৃহস্থালী
৬৫ পূর্ত্ত ও বাণিজ্য
৬৬ বস্ত্র বিদ্যা
৬৭ শিল্প কৌশল
৬৮ নির্ম্মাণ কৌশল
৬৯ গৃহ নির্ম্মাণ

৭০ সুকুমার শিল্পকলা
৭১ ভারতীয় শিল্পকলা
৭২ স্থাপত্য
৭৩ ভাস্কর্য্য
৭৪ অঙ্কন ও বিভূষণ কলা
৭৫ চিত্র-বিদ্যা
৭৬ খোদাই কার্য্য
৭৭ আলোক চিত্র (ফটোগ্রাফী)
৭৮ সঙ্গীত শাস্ত্র
৭৯ বিনোদন ও ক্রীড়া

৮০ সাহিত্য
৮১ কবিতা
৮২ নাট্য
৮৩ গল্প ও উপন্যাস
৮৪ প্রবন্ধ
৮৫ বক্তৃতা
৮৬ পত্র
৮৭ বিদ্রূপ সাহিত্য
৮৮ বিবিধ
৮৯ অনুবাদ

৯০ ইতিহাস
৯১ ভ্রমণ কাহিনী; ভূবৃত্তান্ত
৯২ জীবনী.
৯৩ প্রাচীন ইতিহাস

৯৪ য়ুরোপের ইতিহাস
৯৫ এশিয়ার "
৯৬ আফ্রিকার "
৯৭ উত্তর আমেরিকার ইতিহাস
৯৮ দক্ষিণ আমেরিকার "
৯৯ ওশেনিয়া, মেরুর "

(তৃতীয় বিভাগ)

০০ বাঙলা—সাধারণ

০১ গ্রন্থ তালিকা

'১ গ্রন্থ তালিকা-সাধারণ

'২ বিশেষ গ্রন্থকারের গ্রন্থতালিকা

'৩ বিশেষ শ্রেণীর গ্রন্থতালিকা ; (কবিওয়ালাদের গ্রন্থতালিকা)

'৪ ছদ্মনাম, অজ্ঞাতনাম

'৫ বিশেষ দেশের গ্রন্থতালিকা

'৬ বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থতালিকা

'৭ সাধারণ পুস্তক তালিকা ;

'৭১ পাব্লিক লাইব্রেরী [যথা রামমোহন রায় লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকা]

'৭২ ব্যক্তি বিশেষের সংগৃহীত লাইব্রেরীর পুঃ তাঃ

'৭৩

'৭৪ পুস্তক বিক্রেতাদের পুঃ তাঃ

'৭৭ স্কুল ও কলেজ লাইব্রেরীর পুঃ তাঃ ,

'৮ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার তালিকা

'৯ পুঁথির বিবরণ

০২ লাইব্রেরী ব্যবস্থা

০৩ বিশ্বকোষ

০৪ পুস্তিকা (Pamphlets)

০৫ পত্রিকা—সাধারণ

০৬ সভা, সমিতি পরিষদ প্রভৃতির প্রতিবেদন

০৭ সংবাদ পত্র

[প্রয়োজন বোধ করিলে স্থানানুযায়ী সাজাইতে পারা যায় ; ০৭ এর পর বিন্দু দিয়া স্থানের নম্বর দিতে হইবে ; যথা ০৭ ১ কলিকাতা ; ০৭'১১ চব্বিশ পরগণা ; ০৭'২২ বীরভূম

জেলার সংবাদপত্র]

০৮ [খালি—বিশেষ কোনো বিষয়ের লেখা বা পুস্তিকা এইখানে রাখা যায়]

০৯ দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ

'১ হাতের লেখা বই

'২

'৩ প্রাচীন ছাপা,—যথা লণ্ডনে ও শ্রীরামপুরে ছাপা ;

'৪ গোপনে ছাপা বই

'৫ মূল্যবান্ বাঁধাই (দুস্প্রাপ্য)

'৬ দুষ্প্রাপ্য ছবির বই

'৭ ছাপাবন্ধ বই

'৮ অশ্লীল বই

'৯ অন্যান্য

---

১০ দর্শন (সাধারণ)

১১ দর্শন

১১'১ তত্ত্ববিদ্যা

১১'২ আত্মা

১১'৩ দেহ ও মন

'৩১

'৩২ মানসিক বিকার

১ উন্মাদ

২ জড়বুদ্ধিত্ব

৩ শুচিবায়ু, জলাতঙ্ক

৪ মূর্চ্ছা

৫ দশা, সমাধি

৬ চৌর্য্যরোগ

৭ মদ্য-উন্মাদ

'৩৩ গুহ্যবিদ্যা, যাদু, ইন্দ্রজাল,

১ প্রেত

২ মায়া, ভ্রম

৩ দৈব আবেশ, দৈববাণী, বাক্‌সিদ্ধি

৪ ডাইন বিদ্যা, পিশাচ সিদ্ধি

৫ ইন্দ্রজাল যাদু ভানুমতী

'৩৪ সম্মোহন (মেস্‌মারিজিম)

'৩৫ নিদ্রা, স্বপ্ন ইত্যাদি

'৩৬ মানসিক বিশেষত্ব

'৩৭ স্বভাব

'৩৮ মুখসামুদ্রিক (physiognomy)

'৩৯ মস্তিষ্ক সামুদ্রিক বা করোটি বিজ্ঞান (phrenology)

১১.৪ মতবাদ
১
২ দুঃখবাদ
৩ মরমীয়া অথবা আলোকপন্থ (mysticism)
৬ বস্তুতন্ত্রবাদ
৭ অজ্ঞেয়বাদ
১১.৫ পারলৌকিক
১১.৬ পুনর্জন্ম
১১.৭ স্বর্গনরক
১১.৮
১১.৯ বিবিধ
১২ হিন্দু দর্শন
.১ ন্যায়- গোতম [১৬দ্রষ্টব্য]
.২ বৈশেষিক- কনাদ
.৩ সাংখ্য - কপিল
.৪ যোগ - পতঞ্জলি
.৫ মীমাংসা - জৈমিনি
.৬ বেদান্ত - বাদরায়ণ
.৬১ অদ্বৈতবাদ—শঙ্করাচার্য্য
.৬২ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—রামানুজ
.৬৩ দ্বৈতবাদ—মধ্বাচার্য্য
.৬৪ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—বল্লভাচার্য্য
.৬৫ দ্বৈতাদ্বৈত—নিম্বার্ক-নীলকণ্ঠ
.৬৬ ভেদাভেদ—ভাস্কর
.৬৭ অচিন্ত্যভেদাভেদ-বলদেব
.৬৮ বিজ্ঞানভিক্ষু
.৬৯ অন্যান্য বেদান্ত প্রতিপাদ্য মত
৭ শৈবদর্শন
.৮ বর্ত্তমান
১২.৯ বিবিধ মত
.৯১
.৯২ চার্বাক, লোকায়ত
.৯৩ বৌদ্ধমতানুসারে—
১ শাশ্বতবাদ
২ শাশ্বতাশাশ্বতবাদ
৩ অনন্তানন্তিকবাদ
৪ অমরা বিক্ষেপিকা
৫ অধিকৃত্যসমুৎপন্নতাবাদ
৬ উর্দ্ধআঘাতানিকবাদ
৭ উচ্ছেদবাদ
৮ দৃষ্ট ধর্ম্ম নির্বাণবাদ
৯ অন্যান্য
.৯৪ জৈন মতানুসারে—
.৯৪১ ক্রিয়াবাদী ১৮ প্রকার মত (মরীচি, কুমার, কপিল, উলূক, মাঠর প্রভৃতি)
১ কালবাদী ২ ঈশ্বরবাদী

৩ আত্মবাদী ৪ নিয়তিবাদী

৫ স্বভাববাদী

'৯৪২ অক্রিয়াবাদী (৮৪ প্রকার মত

'৯৪৩ অজ্ঞানবাদী (৬৭ প্রকার)

'৯৪৪ বৈনায়িক (৩২ প্রকার)

১৩ বৌদ্ধ শাস্ত্র

১৩'১ বিনয় পিটক

১ পারাজিক কাণ্ড ২ পাচিত্তিয় কাণ্ড

৩ মহাবগ্‌গ ৪ চুল্লবগ্‌গ

৫ পাববার

১৩'২ সুত্ত পিটক

১ দীঘনিকায়

২ মজ্ঝিম নিকায় ৩ সংযুক্ত নিকায়

৪ অঙ্গুত্তর নিকায় ৫ খুদ্দক নিকায়

১ খুদ্দক পাঠ ২ ধম্মপদ

৩ উদান ৪ ইতিবুত্তক

৫ সুত্তনিপাত ৬ বিমান বত্থু

৭ পেতবত্থু ৮ থেরগাথা

৯ থেরীগাথা ১০ জাতক

১২ পটি সম্ভিদা ১৩ অপদান

১৪ বুদ্ধবংস ১৫ চারিয়া পিটক

১৩'৩ অভিধম্ম পিটক

১ ধম্মসঙ্গনি

২ বিভঙ্গ

৩ ধাতুকথা

৪ পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি

৫ কথাবত্থু

৬ যমক

৭ পট্‌ঠান বা মহাপকরণ

১৩'৪ নবাঙ্গ বুদ্ধশাসন

১ সুত্ত

২ গেয়্য (গাথা মিশ্রিত সূত্র)

৩ বেয়্যাকরণ (সমগ্র অভিধর্ম্ম পিটক, গাথাহীন সূত্র, ও অপর অষ্টাঙ্গে সংগৃহীত বুদ্ধবচন)।

৪ গাথা (ধম্মপদ, থের ও থেরী গাথা, এবং সুত্তনিপাতের মধ্যে মধ্যে 'সুত্ত' নামে অগৃহীত অমিশ্রিত পদ্য)

৫ উদান (খুদ্দনিকায়ের চতুর্থ অংশ)

৬ ইতি বুত্তক (খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত ১১০টি সুত্ত)

৭ জাতক (৫৫০টি গল্প)

৮ অব্ভুত ধম্ম

৯ বেদল্ল

১৩'৫ বৌদ্ধ মহাবিহার

১৩'৬ অন্যান্য সাহিত্য

১৩'৭ হীনযান

'৭১ স্থবিরবাদ (থেরাবাদ)

[বাৎসপুত্রিয়, ধর্ম্মোত্তর,
ভদ্রাবানিক, সম্মিতিয় ষণ্নগরিক
মহীশাসক, ধর্মগুপ্তক
কাশ্যপীয় সৌত্রান্তিক]
'৭২ মহাসঙ্ঘিক (বসুমিত্র)
[মূলমহাসঙ্ঘিক, একব্যবহারিক,
লোকত্তরবাদী, কৌরুকুল্লক
বহুশ্রুতীয়, প্রগুপ্তিবাদী, চৈত্যশালী,
অবরশৈল, উত্তরশৈল]
'৭৩ বজ্জিপুত্তক
'৭৪ অন্ধক [পুব্বসেলিয় অপর-
সেলিয়, রাজগিরিক, সিদ্ধথিক]
'৭৫ সর্ব্বাস্তিবাদী
'৭৬ উত্তরাপথক
'৭৭ হেতুবাদী
'৮৮ বেদল্যক, মহাশূন্য সত্যসিদ্ধি
'৭৯ অন্যান্য যথাঃ-গোকুলিক

১৩.৮ মহাযান
১ মহাযান সূত্র
২ বোধিসত্ত্বাবতার
৩ সুখাবতীব্যুহ
৪ মাধ্যমিক
৫ বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার
৬ শাক্ত বৌদ্ধসাহিত্য
৭ ধারনী
৮ স্তোত্র
৯ বিবিধ যান, যথা বজ্রযান,
মন্ত্রযান,

১৩.৯ অন্যান্য

১৪ জৈন দর্শন

১৪.১ জৈন তত্ত্ববিদ্যা
'১১ জীব (১৪ ভাগ)
'১২ অজীব (অরূপী ও রূপী জীব
'১৩ পুণ্য (৯ রূপ পুণ্য)
'১৪ পাপ (১৮ প্রকার)
'১৫ আস্রব (১৭ প্রধান আস্রব
ও ১৭ অপ্রধান অস্রব)
'১৬ সংবর— ৫ সমিতি,
৩ গুপ্তি
৩২ পরি সহ
১০ যতি ধর্ম্ম
৫ চরিত
১২ ভাবনা
(মোট ৫৭)
'১৭ বন্ধ (৪ প্রকার)
'১৮ নির্জ্জর (৬ প্রকার বাহ্য
কর্ম্মের দ্বারা কর্ম হইতে উদ্ধার
৬ প্রকার আন্তর কর্ম)
'১৯ মোক্ষ(১৬ প্রকার সিদ্ধি)
.২ জৈন ধর্ম্মতত্ত্ব

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

THE VISVABHARATI

"*Yatra viśvam bhavatyekanidam.*"

1. The Visvabharati is for higher studies.

2. The system of examinations will have no place whatever in the Visvabharati, nor is there any conferring of degrees.

2. Students will be encouraged to follow a definite course of study, but there will be no compulsion to adopt it rigidly.

SUBJECTS

3. At present there are four departments of studies here, *viz.*

I. Language and Literature.
II. Philosophy.
III. Arts.
IV. Music.

LANGUAGE AND LITERATURE.

4. This department is now ready to teach the following Languages :—

(i) Sanskrit.
(ii) Pali.
(iii) Prakrit.
(iv) Bengali.
(v) Hindi.
(vi) Gujrati.
(vii) Marathi.

(viii) Maithili.
(ix) Sinhalese.
(xii) French.
(xiii) Greek.
(ix) Latin.

Sanskrit

5. The Sanskrit course is of six years and is divided into two parts, (1) General and (2) Special, each of them being of three years' duration.

PART I.

GENERAL.

(i) Classical Sanskrit :
(*a*) Grammar (Panini)
(*b*) Literature (kavyas including a volume of selected passages beginning from the Vedas down to the Puranas and Tantras).
(ii) Vedic Sanskrit.
(iii) Allied Languages :
(*a*) Gatha Sanskrit.
(*b*) Pali.
(*c*) Prakrit.
(*d*) Avesta.
(*e*) Greek.
(*f*) Latin.

In (*a*), (*b*), (*c*) and (*d*) only a general introduction will be given in the form of lectures not more than six

for each, dealing with the history and phonology, as ar as possible, giving also a few lessons as illusrtaton.

In (*e*) and (*f*) only elementary lessons will be given for philological purposes.

(iv) English.

(v) One European language other than English.

(vi) One Indian vernacular other than the student's mother tongue.

(vii) Philology.

A few lectures in the form of general introduction touching the Indo-European languages with special reference to the Indo-Iranian branch, as well as to the modern Aryan vernaculars of India, and the influence of the Dravidian languages on Sanskrit and the vernaculars.

(viii) History of Sanskrit Literature.

(ix) An outline of the history of Ancient India, Persia, Arabia, Chaldea, Egypt, Greece, Rome, etc., with special reference to India, and Indian religion and literature—only a few lectures, not more than five for each ; but as regards India itself more lectures will be required.

(x) An Ancient Geography of India.

PART II.

SPECIAL

6. The special course (three years) is meant for specialisation in a subject chosen by the student.

7. After finishing the general course in Sanskrit the student may now take up one of the following subjects :

(i) Grammar (Panini).

(ii) Vedanta.

(iii) Buddhist Philosophy.

(iv) Western Philosophy.

In the case of (iii) a considerable amount of knowledge in Pali is absolutely necessary.

Pali

8. The Pali course also extends over six years and is divided into two parts, general and special, for three years each.

9. In the general course some of the subjects are common to the general course of Sanskrit ; but in certain cases the lessons in Pali will be either more or less than those in Sanskrit according to the requirements of the students.

PART I.

GENERAL

(i) Pali ·
  (*a*) Grammar.
  (*b*) Literature.

(ii) Sanskrit :
  (*a*) Grammar.
  (*b*) Literature (chiefly Buddhist works).

(iii) Other allied Languages :

(a) Vedic Sanskrit.

(b) Avesta.

(c) Prakrit.

(d) Gatha Sanskrit.

(e) Greek.

(f) Latin.

(c) and (d), and specially (d), are to be studied more than in the Sanskrit course.

(iv) English.

(v) One European Language other than English.

(vi) One vernacular other than the student's mother tongue.

(vii) Philology.

(viii) History of Buddhist Literature.

(ix) An Outline of the History of Ancient India, etc.

(x) History of Buddhist and Jain India.

(xi) An Ancient Geography of India.

(xii) Deciphering Brahmi and Kharosthi scripts.

PART II.

GENERAL.

10. Having fiinished this course the student may specialise either in the Abhidhamma or the Buddhist Psychology, or in Buddhist philosophy, or in general Pali literature.

11. The students of Sanskrit, Pali, etc. will be

encouraged to learn Bibliographical work and the art of editing and indexing books.

12. They are expected to make themsleves acquainted with up-to-date information regarding their subjects by reading different Oriental Journals.

English

13. The course will be so arranged as to cover the same period of years as to Sanskirt and Pali courses. It would contain the folowing subjects and headings :—

(i) History of the English language.

(ii) History of English literature.

(iii) A comparison with French and German.

(iv) A series of selected poems illustrating the different period of English literature.

(v) A series of selected passages, from prose authors, illustrating English Prose in the different periods of English literature.

(vi) Original composition in English.

(vii) The prosody of English verse.

14. Where students, however, specialise in Sanskrit or Pali, sections ii, iv, v, amd vi, would be taken and i, iii, & vii would be omitted.

Other Languages

15. Syllabuses of other languages are also sufficiently high. These will be published from time to time,

II. PHILOSOPHY

16. For this department see Rule No. 7.

TEXT BOOKS

17. The actual authors and books, to be studied in detail, in all the departments, will be decided at the beginning of each year.

III. ARTS

18. The course to be followed in this department is of not less than six years, and it will be divided into two parts, the first being for general efficiency and the second for higher proficiency.

19. Instruction in Drawing and Painting is given here according to the Indian School of Art.

There is an Art Gallery as well as an Art Library attached to this department.

IV. MUSIC

20. The course of Music, too, is of six years, three years being for general efficiency and three years for higher proficiency.

21. Lessons are given in classical Indian Music as well as in Rabindranath's songs. For comparative study, Western Music is also tought in a general manner.

22. Lessons in Instrumental Music are given also.

RESEARCH WORK

23. Special facilities will be given to students who

desire to conduct research work in the following subjects:—

(i) Sanskrit.
(ii) Pali.
(iii) Prakrit.

LIBRARY

24. Students will get the advantage of using freely a well-equipped library which is an 'open-shelf' one.

ADMISSION

25. Admission will be once a year in January; but during this year there may be some exceptions.

FEES

26. Admission fee is Rs. 20. The usual fee is Rs. 25 per month including board.

27. All correspondence should be made to

The Principal,
Visvabharati,
Santiniketan, Bengal.

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন
পত্রিকাবিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadanand Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা — ফাল্গুন, ১৩২৭ সাল

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"শান্তিনিকেতন" পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হয় বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্রষ্টব্য

কলিকাতায় নং ২০বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এণ্ড কোম্পানীতে খুচরা "শান্তিনিকেতন" নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁহারা ঐ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
(পত্রিকাবিভাগ)

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা | ফাল্গুন, ১৩২৭ সাল

বৌদ্ধদর্শন

(আত্মতত্ত্ব)

[পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে চেতন আত্মা হইতে পারে না, এখন দেখান হইতেছে যে, অচেতনও আত্মা হইতে পারে না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মা চেতন নহে, অচেতন; অপর কথায় আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মার সহিত মনের, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আচার্য্য [illegible] এই মতই খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—]

৬৯

অচেতনত্ব হেতু [illegible]ায় অচেতনও 'আমি' (অর্থাৎ আত্মা) হইতে পা[illegible]

পূর্ব্বোক্ত রূপে চেতন তো আত্মা হইতে পারে না, অচেতনও আত্মা হইতে পারে না। অচেতন বলিয়া পট-প্রভৃতি যেমন আত্মা হয় না, সেইরূপ, আত্মা বলিয়া যাহাকে আপনারা মনে করিতেছেন সে-ও অচেতন হইলে আত্মা হইতে পারে না। আপনারা ইহাকে অচেতন বলেন, অথচ ইহা কর্ত্তা (ভোক্তা ইত্যাদি) ইহাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

আত্মার অচেতনত্ববাদী মনে করিতে পারেন যে, আত্মা স্বয়ং অচেতন হইলেও বুদ্ধিরূপ চেতনা থাকায় তাহাতেই সে জানে, এবং এইরূপেই পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারে না। ইহাই ভাবিয়া আচার্য্য বলিতেছেন—

আর যদি (ইহা) চেতনার যোগে জ্ঞাতা হয়, তাহা হইলে যখন ইহা জ্ঞাতা নহে, তখন বলিতে হয় যে, ইহা নষ্ট হইয়াছে।

'চেতনার যোগে' অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত সমবায় সম্বন্ধ থাকায় আত্মা স্বয়ং অচেতন হইলেও জ্ঞাতা হয়, যদি আত্মাকে এইরূপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, ইহা নষ্ট হইয়া যায়; মদ-মূর্চ্ছা-প্রভৃতি অবস্থায় যখন চেতনার নিবৃত্তি হয়, তখন এই আত্মা অজ্ঞ অজ্ঞাতা, ইহা কোনো কিছু জানে না, তখন তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী চৈতন্যসম্বন্ধরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করায় বিনষ্ট হয় বলিতে হয়।

যখন চৈতন্যের সম্বন্ধ থাকে, এবং যখন তাহা থাকে না, এই উভয় কালেই আত্মার স্বভাব একই থাকে, এবং সেই জন্যই পূর্ব্বোক্ত দোষ হয় না। পূর্ব্বপক্ষীর এই অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন—

৭০

আর যদি আত্মা অবিকৃতই থাকে, তবে চৈতন্য ইহার কি করে?

আর যদি চৈতন্যের উৎপত্তিতে ও [illegible] বিরোধে আত্মা অবিকৃতই থাকে, অনুৎপন্ন- ও অনিরুদ্ধ-স্বভাবই [illegible] এই অচেতন ও সর্ব্বকালে অবিকৃত

আত্মার চৈতন্ত কি করে ? চৈতন্য ইহার কোন্ অতিরিক্ত অবস্থা (অতিশয়) উপস্থাপিত করে ? কিছুই করে না। বুদ্ধির সহিত যোগ হইলেও অবিচলিত পূর্ব্ব স্বভাবেই যদি আত্মা অবস্থান করে তবে তাহা অচেতনই (অর্থাৎ অজ্ঞই) থাকে।

আর যদি ইহাই হয় তাহা হইলে—

এইরূপে অজ্ঞ ও নিষ্ক্রিয় আকাশকেও আত্মা বলিয়া মনে করিতে হয়।

'অজ্ঞ' অর্থাৎ হিতাহিত কিছুই জানিতে অসমর্থ। 'নিষ্ক্রিয়' ক্রিয়া হইতে বহির্ভূত, কেননা তাহার (আকাশের) কোনো প্রতীকার করিতে পারা যায় না, তাহার কোনোরূপ বিশেষ অবস্থা উৎপাদন করিতে পারা যায় না, তাহার কোনোরূপ সংস্কার করিতে পারা যায় না। অথবা 'নিষ্ক্রিয়' শব্দের অর্থ সমস্ত কর্ম্মে শক্তিহীন, গমনাদিক্রিয়াশূন্য। 'আকাশ' শব্দে এখানে আকাশকল্প অর্থাৎ আকাশ-সদৃশ, কেননা 'আকাশের' এখানে কোনো উপযোগিতা নাই। অর্থাৎ অজ্ঞ ও নিষ্ক্রিয় এবং এই জন্যই আকাশসদৃশ বস্তু আত্মা হয়, ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়া পড়ে। সিদ্ধান্তীর ইহা নিজের মতে উদাহরণ—যেমন আকাশ নিঃস্বভাব ও সর্ব্বক্রিয়াশূন্য এবং বস্তুত তাহা সংজ্ঞামাত্র আত্মাও সেইরূপ। অথবা ইহা পূর্ব্ব-পক্ষীরও মতে উদাহরণ—যেমন আকাশ অচেতন ও অক্রিয় বলিয়া কোনো কর্ম্মের কর্ত্তা প্রভৃতি হইতে পারে না, আত্মাও সেইরূপ, ইহাই ভাবার্থ।

পূর্ব্বপক্ষীর মত উল্লেখ করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন—

৭১

যদি (বল), আত্মা বিনা কর্ম্মফলের সম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত হয় না,

যদি পরলোকগামী কেহ না থাকে তবে সেই পরলোকগামী আত্মা বিনা কর্ম্মফলের সম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত হয় না। 'কর্ম্ম' শুভ ও অশুভ দ্বিবিধ। 'ফল' সেই (শুভ

ও অশুভ) কর্ম্মেরই ইষ্ট ও অনিষ্ট রূপ ফল। তাহাদের সম্বন্ধ। অথবা কৃত কর্ম্মের ফলের সহিত সম্বন্ধ। যে কাজ করে সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, অন্যে নহে। 'যুক্তিযুক্ত হয় না' ঘটিত হয় না। পরলোকে কর্ম্মফলের সম্বন্ধ (সকলেরই) অভিলষিত। বৌদ্ধগণেরও ইহাতে বিবাদ নাই। সূত্রে (দিব্যাবদান ৫৪ পৃ.) ইহা উক্ত হইয়াছে—"কর্ম্ম করিয়াছে এই ব্যক্তি, অন্য আবার কে (ফল) অনুভব করিবে?...অতএব কর্ম্মফল-সম্বন্ধ আপনাদেরও (বৌদ্ধগণেরও) মতে অভিষিদ্ধ। অতএব আত্মাকে স্বীকার করা উচিত। তাহা না হইলে এই সমস্তই অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বপক্ষীর মত উল্লেখ করিয়া আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন যে, আত্মা না থাকিলে কিরূপে কর্ম্মফল-সম্বন্ধ ঘটিতে পারে—

কেননা কর্ম্ম করিয়া (কর্ম্মকর্ত্তা) বিনষ্ট হইলে ফল হইবে কাহার?

'কর্ম্ম করিয়া' শুভাশুভ কর্ম্ম উৎপাদন করিয়া, 'বিনষ্ট হইলে' অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা নিরুদ্ধ হইলে, 'ফল হইবে কাহার?' কারণ, পরলোকগামী কোনো আত্মার অস্তিত্ব (আপনাদের বৌদ্ধদের মতে) নাই। (আপনাদের মতে) চিত্ত ক্ষণিক, কর্ম্ম করিবার পর যখন ঐ কর্ম্মের ক্রিয়া হয় চিত্ত তখন নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন আর তাহা থাকে না। অতএব সুগতিতে বা দুর্গতিতে কৃত কর্ম্মের সুখদুঃখরূপ ফল কাহার 'হইবে' উৎপন্ন হইবে? কাহারো হইবে না। আপনাদের মতে বলিতে হয়, পরলোকে কৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা অন্য কোনো ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপে আপনাদের মতে কৃত কর্ম্মের বিনাশ হয় (অর্থাৎ তাহা ফল দেয় না), আর অকৃত কর্ম্মের উপস্থিতি হয় (অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলেও তাহার ফল পাওয়া যায়)। স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, বন্ধ ও মোক্ষ প্রভৃতিও আপনাদের মতে যুক্তিযুক্ত হয় না।

আচার্য্য পূর্ব্বপক্ষীকে বলিতেছেন, যদি ইহাই আপনাদের মত হয় তবে তাহা ঠিক নহে, কারণ :—

৭২

আমাদের দুই জনেরই মতে ক্রিয়া ও (তাহার) ফলের আধার যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা নিশ্চিত।

'আমাদের দুই জনেরই' অর্থাৎ আত্মবাদী আপনার ও নৈরাত্ম্যবাদী আমার। ...'ক্রিয়া ও ফলের আধার ভিন্ন-ভিন্ন অর্থাৎ কর্ম্ম করা হয় এই ভবে, আর ফল হয় পরলোকে, অতএব তাহাদের আধার ভিন্ন-ভিন্ন। কারণ, যে শরীরে এজন্মে কর্ম্ম করে, মৃত হইয়া সেই শরীরেই আবার ফল ভোগ করে না। অতএব কর্ম্মের কর্ত্তা অন্য, আর তাহার ফলভোক্তা অন্য। এইরূপে ক্রিয়া ও ফলের আধার ভিন্ন-ভিন্ন। ইহাতে আমাদের দুই জনেরই বিপ্রতিপত্তি (অর্থাৎ বিরুদ্ধ বুদ্ধি) নাই।

পূর্ব্বপক্ষী। আত্মার ব্যাপার যদি না থাকে তবে তো কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বই হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

আর তাহাতে আত্মার কোনো ব্যাপার নাই। অতএব এ বিষয়ে বিবাদ নিষ্ফল।

'তাহাতে' অর্থাৎ কর্ম্ম করা আর তাহার ফলভোগে আত্মার কোনো ব্যাপার নাই, কারণ তাহা নিষ্ক্রিয়; এবং তাহা এই জন্যই নিষ্ক্রিয় যে, তাহা অচেতন। আবার যেহেতু তাহা নিত্য, সেই জন্যই তাহা কোনো কার্য্যে সমর্থ নহে। আর যে আপনারা বলিয়া থাকেন—

> "আত্মার কর্ত্তৃত্ব বলিতে ইহাই বুঝায় যে, তাহার সহিত জ্ঞান-প্রভৃতির সম্বন্ধমাত্র আছে; আর তাহার ভোক্তৃত্ব বলিতে ইহাই বুঝায় যে, তাহার সহিত সুখদুঃখাদির অনুভবের যোগ (সমবায়) আছে।"

ইহাও সঙ্গত হয় না, কারণ কর্ম্ম করা ও ফলভোগের পূর্ব্বে ও পরে উভয় কালেই পূর্ব্বোক্তরূপে (দ্রষ্টব্য ৭০শ কারিকা) আত্মার স্বভাব অবিচলিত অবিকৃত ভাবে থাকে। অতএব এ বিষয়ে অর্থাৎ নির্ব্যাপার আত্মার বিষয়ে বিবাদ নিষ্ফল,

কেননা যে অন্য, অর্থাৎ যে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের জন্য আত্মাকে স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহাতে তাহার কোন উপযোগিতা নাই।

পূর্ব্বপক্ষী। ভাল, যদি আত্মা না থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় কর্ম্ম করিলেও তাহার ফলভোগ করা হয় না; এবং এইরূপ আরো দোষ হইয়া থাকে। ইহার সমাধান কি?

সিদ্ধান্তী উত্তর করিতেছেন—

৭৩

যাহার হেতু আছে তাহারই সহিত ফলের যোগ হয়, এ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

'যাহার হেতু আছে' অর্থাৎ যাহার সহিত কর্ম্মের যোগ আছে 'তাহারই সহিত ফলের যোগ হয়' অর্থাৎ সে-ই ফলসম্বদ্ধ বা ফলভোগী হয়, এরূপ সম্ভাবনা তো দেখা যায় না, অর্থাৎ উপলব্ধ হয় না। কারণ, মৃত হয় অন্য ব্যক্তি, আর জাত হয় অন্য ব্যক্তি।[১] অতএব যাহার হেতু আছে তাহারই সহিত ফলের যোগ হয় ইহা দেখা যায় না।

পূর্ব্বপক্ষী। যদি তাহাই হয়, তবে আপনারা যে, বলিয়া থাকেন "কর্ম্ম করিয়াছে এই ব্যক্তি অন্য আবার কোন্ ব্যক্তি ইহার (ফল) অনুভব করিবে,"[২] ইহার সমাধান কিরূপে হইবে?

সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

১। বোধিচর্য্যাবতারে পূর্ব্বে (৮.৯৮) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যখন আত্মা বা এইরূপ অপর কিছু পরলোকগামী নাই, কেবল রূপাদি পাঁচটী স্কন্ধমাত্র আছে, তখন পরজন্মেও ঐ একই 'আমি' থাকে, এ কল্পনা মিথ্যা, যেহেতু মরে অন্য, আর জাত হয় অন্য; এক স্কন্ধপঞ্চক এ জন্মে নষ্ট হয়, অন্য স্কন্ধপঞ্চক পর জন্মে উৎপন্ন হয়। মূল কারিকাটি এই:—

"অহমেব তদাপীতি মিথ্যেয়ং পরিকল্পনা।
অন্য এব মৃতো যস্মাদন্য এব প্রজায়তে॥

তদাপীতি—ভবান্তরেহপি।

২। দিব্যাবদান পৃঃ৫৪, ৫০৪।

সন্তানের (প্রবাহ বা ধারার) ঐক্য অবলম্বন করিয়াই 'কর্ত্তা' 'ভোক্তার' কথা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সন্তানের অর্থাৎ কার্য্যকারণ-ভাবে প্রবর্ত্তমান পর-পরবর্ত্তী ক্ষণসমূহের[৩] ঐক্য অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিশ্চয়-অনুসারে অনেকের মধ্যে আরোপিত এক-ত্বকে অবলম্বন অর্থাৎ নিমিত্ত করিয়া 'কর্ত্তা' 'ভোক্তা' এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কর্ম্মের কর্ত্তা সেই তাহার ফলের ভোক্তা' এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যদিও ভগবান্ ইহা উপদেশ দিয়াছেন তথাপি ইহার তাৎপর্য্যকে বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে, এই মনে করিয়াই তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন; কেননা এরূপ না করিলে সাধারণ লোকে মনে করিতে পারিত যে, কর্ম্মফলের উচ্ছেদ হয় (অর্থাৎ কর্ম্মের ফল কেহ ভোগ করে না)। ঐরূপ বলায় তিনি যে পরলোকগামী কোনো জীবের কথা বলিয়াছেন তাহা নহে। এই জন্যই সেখানে[৪] বলা হইয়াছে "(হে ভিক্ষুগণ, যে সকল কর্ম্ম কৃত ও সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমুদয় বাহিরে পৃথিবীতে, জলে, তেজে, বা বায়ুতে বিপাক অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত হয় না), সেই সমস্ত কৃত ও সঞ্চিত কর্ম্ম গৃহীত স্কন্ধপ্রভৃতিতেই[৫] বিপাক প্রাপ্ত হয়।"

৩। একটি ক্ষণের পর আর একটি ক্ষণ, তাহার পর আর একটি, তাহার পর আর একটি, এইরূপে ক্ষণসমূহ চলিতেছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ পরবর্ত্তী ক্ষণের কারণ, আর পরবর্ত্তী ক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণের কার্য্য, এই প্রকারে ক্ষণসমূহের মধ্যে কার্য্যকারণ-ভাব থাকে। এইরূপে পূর্ব্বক্ষণে যে পদার্থ, পরবর্ত্তী ক্ষণে তাহা হইতেই ঠিক তাহারই মত আর একটি পদার্থ, তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণে তাহা হইতে আবার সেইরূপ আর একটি পদার্থ, এই প্রকারে পদার্থসমূহের ধারা চলিতে থাকে। এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্বপূর্ব্ব পদার্থ পর-পরবর্ত্তী পদার্থের কারণ, আর পর-পরবর্ত্তী পদার্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থের কার্য্য, এইরূপে ইহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব থাকে।

৪। পূর্ব্বোল্লিখিত দিব্যাবদান দ্রষ্টব্য।

৫। অর্থাৎ রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ, চক্ষু প্রভৃতি অষ্টাদশ ধাতু, চক্ষুর্বিজ্ঞানাদি দ্বাদশ আ...।

আরো একটা কথা বিচার করিয়া দেখিবার আছে। কর্ম্মের ও তাহার ফলের কথা বলা হইতেছে, কিন্তু দেখিতে হইবে বস্তুত এই কর্ম্ম কি। কর্ম্ম চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে, চিত্তই কর্ম্ম। কর্ম্ম বলিতে গমনাদি কোনো ক্রিয়া নহে, কিন্তু যে চিত্ত উৎপন্ন হইলে গমনাদি ক্রিয়া উৎপন্ন হয় সেই চিত্তেরই নাম কর্ম্ম। উক্ত হইয়াছে "কর্ম্ম হইতে লোকের বৈচিত্র্য হয়, এই বৈচিত্র্য হইতেছে চেতনা (অর্থাৎ চিত্ত) এবং চেতনা দ্বারা যাহা কৃত হয়। চেতনা শব্দে মানস কর্ম্ম, আর তাহা হইতে জাত হয় বাক্য ও শরীরের ক্রিয়া।"[৬] অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে "অতিবিচিত্র চিত্তই জীবলোক ও তাহার আধারভূত লোককে রচনা করিয়া থাকে। বলা হইয়াছে অশেষ জগৎ কর্ম্ম হইতে জাত হয়, কিন্তু চিত্ত ছাড়া কর্ম্ম নাই।"[৭] অতএব চিত্ত ছাড়া অন্য কর্ম্ম নাই। সেই কুশলাকুশলরূপ চিত্ত উৎপন্ন হইয়া যে ক্ষণে নিরুদ্ধ হয় ঐ ক্ষণে তাহা হইতে যে চিত্ত (সন্তানভাবে) উৎপন্ন হয়, তাহাতে নিজের কুশলাকুশলাদি সংস্কাররূপ বাসনাকে অর্পণ করে। আবার এইরূপে বাসনাপ্রাপ্ত এই চিত্তও পরপরবর্ত্তী ক্ষণপরম্পরায় অবিচ্ছেদে সন্তানরূপে প্রবর্ত্তমান হইয়া পরিণামবিশেষ প্রাপ্ত হয়, ও পূর্ব্বের শুভাশুভ কর্ম্মবিশেষের অনুরূপ সেইরূপ সুখাদিস্বভাব চিত্তরূপই ফল পরলোকে উৎপাদন করে। পৃথিবী-বীজ-প্রভৃতি পরস্পরসংযোগরূপ কারণ-বিশেষে প্রথম ক্ষণে একটি অবস্থাবিশেষে (অতিশয়) প্রাপ্ত হয়, পরে তাহার দ্বিতীয় ক্ষণে অঙ্কুররূপ কার্য্যের অনুকূল অবস্থাবিশেষ উৎপাদন করিয়া পর-পরবর্ত্তী ক্ষণে ঐ অবস্থাবিশেষের তারতম্য উৎপন্ন করিতে-করিতে শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ তারতম্যের চরম প্রকর্ষ উৎপন্ন করিয়া বীজের অনুরূপ শালি বা কোদ্রবের অঙ্কুর উৎপাদন করে। তালরূপে লাক্ষারসের ভাবনা দিয়া (অর্থাৎ তাহাতে ভিজাইয়া রাখিয়া)

৬। "কর্ম্মজং লোকবৈচিত্র্যং চেতনা তৎকৃতং চ তৎ।
চেতনা মানসং কর্ম্ম তজ্জে বাক্‌কায়কর্ম্মণী ॥"

৭। "সত্ত্বলোকমথ ভাজনলোকং চিত্তমেব রচয়ত্যতিচিত্রম্।
কর্ম্মজং জগদুক্তমশেষং কর্ম্ম চিত্তমবধূয় চ নাস্তি ॥"

দাড়িম-প্রভৃতির বীজকে যদি বপন করা যায়, তাহা হইলে সেই লাক্ষারসের সংস্কার পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়া তাহাদের পুষ্পকে রক্তবর্ণ করে। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালে অনুগামী কোনো এক পদার্থ নই।...উক্ত হইয়াছে—

"যে সন্তানে কর্ম্মের বাসনা (সংস্কার) অর্পিত হয়, ফল তাহাতেই হয়, যেমন কার্পাসে রক্ততা উৎপন্ন হইয়া থাকে।"[৮]

অতএব বীজপ্রভৃতিতে যেমন আত্মা না থাকিলেও নিয়মত কার্য্য ও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয়, আলোচ্য বিষয়েও সেইরূপ পরলোকগামী কেহ না থাকিলেও কার্য্যকারণভাবের নিয়ম থাকায় প্রতিনিয়তই ফল হইয়া থাকে। রাগদ্বেষাদি ক্লেশ ও কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানের অবিচ্ছেদে প্রবৃত্তি হেতু পরলোকে ফল পাওয়া যায়। অতএব এইরূপেই কৃত কর্ম্মের নাশ হয় না, এবং অকৃত কর্ম্মেরও ফল উপস্থিত হয় না।[৯] ...এইরূপে উভয় লোকগামী একজন কেহ না থাকিলেও কোনো বিরোধ হয় না।...

পূর্ব্বপক্ষী। যদি আত্মা না-ই থাকে তবে কিরূপে "আত্মাই আত্মার নাথ, অন্য নাথ আর কে হইবে? আত্মাকে ভাল করিয়া দমন করিলে তাহা দ্বারা পণ্ডিত জন স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।"—এই গাথায় (আত্মার কথা) উক্ত হইয়াছে?

সিদ্ধান্তী। এখানে অহঙ্কারের আশ্রয়রূপে চিত্তকেই আত্মশব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা অপর সূত্রে চিত্তেরই দমনের কথা বলা হইয়াছে—

"চিত্তের দমন উত্তম, চিত্তকে দমন করিলে তাহা সুখাবহ হয়।"

যাহারা আত্মবাদে অভিনিবিষ্ট, হইয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে অন্যত্র আত্মার কল্পনা করে, তাহাদের ঐ কল্পনাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ব্যাবহারিক ভাবে (সংবৃতি সত্য-

---

৮। কার্পাসের বীজকে লাক্ষারসে ভিজাইয়া লাগাইলে অঙ্কুরাদি পরম্পরায় কার্পাসে রক্তবর্ণ উৎপন্ন হয়। বস্তুত ইহা হয় কি না পরীক্ষণীয়। দ্রঃ—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (আর্হত দর্শন) পৃ.২৫ (এসিয়াটিক সোসাইটী)।

৯। বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকায় এখানে (৪০৪-৪৮২ পৃঃ) আরো বহু কথা বলা হইয়াছে বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

অনুসারে) চিত্তকে আত্মা বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, পরমার্থ ভাবে নহে। অতএব যে, লঙ্কাবতারে উক্ত হইয়াছে—

> "পুদ্‌গল (জীব বা আত্মা), সন্তান, স্কন্ধ সমূহ, হেতু বা কারণসমূহ, অণুসমূহ, প্রধান (প্রকৃতি), ঈশ্বর ও কর্ত্তা,—এই সমস্তকেই আমি কেবল চিত্ত বলি।"

তাহাও ব্যাখ্যাত হইল; কেননা, ইহাও লোকের অন্যত্র আত্মাভিনিবেশকে খণ্ডন করিবার জন্য বলা হইয়াছে। ইহাতে পরমার্থত চিত্তের সত্তা উক্ত হয় নাই। এইরূপে স্কন্ধ-প্রভৃতিতেও আত্মার উক্তিকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব চিত্তও বস্তুত 'অহং' প্রতয়ের বিষয় নহে।

অথবা, না হয় চিত্ত পরমার্থতই সৎ হইল; কিন্তু তাহা হইলেও তাহা অহঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না। আচার্য্য তাহাই দেখাইয়াছেন—

৭৪

অতীত ও অনগতে চিত্ত 'আমি' নহি; কেননা তাহা নাই।

কল্পনা করিলে চিত্ত তিন প্রকার হইতে পারে; অতীত, অনাগত, ও বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে যে চিত্ত অতীত তাহা তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর অনাগত চিত্ত (এখনো) জাত হয় নি। অতএব এই দুই চিত্ত 'অহং' প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারে না; কেন না সেই অতীত ও অনাগত চিত্ত বিদ্যমান নাই, এখন তাহারা নাই। যাহা অতীত তাহা ক্ষীণ নিরুদ্ধ, বিগত ও বিপরিণাম প্রাপ্ত, আর যাহা অনাগত তাহা তো উপস্থিতই হয় নি।

পূর্ব্বপক্ষী। ভাল, তাহা হইলে বর্ত্তমান চিত্ত 'আমি' হইবে।

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

আর যদি উৎপন্ন চিত্ত 'আমি হয়, তাহা হইলে ইহা নষ্ট হইলে 'আমি' আর থাকে না।

আপনারা যে বলিতেছেন 'উৎপন্ন' অর্থাৎ বর্ত্তমান চিত্ত 'আমি' হউক, তাহাও

যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু 'ইহা নষ্ট হইলে 'আমি' আর থাকে না, অর্থাৎ এই বর্ত্তমান চিত্ত নষ্ট হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষণে অতীত হইলে 'আমি' আর থাকে না। পরে আর তাহাকে 'অহং'-প্রত্যয়ের বিষয় বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান চিত্তের স্থিতি (পরক্ষণেই আর) পাওয়া যায় না; অতএব কিরূপে তাহাকে ('অহং' প্রত্যয়) আগমন করিতে পারে। অতএব (এই অহং প্রত্যয়) চিত্তকেও আলম্বন না করায় তাহা নিরালম্ব, ইহাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে আত্মার অভাব হেতু তাহা কালত্রয়বর্ত্তী চিত্তের বিষয় হয় না, এবং চিত্তও অহঙ্কারের বিষয় হয় না।

ইহাই সিদ্ধ করিয়া আচার্য্য উপসংহার করিয়া বলিতেছেন :—

৭৫

যেমন কদলীস্তম্ভকে ভাগভাগ করিলে তাহার (মধ্যে) কোন সদ্‌বস্তু থাকে না (অর্থাৎ তাহার কোন সার পদার্থ পাওয়া যায় না), সেইরূপ বিচার করিয়া অন্বেষণ করিলে 'আমিও' অসৎস্বরূপ হইয়া থাকে।

'আমিও' অর্থাৎ 'অহং' প্রত্যয়ের বিষয়ও; 'অসৎস্বরূপ' অর্থাৎ অবস্তুভূত, বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায়। তাৎপর্য্য এই যে, ('অহং'-প্রত্যয়ের) কোনো বিষয় নাই।

সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

৭৬

যদি বলা যায়, জীব (আত্মা) যদি না থাকে তবে (বোধিসত্ত্বগণের) দয়া কাহার উপরে হইবে?

বিচার করিলে সর্ব্বপ্রকারেই যদি আত্মা না থাকে, তবে বোধিসত্ত্বগণের দয়া কাহার উপরে হইবে? কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই দয়া হইবে? করুণা হইতেছে সম্যক সম্বোধির সাধন, এই জন্য ইহা সমস্ত বুদ্ধধর্ম্মের অগ্রে থাকে। আর্য্যধর্ম্মসঙ্গীতি-নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, মহাসত্ত্ব আর্য্য অবলোকিতেশ্বর-

শঙ্খা নামক বোধিসত্ত্ব ভগবান্‌কে বলিয়াছেন—"ভগবন্, বোধিসত্ত্বের বহুধর্ম্ম শিক্ষা করার প্রয়োজন নাই, তাহাকে একটি ধর্ম্মের ভাল করিয়া আরাধনা করিতে হইবে, তাহাতেই প্রবেশ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই সমস্ত বুদ্ধধর্ম্ম তাহার করতলগত হইবে। সেই একটি ধর্ম্ম কি? তাহা মহাকরুণা। মহাকরুণার সমস্ত বুদ্ধধর্ম্ম করতলগত হয়। যেমন চক্রবর্ত্তী রাজার রথচক্র যেখানে যায় তাঁর সমস্ত বল সেখানে গিয়া থাকে, সেইরূপ বোধিসত্ত্বের মহাকরুণা যেখানে থাকে, সমস্ত বুদ্ধধর্ম্ম সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। যেমন জীবিতেন্দ্রিয় থাকিলে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়েরও কার্য্য হয়, সেইরূপ মহাকরুণা থাকিলে সমস্ত বোধিধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হয়।" অতএব প্রথমত ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই করুণার বিষয় হইতেছে জীব, জীব না থাকিলে তাহা হইতে পারে না, দুঃখিত জীবেরই প্রতি করুণা উৎপন্ন হইয়া থাকে। (সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীকে বলিতেছেন, আপনারা যদি এইরূপ বলেন, তবে তাহার উত্তর এই)—

কার্য্যের জন্য স্বীকৃত মোহ দ্বারা যে কল্পিত হইয়াছে (তাহার উপর)।

'কার্য্য' অর্থাৎ অভিমত বা সাধ্য বিষয়, পুরুষার্থ; তাহার জন্য যে 'মোহ' অর্থাৎ সংবৃতি (ব্যাবহারিক) সত্য স্বীকার করা হয়, ইহারাই দ্বারা যে জীব কল্পিত হইয়া থাকে, তাহারই উপর বোধিসত্ত্বগণের করুণা হয়। এখানে সাধ্য অর্থাৎ সাধনার বিষয় হইতেছে বুদ্ধত্ব—যাহাতে কোনোরূপ কল্পনা বা কোনোরূপ আবরণ থাকে না। সমস্ত পদার্থই (নিঃস্বভাব আকাশের ন্যায়, তাহাদের কোনো সত্তা নাই, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহাদের কোনো) উপলব্ধি হয় না,—এই জ্ঞান না হইলে ঐ বুদ্ধত্ব পাওয়া যায় না। প্রজ্ঞা প্রকর্ষ লাভ করিলেই ইহা পাওয়া যায়। আদরপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলেই প্রজ্ঞার প্রকর্ষ হইতে পারে, এবং তাহার আরম্ভ হয় করুণায়। এই করুণা প্রথমত দুঃখিত জীবের প্রতি উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতেই দানাদির জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। এই কার্য্যের জন্য সংবৃতিসত্যরূপ মোহ স্বীকৃত হইয়াছে। তাই প্রথমত করুণার বিষয় হয়

জীব, পরে তাহার বিষয় হয় (জীবাজীবনির্ব্বিচারে সাধারণত) পদার্থ (ধর্ম্ম), এবং শেষে তাহার কোনো অবলম্বন বা বিষয় থাকে না। এইসব কথার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, জীবের যে একব্যরেই অভাব, তাহা নহে। সংবৃতি বা ব্যাবহারিক সত্য অনুসারে স্কন্ধ-প্রভৃতিকেই আত্মা বলা হইয়া থাকে। ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন—"হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ 'আত্মা' বলিয়া কিছু দেখেন, তাঁহারা এই (রূপবেদনাদি) পাঁচটি উপাদান-স্কন্ধকেই আত্মা বলিয়া দেখিয়া থাকেন।" এই জন্য যদিও পরমার্থত বিচার করিলে জীবকে পাওয়া যায় না, তথাপি সংবৃতি সত্য-অনুসারে তাহা নিষিদ্ধ হয় না। ইহাই উক্ত হইয়াছে :—

"যেহেতু প্রজ্ঞা তত্ত্বকে (অর্থাৎ পরমার্থসত্যকে), আর করুণা সংবৃতিকে (অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্যকে) অনুসরণ করে, সেই জন্য তুমি যখন যথার্থভাবে বিচার করিয়াছিলে তখন তোমার নিকট সমস্ত জগৎ নিঃসত্ত্ব (অর্থাৎ জীবহীন) বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল ; কিন্তু যখন তুমি দশবলের[১০] জননীস্বরূপা করুণায় আবিষ্ট হইয়াছিলে তখন পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় এই জগতে আর্ত্তজনের প্রতি তোমার প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল।"

চতুস্তবেও উক্ত হইয়াছে—

"হে নাথ, জীব-বুদ্ধি সর্ব্বপ্রকারেই আপনার উৎপন্ন হয় না ; আবার দুঃখার্ত্ত জীবের প্রতি আপনি অত্যন্ত দয়ালু।"

অতএব ঐ রূপপ্রভৃতি স্কন্ধই সত্ত্ব (বা জীব) শব্দে উক্ত হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই করুণা নির্বিষয় নহে।

পূর্ব্বপক্ষী। ভাল, পরমার্থত যদি জীব না থাকে, তবে, (পূর্ব্বে যে আপনারা বলিয়াছেন "কার্য্যের জন্য," কারিকা ৭৬) সেই কার্য্য কাহার? সেই কার্য্য-সাধনায় জন্য কাহার প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ?

১০। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, ইত্যাদি বুদ্ধের দশটি বল। অথবা 'দশবল' শব্দে এখানে বুদ্ধকেও ধরিতে পারা যায়।

পূর্ব্বপক্ষীর এই আশঙ্কা উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

৭৭

জীব যদি না থাকে তবে কার্য্য কাহার?
সত্য কথা; চেষ্টাটা মোহবশত হইয়া থাকে।

জীব যদি না থাকে তাহা হইলে অনুগামী কেহ না থাকায় কার্য্য কাহার? রূপপ্রভৃতি স্কন্ধের ইহা হইতে পারে না, কারণ তাহারা উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব বলিতে হয় যে, কাহারো কার্য্য নাই।

পূর্ব্বপক্ষীর এই কথার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, সত্য কথা, পরমার্থত কাহারো কার্য্য নাই; কারণ কোনো পদার্থেরই কেহ স্বামী নহে।[১১]

পূর্ব্বপক্ষী। যদি তাহাই হয়, তবে তাহা সাধন করিবার জন্য প্রথমত প্রবৃত্তি হয় কেন?

সিদ্ধান্তী। মানুষ কার্য্যার্থী হইয়া যে, তজ্জন্য চেষ্টা করে তাহা মোহবশত। অর্থাৎ বস্তুত জীব না থাকিলেও ব্যাবহারিক সত্য-অবলম্বনে 'ঐ কার্য্যটি আমার হইবে' এইরূপে (কার্য্যকর্ত্তার) একত্বনিশ্চয়[১২] হেতুই তাহা হইয়া থাকে; কারণ সমস্তই মায়াস্বরূপ বলিয়া কোনো পদার্থের চেষ্টা থাকিতে পারে না।...অতএব কার্য্যের জন্য যে চেষ্টা তাহা সংবৃতি হইতেই হইয়া থাকে।

পূর্ব্বপক্ষী। মোহ অবিদ্যাস্বরূপ বলিয়া যখন কোনোরূপেই তাহাকে স্বীকার করিতে পারা যায় না, তখন কিরূপে তাহাকে আপনারা স্বীকার করিতেছেন?

সিদ্ধান্তী—

১১। সম্ভবত ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, বস্তুত যদি কেহ কোনো বস্তুর স্বামী হয়, তাহা হইলে সে ঐ বস্তুকে নিজের ইচ্ছানুসারে যেমন চায় তেমনি করিতে পারে, কিন্তু বস্তুত কেহ তাহা সেরূপ করিতে পারে না। কোনো দুঃখকর পদার্থকে কেহ ইচ্ছা করিলে সুখকর করিতে পারে না; অগ্নিকে কেহ জল করিতে পারে না।

১২। অর্থাৎ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ও পরে, অথবা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ও কার্য্য করিবার সময় কার্য্যকর্ত্তা একই,—এই নিশ্চয় করায়।

কার্য্যমোহকে (অর্থাৎ যাহাতে কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে সেই মোহকে) দুঃখের বিশেষরূপ উপশমের জন্য নিষেধ করা হয় না।

মোহ দুই প্রকার; এক সংসারের উৎপত্তির হেতু, আর অপরটি তাহার উপশমের হেতু। ইহাদের মধ্যে যাহা সংসারের হেতু তাহা পরিত্যাজ্য; কিন্তু দুঃখের বিশেষরূপ উপশম হয় বলিয়া অর্থাৎ সমস্ত জীবপ্রভৃতির দুঃখের নিবৃত্তি হয় বলিয়া 'কার্য্যের' অর্থাৎ পরমার্থসত্যের লাভের জন্য যে, দ্বিতীয় মোহ তাহাকে নিষেধ করা হয় না, বরং স্বীকারই করা হইয়া থাকে; কেননা পরমার্থ-লাভের জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। এই যে পরমার্থ সত্যের লাভরূপ কার্য্য, মহতেরা তাহা নিজের সুখের জন্য করেন না, তাহা তাঁহারা সমস্তজীব-দুঃখের আত্যন্তিক ও সবিশেষ উপশমেরই জন্য করিয়া থাকেন। এই দুঃখোপশমের উপায় হইতেছে পরমার্থ সত্যের লাভ (জ্ঞান), এবং পরমার্থ সত্যের লাভের উপায় সংবৃত্তি সত্য, কারণ সংবৃতি বিনা পরমার্থ বুঝা যায় না।[১৩]

পূর্ব্বপক্ষী। কার্য্যমোহ অবিদ্যাস্বরূপ হইলেও যেমন দুঃখোপশমের কারণ বলিয়া তাহাকে আপনারা স্বীকার করিতেছেন, সেইরূপ আত্মমোহকে আপনারা

১৩। অন্যত্র (মূলমধ্যমককারিকা, ২৪. ১০; বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকা, ৯.২, ৩৬৫ পৃ. উক্ত হইয়াছে:—

"ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে।
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগম্যতে॥"

ব্যবহারকে আশ্রয় না করিলে পরমার্থ উপদেশ দিতে পারা যায় না, আর পরমার্থ না বুঝিলে নির্ব্বাণ পাওয়া যায় না।

ইহাও উক্ত হইয়াছে (মধ্যমকাবতার, ৬.৮০; বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকা, ৯. ৪, ৩৭২ পৃ.)—

"উপায়ভূতং ব্যবহারসত্য—
মুপেয়ভূতং পরমার্থসত্যম্।"

ব্যবহার সত্য উপায়, আর পরমার্থ সত্য উপেয়।

স্বীকার করুন না কেন, তাহাতেও দুঃখের উপশম হইবে। যত্ন করিয়া আত্মাকে নিষেধ করিতেছেন কেন? আত্মা থাকিলেও তাহার ভাবনার অহঙ্কারের ক্ষয়ে সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে। অতএব নৈরাত্ম্য-ভাবনার প্রয়োজন কি?

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

৭৮

অহঙ্কার দুঃখের হেতু, আত্মমোহে ইহা বাড়িয়া যায়।

কার্য্যমোহ যেমন দুঃখোপশমের হেতু, আত্মমোহ সেরূপ নহে; ইহাতে অহঙ্কারের ক্ষয় হয় না। আত্মমোহে অনাত্মাতেও 'আত্মা' এই বিপরীত দর্শনে অহঙ্কার বাড়িয়া উঠে। এবং এই অহঙ্কার সংসারের তাপত্রয়রূপ দুঃখের কারণ। অহঙ্কারের ক্ষয়ে দুঃখের উপশম হয়, ইহাই মনে করা হয়; কিন্তু 'আত্মা' এই দর্শন (বুদ্ধি) থাকিলে কিরূপে ইহাতে (অহঙ্কার) নিবৃত্ত হইতে পারে? কারণের শক্তি যদি অবিকল থাকে, তাহা হইলে কার্য্য না হইয়া পারে না। অতএব দুঃখও নিবৃত্ত হয় না। যে ব্যক্তি আত্মাকে দেখে স্কন্ধ-প্রভৃতিতে তাহার 'আমি' এই দৃঢ়তর স্নেহ উৎপন্ন হয়। অনন্তর তাহাতে (স্কন্ধ-প্রভৃতিতে) যে দুঃখ হয় তাহার প্রতীকার ইচ্ছায় সুখাভিলাষী ঐ ব্যক্তি তাহাদের দোষসমূহ আচ্ছাদন করিয়া ও তাহাতে গুণ আরোপ করিয়া[১৪] তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়। এ বিষয়ে যে তাহার উপকার করে (তাহাকে সে নিজের মধ্যে ধরায়) তাহার 'আমরা' এই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; তাহার 'আমি' 'আমার' এই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যে তাহার প্রতিকূল হয় তাহাতে তাহার বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। অনন্তর এইরূপে তাহার সমস্ত দুঃখের কারণ, সমস্ত ক্লেশ-উপক্লেশ প্রসার লাভ করিয়া উঠে। তাই আত্মমোহ হইতে দুঃখহেতু অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। আচার্য্য (নাগার্জ্জুন) ইহাই বলিয়াছেন :—

১৪। অর্থাৎ বস্তুত যে ঐ সমস্ত উপভোগ্য নহে, তাহাদের উপভোগে যে, বিবিধ দুঃখ, বিবিধ দোষ আছে, ইহা মোহবশত না বুঝিয়া; এবং তাহারা উপভোগ্য তাহাদের দ্বারা অনেক উপকার আছে, এইরূপে তৎসমুদয়ের উপর গুণ আরোপ করিয়া

"যে আত্মাকে দেখে তাহার তাহাতে 'আমি' এই এক নিত্য স্নেহ উৎপন্ন হয়। স্নেহহেতু সুখে তাহার তৃষ্ণা হয়। তৃষ্ণা ভোগ্য বিষয়ের দোষ-সমূহেক তিরস্কৃত (অর্থাৎ আবৃত) করে। আর সে তাহাতে গুণ দেখিয়া তৃষ্ণাবশত তাহাকে 'আমার' মনে করিয়া (তাহার উপভোগের জন্য') উপায়সমূহ অবলম্বন করে। তাহার এই আত্মাভিনিবেশ যতকাল থাকে, সংসারও ততকাল। আত্মা থকিলে তখন পর-বুদ্ধি হয়, আর এইরূপে নিজ ও পর এইরূপ বিভাগবশত রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ হয়। অনন্তর রাগ ও দ্বেষের সহিত সম্বদ্ধ সমস্ত দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

অতএব আত্মার প্রতি স্নেহ থাকায় অহঙ্কার নিবৃত্ত হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—

তাহাতেও যদি (অহঙ্কারকে) নিবৃত্ত করিতে না পারা যায়?

'তাহাতেও' অর্থাৎ আত্মদর্শনেও।

সিদ্ধান্তী। তাহা হইলে—

নৈরাত্ম্য ভাবনা করাই উত্তম।

নৈরাত্ম্য' অর্থাৎ জীবাদির অভাব। 'ভাবনা' অভ্যাস। ইহা এই জন্য উত্তম যে, ইহাতে আত্ম-দর্শনে উৎপন্ন অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইয়া যায়।...সাক্ষাৎ নৈরাত্ম্য-দর্শন হইলে সৎকায়দৃষ্টি (শরীরে আত্মবুদ্ধি) নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে কোন এক অনুগামী পদার্থকে দেখা যায় না, এবং সেই জন্যই পূর্ব্ব বা অপর উভয়রূপ-বিহীন একটিমাত্র ক্ষণের দর্শন হয়। সেই জন্য পূর্ব্ব ও পর (ভাব বা কাল) আরোপ করিতে না পারায় মানুষে আত্মার ভবিষ্যৎ সুখের কোনো উপায় দেখিতে পায় না। তাই তাহার কোনো বিষয়ে রাগ উৎপন্ন হয় না, বা প্রতিকূলের প্রতি দ্বেষও উৎপন্ন হয় না। তাহার কোনোরূপ আসক্তি না থাকায় অপকারীকেও প্রত্যপকারের বিষয় বলিয়া সে দেখিতে পায় না; কেননা যে অপকার করে, ও যাহার প্রতি অপকার করে এই উভয়েরই দ্বিতীয় ক্ষণ নাই (যে ক্ষণে তাহারা থাকে

তাহার দ্বিতীয় ক্ষণে তাহাদের ভঙ্গ বা ধ্বংস হওয়ায় সত্তা থাকে না)। আবার, একজন অপকার করিলে অন্যের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করা জ্ঞানীর উচিত নহে। এইরূপে যাহার অপকার করা হইয়াছে তাহারও বৈরনির্য্যাতন কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে রাগাদির নিবৃত্তিতে তদুৎপন্ন সমস্ত ক্লেশ-উপক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।... এইরূপে জীবশূন্যতায় সৎকায়-দৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে ক্লেশসমূহ আর উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ তাহাদের মূল উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আর্য্যতথাগতগুহ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"হে শান্তমতি, যেমন বৃক্ষের মূল ছিন্ন হইলে তাহার সমস্ত শাখা-পত্র শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ সৎকায়-দৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া গেলে সমস্ত ক্লেশ উপশান্ত হইয়া যায়।"

অতএব নৈরাত্ম্যভাবনাই উত্তম।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

কীট্‌স

জগতে যে সমস্ত প্রতিভাবান্‌ পুরুষ তাঁহাদের নাতিদীর্ঘ জীবনে কল্পনার ফসল পাকাইয়া যাইবার সময় পাইলেন না—অথচ যে ফসলের জন্য সকলে অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই শস্যের অপরিণত ভবিষ্যৎ জানিবার আগ্রহ সকলেরই সমধিক দেখা যায়। আগ্রহও যেমন অধিক আবার তাহার অপরিণতি সম্বন্ধে রহস্যও তেমি নিবিড়। পাকা ব্যবসায়ী ইহাকে শস্যের মধ্যে গণ্য না করিতেও পারে। ইহার মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য ছোট একটী কথার সাহায্য লইতে হয় তাহা—'যদি'। বয়স পাকিয়া জীবন শেষ হইলে জীবনেই তাহার মীমাংসা হইয়া যায়; কিন্তু অপরিণত বয়সের মৃত্যুতে লোকে একটী 'যদি' যোগ করে। যদি বাঁচিত তবে এমনটী হইতে পারিত। এই রকম প্রতিভাবান্‌ পুরুষদের ভক্তেরা তাঁহাদিগকে দ্বিধার সহিতই লোক সমক্ষে প্রকাশ করেন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁহাদের জীবনকাল স্বল্প হইলেও নিজেদের প্রতিভার সন্দেহাতীত পরিচয় রাখিয়া যাইতে পারেন। ইংরেজ কবি কীট্‌স এই রকম একজন প্রতিভাবান্‌ পুরুষ। তাঁহার ২৫ বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে যে অমরতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তিনি ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কীট্‌সের জীবনী আলোচনা করিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—এ যেন একটা অসম্পূর্ণ তাজমহল, কি কারুকার্য্য, কি শিল্পনৈপুণ্য! ভালো artএর লক্ষণ এই যে, তাহার অংশমাত্র দেখিয়া সম্পূর্ণ জিনিষটীকে উপলব্ধি করা যায়। কীটস্‌ যে-জীবনটীর পরিচয় রাখিয়া যাইতে

পারেন নাই তাঁহার কাব্য এবং জীবনের আশা ও উদ্যম হইতে তাহারই বিচার করিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের কাব্যকাননে অনেকগুলি সুধা-কণ্ঠ বিহঙ্গ ছিল। তাহাদের মধ্যে ওয়ার্ডস্বার্থ, স্কট, বায়রন, শেলী ও কীটস্ প্রধান। আমরা যদি ইহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব ইঁহাদের সকলেরই জীবনে কিছু না কিছু বিশেষত্ব ছিল যাহা তাঁহাদের কাব্যশক্তির উন্মেষে সাহায্য করিয়াছিল।

ওয়ার্ডস্বার্থ Crumbian পর্ব্বত শ্রেণীর উপত্যকা-কুটীরে বর্দ্ধিত হইয়া শান্ত আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য গড়িয়া উঠিতেছিলেন। স্কট নিজের দেশের অতীতের স্মৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে পালিত হইয়া Romantic Tales এর কবি হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি? বায়রন বংশসুলভ দুঃসাহসিকতা ও অসাধারণত্বে পরিপুষ্ট হইয়া ভাবী কালের বীরকবি হইয়া উঠিতে ছিলেন। কিন্তু কীটসের জীবনে এ সমস্ত বিশিষ্টতা কোথায়? মধ্য-বিত্ত ইংরাজ পরিবারের মধ্যে মানুষ হইয়া, সামান্য রকমের শিক্ষা পাইয়া, ডাক্তা-রের শিক্ষানবিশী করিয়া, সহসা বিশ বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করা একটু নূতন ধরণের। কিন্তু আমরা একটু আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব, কীটস্ তাঁহার কাব্যোন্মেষের এই অনুপ্রেরণা কোথা হইতে লাভ করিলেন।

ইংলণ্ডের কাব্য-ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখিতে পাই যে, উক্ত দেশের শ্রেষ্ঠ কবিরা প্রায় সকলেই কাব্যের অনুপ্রেরণার জন্য ইংলণ্ড ছাড়িয়া আর কোথাও গিয়াছেন। সেক্সপিয়র, মিল্টন্ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাউনিং পর্য্যন্ত প্রায় সকলের পক্ষেই এই কথা খাটে। প্রধানতঃ ইউরোপের কবিতার ও কল্পনার উৎস হইতেছে গ্রীস্ ও ইটালী। গ্রীস ও ইটালী হোমার-ভার্জ্জিলের কল্পনা-স্বপ্ন লইয়া প্রাগৈতিহাসিক-রহস্যে নিবিড় হইয়া ইউরোপের চোখে অনির্ব্বচনীয়। বায়রন, শেলী, কীটস্ তিন জনেই গ্রীস্ ও ইটালীর নিকটে কাব্য-উন্মেষের জন্য ঋণী। বায়রন, ইউরোপ, ও এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে নিজের অগোচরে নিজের

কাব্যের অনুপ্রেরণাকে, কল্পনার আশ্রয়কে খুজিয়া বেড়াইয়াছেন। শেলীরও প্রায় সেই দশা। ইঁহাদের উভয়েরই ইটালীতে আসিয়া কাব্য শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। কিন্তু কীট্‌সের ভাগ্যে কাব্যান্বেষের জন্য স্বশরীরে গ্রীসে আসা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহাকে কেবল গ্রীসের কাব্য-ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ করিয়াই তৃপ্ত হইতে হইয়াছিল। যে দেশ সর্ব্বদা চোখে দেখিতেছি সেখান হইতে একটী অপূর্ব্ব মোহ চলিয়া যায়। কীট্‌সের পক্ষেও ইহাই হইয়াছিল। বিশেষত ইংলণ্ডের ধূলিধূম্রমলিন নগরের উন্মত্ত কোলাহল, ইংলণ্ডের জাতীয়তার সংকীর্ণতা, ও British Philistinism কীট্‌সের মত কোমলচিত্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবিকে পদে পদে তীব্র আঘাত করিতেছিল। তাই স্বভাবতই তাঁহার মন সেই সুদূর স্বপ্নলোকের জন্য উৎসুক হইয়াছিল। যাহা ছোঁয়া যায়, পাওয়া যায়, চোখে দেখা যায় তাহা সুন্দর, কিন্তু সুন্দরতর তাহাই যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত—"Heard melodies are sweet,—but those unheard are sweeter"

কীটস্ গ্রীক্ বা ল্যাটিন প্রায় জানিতেন না বলিলেই হয়; কিন্তু তবু তিনি হোমরের এবং গ্রীক্ পুরাণের অনুবাদ পাঠ করিয়াই মনের খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সুদূর হইতে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সায় পাইলেন। গ্রীক্ সৌন্দর্য্যতত্ত্বটী তাঁহার মনের সহিত খাপে খাপে মিলিয়া গেল—"Beauty is Truth—Truth Beauty" এই সুরে তিনি নিজের জীবনের বীণাটী বাঁধিয়া লইলেন। ইংলণ্ড যে তাঁহার মন্দ লাগিত তাহা নহে, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তবু কেন যে সুদূরের জন্য তৃষ্ণা জাগিত, তাহা তাঁহার একটী সনেটে বড় চমৎকার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে:—

"Happy is England! I could be content
  To see no other verdure than its own;
  To feel no other breezes than are blown

Through its tall woods with high romances blent :
Yet do I sometimes feel a languishment
For skies Italian, and an Inward groan
To sit upon an Alp as on a throne,
And half forget what world or worldling meant."

গ্রীস দেশের জমিতে কবি আপন পা রাখিবার স্থান পাইয়া যেন এতদিনের জলে হাবুডুবু খাওয়া হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন। দেশসম্বন্ধে যেমন কাল সম্বন্ধেও তেমি। ফরাসী-বিপ্লব শেষ হইয়া গেলেও তাহার কামানের ধূমে বায়ুমণ্ডল তখনও সমাচ্ছন্ন। নেপোলীয়ানীয় সংগ্রামও সেদিন মাত্র শেষ হইল। ইউরোপ-খণ্ড রণক্ষেত্র। এই রকম দেশে এবং কালে কীট্‌সের কল্পনা-রাজ্যের স্থান কোথায়? তাই তিনি নিজের মানস-প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন গ্রীসে—সেই পুরাণো যুগের গ্রীসে—যখন মানুষে দেবতায় কথা চলিত,—যখন চাঁদের রাণী পৃথিবীতে আসিয়া Endymion-এর সুপ্তিকে স্বপ্নজালে খচিত করিয়া তুলিত।

এই যুগের ইংলণ্ডের অন্যান্য বড় বড় প্রায় সকল কবিই ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাবে পড়িয়াছিলেন; কেবল কীট্‌সের কাব্যেই ইহার প্রভাব নাই। Wordsworth যৌবনে ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে ফরাসী দেশে গিয়া আন্দোলনে বেশ একটু ডুবিয়াছিলেন। ইহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে আছে। তিনি শেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়াছিলেন। Shelleyর কাব্য-ইতিহাসে এম্নিতর একটা অধ্যায় পাওয়া যায়। কৈশোরে শেলী Ireland-এর স্বাধীনতার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের মধ্যে যে একটী ভাঙিবার প্রয়াস ছিল তাহা শেলীকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি সমস্তই ভাঙিতে চাহেন—সমাজ, ধর্ম্ম, রাজত্ব সমস্তই। তাঁহার Queen Mab-কে খাঁটি কাব্য বলা চলেনা। উহা দার্শনিক Godwin-এর ধ্বংসনীতির কাব্যে অনুবাদমাত্র। শেলীর এই ধ্বংসমুখী প্রয়াস Promethuas Unbound পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

কিন্তু উহা শেলীর শ্রেষ্ঠ রচনা নহে, এমন কি উহা তাঁহার প্রাণের কথাটি পর্য্যন্ত নহে। মোট কথা যখনি তিনি কালের ও থিয়োরীর গণ্ডীর উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তখনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি লিখিতে পারিয়াছেন। কিন্তু কীট্‌স উচ্চশিক্ষার অভাব বশতই হোক্, কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরের অর্থের অপ্রাচুর্য্য বশতই হোক্, ঠিক বিপ্লবের সীমার মধ্যে গিয়া পড়েন নাই। সেই জন্য তাঁহার সুবিধা হইয়াছিল যে, তিনি প্রথম হইতেই নিজের স্বরূপটী ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিপথে চলিতে হয় নাই বলিয়াই তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্যজীবনের বিকাশ এত দ্রুত হইতে পারিয়াছিল।

একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে শেলীর সহিত কীট্‌সের মিল যেমন অধিক, অন্যদিকে প্রভেদও তেমি বেশী। শেলীর গোড়া হইতেই ভিতরের দিকে টান ছিল। কীটস্ আরম্ভ করিয়াছিলেন বাহির হইতে একজন আর্টিষ্টের মত। তাঁহার কাছে বাহিরের সৌন্দর্য্য কোথাও এতটুকু ফাঁক পড়িবার জো নাই। বাস্তবের পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের স্বর্গ সৃষ্টি করাই আর্টিষ্টের কাজ, তাই তিনি তাঁহার প্রত্যেকটী লাইন পদলালিত্যে, উপমামাধুর্য্যে, ভঙ্গীর সরসতায় অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছেন। বহির্জগৎ কীট্‌সের নিকট তখনও বৃহত্তর ছিল। এবং এইখানেই তিনি তাঁহার মূল উৎসটীকে, তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রতিমাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "Oh for a life of sensation rather than of thought." কীট্‌স অনুভূতিপ্রবণ বটে। আর্টিষ্ট মাত্রেই অনুভূতিপ্রবণ, কারণ পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, তাঁহার অন্তরে যে ছাপ দেয়, তাহাকেই নিজের প্রাণের অনির্ব্বচনীয় রংটীতে সুন্দরতর সম্পূর্ণতর করিয়া বাহিরে প্রকাশ করাই প্রকৃত আর্টিষ্টের কাজ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কীট্‌স আর্টিষ্টের মত তাঁহার কাব্যজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্র "ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।" কীট্‌স সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, আর তারি অবকাশ পথে বহির্জগতের আকাশভরা আলো, বাতাসভরা গান ইন্দ্রধনুর রং, তাঁহার অন্তর্জগতের আনন্দের সহিত মিলিতে পারিয়াছিল;

তাই তাঁহার কাব্যে এত রঙের ছটা, ছন্দে এত গানের ঘটা। এই খানেই কীট্‌সের আর একটী বিশেষত্ব। আর্টিষ্ট হিসাবে বাহিরের দিকে তাঁহার যে টান ছিল, বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা নিশ্চয়ই ভিতরের গভীরতায় পরিণত হইতে পারিত; তাঁহার এই ক্ষুদ্র জীবনেও তাহা বেশ প্রত্যক্ষ হয়।

কীট্‌সের কাব্যজীবনকে মোটামুটি দুই ভাগ করা চলে। তাঁহার ২৩ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮১৮ সালে একটী লাইন টানা চলে। ইহার পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন On first looking on Chapman's Homer, sleep and Poetry, তখনও তিনি Endymion. পৃথিবীর সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ পরিচিত নন; দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, আশা আনন্দে তিনি দোদুল্যমান; তাঁহার মনের কথাটী হইতেছে "A thing of beauty is a joy for ever." তিনি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে আনন্দময় সত্তাকে উপলব্ধি করিতেছেন।

কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী কালে কীট্‌সের মধ্যে পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন জগতে দুঃখ বলিয়া একটা পদার্থ আছে যাহাকে মানুষ এড়াইয়া চলিতে পারে না। না—শুধু তাই নয়, দুঃখের ভিতর দিয়াই মানুষ প্রকৃত আনন্দ লাভ করে। এই সময়ে কীট্‌সের জীবনে কতগুলি ঘটনা ঘটে, যাহাতে তাঁহার নিকট ইহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ তাঁহার ভাই টম্‌ কীট্‌সের এই বৎসর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ Blackwood ও Quarterly-তে Endymion. এর অতি তীব্র সমালোচনা প্রকাশ হইল। তৃতীয়তঃ Fanny Brawne'র প্রতি নিষ্ফল প্রেম এবং চতুর্থতঃ স্কটলাণ্ডে পদব্রজে ভ্রমণে তাঁহার ক্ষয়রোগের আক্রমণ। উপরি উক্ত নানা কারণে তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল যেমন সুখ দুঃখও তেমি মানুষের জীবনকে গড়িয়া তোলে।

শেলী ও কীট্‌সের দুঃখ ও আনন্দ সম্বন্ধে মতের অনৈক্যটুকু ধরিতে পারিলেই দুই জনের কাব্যের মূল সুরটী বুঝিতে পারা যাইবে। শেলীর নিকটে দুঃখ অসত্য এবং মানুষের জীবনে প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ। এই দুঃখই পৃথিবীতে যত

সমস্ত মিথ্যার অবতারণা করিয়াছে। পৃথিবীই স্বর্গের মত সুন্দর হইত যদি ইহা মানুষেরই দোষে দুঃখে পঙ্কিল না হইত। শেলীর Principle of Beauty হইতেছে Intellectual Beauty. তাহা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব নহে। এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তখন সমস্ত পৃথিবী আনন্দে উজ্জ্বল। আবার পরক্ষণেই ইহা—"A dim vast vale of tears." শেলী প্রাণপণ শক্তিতে এই প্রকাণ্ড বাধা কাটাইয়া উঠিতে চাহিয়াছেন, এবং যতটা পরিমাণে সমর্থ হইয়াছেন ততটা পরিমাণেই তাঁহার কবিতা সুন্দর।

কিন্তু কীটসের নিকটে দুঃখ-কষ্ট মানুষের ideal-এর পক্ষে বাধাস্বরূপ নহে। মানুষের জীবনে ইহাদের একটা বিশেষ অর্থ আছে। তাঁহার মতে পৃথিবী নিরবচ্ছিন্ন সুখের নহে। এই কথাটী Endymion কাব্যের মর্ম্মটুকু আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব। Endymion তাঁহার প্রেয়সী Cynthia দেবীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইহার তলে কি এই অর্থটুকু প্রচ্ছন্ন নাই যে, মানুষের আত্মা চিরসুন্দরের অনুসন্ধান করিতেছে। Endymion স্বপ্নে যাহার সন্ধান পাইয়াছেন জাগরণে তাহারই অনুসন্ধানে রত। তাহাকে অনায়াসে বিনা দুঃখে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; পৃথিবীর এই সুন্দর দৃশ্য ছাড়িয়া Endymion পাতালের হিমশীতল দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া প্রেয়সীর খোঁজ করিতে করিতে এক একবার নিরাশায় হতাশ হইয়াছে। যাহাকে সে ভাল বাসিয়াছিল, তাহার সেই Indian maid অবশেষে প্রকাশ হইল। তাহার স্বপ্ন-সুন্দরী Cynthia ও সেই Indian maid একই। যে মনের ideal-তে ছিল তাহারই প্রকাশ realityতে। পৃথিবীর উপরের আরামের অনুসন্ধানে Endymion Cynthiaকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহাকে পাতালের তুষাররাশির তীব্র দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেছি যে, সুন্দরকে লাভ করিতে হইলে কীটসের মতে দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। সৌন্দর্য্য লোকে পৌঁছিবার দুই প্রকার পথের কথা কীটস বলিয়াছেন—একটী সুখের ভিতর দিয়া, অপরটী দুঃখের ভিতর দিয়া। সুখের ভিতর দিয়া যে সৌন্দর্য্য

পৌঁছান যায়, তাহা নিম্নশ্রেণীর, তাহা বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। কিন্তু দুঃখ আমাদিগকে যে সৌন্দর্য্যে লইয়া যায় তাহা উচ্চতর, তাহা অন্তের বা মানব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য।

কীটস্ ও শেলীর অনৈক্যের কথা অনেক বলা হইল কিন্তু দুই কবির মূল সুরটী একই। দুই জনেরই জীবন বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ব্যর্থ বলিতে হইবে। দুইজনেই দেশ ত্যাগ করিয়া ইটালীতে গিয়া তরুণ বয়সে প্রাণ-ত্যাগ করেন; অবশেষে দুই কবি-ভ্রাতাই রোম নগরের শান্তি-চ্ছায়ায় পাশাপাশি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। কীটস্ বর্হিজগতের সৌন্দর্য্য হইতে তাঁহার idealএর অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া সত্যে গিয়া পৌঁছিয়া-ছিলেন। পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, তবে তাঁহার ক্ষুদ্র জীবন যে-পথে চলিতেছিল তাহা সত্যের রাজ্যে গিয়াছে। তাঁহার সমগ্র কাব্য পাঠ করিলে এই কথাটীই সব চেয়ে বেশী মনে হয়—কবি একটা কিছুকে ব্যগ্রভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহার Endymion-এও এই সৌন্দর্য্যেরই অনুসন্ধান। কীটস্ তাঁহার দুঃখনিশাময় অন্ধকার জীবনে সত্যের রাজ্যে পৌঁছিবার জন্য সৌন্দর্য্যের দীপটী হাতে পাইয়াছিলেন। এক-একবার দুঃখ-দৈন্যের ঝড়-ঝাপটে দীপশিখাটী যায়-যায়, তবুও তাহা নিভে নাই, কবি তাহাকে সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। এই রকম অন্ধ-কারের পরপারেও যে, সত্যের উষালোক বর্ত্তমান, তাহা সকলে জানিতে পারে না। কীটস্ তাহা জানিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই উচ্চতর উজ্জ্বলতর জীবনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—"For what a height my spirit is contending."

কিন্তু পদে পদে আঘাতে আঘাতে ব্যর্থতার নিরাশার সুর কি করুণ ভাবে তাঁহার জীবনে বাজিয়াছিল, তাহা Ode to a Nightingale কবিতাটিতে দেখিতে পাই:—

"My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk :"

দেহের বৃন্তটী হইতে যেন মনটী খসিয়া পড়িল। এই কবিতাটীর মূল ভাবটি যাহা—শেলীর "To a skylark" কবিতাটির মূল ভাবটীও তাহাই। আমাদের জীবন: আশা-নিরাশার মাঝে দোদুল্যমান একটা ক্ষণস্থায়ী অশান্তিপূর্ণ জিনিষ। ইহা কি তাহা আমরা জানি না। আমরা একটি আদর্শ লোকের আভাস পাই, কিন্তু সেখানে পৌছিবার কোন উপায় নাই। ইহাতে আমরা যাহা কিছু পাই সবেরই মধ্যে একটা নৈরাশ্য ও বিতৃষ্ণা জাগিয়া ওঠে। মৃত্যু আমাদের ঘটে, কিন্তু তাহাও আমাদের নিকট রহস্যময়। পাখীরাই সুখী, তাহারা এই নৈরাশ্য-ময় জীবনের উর্দ্ধে, তাই:—

Thou wast not born for death, immortal bird!
No hungry generations tread thee down;
The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown:

পাখীরাই সুখী—তাহাদের দুঃখ নাই। আমরাই চিন্তাভারে পীড়িত, কারণ "To think is to be full of sorrows.,' "Ode on Greecian urn." নামে সুন্দর কবিতাটীতেও এই একই ভাব। যুগের পর যুগ, কত যুগ মৃত্যুর অন্ধকার গুহার ভিতর চলিয়া গেল, তাহাদের কোন চিহ্ন নাই। কেবল একটী মাত্র মুহূর্ত্ত সৌন্দর্য্যের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়া অমর হইয়া আছে। সে একটী সুন্দর দিন গ্রীসের নীলাকাশের-তলে। কোন্ এক সাগর বা তটিনীর-তীরে ক্ষুদ্র নগর; পুরবাসীরা বনে বসন্তোৎসবে গিয়াছে। পুরীর পথ জনশূন্য; বলির পশু লইয়া নগরবাসীরা কোন্ দেবালয়ে চলিয়াছে। তরুতলে একটী যুবক একটী যুবতী,

একজন বাঁশী বাজাইতেছে। সেই গ্রীসের আজ তো আর কিছুই নাই—তবু সেই উৎসবের দিনটী চিত্রের রেখায় সৌন্দর্য্য-সুধাপানে চিরস্থায়ী হইয়া আছে। তাই কবি ভাবিয়াছেন পৃথিবীর উপরে প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের জোয়ার বহিতেছে তাহার পূর্ণ স্বাদ পাইলে আমরাও অমর হইতে পারি। সে অমরতা মৃত্যুরই মধ্যে; এক জীবনের আনন্দের স্মৃতিকে জীবনান্তরে বহিয়া লইয়া যাওয়াই সেই অমরতা। তাই—

> "When old age shall this generation waste,
> Thou shalt remain, in midst of other woe
> Than ours, a friend to man, to whom thou say'st
> "Beauty is truth, truth beauty,"—that is all
> Ye know on earth, and all ye need to know."

আর যাহা কিছু সমস্তই বিনষ্ট হইবে—কেবল যাহা সুন্দর তাহাই অমর; এই সত্যটী কীট্‌সের মনকে খুব নাড়া দিয়াছিল, এবং বস্তুত বলিতে গেলে কীট্‌সের কাব্যের মূল সুরটী ইহাই। যে গ্রীক্ সাহিত্য ও শিল্প তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল তাহার প্রধান তত্ত্বটীও ইহাই। সৌন্দর্য্যই সত্য, ইহাই তাহার মূল মন্ত্র বলিয়া গ্রীস্ দেশের প্রতি স্বভাবতই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কীট্‌স গ্রীসের এত অল্প পরিচয়েও কি করিয়া যে তাহার উৎসমূলে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য মনে হয়। শেলীকে একজন এই প্রশ্নটী করাতে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন "Because he was a Greek." বাস্তবিকই ভিতরে ভিতরে কীট্‌স গ্রীক্ ছিলেন, যেমন শেলী ছিলেন ভারতীয়। কাব্যের বর্ণ-বৈচিত্র্যে, স্বচ্ছন্দতায়, সরলতায়, এবং সর্ব্ববিধ সংস্কারের সীমাতিক্রমে কীট্‌স গ্রীক্ কবিদেরই প্রকৃত বংশধর। প্রকৃতি যে তাঁহার চিত্তবীণায় কি সুর তুলিয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই বলিব—"In truth, the great Elements we know of, are no mean comforters: the open sky

sits upon our senses like a sapphire crown ; the air is our robe of state ; the earth is our throne ; and sea a mightly ministrel playing before it." কীট্‌স তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনে চিরসুন্দরের সাধনা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি একদিন মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন ;—"I have loved the principle of Beauty in every thing."

Endymionএ যেমন কীট্‌সের সৌন্দর্য্যতত্ত্বটা একভাবে প্রকাশিত হইয়াছে Hyperionএ তেমি উহা অন্য একভাবে বিকশিত। Hyperion একখানি কাব্যের অংশমাত্র, কীটস্ ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যান নাই। সমালোচকদের হাতে Endymionএর দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি এই কাব্য লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমাদের পুরাণে যেমন দেবাসুরের যুদ্ধের কথা আছে, Hyperion-এর গল্পটাও অনেকটা সেই রকমের। প্রাচীন দেবতারা স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত। Saturn প্রভৃতি সকলে হৃতরাজ্য হইয়া বিলাপ করিতেছে—স্বর্গে নূতন দেবতাদের রাজত্ব-আরম্ভ। প্রাচীন দেবতারা যে, নূতন দেবতাদের নিকট পরাজিত, তার একমাত্র কারণ নূতন দেবগণ সম্পূর্ণতর। প্রাচীনেরা সুন্দর, কিন্তু নূতনেরা সুন্দরতর। তাই এই পরাজয় ঠিক পরাজয় নহে—ইহা সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্র। কারণ "For 'tis the eternal law that first in beauty should be first in might."

জগতের বিবর্ত্তনবাদের ইতিহাসে আমরা যেমন দেখিতে পাই, জীবশরীর ক্রমেই সম্পূর্ণতার দিকে, সুতরাং সৌন্দর্য্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে—তেমি মানুষের মনের এবং চিন্তার বিবর্ত্তন-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সেই পুরাকাল হইতে, নিঃসন্দেহ, মানুষের সমগ্র চিন্তাস্রোত, জীবনের গতি, প্রয়াস, কর্ম্ম কোন একটী নির্দ্দিষ্ট দিকে ধাবিত হইতেছে।

"On our heels a fresh perfection treads,
A power more strong in beauty."

ইহাই সত্য। সৌন্দর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি। কারণ আর সমস্ত শক্তিরেই অনর্থের, অসত্যের আবির্ভাব হয়।

কীট্‌সের এই বাণীটি আজকার পৃথিবীতে বড়ই প্রয়োজনীয়। ইহা বিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমান জগতের ভবিষ্যতের অন্ধকার পথটা আলোকিত করিবে। এতদিন যে শক্তি জগতে রাজত্ব করিত তাহা সৌন্দর্য্যের শক্তি নহে তাহা অসত্য তাহা কুৎসিত। সেদিনকার দারুণ যুদ্ধের পর সকলেই ইহা বুঝিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে যাহা প্রার্থনা করিতেছে তাহা ইহাই ;—" 'tis the eternal law that first in beauty should be fiirst in might." কারণ "Beauty is truth, truth beauty. ভবিষ্যৎ জগৎ যে শক্তির উপর স্থাপিত হইবে তাহা এই সৌন্দর্য্যের শক্তি। কীটস্ যে Principle of Beautyর কথা বলিয়াছেন তাহা সমস্ত জগতের মধ্যে নিরন্তর কাজ করিতেছে। তাহার কাজ পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করা। আদি কাল হইতে এই শক্তি পৃথিবীকে তাহারই জন্য প্রস্তুত করিতেছে। এবং ইহারই জন্য কত রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তির স্রোত পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিয়াছে। তাহাও নিরর্থক নহে, তাহাও নিষ্ফল নহে, তাহারও বিশেষ অর্থ আছে।

বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতেরা বলেন, প্রকৃতি একদিনেই মানুষ তৈরী করে নাই; :কত যুগ ধরিয়া কত বিভিন্ন রকমের প্রাণী গড়িয়া হাত পাকাইয়া তবে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সমস্ত ব্যর্থতার যুগের খণ্ডতায় যাঁহারা সুদূর ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়া পুলকিত হইয়াছেন তাঁহারা ভবিষ্যৎ জগতের শিল্পী। কীটস্ সেই দলের একজন। যাঁহারা ভবিষ্যতের সেই সৌন্দর্য্য-জগৎ রচনা করিতেছেন, আজকার দুর্দ্দশার মধ্যে তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। কীট্‌স শতবর্ষ পূর্ব্বে যে আশার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আজ শতাব্দীর কুয়াশা ভেদ করিয়া দেখা দিতেছে—সত্য বলিয়া তাহা সকলে বুঝিতে পারিতেছে। মানবের পূর্ণতর সভ্যতার একজন শিল্পী বলিয়া আজ শতবর্ষ পরে আমাদের প্রিয় কবিকে আমরা ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করি।

কীট্‌সের জীবনের দুঃখ-দৈন্যের আবিলতার মধ্যে, সৌন্দর্য্যই সত্য এই তত্ত্বটী সোনার পদ্মের মত ফুটিয়াছিল। তাঁহার জীবনে কত আশা ছিল, মৃত্যুতে সমস্তই ব্যাহত; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কারণ মানবজীবনের সার্থকতা প্রেমে; পৃথিবীকে যে আমরা সুন্দর দেখি তাহা আমরা তাহাকে ভালবাসি বলিয়া; সৌন্দর্য্য রসটী বাহিরে নাই, তাহা আমাদের ভিতরে। প্রেমের অধিকার যাহার যত বেশী, পৃথিবীর রহস্যনিবিড় অন্তস্তলে প্রবেশাধিকারও তাহার তত অধিক। তাই যতক্ষণ আমরা ভাল না বাসিতে পারি ততক্ষণ কি বহিঃপ্রকৃতির কি মানব-প্রকৃতির কোনও স্থানের কোনও কথা বুঝিতে পারি না। যখনই ভাল বাসিতে পারি তখনই মর্ম্মরিত বনবীথির ধ্বনি সঙ্গীত হইয়া উঠে। প্রদীপ্ত সূর্য্যালোক আমাদিগকে বিশ্বসাম্রাজ্যে অভিষেক করিয়া যায়। মানুষের জগৎ ছাড়া বাহিরের প্রকৃতির এত বড় যে জগৎ তাহা জীবন্ত হইয়া উঠে। হতভাগ্য তাহারাই যাহাদের নিকট এত বড় জগৎটা মিথ্যা হইয়া রহে। কীট্‌সের জীবনে দেখা যায়, বন্ধুদের তিনি কি গভীর ভাল বাসিতেন, আর তাহারই প্রসাদে বাহিরের জগতের দিকে তাঁহার দরজা খুলিয়া গিয়াছিল। এই হিসাবে জীবনকে পরিমাণ করিতে গেলে বহু ব্যর্থতার মধ্যেও কীট্‌সের জীবন সার্থক।

রোম নগরীর বিশাল ভগ্নাবশেষের প্রগুল্মচ্ছায়াতলে নিবিড় নির্জ্জনতার মধ্যে কবিবর চির বিশ্রান্ত। প্রকৃতি দেবীর সেবায় শ্যামসুরভি সেই সমাধির উপরে তাঁহার কাব্যের অমরতা ও বন্ধুপ্রীতি দুইটী অলৌকিক পুষ্পের মত চির-গন্ধি হইয়া রহিল। কিন্তু প্রচণ্ড মৃত্যুর মুখেও তুড়ী বাজাইয়া কীটস্ সম্বন্ধে শেলী সগর্ব্বে আশ্বাস বাণী প্রচার করিয়াছেন—

"Peace, Peace! he is not dead, he doth not sleep—
He hath awakened from the dream of life.—

* * * *

He lives, he wakes—'tis Death is dead, not he ;

*　　*　　*　　*　　*

He is a presence to be felt and known
In darkness and in light, from herb and stone,
Spreading itself where'er that Power may move
Which has withdrawn his being to its own ;
Which wields the world with never-wearied love,
Sustains it from beneath, and kindles it above."

যে একদিন প্রকৃতিকে ভাল বাসিত আজ সে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

"আজ নয়নের বাহিরে সে নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়াছে সে ঠাঁই"

আজ "আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।"

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২১।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

---

* কবিবরের শততম বার্ষিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে পঠিত

·৩ সৃষ্টিতত্ত্ব

৪

·৫ মনোবিজ্ঞান

·৬ ন্যায়

·৭ শীলধর্ম্ম

·৮ জৈনসাহিত্য

·৯ বিবিধ

১৫ মনস্তত্ত্ব (Psychology)

·১ বুদ্ধি intellect

·২ ইন্দ্রিয়

·৩ বোধ (understanding)

৪ স্মৃতিশক্তি

·৭ ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান

১৬ ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র

·১ প্রাচীন ন্যায়

·৫ নব্য ন্যায়

·৯ পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্র

১৭ শীলধর্ম্ম Ethics

·১

·২ শাসনের নীতি

·৩ পারিবারিক ,,

·৪ ব্যবসায় ,,

·৫ বিনোদন ,,

৬ যৌন নীতি [সতীত্ব, কৌমার্য্য, সংযম, গোপনপাপ, সামাজিক দুর্নীতি, ব্যভিচার; কুৎসিত শিল্প, কুৎসিত সাহিত্য]

·৭ সামাজিক নীতি

·৮ মিতাচার

·৯ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

১৮ প্রাচীন দার্শনিক

১ চীন ও জাপান [যথা লা-তু কন্‌-ফুৎ-জি ইত্যাদি]

·২ মিশর

·৩ ইহুদী

·৪ অসুরিয়া, বাবিলন

·৫ পারস্য

·৬ মুসলমান

·৭ রোমীয়

·৮ গ্রীক

·৯ অন্যান্য

১৯ পাশ্চাত্য দার্শনিক

·২ ইংরাজ দার্শনিক

·৩ জারমেন ,,

·৪ ফরাসী

·৫ ইতালীয়

·৬ স্পেনীয়

৭ রুশিয়

৮ স্ক্যান্ডিনেভিয়
৯ অন্যান্য দেশীয়

২০ ধর্ম্ম (সাধারণ)

২. ধর্ম্মতত্ত্ব

২ হিন্দু ধর্ম

২ ·১ বৈদিক ধর্ম
[সাধারণ আলোচনা]

১১ সংহিতা [১ ঋক্ ২ সাম ৩ কৃষ্ণযজু ৪ কাঠক ৫ মৈত্রায়নী ৬ ও শ্বেতযজু ৭ অথর্ব]

১২ ব্রাহ্মণ [ঋকবেদের ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও কৌষিতকীর নম্বর হইবে ২২·১২১ ; সামবেদের ব্রাহ্মণের নম্বর ২২ ১২২ ; কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ—২২·১২৩ ইত্যাদি]

১৩ আরণ্যক

১৪ উপনিষদ্ [সংহিতানুযায়ী নম্বর যথা কৌষিতকী উপনিষদ্ ২২ ১৪১ ইত্যাদি]

১৫ শ্রৌতসূত্র

১৬ গৃহ্যসূত্র

১৭ ধর্মসূত্র

১৮ বেদসম্বন্ধীয় আলোচনা

১৯ বেদাঙ্গ [১ প্রতিশাখ্য ২ শিক্ষা ৩ নিরুক্ত ৪ ছন্দ ৫ জ্যোতিষ ৬ কল্পসূত্র

২২.২ পৌরাণিক

১ পুরাণ (নয়খানি)
২ পুরাণ (নয়খানি)
৩ উপপুরাণ
৪ স্থলমাহাত্ম্য
৫ স্তোত্র

২২.৩ তান্ত্রিক মত

১ অভিষেক

২ আচার [১ বেদাচার ২ বৈষ্ণবাচার ৩ শৈবাচার ৪ দক্ষিণাচার ৫ বামাচার ৬ সিদ্ধান্তাচার ৭ কুলাচার

·৩ পঞ্চমকার

·৪ পঞ্চতত্ত্ব বা শোধন

·৫ চক্র [৫টি রাজচক্র, মহাচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র, পশুচক্র

·৬ ষটকর্ম্ম [মরণ, মারণ, বশীকরণ, উচাটন, সম্মোহন, বিদ্বেষন]

৭ দশমহাবিদ্যা

·৮

৯ বিবিধ

১ কাদিমত

২ হাদিমত

৩ বৌদ্ধতন্ত্র

৪ বৈষ্ণবতন্ত্র

৫ শাক্ততন্ত্র

৬ শৈবতন্ত্র

৮

৯ বিবিধ

.২. ৪ বৈষ্ণব ধর্ম্ম

.৪১ বিষ্ণু পূজা

.৪২ শ্রীসম্প্রদায় [রামানুজাচার্য্য ১১শ শতাব্দী ; বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ দেখ]

১ রামানুজ

২ রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ

৩ কবীরপন্থী [কবীর]
[১২টি প্রধান শাখা :—শ্রুত-গোপাল, ভগোদাস, নারায়ণ, চূড়ামণদাস, জগোদাস, জীবন দাস, কমাল, টাকশালী, জ্ঞানী সাহেবদাস, নিত্যানন্দ, কমল-নাদ ।]

৪ খাকি [প্রবর্ত্তক কিল]

৫ মলুকদাসী [মলুকদাস-কিলের শিষ্য-১৬শ-শতাব্দী]

৬ দাদুপন্থী [দাদু]
[বিরক্ত, নাগ, বিস্তারধার, অবশিষ্ট ও ৫২ পন্থ]

৭ রয়দাসী [রুইদাস]

৮ সেনপন্থী

৯ যথাঃ অন্যান্য রামসনেসী [প্রবর্ত্তক-রামচরণ

২২, ৪৩ ব্রহ্মসম্প্রদায় মধ্বচারী
[মধ্বাচার্য্য]

২২.৪৪ রুদ্র সম্প্রদায়

১ বল্লভাচারী [বল্লভাচার্য্য

২ মীরাবাঈ

২২. ৪৫ চতুঃসন সম্প্রদায় বা সনকাদি
[নিম্বাদিত্য]

২২. ৪৬

২২, ৪৭ চৈতন্য সম্প্রদায়

২২. ৪৮ বঙ্গদেশের চৈতন্য শাখা

১ স্পষ্টদায়ক

২ সহজিয়া [৮১.৪৯ দেখ]

৩ নেড়া-নেড়ী

৪ বাউল [গীত দেখ ৮১.৭৪]

৫ কর্ত্তা ভজা (আউলেচাঁদ ১৬১৬ শক)

৬ দরবেশ, সাঁই

৭

৮

৯ অন্যান্য [রামবল্লভী, বলরামী, খুসীবিশ্বাসী, কালীকুমারী, বলহরি, গৌরবাদী, সাধ্বিনী ইত্যাদি]

২২. ৪৯ অন্যান্য দেশের

.৪৯১ আসাম

মহাপুরুষিয়া [শঙ্করদেব ১৪৪৮ খৃঃ অঃ]

.৪৯২ উড়িষ্যা

২২. ৪৯৩ উত্তর-পশ্চিমের বৈষ্ণব

১ রাধাবল্লভী, সখীভাবক

২ চরণদাসী [চরণদাসদিল্লী]

৩ সৎনামী [জগজীবন-দিল্লী ১৭৬১]

৪ পল্টুদাসী

৫ অপ্পাপন্থী

৬ বীজমার্গী

৭ হরিদাসী [১৬০০ খৃ ।]

৮

৯ অন্যান্য—হরিশ্চন্দী, সধ্নপন্থী, চুহড়পন্থী কুড়াপন্থী

২২.৪৯৪ পঞ্জাবের বৈষ্ণবশাখা

২২. ৪৯৫ মহারাষ্ট্রদেশীয় বৈষ্ণব শাখা

১ বিথলভক্ত বা বৈষ্ণববীর [পুণ্ডরীক-১৪শ] বিঠোবা ইত্যাদির পূজক যথা তুকারাম, একনাথস্বামী।

২ মানভৌ [মঠ-রিধপুর, বেরার]

২২. ৪৯৭ অন্ধ্র দেশীয় বৈষ্ণব

২২. ৪৯৮ দাক্ষিনাত্যের বৈষ্ণবশাখা

[অল্‌বারদের জীবনী ও ধর্ম :—সৎকোপ, নাথমুনি পুণ্ডরীকাক্ষ, যমুনাচার্য্য]

২ দ্রাবিড়বেদ নম্মালবার প্রণীত

২২. ৪৯৯ অন্যান্য বৈষ্ণবশাখা

২২. ৫ শাক্তধর্ম্ম

১ দক্ষিণাচার

২ বামী বা বামাচারী

৩ কাঞ্চুলীয়া [দাক্ষিণাত্য]

৪ করারী

২২. ৬ শৈবমত

.৬১ লিঙ্গ পূজা

.৬২ পাশুপাতমত

.৬৩ শৈবসিদ্ধান্ত মত

.৬৪ কাপাল বা কালমুখ

.৬৫ কাশ্মীর শৈবমত
(আগমশাস্ত্র, স্পন্দশাস্ত্র, প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্র)

.৬৬ বীরশৈব (লিঙ্গায়েৎ)

.৬৭ দ্রাবিড় শৈব

১ বেমন (১৪০০খৃঃ) ;
২ শ্রীনাথ (১৪২০ খৃঃ) ; রাজ লিঙ্গ (১৫০০ খৃঃ) ; ৪ হরি ভদ্র (১৫৫০ খৃঃ অঃ)

.৬৮ তামিল (২৮ খানি আগম ও উপআগম) ।

.৬৯ শৈব অন্যান্য

১ দণ্ডী বা দশনামী
২ যোগী, জঙ্গম
৩ পরমহংস
৪ অঘোর
৫ উদ্ধবাহু, আকাশবাহু, নখী
৬ সুথর, রূখর, উখড়
৭ কড়ালিঙ্গী
৮ গূদর
৯ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, অব-ধূত, নাগা ইত্যাদি

২২. ৭ সাধু সন্ন্যাসীদের ইতিহাস

২২. ৮ শিখ

১ উদাসী
২ গঞ্জ বথ্‌শী
৩ রামরায়ী
৪ সুথরাসাহী
৫ গোবিন্দ সিংহী
৬ নিরমল
৭ নাগা
৯ অন্যান্য

২২. ৯ বিবিধ

১ প্রাণনাথ [১৭শ শতাব্দী. বুন্দেলখণ্ড]
২ সাধ [বীরভান-১৬৫৮ ; ফরঙ্কাবাদ]
৩ শিবনারায়ণী [শিবনারায়ণ-১৭৩৫] গাজীপুর
৪ শূন্যবাদী [নাস্তিক সম্প্রদায়ঃ গুনিসার নামে বই হিন্দিতে আছে]

২৩ বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম

.১ চীনের বৌদ্ধ ধর্ম্ম
.২ জাপানের ধর্ম
.৩
.৪ বিবিধ দেশের বৌদ্ধধর্ম

২৩. ৫ জৈনধর্ম

.৬ শ্বেতাম্বর

১ পূজেরা

২ ঢুন্ধিয়া বা বিশ্টোল (১৫৮ খৃঃ স্থাপিত)

.৩ থেরপন্থী (১৭৬২ স্থাপিত)

.৭ দিগাম্বর

১ বিশ্পন্থী

২ থেরপন্থী (১৭শ শতাব্দী)

৩ সমৈয়াপন্থী ব তরণপন্থী (স্থাপয়িতা-তবণস্বামী ১৪৪৮খৃঃ—১৫১৫খৃঃ)

৪ গুমনপন্থী (১৮শ শতাব্দী)

৫ তোট পন্থী

৬

৭

৮

৯ দিগম্বর সঙ্ঘ

১ মূল সঙ্ঘ ২ দ্রবিড়

৩ যপনীয়৪ কষ্ট৫ মাথুর

৮ শ্রাবক সম্প্রদায়

৯ তীর্থঙ্কর জীবনী

২৪. ১ হিন্দুধর্ম আধুনিক

.১ ব্রাহ্মধর্ম

.১১ আদিব্রাহ্মসমাজ

.১২ নববিধান বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

.১৩ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

.১৪ পুস্তিকা

.১৫ পত্রিকা-যথা-তত্ত্ববোধিনী, ধর্মতত্ত্ব তত্ত্বকৌমুদী

.১৬ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট

.১৭ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

.১৮

.১৯ ইতিহাস ও জীবনী

২৪. ২ রা কৃষ্ণ মিশন

.২১ উপদেশাবলী

.২২ অন্যান্য

.২৩ স্বামী বিবেকানন্দেরগ্রন্থ

.২৪ পুস্তিকা

.২৫ পত্রিকা-যথা উদ্বোধন

.২৬ প্রতিবেদন রিপোর্ট

.২৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

.২৮

.২৯ ইতিহাস ও জীবনী

২৪.৩ বঙ্গদেশের অন্যান্য সম্প্রদায়

১ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

২ ঠাকুর দয়ানন্দ-অরুণাচল,

৯ উড়িষ্যা, আসাম

২৪.৪ পঞ্জাব হিন্দুস্থান

·৪১ আর্য্যসমাজ

·৪২ রাধাস্বামী

২৪·৫ বোম্বাই

২৪·৬ মধ্যপ্রদেশ

২৪·৭ মান্দ্রাজ

২৪.৮

২৪.৯ অন্যান্য প্রদেশের সম্প্রদায়

২৫ খৃস্টান ধর্ম

বাইবেলের অনুবাদ সমগ্র]

·১ বাইবেল ; প্রাচীন সুসমাচারের বিভিন্ন পুস্তক গুলিকে পৃথক করিয়া রাখিতে পারা যায়। যথা

১৫ নূতন সুসমাচার ইত্যাদি

২ বাইবেল সম্বন্ধীয় সমালোচনা

[সপক্ষে ও বিপক্ষে]

৩ খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব

৪ প্রার্থনা

৫ খৃষ্টীয় পত্রিকা (০৯ ২৫)

৬ প্রতিবেদন

৭ প্রচারসাহিত্য (Tracts)

পদ্য-সঙ্গীত

৮ প্রচারসাহিত্য গদ্য

৯ ইতিহাস ও খৃষ্টের জীবনী

২০ ধর্ম্ম (সাধারণ)

২১ ধর্ম্মতত্ত্ব

২৬ মুসলমান ধর্ম

.১ কোরাণ হদিসের অনুবাদ

.২ শিয়া

.৩ সুন্নী

.৪ সুফী

.৫ অন্যান্য সম্প্রদায়

.৬ বাহাই ধর্ম

.৭ আহমেদিয়া

.৮

.৯ অন্যান্য শাখা

২৭ অন্যান্য ধর্ম

১ চীন

২ জাপান

৩ বাবিলন-কালদীয় যাহু।

মিশর, গ্রীক, রোম

৪ পারসিক

৫ ইহুদী

৬ আফ্রিকার আদিম ধর্ম
৭ উঃ আমেরিকার আদিম ধর্ম্ম
৮ দঃ আমেরিকার ধর্ম্ম
৯ আদিম জাতির ধর্ম্ম

২৮ ধর্মমত

১ বস্তু পূজা (Fetichism)
২ প্রকৃতি পূজা (Totemism)
৩ ভূত পূজা (Shamanisin)
৪ পূর্বপুরুষ পূজা (Amiism us)
৫ বহুদেব পূজা (Polytheism)
৬ দ্বৈতবাদ (Dulism)
৭ একেশ্বরবাদ (Monotheism)
৮
৯ অন্যান্য মত

২৯ পৌরাণিক আখ্যায়িকা

১ তুলনামূলক পুরাণ
২ ভারতবর্ষের পুরাণ
৩ প্রাচীন অন্যান্য দেশ
৪ য়ুরোপ
৫ এশিয়া
৬ আফ্রিকা
৭ উত্তর আমেরিকা
৮ দক্ষিণ আমেরিকা
৯ ওশেনিয়ার পুরাণ

৩০ সমাজতত্ত্ব

৩১ আদম সুমারী ও গণনাতত্ত্ব (Statistics)

.১ গণনাতত্ত্ব (Statistics)
.২
.৩ বার্ষিক (Annuals) এই-থানে দেশ অনুসারে থাকিবে।
.৪ য়ুরোপ
.৫ এশিয়া
.৬ আফ্রিকা
.৭ উঃ আমেরিকা
.৮ দঃ আমেরিকা
.৯ ওশেনিয়া

৩২ রাষ্ট্র বিজ্ঞান

.১ রাষ্ট্র তত্ত্ব
.২ তুলনা মূলক রাষ্ট্রনীতি
.৩ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি
.৪ জনমত ও অধিকার
.৫ উপনিবেশ ও দেশান্তর গমন

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পঞ্চপল্লব

হিন্দু মূর্ত্তিশিল্পের ইতিহাস

ঋগ্বেদে যে ৩৩টি দেবতার নাম পাওয়া যায় তাঁহারা প্রায় সমস্তই কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের কল্পিত মূর্ত্তি মাত্র। এই সকল দেবতার পূজা হইত উন্মুক্ত স্থানে। যে দেবতার পূজা করা হইত সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যটি যখন প্রত্যক্ষ থাকিত তখন তাহার কোনও মূর্ত্তি কল্পনা করার প্রয়োজন ছিল না। এইজন্যই ঋগ্বেদে কোনও দেবতার মনুষ্যের ন্যায় মূর্ত্তি পরিকল্পিত হয় নাই। কিন্তু তাহার অনেকস্থানেই দেবতাদের আকারের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের মস্তক, মুখ, চক্ষু, উদর, হস্ত, পদ প্রভৃতি আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন, অগ্নির জিহ্বা অর্থ তাহার শিখা এবং সূর্য্যের বাহু অর্থ তাহার রশ্মি। ঋগ্বেদে দেবতাদিগের একটি মস্তক ও দুইটি বাহু আছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই বাহুতে প্রত্যেক দেবতা তাঁহার বিশেষ অস্ত্র—যেমন ইন্দ্রের বজ্র—ধারণ করেন। রুদ্রদেবতারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে ঋগ্বেদের দেবতাগণ তাঁহাদের আয়ুধ ও বাহন দ্বারাই পরিচিত।

যাস্কের সময় (খৃঃ পূঃ ৫০০) পর্য্যন্ত দেবতাদের কোনও মূর্ত্তি ছিল না। তাঁহার পরে পতঞ্জলির (খৃঃ পূঃ ২০০) এবং সম্ভবতঃ পাণিনির সময় দেবতার মূর্ত্তির প্রচলন ছিল। সাঁচীর স্তূপে অনেক স্থানে স্বাভাবিক নারীরূপে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। তিনি পদ্মফুলের উপর সমাসীনা অথবা দণ্ডায়মানা, তাঁহার দুই হস্তে দুইটি পুষ্প ও দুইটি হস্তী তাঁহার মস্তকে বারি বর্ষণ করিতেছে। অপর

দিকে দ্বিতীয় ক্যাড্‌ফাইসসের (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) রাজত্বকালের একটি মুদ্রা স্বাভাবিক দ্বিভুজ নরাকারে শিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিতে শিবে সহচর বৃষ, ত্রিশূল ও চর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের একটি প্রাচীন গল্পে (সম্ভবতঃ খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে লিখিত দেখা যায় যে নরমূর্ত্তি দেবতাগণকে নল চিনিতে পারিতেছেন না—এই জন্য তাঁহাবে বলিয়া দিতে হইয়াছে যে ইঁহারা দেবতা। এই স্থানে দেবতাগণের পলকহীন চ প্রভৃতি ছয়টি বিশেষ লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। এই লক্ষণগুলির দ্বারা দময়ন্তী তাঁহাদিগকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায় যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত দেবতাগণ স্বাভাবি মনুষ্যাকারেই কল্পিত হইয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যে—যথা মহাভারতে শেষাংশ, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতিতে—দেবতাগণকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা ক হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই চতুর্ভুজ—কেবলমাত্র ব্রহ্মা চতুর্মুখ আ সকলেরই এক এক মুখ। প্রত্যেকেরই হস্তে বিশেষ বিশেষ আয়ুধ।

দ্বিতীয় ক্যাড্‌ফাইসসের রাজত্বকালের (অনুমান ৫০ খৃঃ) একটি মুদ্রা দ্বিভুজ শিবের মূর্ত্তি দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের সময়ে চতুর্ভু শিবমূর্ত্তি দেখা যায়। সুতরাং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগেই প্রথম চতুর্ভু দেবমূর্ত্তির প্রচলন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অতিরিক্ত দুইটি হস্ত স্বাভাবিক হস্তের পশ্চাতে সন্নিবেশি হইয়াছিল। ইহার পর ক্রমেহ হস্তের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম অষ্টভুজ দেবমূর্ত্তি দেখা যায়। এলোরায় পর্ব্বতগাত্রে খোদিত (অষ্টম শতাব্দী কৈলাস শিব মন্দিরে অনেক বহুভুজ মূর্ত্তি আছে। অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে দেখা যায় বিষ্ণু অষ্টভুজ, ত্রিবিক্রম ষড়্‌ভুজ, নরসিংহ অষ্টভুজ, শিব সাধারণত অষ্টভুজ এবং নৃত্যকালে ষোড়শভুজ এবং কার্ত্তিকেয় দ্বাদশভুজ ও ষড়ানন।

প্রথমতঃ বৈদিক দেবতাগণের কোন বিশিষ্টতা ছিল না। এই জন্য প্রত্যে দেবতার সহিত তাঁহার বিশেষ বাহনের কল্পনা করা হয়। বাহন দ্বারা

দেবতার পরিচয় হইত। এইরূপে ইন্দ্রের বাহন হস্তী, সূর্য্যের সপ্তঘোটক, গঙ্গার মকর, যমুনার কূর্ম্ম এবং লক্ষ্মীর সহচর হস্তিদ্বয়। পরবর্ত্তী যুগে প্রত্যেক দেবতার মূর্ত্তি যতই বিশিষ্টতা লাভ করিতে লাগিল ততই বাহনের ব্যবহার কমিয়া আসিতে লাগিল; কারণ, তখন বাহন ভিন্নও দেবমূর্ত্তির স্বরূপ নির্ণয় করা যাইত। এই সময়কার সূর্য্যমূর্ত্তিতে দেখা যায় যে তাঁহার সঙ্গে অশ্ব নাই এবং দুই হস্তে দুইটি পদ্মফুল। বর্ত্তমানকালের অনেক চিত্রকর লক্ষ্মীর যে চিত্র অঙ্কন করেন তাহাতে হস্তী নাই কিন্তু লক্ষ্মীর চারি হস্ত আছে এবং তিনি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতেছেন এইরূপে অঙ্কিত হয়।

কিন্তু দেবতাদের বাহনের পরিকল্পনা নূতন নয়; বেদেই ইহার সূচনা আছে। ঋগ্বেদের দেবতাদের রথ অশ্বব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর দ্বারাও চালিত হয়; যেমন মরুতের কৃষ্ণসার এবং পুষণের ছাগ। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের দেবতাগণের বাহন বেদের বাহনের সঙ্গে (সূর্য্যের সপ্তাশ্ব ব্যতীত) এক নহে। ইন্দ্রের ঐরাবত, শিবের নন্দী প্রভৃতি এই যুগের কল্পনা।

দেবতাদিগকে চিনিবার আর একটি উপায় তাঁহাদের আয়ুধ, যথা, ইন্দ্রের চক্র, এবং শিবের ত্রিশূল। প্রথমতঃ একটি অস্ত্র দ্বারাই কোনও দেবতার পরিচয় লাভ করা যাইত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের মূর্ত্তিশিল্পে দেখা যায় যে দেবতাদের আয়ুধের সংখ্যা চার এবং কোনও কোনও স্থানে ততোধিক।

এই সকল প্রমাণ হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়।

বৈদিক দেবতাদিগের কোনও বিশিষ্টতা না থাকাতে তাহাদিগকে চিনিবার কোনও উপায় ছিল না এই জন্যই বাহনের সৃষ্টি হইল। কিন্তু যখন বাহন ব্যতীত দেবগণের মূর্ত্তি অঙ্কন করার আবশ্যক হইল তখন আয়ুধের পরিকল্পনা আবশ্যক হইল। কিন্তু স্বাভাবিক দুই হস্তে যদি কোনও ভঙ্গী প্রকাশ করিতে হয় তাহা হইলে আয়ুধের জন্য অপর দুইটি হস্তের প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতনও নহে; কারণ, ঋগ্বেদে রূপকার্থে কোনও কোনও দেবতার বহুমুখ ও বহুহস্তের উল্লেখ আছে; যেমন, অগ্নি ত্রিমুখ ও সপ্তভুজ, বরুণ চতুর্ম্মুখ এবং

বিশ্বকর্ম্মা চতুর্ভুজ। এই সিদ্ধান্তের পোষকতায় আরও প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। হিন্দু শিল্পকলায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় দেবতাগণ স্বাভাবিক দুইটি হস্তে কোনও ভঙ্গী প্রকাশ করিতেছেন এবং পশ্চাতের দুইটি অতিরিক্ত হস্তে আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন। যেখানেই দেবতার সহিত বাহন বর্ত্তমান সেখানেই তাঁহার দুই হস্ত। এই দুই প্রমাণই উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগের দেবতাগণের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মারই চতুর্মুখ। বোধহয় ঋগ্বেদে বিশ্বকর্ম্মা চতুর্দ্দিকে চাহিয়া আছেন বলিয়া উল্লিখিত হওয়াতে এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে তিনি চতুর্মুখ বলিয়া উক্ত হওয়াতে ব্রহ্মারও চতুর্মুখ কল্পনা করা হইয়াছে।

ক্রমে বহু মুখ ও বহু বাহু যখন দেবতাদিগের বিশেষ চিহ্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল তখন হইতেই ক্রমে অপ্রধান দেবতাদেরও মুখও হস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে, উৎকীর্ণ মূর্ত্তিতে দেবতাদের কুড়ি হস্ত এবং সাহিত্যে পঞ্চাশ হস্ত পর্য্যন্ত দেখা যায়। এদিকে মুখের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল— রাবণের দশমুখ তাহার উদাহরণ।—Rupam.

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আশ্রমসংবাদ

সাধারণ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে, আমাদের সঙ্গীতশিক্ষক ৺লোকনাথ গোস্বামী মহাশয় গতমাঘমাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার পদে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রাসাদ গোস্বামী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাধিকা নাথ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র।

পৌষের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পল রিশার্ডের আগমনের খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। গত ১২ই ফাল্গুন তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের মধ্যে পাঁচ সপ্তাহ ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার উন্নত সাধক-জীবনের পরিচয় পাইয়া অনেকেই লাভবান্ হইয়াছেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিতরূপে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি প্রত্যহ ফরাসী শ্রেণীতে পড়াইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, আমাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত চিমনলাল আশ্রমের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গত ১৪ই মাঘ চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বগ্রামে (সিন্ধুদেশে) দেশসেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

সকলেই শুনিয়া খুসি হইবেন যে, এ বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষার জন্য বালকদিগকে আশ্রমে শিক্ষাদানকরা হইবে না। তাহাদিগকে আমাদের নিজের পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়ান হইবে। যদি কেহ বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করে তবে তাঁহাকে অন্তত একবৎসর পূর্ব্বে আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্য বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে হইবে। আশা করি সকল ছাত্রই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত

করিয়া বিশ্বভারতীকে অধ্যয়ন করিবে। পূর্ব্ব প্রথানুসারে কয়েকটি ছাত্র এইবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে। শ্রীমান্ সাধকচন্দ্র নন্দী ও শ্রীমতী রমা দেবী এইবার পরীক্ষা না দিয়া বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রাক্তন ছাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশশধর সিংহ কলেজ ছাড়িয়া বিশ্বভারতীতে যোগদান করিয়াছেন।

মাঘ মাসে দুইটি পত্রিকার জন্মোৎসব সমারোহের সহিত হইয়াছে। "প্রভাত" ও "শিশু" আশ্রমের বহু পুরাতন পত্রিকা; ইহাদের সহিত বহু প্রাক্তন ছাত্রের স্মৃতি গ্রথিত হইয়া আছে। "শিশুর" জন্মোৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

গত শ্রীপঞ্চমীর দিন আশ্রমে "বসন্তোৎসব" খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। শারদোৎসবের ন্যায় এই বসন্তোৎসবেও প্রাঙ্গনে বিচিত্র আলপনা দেওয়া হইয়াছিল, এবং জ্যোৎস্নালোকে তাহার চতুর্দ্দিকে আশ্রমবাসী সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানে "ফাল্গুনী"র প্রায় সমস্ত গান গীত হইয়াছিল।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী কবিবর কীট্‌সের শততম বার্ষিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে আমাদের আশ্রমে একটি সভা হইয়াছিল। তাহাতে বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীপ্রমথনাথ বিশী "কীট্‌স্" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত-মল্লিক তাঁহার সম্বন্ধে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রসঙ্গে কীট্‌সের ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতাও পঠিত হইয়াছিল।

আমাদের এখানে ফরাসীভাষা শিক্ষা করিবার প্রবল উৎসাহ আসিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মরিসের অদম্য উৎসাহ। তদুপরি ফরাসী দেশীয় কোনো-না-কোনো অতিথিকে প্রায়ই আমরা দীর্ঘকালের জন্য পাইতেছি। মিঃ পল রিশার্ড চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত নসিরুল্লা সস্ত্রীক আশ্রমে কিছু দিন বাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি পাঞ্জাবী, কিন্তু তাঁহার পত্নী ফরাসী; এই ফরাসী মহিলার ফরাসী-শ্রেণীতে অনেক নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নসিরুল্লা সাহেব উর্দ্দু শিখাইতেছেন।

হল্যাণ্ডবাসী ডাঃ লিউ (Leeuw) দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন।

তিনি সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন। তিনি হল্যাণ্ডের একটি যুবক-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ; সমিতির নাম Practical Idealist Association. ইহার আদর্শ প্রচার করা পৃথিবী পর্য্যটনের একটি কারণ। রটের্, ডামে বাসকালে ইঁহার ভবনে গুরুদেব নিত্য আহার করিতেন। ইঁহার বিষয়ে ও গুরুদেবের হল্যাণ্ডেবাসের সংবাদ Modern Review (March) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ লিউ এখনকার বালকগণের প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপের চলন্ত ছায়াচিত্র (Cinema) তুলিয়া লইয়াছেন। বালকগণ বাল্মিকী-প্রতিভার কিয়দংশ অভিনয় করিয়াছিল, তাহারও ঐরূপ চিত্র উঠান হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত আরো অনেক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অতিথি এখানে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালোরের United Theologian Institute এর অধ্যক্ষ Dr. Rev. L. P. Larson আসিয়াছিলেন। তিনি বহুবৎসর ঐ অঞ্চলে থাকিয়া ঐ দেশের ভাষা ও রীতি-নীতি আচার শিক্ষা করিয়াছেন।

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, কাশীমবাজারের রাজসভার গায়ক শ্রীরাধিকালাল গোস্বামী মহাশয় এখানে আসিয়া দুই রাত্রি গানের বৈঠক করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হলদার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কর মহাশয়গণ দুই মাসের জন্য গোয়ালিয়রের রাজার আমন্ত্রণে "বাঘ" গুহার ভিতরকার চিত্রের নকল লইবার জন্য গিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী দিন-দিন পুষ্টি লাভ করিতেছে। শ্রীমান সাধকচন্দ্র নন্দী ও শ্রীমতী রমা দেবী এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়া বিশ্বভারতীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীমতী রেখা দেবীও এই সঙ্গে ভর্ত্তি হইয়াছেন। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান্ শশধর সিংহ কলেজ ছাড়িয়া এখানেই পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো পাঁচটি ছাত্র বিশ্বভারতীর

ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের প্রায় সব অধ্যাপকই বিশ্বভারতীর ছাত্র সুতরাং আজকাল বিশ্বভারতীর ছাত্র সংখ্যা মন্দ নহে।

দর্শনশাস্ত্র পড়াইবার নিমিত্ত বহুদিন হইতে উপযুক্ত লোকের অভাব ছিল; সম্প্রতি তাহা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস এম, এ, মহাশয় পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত জ্ঞানপিপাসা, ও নম্র স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। হিন্দী পড়াইবার জন্য শ্রীযুক্ত রাজধর কাব্যতীর্থ মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বহুদিন হইতে পরস্পর প্রীতি, ভাবের আদানপ্রদান, ও যোগরক্ষা প্রভৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, সম্প্রতি সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর যাবতীয় ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মিলনের জন্য "বিশ্বভারতী-সম্মেলনী" নামে একটি সভা গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস মহাশয় ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদক। সভার প্রারম্ভিক অধিবেশন গত ২৫শে চৈত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ সমারোহে হইয়া গিয়াছে। গীত ও বাদ্যে সভাগৃহ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত "বাঘ" গুহার ও সেই প্রদেশের তাঁহাদের অঙ্কিত বিবিধ চিত্র প্রদর্শন করিয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন। সভা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। আশা করা যায় এই সভা দ্বারা বিশ্বভারতীর সমগ্র অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে প্রীতির যোগসূত্র গ্রথিত হইবে।

গুরুদেবের খবর

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যান্ত গুরুদেব আমেরিকায় ছিলেন। তিনি নিয়ুইয়র্কে সহর ও তাহার সন্নিকট স্থানসমূহে অধিক দিন কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার কর্ম্মস্রোতে নিমগ্নলোককোলাহল তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। চিকাগোতে তিনি কিছুদিন ছিলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে ভাল লাগে নাই। দক্ষিণে Texas প্রদেশে কিছুদিনের জন্য গিয়া তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে, ঐ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—

My tour in this part of America will be ended tomorrow. I am writing this from a dormitory in a Women's College. I am invited to give readings from my books to the girl students this evening. It is touchingly sweet to watch their immense delight when I recite to them Crescent Moon poems—the mother in their hearts is stirred in laughter and tears and the child which is in the poet feels itself bathed in a shower of tenderness. Yesterday I spoke to a very large audience in a church about my life and aspiration, which became possible for me because these people in the south are simple-minded, warm-hearted creatures, they have faith and interest in the personality of man. I talked for over an hour and a half, they heard me

with rapt attention. I know, most of them will never forget that evening, for I helped them to open some window of their mind through which streamed in the sunlight from the East. I feel this is my real mission, and for this I have been called to the West, I who outwardly speaking, was least prepared for it.

দক্ষিণে ভ্রমণের সময় পিয়ার্সন সাহেব গুরুদেবের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার চিঠিতে কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানাভাবে সব প্রকাশ করিতে পারা যায় না। টেক্সাস ভ্রমণের পর তাঁহারা চিকাগো হইয়া নিয়ুইয়র্কে ফিরিয়া যান। সেখান হইতে ১৯শে মার্চ্চ গুরুদেব, রথীবাবু ও প্রতিমা দেবীর সহিত পর্ট গাল যাত্রা করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রওয়ানা হইবার বা পঁহুছিবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পিয়ার্সন সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে য়ুরোপ ভ্রমণে না গিয়া আমেরিকায় থাকিয়া সেখানকার বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া শিক্ষাপ্রণালী, ও গল্প বলিবার প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে অনুশীলন করিতেছেন। তিনি সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে ফিরিয়া নবেম্বর মাসে এখানে ফিরিবেন বলিয়া মনে করেন।

শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥০ আড়াই টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়।

৩। পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন
পত্রিকাবিভাগ
শান্তিনিকেতন, E. I. Ry. Loop.

গ্রাহকগণের প্রতি

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed & Published by—Jagadanand Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop

সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা — চৈত্র, ১৩২৭ সাল

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"শান্তিনিকেতন" পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হয় বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্রষ্টব্য

কলিকাতায় নং ২০বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এণ্ড কোম্পানীতে খুচরা "শান্তিনিকেতন" নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁহারা ঐ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শান্তিনিকেতন"
(পত্রিকাবিভাগ)

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩২৭ সাল

বোধিসত্ত্ব

"লোকে দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার আশায় মোহবশত দুঃখেরই দিকে ধাবিত হয়, এবং সুখের ইচ্ছায় শত্রুর ন্যায় নিজের সুখকেই বিনাশ করে; যিনি এই সুখলোলুপ (অথবা সুখদরিদ্র) ও বহুদুঃখপীড়িত ব্যক্তিগণের সর্ব্ববিধ পীড়া ছেদন করেন, সর্ব্ববিধ সুখ বিধান করিয়া তৃপ্তিসাধন করেন, ও মোহের অপনয়ন করেন, তাঁহার সমান সাধু কোথায়? তাঁহার সমান মিত্র কোথায়? এবং সেই কার্য্যের মত পুণ্যই বা কোথায়?"—শান্তিদেব, বোধিচর্য্যাবতার, ১-২৮ ৩০।

বোধি শব্দের অর্থ 'বোধ' 'জ্ঞান,' অর্থাৎ 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান;' আর সত্ত্ব শব্দের অর্থ 'জীব' 'পুরুষ;' যে জীব বা ব্যক্তি বোধি কামনা করেন, তিনি বোধিসত্ত্ব। যতক্ষণ বোধি লাভ না হয় ততক্ষণ সাধককে বোধিসত্ত্ব বলা হয়, বোধি লাভ হইলেই তিনি হন বুদ্ধ অর্থাৎ যিনি জ্ঞেয় তত্ত্বকে যথাযথ ভাবে জানিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হইতে পারেন, এবং যতদিন তিনি ততদিন সাধনা অবস্থায় থাকেন ততদিন তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বলা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মে বোধিসত্ত্বগণের জীবন অতিপবিত্র, অতিরমণীয়। সমস্ত জগতের হিতের জন্য সুখের জন্য নিজের জীবনকে কিরূপে উৎসর্গ করিতে হয়, ইহার মধ্যে তাহাই পাওয়া যায়। সমগ্র মানবের দুঃখ দূর করিবারই জন্য তাঁহাদের জন্ম, নিজের প্রতি তাঁহাদের কোনো দৃষ্টি থাকে না। যতক্ষণ তাঁহারা সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে না পারেন ততক্ষণ তাঁহাদের বুদ্ধত্ব লাভ হয় না। ইহা সাধনসাপেক্ষ। এই সাধনের বিন্দুমাত্রও করিতে পারিলে প্রভূত কল্যাণ হয়। এই আদর্শে চলিতে পারিলে লোকের বাহ্য ও আধ্যাত্মিক উভয়ই জীবন সুমধুর হইয়া উঠে। নিম্নে এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিত হইতেছে।

প্রথমত বোধিসত্ত্ব ভাবিয়া দেখেন—'যখন আমার ও অন্যের উভয়েরই ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে, তখন আমার এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, আমি নিজকেই তাহা হইতে রক্ষা করি, অন্যকে নহে।'

এইরূপ চিন্তা করায় তাঁহার হৃদয়ে নিজের ও এই সমস্ত জীব লোকের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা হয়। এইরূপ ইচ্ছা হইলে তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে দৃঢ়তর শ্রদ্ধার সহিত বো ধি চি ত্ত লাভ করা, অর্থাৎ 'আমি বোধি লাভ করিব' দৃঢ়তর শ্রদ্ধার সহিত মনে করা।

বোধিচিত্ত দুই প্রকার, বো ধি প্র ণি ধি চি ত্ত ও বো ধি প্র স্থা ন চি ত্ত। সমস্ত জগতের পরিত্রাণের জন্য আমাকে বুদ্ধ হইতে হইবে' এই প্রার্থনা রূপ যে চিত্ত বা সঙ্কল্প তাহার নাম বো ধি প্র ণি ধি চি ত্ত; আর এই সঙ্কল্প করার পর বুদ্ধত্ব লাভের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় যে চিত্ত তাহার নাম বো ধি প্র স্থা ন চি ত্ত। গমনেচ্ছু ও গমনপ্রবৃত্ত এই দুই ব্যক্তির যে ভেদ, বোধিপ্রণিধিচিত্ত ও বোধিপ্রস্থান চিত্ত এই উভয়েরও সেই ভেদ।

বলা বাহুল্য, প্রণিধিচিত্ত হইতে প্রস্থানচিত্ত উৎকৃষ্টতর। তাই এক স্থানে (শিক্ষা =শিক্ষা সমুচ্চয়, ৮; বোধিপ=বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকা, ২৪) উক্ত হইয়াছে:—সেই সমস্ত মানব দুর্লভ, যাহারা সম্যক্ সম্বোধি লাভের জন্য চিত্তকে প্রণিহি

প্রহান অর্থাৎ উদ্ভব করে। আর এক জায়গায় (বোধি প.৩৩) বলা হইয়াছে :—যদি কোনো ব্যক্তি গঙ্গার বালুকা পরিমাণ অসংখ্য বুদ্ধক্ষেত্র সদ্রত্নপূর্ণ করিয়া বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করে, আর যে ব্যক্তি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বোধির জন্য নিজের চিত্তকে উৎপন্ন করে, ইহাদের মধ্যে এই শেষোক্ত ব্যক্তিরই বুদ্ধপূজা উৎকৃষ্ট। এই ভাবিয়া একজন (বোধি.=বোধিচর্য্যাবতার, ১-২৭) বলিয়াছেন :—জগতের পরিত্রাণের জন্য বুদ্ধ হইব, কেবল মাত্র এই প্রার্থনাও যখন বুদ্ধকে পূজা করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, তখন সমস্ত মানবের সর্ববিধ সুখের জন্য উদ্যম করিলে যে ফল হয় তাহার সম্বন্ধে আর কি বলা যাইবে।

বোধিচিত্ত চারি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে ; (১) বুদ্ধ বা বুদ্ধ শ্রাবকের (অর্থাৎ বুদ্ধ-উপাসকের) প্রবর্ত্তনায়, (২) অথবা বোধি বা বোধিচিত্তের প্রশংসা শুনায়, (৩) অথবা অনাথ-অশরণ ব্যক্তিগণকে দেখিয়া করুণার উদ্রেকে, (৪) কিংবা বুদ্ধের সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণতা-দর্শনে প্রীতির উদ্রেকে।

বোধিচিত্ত লাভ করিয়া বোধিসত্ত্বকে সাবধান থাকিতে হয় যাহাতে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া না ফেলেন। সমস্ত জগতের ত্রাণের জন্য বোধি লাভ করিব, এই মনে করিয়াই তিনি বোধির প্রতি চিত্ত উৎপাদন করিয়া থাকেন, তিনি যদি কার্য্যত তাহা না করিতে পারেন, তবে তাঁহার কথার সহিত কার্য্যের মিল হয় না। বোধিচিত্ত লাভের পর তাঁহাকে বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে অভ্রান্ত ও সংযমপরায়ণ কোনো কল্যাণমিত্রের[১] নিকট সংযমশিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। যদি কোনো কল্যাণমিত্র না থাকেন, তবে দশ দিকে অবস্থিত সমস্ত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণকে সম্মুখে উপস্থিত ভাবিয়া তাঁহাকে শিক্ষা ও সংযম গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষণীয় বহু বিষয় আছে, কিন্তু যখন তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, তখন তিনি নিজের শক্তি ও শিক্ষণীয় বিষয় ওজন করিয়া যেরূপ যাহা সাধ্য হয় সেইরূপই তাহা গ্রহণ করিবেন। তাহা না হইলে সকলেরই

১। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের লাভরূপ কল্যাণবর্ত্মে যিনি মিত্র অর্থাৎ অসাধারণ বন্ধু, তাঁহাকে কল্যাণমিত্র বলা হয় (বোধিপ. ১৫)।

নিকট তাঁহার বাক্যের ও কার্য্যের মিল থাকিবে না। তাই একস্থানে (সদ্ধর্ম-স্মৃত্যুপস্থানসূত্র, শিক্ষা ১২ পৃ.) বলা হইয়াছে—অতিযৎসামান্যও বস্তুকে 'দিব' এই চিন্তা করিয়াও যদি না দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রেতগতি হয়, আর যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা না দেওয়া যায় তবে নরকগতি হয়। এ অবস্থায় সমস্ত জগতের নিকট অসাধারণ বিষয় দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিণাম যে, আরো গুরুতর, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই বোধিসত্ত্বকে প্রথম হইতেই সাবধান থাকিতে হয়, নিজের শক্তি ও প্রতিজ্ঞেয় বিষয়কে ওজন করিয়া দেখিতে হয়, যাহাতে তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিবেন তাহা মিথ্যা হইয়া না যায়। তাই বলা হইয়াছে (ধর্ম্মসঙ্গীতিসূত্র, শিক্ষা পৃ. ১২) বোধিসত্ত্বকে সত্য গুরু হইতে হইবে, অর্থাৎ তিনি গুরুর নিকট যে শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহা যেন সত্য হয়; তাঁহাকে সত্য স ঙ্গী তি হইতে হইবে অর্থাৎ তিনি সেখানে মুখ হইতে যাহা উচ্চারণ করিবেন তাহা যেন সত্য হয়। সত্য বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি বোধির জন্য যে চিত্ত উৎপাদন করিয়াছেন নিজের প্রাণেরও জন্য তাহা পরিত্যাগ করিবেন না, এবং সমস্ত লোকের সম্বন্ধে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা কোনোরূপ অন্যথা করিবেন না। বোধিসত্ত্ব যদি একবার বোধিচিত্ত উৎপাদন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন, বা সমস্ত লোকের সম্বন্ধে কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার মিথ্যাচরণ করা হয়। তাই এক স্থানে (আর্য্য সাগরমতিসূত্রে, শিক্ষা ১২ পৃ.) বলা হইয়াছে—যদি কোনো রাজা বা রাজার মন্ত্রী নগরের সমস্ত লোককে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া যথাসময়ে তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ভোজন না করান, তাহা হইলে সেই রাজার বা রাজমন্ত্রীর কথা ও কার্য্যের মিল থাকে না, নাগরিকেরা উপবাস করিয়া চলিয়া যায়; এইরূপ যে বোধিসত্ত্ব কোনো ব্যক্তিকে আশ্বাস দিয়া—যে সংসারদুঃখ তীর্ণ হয় নি তাহাকে তরাইবার জন্য, যে মুক্ত হয় নি তাহাকে মোচন করিবার জন্য, এবং যাহাদের কোনো আশ্বাস নাই তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য আশা দিয়া তজ্জন্য উদ্যোগ করেন না, এবং বোধিলাভের অনুকূল কল্যাণ-

সম্পাদনের চেষ্টা করেন না, সমস্ত লোকের নিকটে তাঁহার নিজের কথানুসারে কার্য্য করা হয় না। অতএব বোধিসত্ত্বের এরূপ কোনো কথা বলা উচিত নহে, যাহা তিনি করিতে পারেন না। বোধিসত্ত্বকে কেহ কোনো কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রার্থনা করিতে পারে, তিনি তাহাকে কথা দিলে তজ্জন্য প্রাণত্যাগও করিবেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিবেন না। অতএব নিজের শক্তি অনুসারে অন্তত একটি মাত্রও মঙ্গল অনুষ্ঠান করিবেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে দশটি কুশল কর্ম্মপথ২ গ্রহণ করিয়া চলিতে হয়। যে ব্যক্তি ইহাদের একটিও গ্রহণ করেন না, অথচ বলেন যে, আমি মহাযান অবলম্বন করিয়াছি, আমি সম্যক্ সম্বোধির অন্বেষণ করিতেছি, তিনি অত্যন্ত মায়াবী, মিথ্যাবাদী, ও বুদ্ধগণের নিকট প্রতারক।

বোধিসত্ত্বের ব্রতচর্য্যা বড় সহজ ব্যাপার নহে, ইহা অতিদুষ্কর। ইহা বেশ ভাল করিয়া জানিয়া বুঝিয়াও যাঁহার তাঁহাতে উৎসাহ থাকে, তিনি সমস্ত দুঃখিত জনের পরিত্রাণের ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণকে সম্মুখস্থিত চিন্তা করিয়া পূজাবন্দনাদি৩ পূর্ব্বক বোধিলাভের জন্য এইরূপে চিত্তকে উৎপাদন করেন (শিক্ষা. ১৩-১৪)

আমি বুদ্ধের সম্মুখে বোধির জন্য চিত্তকে উৎপাদন করিয়াছি। আমি সমস্ত জগৎকে আহ্বান করিতেছি আমি ইহার দারিদ্র্যকে অপনয়ন করিব। আজ হইতে আর আমি ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও দ্রোহবুদ্ধি করিব না, ইহাতেই আমার বোধিলাভ হইবে। আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব ও সমস্ত পাপ কামনাকে পরিত্যাগ করিব। বুদ্ধগণের শীলরক্ষা ও সংযমকে শিক্ষা করিব। দ্রুতভাবে বোধি

২। অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, পিশুন বাক্য না বলা বা অপবাদ না করা, কর্কশ বাক্য না বলা, নিরর্থক বাক্য না বলা, অলোভ, অদ্রোহ, ও সম্যগ্ দৃষ্টি, এই দশটিকে কুশল কর্ম্মপথ বলে।

৩। (১) বন্দন, (২) পূজন, (৩) শরণগমন, (৪) পাপদেশনা (নিজের পাপের উল্লেখ করিয়া অনুতাপ প্রকাশ), (৫) পুণ্যানুমোদন, (৬) বুদ্ধের আধ্যেষণা (প্রার্থনা), ও (৭) যাচনা। দ্রষ্টব্য—বোধি ২. ১—৩, ৫।

লাভের জন্য আমার উৎসাহ নাই, আমি একটি মাত্রও জীবের জন্য বহুকোটি বৎসর অবস্থান করিব। আমি আমার শরীরের, বাক্যের ও মনের কার্য্য-সমূহকে শোধন করিব। আমি অশুভ কর্ম্ম করিব না।

তিনি আরো বলেন—

বুদ্ধের বন্দনাদি করিয়া যদি কিছু আমার পুণ্য হইয়া থাকে তবে যেন আমি তাহা দ্বারা সমস্ত লোকের সমস্ত দুঃখকে শান্ত করিতে পারি। পীড়িতগণের আমি ঔষধ ও চিকিৎসক, এবং যত দিন তাহাদের রোগের একবারে নিবৃত্তি না হয় ততদিন আমি তাহাদের পরিচারক। যাহারা ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর, আমি তাহাদিগকে প্রচুর অন্ন ও পান (জল) প্রদান করিয়া তাহাদের ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট নিবারণ করিব। দুর্ভিক্ষের সময় আমিই লোকের পান ও ভোজন হইব। অক্ষয় রত্নের ন্যায় আমি দরিদ্রব্যক্তিগণকে নানাপ্রকারে সেবা করিব। সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমি আমার শরীরকে, আমার উপভোগ্য সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীকে, এবং আমার অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত কল্যাণকে অনাসক্ত হইয়া পরিত্যাগ করিতেছি। মন আমার নির্ব্বাণ চায়, কিন্তু সমস্ত ত্যাগ না করিলে নির্ব্বাণ পাওয়া যায় না, অতএব যখন আমাকে সমস্ত ত্যাগ করিতেই হইবে, তখন তাহা জীবগণকেই প্রদান করা উত্তম। আমি সমস্ত জীবের নিকটে আমার এই শরীরকে অর্পণ করিলাম; তাঁহাদের ইচ্ছা দ্বারা যেরূপে সুখ হয় সেইরূপই ইঁহাকে ব্যবহার করুন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আমাকে আঘাত করুন বা নিন্দা করুন, অথবা ধূলি দ্বারা ইহাকে আকীর্ণ করুন, অথবা এই শরীরের দ্বারা তাঁহারা ক্রীড়া বা বিলাসভোগ করুন; আমি তাঁহাদিগকে এই শরীর যখন প্রদান করিয়াছি। তখন আর আমার ইহার সম্বন্ধে চিন্তার কোনো ফল নাই, যেরূপে সুখ হয় তাঁহারা সেইরূপই করুন আমাকে লইয়া যেন কখনো কাহারো কোনো অনর্থ না হয়। যাঁহারা মিথ্যা দোষ আরোপ করিয়া আমার নিন্দা করেন, যাঁহারা আমার অপকার করেন, অথবা যাঁহারা আমাকে উপহাস করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই যেন বোধি লাভ করিতে

পারেন। অনাথগণের আমি নাথ, পথিকগণের আমি (পথপ্রদর্শক) সার্থবাহ এবং পারগমনেচ্ছুগণের আমি নৌকা, সেতু ও পদক্ষেপণ করিবার স্থান; দ্বীপার্থি ব্যক্তিগণের আমি দীপ, শয্যার্থীদের শয্যা, এবং দাসার্থীদের দাস। চিন্তামণি যেমন লোককে তাহার চিন্তিত ফল প্রদান করে, সিদ্ধবিদ্যার দ্বারা যেমন যাহা কিছু ইচ্ছা করা যায় তাহাই সিদ্ধ হয়, ভদ্র ঘটে হস্ত প্রদান করিলে যেরূপ অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, মহৌষধি দ্বারা যেমন সমস্ত পীড়ার উপশম হয়, এবং কল্পবৃক্ষ ও কামধেনু যেমন প্রার্থয়িতার সমস্ত প্রার্থিত বস্তু প্রদান করে, আমিও যেন সেইরূপ সমস্ত লোকের সমস্ত প্রয়োজন সম্পাদন করিতে পারি। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত যেমন নানাপ্রকারে সমস্ত জীবের উপভোগ্য হয়, আমিও সেইরূপ যতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত জীব নির্ব্বাণ লাভ না করে ততদিন যেন তাহাদের নানাপ্রকারে উপভোগ্য হই।৪

বোধিসত্ত্বের এই ব্রতপালন শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। তাই এক স্থানে (প্রশান্ত বিনিশ্চয়প্রতিহার্য্যসূত্রে, শিক্ষা ১৬ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে:—যদি কোনো বোধিসত্ত্ব গঙ্গানদীর বালুকার ন্যায় অসংখ্য বুদ্ধগণের প্রত্যেককে মহামণিরত্নপূর্ণ ঐরূপ অসংখ্য ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করে, এবং আর এক ব্যক্তি যদি বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মসমূহ শ্রবণ করিয়া একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত ধর্ম্ম শিক্ষা করিব বলিয়া নিজের চিত্ত উৎপাদন করে, তাহা হইলে এই শেষোক্ত ব্যক্তি ঐ সমস্ত ধর্ম্মে শিক্ষিত না হইলেও যে পুণ্য প্রাপ্ত হয় তাহা ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তির পুণ্য অপেক্ষা অনেক অধিক।

বোধিসত্ত্ব একবার এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যেন কোনোরূপেই তাহা হইতে নিবৃত্ত না হন। পূর্ব্বোক্ত স্থানেই এ বিষয়ে বলা হইয়াছে:—এই সমগ্র ভুবনের ধূলিকণার ন্যায় অসংখ্য জীবের প্রত্যেকটি যদি জম্বুদ্বীপাধিপতি রাজা হন, আর তাঁহারা সকলেই যদি ঘোষণা করেন যে, যে-কোনো ব্যক্তি মহাযানকে গ্রহণ করিবে, ধারণ করিবে, বা অধ্যয়ন করিবে, বা আবৃত্ত করিবে, বা প্রচার করিবে, তাহার

নখচ্ছেদন করিয়া পলপল পরিমাণ মাংস তুলিয়া লইব, এবং এইরূপে তাহাকে প্রাণহীন করিব ; আর যদি কোনো বোধিসত্ব ইহা শুনিয়াও ভীত না হন, ত্রস্ত না না হন, কম্পিত না হন, বিষণ্ণ না হন, বা সন্দিগ্ধও না হন, বরং সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিবারই জন্য নিযুক্ত থাকেন, তবে বলিতে হইবে সেই বোধিসত্ব হইতেছেন চিত্তশূর, দানশূর, শীলশূর, ক্ষান্তিশূর, বীর্য্যশূর, ধ্যানশূর, প্রজ্ঞাশূর, ও সমাধিশূর।

কেবল শীল-সংযম-নিয়মের দ্বারা বোধিলাভ করা যায় না, বোধিসত্বগণের যে সমস্ত আচার বা কার্য্য বিষয়ক শিক্ষা রহিয়াছে, তৎসমুদয় অভ্যাস করিতে হয়। এই শিক্ষার কথা শাস্ত্রে অনেক বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই বিস্তারের মধ্যে না গিয়া যাহা যাহা তাহার মর্ম্মস্থান তাহাই গ্রহণ করা উচিত। এই মর্ম্মস্থান হইতেছে (শিক্ষা, ১৭):—নিজের শরীর, নিজের ভোগ্য বিষয়, ও অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিন কালে নিজের যাহা কিছু কল্যাণ, এই সমস্তকেই সমস্ত জীবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা, তাহাদিগকে রক্ষা করা,[৫] এবং শুদ্ধি বর্দ্ধন করা।

নিজের যাহা কিছু সমস্তই উৎসর্গ করিবার জন্য বোধিসত্ব প্রত্যেক বস্তুকেই পরকীয় বলিয়া মনে করেন। কাহাতেও তাঁর নিজের স্বত্ব আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না, এবং কাহারো প্রতি তৃষ্ণা ও অনুভব করেন না। তৃষ্ণাই হইতেছে ভয়ের কারণ। এক জায়গায় বলা হইয়াছে (আর্য্যোগ্রদত্তপরিপৃচ্ছায়, শিক্ষা ৯):—যাহা দেওয়া হইয়া যায় তাহাকে আর রক্ষা করিতে হয় না, যাহা গৃহে থাকে তাহাকেই রক্ষা করিতে হয়; যাহা দেওয়া যায় তাহা তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য, আর যাহা গৃহে থাকে তাহাতে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়; যাহা দেওয়া হয় তাহাতে কোন পরিগ্রহ (স্বামিত্ব) থাকে না, কিন্তু যাহা গৃহে তাহাতে পরিগ্রহ থাকে; যাহা দেওয়া যায় তাহা অভয়, কিন্তু যাহা গৃহে তাহা সভয়; যাহা দেওয়া যায় তাহা বোধিপথের ধারণের জন্য হয়, আর যাহা গৃহে তাহা মারপথের ধারণের জন্য হয়; যাহা দেওয়া যায় তাহা অক্ষয়, আর যাহা গৃহে তাহা ক্ষয়শীল; যাহা দেওয়া যায়

৫। শরীরাদি রক্ষা না করিলে ইহা দ্বারা কাহারো কোনো প্রয়োজন সম্পন্ন হয় না। তাই যাহাকে উৎসর্গ করা হয় তাহারই জন্য ইহা রক্ষা করা আবশ্যক।

তাহা সুখ, আর যাহা গৃহে তাহা দুঃখ; যাহা দেওয়া যায় তাহা ক্লেশের পরিত্যাগের জন্য হয়, কিন্তু যাহা গৃহে থাকে তাহা ক্লেশের বৃদ্ধির জন্য; যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই প্রচুর ভোগ পাওয়া যায়, কিন্তু যাহা গৃহে তাহাতে তাহা হয় না; যাহা দেওয়া যায় তাহা সৎপুরুষের কার্য্য, যাহা গৃহে থাকে তাহা কাপুরুষের কার্য্য; যাহা দেওয়া যায় তাহাতে সৎপুরুষের চিত্তকে গ্রহণ করিতে পারা যায়; কিন্তু যাহা গৃহে তাহা কাপুরুষের চিত্তকে গ্রহণ করিবার জন্য; যাহা দেওয়া যায় বুদ্ধেরা তাহা প্রশংসা করেন, কিন্তু যাহা গৃহে থাকে তাহা মূর্খ লোকেরাই প্রশংসা করিয়া থাকে।

বোধিসত্ত্ব কিপ্রকারে নিজের চিত্তকে বোধিলাভের অনুকূল করিবেন, কিরূপে তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী হইবেন, তৎসম্বন্ধে একস্থানে (শিক্ষা পৃঃ ১৯) বলা হইয়াছে:—বোধিসত্ত্বের যদি পুত্রের প্রতি অধিকতর প্রেম উৎপন্ন হয় আর অপর ব্যক্তিগণের প্রতি সেরূপ না হয়, তাহা হইলে তিনি নিজের চিত্তকে এইরূপে নিন্দা করিবেন—যিনি সমচিত্ত তাঁহারই বোধিলাভ হয়, যিনি মিথ্যা উদ্যোগ করেন তাঁহার নহে। তিনি নিজের ব্যবহারকে শত্রুর ন্যায় মনে করিবেন, তিনি ভাবিবেন—এই যে আমার পুত্রের উপর এত অধিকতর স্নেহ, আর সমস্ত জীবের উপর সেইরূপ হইতেছে না, ইহা আমার শত্রু। তাই তিনি এরূপভাবে চিন্তা করিবেন যাহাতে সমস্ত জীবের উপরে পুত্রপ্রীতির অনুগামী মৈত্রীর উদয় হয়, নিজের মঙ্গলের অনুগামী মৈত্রীর উদয় হয়।

বোধিসত্ত্বের কোনো বস্তুতেই মমত্ব বা স্বামিত্ব থাকিবে না। তাঁহার নিকটে যদি যাচক আগমন করিয়া কিছু প্রার্থনা করে, তিনি এইরূপ ভাবিবেন—যদি এই বস্তুটিকে আমি পরিত্যাগ করি অথবা না করি, ইহা ছাড়িয়া আমাকে থাকিতেই হইবে; ইচ্ছা না করিলেও আমার মৃত্যু হইবেই, তাই ইহা আমাকে ত্যাগ করিবে, এবং আমিও ইহাকে ত্যাগ করিব। কিন্তু আমি যদি ইহা দান করি, তাহা হইলে তাহাতে আমি তাহার সার লাভ করিয়া মরিতে পারিব, এবং মরণ-কালে তাহাদের দিকে আমার চিত্ত যাইবে না—তাহাতে আসক্ত হইবে না।

ইহাতে আমার মরণকালে প্রীতি হইবে, প্রমোদ হইবে, তখন আমার কোনো অনুতাপ উৎপন্ন হইবে না।

যদি তিনি ইহাতেও সেই বস্তুটি দান করিতে না পারেন তাহা হইলে অগত্যা সেই যাচককে এইরূপে নিবেদন করিবেন—আমি এখনো দুর্ব্বল, আমার কুশল মূল (লোভ, দ্বেষ, ও মোহের অভাব) এখনো অপরিপক্ব। মহাযানে আমি এই প্রথম কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছি। দানের জন্য এখনো আমি চিত্তকে বশীভূত করিতে পারি নি। আমার দৃষ্টি এখনো তৃষ্ণার আবদ্ধ। 'আমি' 'আমার' এ বুদ্ধি এখনো আমার আছে। মহাশয়, ক্ষমা করুন, দুঃখিত হইবেন না। আমি এরূপ করিব, এরূপ উদ্যম করিব যাহাতে আপনার ও আর সমস্ত ব্যক্তির ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে পারি।

যাহাতে বোধিসত্ত্বের ঐ যাচকের উপর, এবং ঐ যাচকের সেই বোধিসত্ত্বের উপর অপ্রীতি উৎপন্ন না হয়, সেই জন্যই এইরূপ করিবার কথা বলা হইয়াছে। বোধিসত্ত্বের যেন কারো প্রতি দ্বেষ না থাকে।

বোধিসত্ত্বগণের এই চারিটি জিনিস থাকে না; তাঁহাদের শঠতা থাকে না, মাৎসর্য্য (পরের কল্যাণ বিদ্বেষ) থাকে না, ঈর্ষ্যা-পৈশুন্য (অর্থাৎ পরোৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত খলতা) থাকে না, এবং চিত্তের এরূপ জড়তাও থাকে না যে, 'আমি বোধি লাভ করিতে পারিব না।' অপর পক্ষে যাহার এই চারিটি থাকে, বুঝিতে হয় সে বোধিসত্ত্ব নহে, সে মায়াবী।

বোধিসত্ত্বেরা চিত্তবীর হন, তাঁহাদের চিত্ত অতিমহান্। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা নিজের হস্ত-পদ-মস্তকাদি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পুত্র-কন্যা-স্ত্রী-পরিবার পরিত্যাগ করিতে পারেন, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন। অদেয় অত্যাজ্য তাঁহাদের কিছুই নাই।

এই জন্যই এক স্থানে (নারায়ণপরিপৃচ্ছায়, শিক্ষা. ২১) বলা হইয়াছে :—তাঁহারা এমন কোনো বস্তু গ্রহণ করেন না যাহা ত্যাগ করিতে তাঁহাদের বুদ্ধি হয় না; এবং তাঁহাদের এমন কোনো দ্রব্য থাকে না, যাচকে প্রার্থনা করিলে যাহা

তাঁহারা প্রদান করিতে পারেন না। বোধিসত্ত্বকে ভাবিতে হয়, এই আমার শরীরকে যখন সমস্ত জীবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছি তখন অন্যান্য বাহ্য বস্তুসমূহকে তো দেওয়াই হইয়াছে। তাই যে-যে ব্যক্তির যাহা-যাহা আবশ্যক হয় তাহাকে আমি তাই প্রদান করিব—যদি আমার তাহা থাকে। হস্তার্থীকে হস্ত, চরণার্থীকে চরণ, নেত্রার্থীকে নেত্র, মাংসার্থীকে মাংস, এমন কি মস্তকার্থীকে মস্তক প্রদান করিব; ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রজত, রত্ন-আভরণ, অশ্ব-গজ, রথ-বাহন, দাসী-দাস, নগর-রাষ্ট্র, ও পুত্র-কন্যা-পরিবার প্রভৃতির কথা বেশী আর কি। যে-সে ব্যক্তির যাহা-যাহা আবশ্যক, যদি থাকে আমি তাহাকে তাহাই দিব। আমি ইহাতে কোনো-রূপ কষ্ট অনুভব না করিয়া, অনুতপ্ত না হইয়া এবং ফলের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা না করিয়া এই সমস্তকে প্রদান করিব। আমি নিজের কোনো ফলের আশা না করিয়া জীবগণের প্রতি কেবল করুণাবশত, অনুগ্রহবশত ও অনুকম্পা বশত সমস্ত প্রদান করিব, যাহাতে তাহারা আকৃষ্ট হইয়া বোধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ধর্ম্মসমূহকে জানিতে পারে।

যেমন কোনো ভৈষজ্যবৃক্ষের (অর্থাৎ যে বৃক্ষের পত্রপুষ্পাদি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় তাহার) মূল, স্কন্ধ, শাখা, ত্বক্, পত্র, পুষ্প, ফল, বা সার গ্রহণ করিলেও সেই ভৈষজ্য বৃক্ষের মনে এরূপ চিন্তা হয় না যে, আমার মূল, বা স্কন্ধ, বা ত্বক্, বা পত্রাদি হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, অথচ তাহা ঐরূপে হীন মধ্যম উৎকৃষ্ট সর্ব্ববিধ লোকেরই ব্যাধি অপহরণ করিয়া থাকে, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ নিজের এই ভৌতিক শরীরকে ঔষধের মত করিয়া চিন্তা করিবেন যে, এই শরীরের যাহা যাহার প্রয়োজন তিনি তাহাই গ্রহণ করুন, যাঁহার হস্তের প্রয়োজন তিনি হস্ত, যাঁহার পদের প্রয়োজন তিনি পদ, এইরূপ যাঁহার যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন তিনি তাহাই গ্রহণ করুন।

অন্য এক স্থানেও (আর্য্যাক্ষয়মতিসূত্রে, শিক্ষা ২১) উক্ত হইয়াছে:—বোধিসত্ত্ব নিজের শরীরকে জীবগণের যাহার যে কার্য্য তাহার সেই কার্য্যেই নিযুক্ত করিয়া শেষ করিবেন। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতসমূহ যেমন নানা প্রকারে সমস্ত জীবের উপভোগ্য হয়, বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিবেন, তিনি যেন সেইরূপে সমস্ত জীবের

উপভোগ্য হইতে পারেন। যদিও ইহাতে তাঁহারা শরীরের কষ্ট আছে, তথাপি সমস্ত জীবের দিকে তাকাইয়া তিনি সেই কষ্টে খেদ অনুভব করেন না।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে নিজের দেহকেও উৎসর্গ করিবেন সত্য, কিন্তু তিনি যেখানে-সেখানে নির্বিচারে আত্মহত্যা করিবেন না। যাহা সুকৃত তাহা তাঁহাকে করিতে হইবে সত্য কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে 'মাত্রাজ্ঞ' হইতে হইবে; কোথায় তাঁহাকে নিজের দেহাদি অর্পণ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহার একটা পরিমাণ-জ্ঞান থাকা আবশ্যক (শিক্ষা-১৪৩)। এই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষার মর্ম্মস্থানের মধ্যে যেমন শরীর-উৎসর্গ একটি, তেমনি আর একটি হইতেছে শরীরের রক্ষা। অনর্থ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে। যেখানে বস্তুত উপকার না হইয়া অপকারই হয় সেখানে শরীর উৎসর্গ করা উচিত নহে। তিনি শরীরের দ্বারা সেই ধর্ম্মেরই সেবা করেন। তাই সামান্য প্রয়োজনের জন্য তিনি এই শরীরকে পীড়ন করিবেন না, কেননা শরীরকে রক্ষা করিলে যে তিনি বহু লোকের মহাপ্রয়োজন সাধন করিতে পারিতেন শরীরকে নষ্ট করায় তাহার হানি হয়। অতি ত্যাগ করিতে গেলে তাঁহার নিজের ও অন্যের উভয়েরই মঙ্গলের হানি হয় (বোধিসত্ত্ব ১৪৩)। অন্যের বোধিলাভে সহায়তা করিতে পারিবেন বলিয়াই বোধিসত্ত্ব নিজেরও বোধিলাভ কামনা করেন, যাহাতে নিজের ও অন্যের বোধিলাভের ব্যাঘাত হয়, এরূপ ত্যাগ বা অত্যাগ উভয়ই তাঁহার করা উচিত নহে। তিনি যখন দেখেন যে, তাঁহার শরীরের দ্বারা তিনি বহুজনের বা যাচকের সমসংখ্যক জনের বস্তুত মঙ্গল বিধান করিতে পারেন, তখন তিনি সেই শরীরকে ত্যাগ করিবেন না, কেননা তাহাতে ঐ মঙ্গলের বাধা হয়। বোধিসত্ত্ব যদি এইরূপে না চলেন, তাহা হইলে একটি লোকের জন্য তাঁহার নিজের ও অন্যান্য বহু-বহু লোকের বোধি-লাভের অনুকূল চিত্ত-শুদ্ধির অন্তরায় হওয়ায় বহু হানি হইয়া থাকে। তাই একস্থানে (রত্নমেঘে, শিক্ষা-৫১) বলা হইয়াছে:—বোধিলাভের জন্য উদ্যম করিতে হইবে সত্য, কিন্তু

সেরূপ উদ্যম ঠিক নহে, যাহাতে ক্লেশ হয়, যেমন দুর্ব্বলের গুরুভার বহন, অথবা অসময়ে অদৃঢ়সঙ্কল্প বোধিসত্ত্বের নিজের মাংসদানাদি দুষ্কর কর্ম্ম।

ফলকথা এই, বোধিসত্ত্ব নিজ দেহকে পূর্ব্বেই সমস্ত জীবের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেন, কিন্তু তাহা যাহাতে অকালে উপভুক্ত না হয়, ইহা দেখা আবশ্যক। অন্যথা ঐ বোধিসত্ত্বের যাহাই হউক তাঁহার কষ্ট দেখিয়া অন্য সমস্ত ব্যক্তির বোধিচিত্ত বীজে নষ্ট হওয়ায় বস্তুত বহু ফল রাশির নাশ হইয়া থাকে। অকালে বোধিসত্ত্বের নিকট তাঁহার শরীরাদি প্রার্থনা করা মারের কার্য্য। যাহারা এইরূপ প্রার্থনা করে তাহারা তাহাতে বোধিচিত্তের পরিপাকপ্রাপ্তির বিরোধী হইয়া মোহবশত স্বার্থেরই ব্যাঘাত করে। এই রক্ষকগণের নিকট হইতে বোধিসত্ত্ব নিজকে রক্ষা করিবেন। ইহাতে তাঁহার যাচকের প্রতি দ্বেষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই আর নিজের প্রতিজ্ঞারও হানি হয় না। এই জন্য বলা হইয়াছে (শিক্ষা.৫১ ; বোধিপ.১৪৫) :—

এমন সুন্দর ঔষধের গাছ থাকে, যাহার মূল-প্রভৃতি সমস্তই ব্যবহৃত হয় ; এই গাছটি যাহাতে অকালে উপভুক্ত হইয়া নষ্ট হইয়া না যায়, তজ্জন্য লোকে তাহার বীজটি দিয়াও যেমন তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে, বুদ্ধ-ভৈষজ্যতরু সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ইংরাজী সাহিত্যের শোকগাথা

মিল্টনের 'লিসিডাস' শেলীর 'এডোনেই' এবং টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়ম্ ইংরাজি সাহিত্যের তিনটি প্রসিদ্ধ শোকগাথা। এই তিন বিভিন্ন যুগের তিনটী কবিতার মধ্যে বিশেষ একটী সামঞ্জস্য প্রচ্ছন্ন আছে। ইহাদের বাহিরের ইতিহাসের ঘটনাবলীর ভিতর যে মিলটুকু আছে তাহা আলোচনা করিলে ভিতরের মর্ম্মটুকু ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।

মিল্টনের সহপাঠী বন্ধু মিঃ এডওয়ার্ডকিং আইরিশ সাগরে জাহাজ ডুবিয়া মারা যান্। মিলটন তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে এই কবিতাটী রচনা করেন। এই কবিতাটী একদিকে যেমন তাঁহার 'পিউরিটান' প্রকৃতির পরিচায়ক অন্যদিকে তেম্নি তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার ও নিবিড় রসবোধের গভীর দৃষ্টান্ত।

ইংরেজ কবি কীট্‌সের অকাল মৃত্যুতে শেলী 'এডোনেই' লিখিয়াছিলেন। সেই সময় কীট্‌সের নাম প্রায় কেহই জানিত না এবং শেলীরও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু শেলী কীট্‌সের করুণাবহ জীবনকাহিনী শুনিয়া, হয় তো নিজের জীবনের সঙ্গে তাহার কোন ঐক্য দেখিয়া, গভীর বেদনার সহিত 'এডোনেই' লিখিয়াছিলেন।

টেনিসনের প্রিয়তম বন্ধু আর্থার হ্যালমের অকস্মাৎ মৃত্যুতে তিনি একান্ত ব্যথিত হইয়া প্রায় সত্তেরো বৎসর ধরিয়া 'ইনমেমোরিয়ামের' কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন। বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে উক্ত তিনটী কবিতার মিল এতটুকুই। কিন্তু ভিতরের দিকের সামঞ্জস্য ইহার চেয়ে অনেক বড়।

দীপশিখা যেমন সমগ্র প্রদীপটীর বাণীকে প্রকাশ করে তেমি কবিরা জনসাধারণের অস্পষ্ট অনুভূতিটীকে নিজেদের হৃদয়ের গভীর রসানুভূতির দ্বারা তাহা প্রকাশ করেন। এই যে প্রকাশ করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ইহা অনন্য-সাধারণ, অনুভব অল্প-বিস্তর সকলেই করিতে পারে, কিন্তু সেই অনুভূতিকে হৃদয়ের জড়তা ভাঙিয়া জাগাইয়া তুলিবার সোনার কাঠিটী পায় কয় জনে? রাত্রির অন্ধকারে স্তব্ধ অরণ্য যে কথাটি বলিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিয়া মরে, পূব গগনে সোণার রেখা ফুটিতে না ফুটিতেই সেই কথাটি শত শত বিহঙ্গের কণ্ঠে স্বতউচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কবিরা সেই ভোরের পাখী। তাঁহারা যে কথাটী বলেন তাহা খাপছাড়া একটা নিতান্ত অদ্ভুত জিনিষ ইহা স্বীকার করা চলে না। তাঁহাদের বাণীটি সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে মগ্ন-চৈতন্য অবস্থায় আছে। সাধারণে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে না, এমন কি অনেক সময় ভুল বোঝে। কিন্তু একথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, কোন মহা কবির সঙ্গীতের জন্য দেশ পূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকলে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ দিয়া কাব্যের উপদান যোগাইয়া যাইতেছে, আর কবি ঠিক জায়গাতে ঠিক সুরটী লাগাইয়া দিতেছেন; ইহাই কাব্য।

হৃদয়ের উত্থানপতনের ইতিহাসই কাব্য। যে কাব্যে ইহা যত তরঙ্গায়িত সেই কাব্য তত সুন্দর। আমাদের আলোচ্য কাব্য তিনখানিতে এই লীলা এত ছন্দোবহুল যে, ইহার সুরকে প্রাণের সঙ্গে মিলিতেই হইবে। মানুষের গভীরতম ব্যথার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাততম অন্ধকাররাজ্যের প্রতি এই করুণ বিলাপ বড়ই আশ্চর্য্য! বাহিরের ইতিহাসের বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া কাব্যের এই তিনটী ধারা এক সঙ্গমে আসিয়া মিলিয়াছে; যে সঙ্গম-তীর্থে দাঁড়াইয়া আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছিলেন:—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" প্রিয়জনের মৃত্যুতে, যাহাদের দূরদৃষ্টি নাই, তাহাদের কত জন নাস্তিক হইয়া যায় হয়তো দুঃখ আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। এই দুঃখ আর

নাস্তিকতার সহিত লড়াই করিয়া যাঁহারা মৃত্যুর সমাপ্তির মধ্যে অপর একটা আরম্ভ দেখিতে পাইয়া থাকেন তাঁহারাই কবি, তাঁহারাই ক্রান্তদর্শী।

প্রথমে মিল্টন বলিতেছেন "But, O the heavy change, now thou art gone 'Now thou art gone, and never must return!". তাঁহার প্রথম সুর এই রকম; তখন চক্ষু জলে ছল ছল, দুর অস্পষ্ট। কবি অপ্সরীদের প্রশ্ন করিতেছেন তাহারা সে সময়,—লিসিডাসের মৃত্যুর সময় কোথায় ছিল। মনে মনে আশা ছিল হয়তো তাহারা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু হায় শেষে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন "Had ye been there—for that what could have done?"

আমরা যে রঙের চশমার ভিতর দিয়া যখন দেখি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তখন সেই রং ধারণ করে। আমাদের মনের উপরও সেই রকম ক্ষণে ক্ষণে নানা রঙের চশমার পরিবর্ত্তন হয়। সেই অনুসারে আমরা পৃথিবীকেও বিভিন্ন রঙের দেখি। বাস্তবিক তাহার কোন বর্ণ নাই। বর্ণ জিনিষটা আপেক্ষিক। এখন যাহাকে সবুজ দেখিতেছি তাহা সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেছি বলিয়াই, কোথাও একটু কল বিগড়াইয়া গেলেই সে-সবুজ অন্য কোন রঙে বদলিয়া উঠিবে। গভীর দুঃখের সময় পৃথিবীর রং কালো হইয়া আসে, আকাশের আলোটুকু নিভিয়া যায়।

"The musk rose, and the well-attired wood bine,
with cowlips wan that hang the pensive head,
And every flower that sad emdroidery wears;
Bid amaranthus all his beauty shed,
And daffodillies fill their cups with tears,
To strew the laureate hearse where Lycidas lies."

কিন্তু এইখানেই যদি মিল্টন শেষ করিতেন তবে ইহার বিশেষ কোন মূল্য হইত

না। সাধারণ মানুষেই তো এই পর্য্যন্ত আসিতে পারে কিন্তু দুঃখ তো শেষ নহে তাহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে। সেইখানে উঠিয়া কবি দেখিয়াছেন মানুষের আত্মা অমর; মৃত্যুর পরে সে আরও মহান হয় যাহা ক্ষয় ভাবি চর্ম্ম চক্ষুতে, তাহা প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধি। সেই জন্য তাঁহার শেষ কথা—

"Weep no mcre, woeful shepherds, weep no more,
For Lycidas, your sorrow, is not dead."
So Lycidas sunk low, but mounted high,
Through the dear might of Him that walked
the waves."

'এডোনেই'র গতিলীলা আরো তরঙ্গায়িত। মৃত্যুতে হঠাৎ যে একটা শূন্যতা অনুভূত হয় তাহা কি কেবলমাত্র একটা বৃহৎ ফাঁকি এ বিষয়ে ঘনীভূত সন্দেহ শেলীর মনে চাপিয়া বসিয়াছিল, শেলী দুঃখকে তমোগুণোদ্ভব বলিয়া মনে করিতেন; তিনি সর্ব্বদা ইহার উর্দ্ধে বাস করিতে চাহিতেন। কিন্তু কীট্‌সের দুর্ভাগ্য, নিজের জীবনের ব্যর্থতা দেখিয়া তাঁহার মন এত দমিয়া গিয়াছিল যে প্রথমে মনে করিলেন মৃত্যুর পরে আর কিছুই বাকী থাকে না।

"Oh, dream not that the amorous Deep
Will yet restore him to the vital air;
Death feeds on his mute voice. and laughs at our,
despair.'

মৃত্যু একটা উপহাসের মত। যখন মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই তখন জগৎটাই সত্য এবং একমাত্র সত্য। কিন্তু এই জগৎটারই অতিমাত্রায় সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া আর এক মহা আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল; জগৎটা মিথ্যা নহে কিন্তু এই জগতের পরেও আরও একটা সত্য রাজ্য আছে।

"Nought we know, dies, shall that alone which knows

Be as a sword consumed before the sheath
By sightless light."

কবির মন যখন এইরূপ নিরাশার কুয়াশায় আচ্ছন্ন তখন এক মুহূর্ত্তে তিনি সত্য দৃষ্টিলাভ করিলেন।

"Peace, Peace! he is not dead, he doth not sleep
He hath awakened from the dream of life"—
"Dust to the dust! but the pure spirit shall flow
Back to the burning fountain whence it came"

যখনি এই আশ্বাস মনে জাগিল তখনি

"Thou young Dawn,
Turn all thy dew to splendour, for from thee
The spirit thou lamentest is not gone;"

এই আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কবি অরণ্য, পর্ব্বত, পুষ্প, উৎস সকলকেই বলিতেছেন দুঃখ নাই দুঃখ নাই সে মরে নাই। জীবনে যে আধারগত হইয়া স্থান বিশেষকে এবং কাল বিশেষকে আশ্রয় করিয়াছিল সে এখন মৃত্যুর পরে স্থান কালের সব সীমা ছাড়াইয়া সকলেরই মধ্যে অনুভূত হইতেছে।

"The splendours of the firmament of time
May be eclipsed, but are extinguished not;"

মৃত্যুতে এই আত্মার আলো ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন হইতে পারে কিন্তু একেবারে নিভিয়া যায় না।

"The one remains, the many change and pass;
Heaven's light for ever shines, Earth's shadows fly;"

এতক্ষণে কবি বিশ্বের একটি মূল নিয়মের গোড়াকার তাৎপর্য্যটীতে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। গতি মাত্রেরই মূলতত্ত্ব এই যে সে স্থিতিকে আশ্রয় করিয়া আছে।

জগৎ গমনশীল, তাই তাহার মধ্যে একটী মাত্র কেন্দ্র কেবল অচল আর তাহাকে ঘিরিয়া অহরহ বস্তুপুঞ্জ নৃত্য করিয়া ছুটিতেছে।

"Life, like a dome of many coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর নিজের কোন রং নাই। তেমি আমাদের জীবনে যে হাজার রঙের লীলা দেখি তাহা স্বর্গীয় আলোক প্রসূত নহে। সূর্য্যের আলো আসে শাদা, আর আমাদের নানা রঙের কাঁচে গড়া এই জীবনটাতে রং বেরঙের ছায়া পড়ে। জীবনে আমরা কত রকমের সংস্কার, আচার, শিক্ষা দ্বারা রঙিন্ আবরণ তৈরী করি আর তাহাতেই স্বর্গীয় আলোককে রঙাইয়া সংস্কারাচ্ছন্ন স্বর্গলোক কল্পনা করি। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মৃত্যু আসিয়া এই রঙিন্ মন্দির ভাঙিয়া না দেয় ততদিন সেই পরমাত্মাকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারি না। অতএব মৃত্যুই তাহার উপায়। সেইজন্যই

"No more let Life divide what Death can join together"

কিন্তু শেলী বোধ হয় বেশী দূর গিয়া পড়িয়াছিলেন, জীবনের ব্যর্থতার দুঃখের তাড়নে সীমা রাখিতে পারেন নাই।

মৃত্যু যখন আসিবে তখন তাহাকে ভয় না করিয়া সাদরে ডাকিয়া নিতে পারিলেই হইল। কিন্তু জীবনকে ত্যাগ করিয়া মৃত্যুরই জন্য এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা কেন? যেন জীবনে সার্থকতা লাভ হয় না, মৃত্যুর ভিতর দিয়াই তাহা লাভ করিতে হইবে। আমাদের দেশেও একদল লোক আছেন যাঁহারা গাহিয়া থাকেন :—পারের কাণ্ডারী গো পার কি দেখা যায়। নামবে কি সব বোঝা এবার ঘুচ্‌বে কি সব দায়।" ওপারে যাইবার জন্য অসময়ে এত আগ্রহ কেন? এ জীবনকে ফাঁকি দিয়া পর জীবনে অমরতা লাভ করিতে হইবে কিন্তু সেই অমরতা লাভের জন্য যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাহার চাষ যে এই পারে। মর্ত্ত্য জীবনের আনন্দস্মৃতি যে যতটুকু লইয়া যাইতে পারে সে ততটুকু অমর।

টেনিসনকে মৃত্যুর এই শূন্যতা ছাড়া দেশ জোড়া একটা নাস্তিকতার সঙ্গে

যুক্ত করিতে হইয়াছে। সেই সময় পণ্ডিতেরা মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে চরম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একদিকে কলের শক্তির কাছে প্রকৃতি পরাস্ত হইতেছে অন্যদিকে ক্রমবিকাশবাদে মানুষ দেখিল যে বানর হইতেই তাহার বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই এক শ্রেণীর লোক পরলোকে অবিশ্বাসী হইয়া দাঁড়াইল।

ইনমেমোরিয়ামের প্রথম কবিতাটী সর্ব্বশেষে লিখিত উপসংহার রকমের। সেখানে টেনিসন এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন:—

"Forgive my grief for one removed,
Thy creature, whom I found so fair.
I trust he lives in thee, and there
I find him worthier to be loved."

দুঃখের সময় আমাদের একরকম বৈরাগ্য উপস্থিত হয় যে, ভালবাসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু কবি জোর করিয়া বলিয়াছেন :—

" 'Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all"

অবশেষে সেই একই সত্যে টেনিসনও গিয়া পৌঁছিয়াছেন যে মৃত্যুর পরেই সব শেষ হয় না, আত্মা অমর।

"Sweet Hesper-Phosphor, double name
For what is one, the first, the last,
Thou, like my present and my past
Thy place is changed ; thou art the same."

অবশেষে আমরা দেখিলাম তিনজন কবিই সাধনার তিনটি পথ অবলম্বন করিয়া একই সিদ্ধান্তে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মৃত্যুর অন্ধকারে আর সকলে যখন হাতড়াইয়া মরে তখন কবিরা পথ দেখিতে পান ; তাহারা আলোকটি হাতে

পান। সকলের হাতে সে আলো থাকে না অনেকেই অন্যের আলো অনুসরণ করিয়া চলে। মৃত্যুর পরে অতীন্দ্রিয় একটা সত্তা বর্ত্তমান থাকে তাহাকে অনুভব করিতে হইলে খুব সূক্ষ্ম একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রয়োজন। কবিদের সেই অনুভূতি স্বাভাবিক। তাঁহারা যখন উপলব্ধি করিতে পারেন যে এই দৃশ্যমান জগতের সমস্ত বস্তুই একটা রূপকের মত রহস্যনিবিড় অরূপ আর একটা জগতের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আভাস দিতেছে তখনি তাঁহাদের নিকট জীবনমরণের সমস্ত রহস্য সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্যাড্রিকের বিদ্যালয়

আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যে সব বীরপুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, প্যাড্রিক পিয়ার্স তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহাদের নিকট প্যাড্রিক পিয়ার্সের নাম অবিদিত নয়। কিন্তু প্যাড্রিক আয়র্লণ্ডের শিক্ষার উন্নতির জন্য যে অসাধারণ প্রয়াস করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

প্যাড্রিক ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয়ে বেশ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন, তাঁহার সে ক্ষমতা ছিল—কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি আয়র্লণ্ডের যথোপযোগী শিক্ষার বিস্তার সাধনের সাধনাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই, তখনই তিনি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রণালী ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া পরে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ডাবলিন সহরের একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বহুকাল হইতে বিদেশীয় রাজশক্তি আয়র্লণ্ডে তদ্দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে রাজভাষার প্রচলনের চেষ্টা করিয়া প্রায় সফল মনোরথ হইয়াছিলেন, প্যাড্রিক প্রথমেই এই বিষয়ে একটা নূতনত্ব আনিলেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয় ছাড়া ইংরেজীভাষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে আইরীশদের দেশীয়ভাষাও পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে সাহিত্য আধুনিক প্রণালী অনুসারেই পড়ান হইত। প্রাচীন ভাষা এবং গণিত শাস্ত্রাদি ছাত্রদের রুচি ও ক্ষমতা উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ছেলেদের কস্মিনকালেও পরীক্ষা দিতে হইত

না। সপ্তাহে দুইদিন নানাবিষয়ে ছেলেদের বক্তৃতা শোনাইবার ব্যবস্থা ছিল। এই দুইদিন কোন কোন সময়ে আয়র্লণ্ডের বড় বড় সাহিত্যিক অথবা কো-অপারেটিভ (সমবায়) আন্দোলনের বড় বড় চিন্তাশীল কর্ম্মীকে আহ্বান করিয়া আনান হইত—তাঁহারা শিশুদের উপযুক্তমত বক্তৃতা দিতেন। শিশুচিত্তে বড় বড় আদর্শের বীজ এইভাবে বপন করা হইত।

বাগান করা এবং ছুতারের কাজও ছেলেদের শিখিতে হইত। প্যাড্রিক নিজে ছিলেন একজন বড় সাহিত্যিক, তিনি সমস্তদিন বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম করিয়া রাত্রে আবার ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করিতেন। প্যাড্রিককে সকলে সেই বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার বলিয়াই জানিত।

বিদ্যালয়ের ছেলেদের প্রতি প্যাড্রিকের আশ্চর্য্য রকমের ভালবাসা ছিল— তিনি বলিতেন নূতন একটি বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁহার আর অন্য কোন কারণে অধিকার না থাকিলেও শিশুদের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান অধিকার। তাঁহার একটি কবিতার গেলিক ভাষা হইতে ইংরেজী অনুবাদ এই—'Of wealth or of glory, I shall leave nothing behind me—(I think it, O God, enough !) But my name in the heart of a child.—অর্থাৎ, "টাকাকড়ি, বা খ্যাতিপত্তির কিছুই আমি রাখিয়া যাইতে পারিব না—কিন্তু হে ভগবান, এই আমি যথেষ্ট মনে করিব—যদি কেবল আমার নাম একটি শিশুর মনেও রাখিয়া যাইতে পারি।"

প্যাড্রিকের বিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপকই যুবক ছিলেন, তাঁহারা প্যাড্রিকের গৌরবের বিষয় ছিলেন। ইহাঁদের ছাড়া আর দু'একটি পণ্ডিত সহযোগীও তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়।

শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি প্যাড্রিকের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শিশুরা স্বাভাবিক ও স্বাধীন অবস্থার মধ্যে থাকিলে তাহাদের মন কখনও ভাল ছাড়া মন্দ চাহে না। তাঁহার বিদ্যালয়ে " শাস্তি " নামে কোন জিনিষই ছিল না। ছেলেদের ছিল পুরাপুরি স্বরাজ। বৎসরের প্রারম্ভে

ভোট লইয়া ছেলেরা সমস্ত বিভাগের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিত—সে সভার উত্তেজনা ও উৎসাহ পার্লামেণ্ট অপেক্ষা কম নহে।

বিদ্যালয়ে ছেলেদের নানারকম খেলার ব্যবস্থাও ছিল—আশপাশের কোন জায়গায় কোন দল এই বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের হারাইতে পারিত না। প্যাড্রিক নিজেও সময়ে সময়ে উৎসাহ দিতে খেলোয়াড়দের সঙ্গে যাইতেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম শুনিয়া চারিদিক হইতে ছাত্র আসিতে লাগিল—অবশেষে সেই উদ্যানের বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার অন্যত্র বিদ্যালয় উঠাইয়া লইতে হইল এবং উদ্যানের পুরাতন বাড়ীতে মেয়েদের একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দুই বিদ্যালয়েরই শিক্ষা প্রণালী প্রায় একরকমই ছিল। তাঁহার অর্থ সম্পদ্ অধিক ছিল না। বিদ্যালয়ের কাজেই তাঁহার বিষয় সম্পত্তির সমস্ত আয় দিয়াছিলেন। তিনি কোনদিন কোনশিশুকে তাঁহার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে চাহিলে ফিরাইয়া দেন নাই।

আয়র্লণ্ডের প্রাচীন গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন আইরিশ্ বা প্রাচীনগেলিক (Gaelic) জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। প্রাচীন কালে তাঁহাদের ভাষায় শিক্ষা শব্দে বুঝাইত 'লালন পালন' বালক বালিকাদের শৈশবেই খ্যাতনামা কোন জ্ঞানী পুরুষের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইত। তাঁহার কাছেই তাহারা লালিত পালিত হইত। প্যাড্রিক এই রকম শিক্ষা প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা আদর্শ স্থানীয় বলিয়া মনে করেন। রাজ সরকার হইতে ফরমাস্ করা বড় বড় অট্টালিকা আর তাহাদেরই দরকার মত পোষাপুত্র বাহির করিবার কলকে প্যাড্রিক শিক্ষাই মনে করিতেন না।

শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "যেমন এক এক মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি এক একটী জ্ঞানী পুরুষকে ঘিরিয়াই এক একটী বিদ্যালয় গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক। শিক্ষার স্থান শুধু যে সাধারণ রকমের হইলেই চলে তাহা নহে—একেবারে না হইলেও চলে। ভব-

যুরেদের মত জ্ঞানী পুরুষদের সঙ্গে এক একজন ছাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেও পারে। প্রাচীন কালে ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও এই ভাবেই জ্ঞান চর্চ্চা হইত। এক একজন দার্শনিকের পদতলে বসিয়া অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ছাত্র জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইতেন।

"প্রকৃত পক্ষে অধ্যাপকের প্রধান কাজই ছাত্রকে লালনপালন করা। ছাত্রের মধ্যে যে সমস্ত শক্তিগুলি সুপ্ত রহিয়াছে, সেইগুলি পুষ্ট করিয়া তোলাই তাঁহার কর্ত্তব্য। ছাত্রকে অধ্যাপকের এক একটী প্রতিধ্বনি করিয়া তোলাই অধ্যাপকের উচিত নয়—তাঁহার জানা উচিত খুব নিকটতম মানুষটিরও ব্যক্তিত্ব তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে এবং পৃথক্। সুতরাং শিশুদের শিক্ষার প্রথম আবশ্যক জিনিষ তাহার চারিদিকে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়ত দরকার, শিশুর নিজেরই ভালো ভালো গুণগুলি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কোন জ্ঞানী পুরুষের সস্নেহ এবং সতর্কদৃষ্টি।

"প্রাচীনকালে শুধু জ্ঞান সম্বন্ধে নহে, এমন কি শিল্পকার্য্যেও এই প্রথাই প্রচলিত ছিল—এক একজন ওস্তাদ্ শিল্পীর কাছে থাকিয়া তরুণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করিত। সেখানে রাজার ছেলে, গরীবের ছেলে সকলেরই যাইতে জুইত।

"তাই, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রেরই কোন না কোন অধ্যাপকের সাথে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিতে হইবে। সেই অধ্যাপক হইবেন গুরু—আর ছাত্র হইবে শিষ্য। অথচ, শিষ্যের ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব গুরু মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিবেন না। বাঁধা বাঁধি কাটাছাঁটা কতকগুলি সংবাদ বচন, মত, শিষ্যের ঘাড়ে না চাপাইয়া গুরু তাহার সম্মুখে নিজের জীবনের একটী আদর্শ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিয়া তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের পথে নিজের আলোকটী লইয়া চলিতে উৎসাহিত করিবেন।

"এই রকম অধ্যাপকের সঙ্গে ছাত্রেরা স্বাধীন ভাবে থাকিয়া নিজেদের পরিচালনা করিতে শিক্ষা লাভ করিবে। স্বাধীনতা এবং একটী আদর্শ জীবনের প্রেরণা না পাইলে সহস্র সহস্র অট্টালিকা, বড় বড় য়ুনিভার্সিটি, অতিরিক্ত

বেতনভোগী ইনস্পেক্টর এবং অতিকম বেতনভোগী অসংখ্য মাষ্টার, আর বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন (Compulsory Education Law) প্রভৃতি উপায়ে দেশে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠিবে না।

"স্বাধীনতা ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের, শিক্ষকদের কাহারো নাই বাঁধা নিয়ম ও বাঁধা দপ্তরে পড়াইতে ও পড়িতে হইবে। এই রকম প্রথা কেবল হাস্যাস্পদ নয়, রাজসরকার ইহা ইচ্ছা করিয়াই আয়র্লণ্ডের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। ইঙ্গ-আয়র্লণ্ডীয় ((Anglo Irish) শিক্ষাপ্রণালী তো আর আয়র্লণ্ডে সহরের লোক ও গ্রামের লোকদের পৃথক রকমের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাহা জানে না—তদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদের বংশধারার যে সাধারণ পার্থক্য রহিয়াছে, সে সংবাদ বা রাখে কে? এই প্রণালী ছাত্রের ব্যক্তিগত রুচির উপর আদৌ লক্ষ্য রাখে না—প্রত্যেকেরই এক ছাঁচে (Type) ঢালাই হইতে হইবে—নহিলে নান্যোব গতিরন্যথা।

"একদিন একটি ছেলের পিতা আসিয়া আমাকে বলিল "মহাশয়, আমার ছেলেটির না আছে পড়াশুনায় মন না আছে কোন কাজকর্ম্মে মন—এ কেবল চায় বাঁশী বাজাইয়া বেড়াইতে এককে নিয়ে কি করি বলুনতো?" লোকটাকে আমি উত্তর দিলাম "ওকে একটা বাঁশীই কিনে দিন্।" লোকটি উত্তর পাইয়া নিশ্চয়ই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা ছাড়া আমি আর কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।

"স্বাধীনতা অর্থে কেহ যেন স্বেচ্ছাচারী আরামপ্রিয়তা মনে না করেন ছাত্রেরা যেন সংসারের কঠোর জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত থাকে। ছাত্রদেরও প্রত্যেককে কোন না কোন দায়িত্ব পূর্ণ কাজ দিতে হইবে।

"রাজনীতি বা কোন বিদ্রোহ প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত নয়,, কিন্তু ছাত্রদের একথাটি বুঝাইয়া দিতেই হইবে, কোন সত্যের জন্য জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করার মত সুখের মৃত্যু আর কিছুই নাই—যে মানুষ কৃপণের মত জীবনটি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চায়, তাহার জীবনের কোন মূল্যই নাই।"

প্যাড্রিকের শিক্ষাসম্বন্ধে আদর্শ তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—ছেলেরা স্বাধীনতার মধ্যে অবাধভাবে বাড়িতে পারিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্মুখে অধ্যাপকদের, বিশেষ ভাবে, প্যাড্রিকের মত অধ্যাপকের আদর্শ জীবন দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যাড্রিকের মনে যৌবন হইতেই দেশসেবার যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহারই ফলস্বরূপ তিনি রাজসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করিলেন। এবং দুঃখের বিষয় সেইজন্যই রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিদ্যালয়টিরও শেষ হইল।

প্যাড্রিকের মতানুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী আমাদের ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে ছিল। তপোবনে জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্য তপস্যানিরত—তাঁহার পদতলে আসিয়া রাজপুত্র ও দরিদ্রসন্তান একসঙ্গে জ্ঞান লাভ করিতেন। রাজসরকার শিক্ষার ব্যবস্থার অধিকারী ছিল না—প্রকৃত জ্ঞানীরাই তাহার অধিকারী।

আমাদের শান্তিনিকেতন এই আদর্শ লইয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৩২৬ সালের "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বভারতী" নামে প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন "বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষিদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্য্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিবেন, সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে। সেই উৎসধারার নির্ঝরিণী তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।"

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী আশ্রমে দেশীয় ও বিদেশীয় কয়েকটী সুপণ্ডিত আসিয়া জুটিয়াছেন তদ্ব্যতীত স্বয়ং তিনি তো রহিয়াছেনই—তাঁহার আদর্শ জীবনের মাধুর্য্য শিশুছাত্র ও অধ্যাপকদের সকলকে সহজেই মোহিত করে। তিনি যখন আশ্রমে উপস্থিত থাকেন, তখন ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের সকলকেই অধ্যাপনা করেন।

বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, পত্রিকার কাজ, সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া আবার তিনি

অবসর মত ছেলেদের অভিনয় ও সঙ্গীতের জন্য নাটক ও সঙ্গীত রচনা করেন। শিশুরা তাঁহার কাছে অবাধে যাইতে পারে মধ্যে মধ্যে তিনি তাহাদের সঙ্গে মজার খেলা করেন, এবং হেঁয়ালী নাট্য পড়িয়া চিত্তবিনোদন করেন।

আশ্রমের ছাত্রেরা নিজেরা নিজেদের পরিচালনা করেন—তাহাদের পুরাপুরি স্বরাজ। কিন্তু এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটী ছাত্রের কোন না কোন না কোন অধ্যাপকের প্রকৃত আদর্শ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

তাই মনে হয়, দেশে যাঁহাদের কোন চাকুরী হয় না, তাঁহারা শিক্ষক না হইয়া যদি দেশের সবচেয়ে বড় বড় মাথাগুলি জ্ঞানার্থীদের লইয়া বসিতেন, তবে দেশের অবস্থা এতদিনে ফিরিয়া যাইত। আধুনিক সভ্যতার ফলে যদি তাহা সম্ভবপর না হয় তবে দেশে অন্ততঃ যে সব স্থানে এক একটা জ্ঞানতপস্বী কোন যজ্ঞের আয়োজন করিয়া বসিয়াছেন দেশের অন্যান্য জ্ঞানবীর ও কর্ম্ম বীরেরা সেই যজ্ঞস্থলে এমন কি অনাহুত ভাবেও উপস্থিত হইয়া নিজেদের অভিজ্ঞতা দেশের ভবিষ্যতের আশাস্থল তরুণ বালকদের জানাইয়া আসিবেন ইহাও কি আশা করা যায় না?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহাত্মা টলষ্টয় ও বিপ্লববাদ

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার বিপ্লবকারীরা একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে। তখন মহাত্মা টলষ্টয় জীবিত। তিনি ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া বিপ্লবকারীদের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাহাদের মধ্যে যে আলাপ হয় 'Living Age' পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ঘোষণাপত্রের একস্থানে লিখিত ছিল Inspire hatred in the hearts o men. That is a holy duty মানুষের মনে হিংসাবিদ্বেষকে জাগ্রত কর—

টলষ্টয় উপস্থিত বিপ্লবকারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মবিরুদ্ধ পাশবিক নীতি মানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে! সৃষ্টির আদিকাল হইতে হিন্দু ও চীন দেশবাসীরা মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, ভালবাসাকেই মানুষের বিশেষ গুণ, মানুষের মনুষ্যত্ব বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের কথ তো ছাড়িয়াই দিলাম। আর আজ কিনা মানুষ ইহাই শিক্ষা করিবে প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণাই মানুষের পবিত্র ধর্ম্ম! ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি মানুষের নৈতিক অবনতি কতদূর ঘটিয়াছে! না, ইহা আমি কখনই ঘটিতে দিব না, ইহা শুধু নৈতিক অবনতি নয়, মানুষের বুদ্ধিভ্রংশতা ও অজ্ঞানান্ধ-রতার পরিচায়ক!

আমার দ্বিতীয় আপত্তির কারণ, তোমরা দেশের নামে দেশের কল্যাণের নামে

যে ভুল পথ অবলম্বন করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছ ইহা দ্বারা সত্যসত্যই কি তোমরা দেশের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইবে? দেশের এই যে দুর্গতি—অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারে দেশ এই যে জর্জ্জরিত, ইহার জন্য কি দেশের মুষ্টিমেয় শাসক-সম্প্রদায়ই একমাত্র দায়ী? আমাদের নৈতিক অবনতিই কি ইহার কারণ নয়! সমস্ত দেশবাসীর মন কি ভয়ে, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন নয়?" তাহা হইলে, মুষ্টিমেয় শাসক-সম্প্রদায় তাহারা যত বড়, যত শক্তিশালীই হউক না কেন ১৫ কোটি লোককে পদানত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত না। সুতরাং হিংসা বিদ্বেষ উপদ্রব নয়, যে নৈতিক শক্তির অভাবে আমরা নির্বীর্য্য, শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি তাহাই আমাদের মনে পুনর্জীবিত করিতে হইবে। তবেই অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে জন্মিবে, তবেই আমরা দেশের যথার্থ হিত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইব।

আমার তৃতীয় আপত্তির কারণ, তোমাদের ন্যায় এতগুলি মহৎ উন্নত, উৎসাহী, উদ্দীপনাপূর্ণ জীবন কিনা কতকগুলি নিষ্ফল চেষ্টায় বিনষ্ট হইবে? তোমরা রুশিয়ার কারাগারে অকথ্য অত্যাচারে তিল তিল করিয়া মরিবে? তোমাদের স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, তারপর তোমাদের কৃতকর্ম্মের জন্য নির্জ্জনকারাগারে কেবল অনুশোচনাই ভোগ করিবে? এই সব কিসের জন্য? শুধু এইটুকু তৃপ্তি যে তোমরা এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছ। না, আবার আমি বলিতেছি তোমাদের বিপ্লবচেষ্টা ধর্ম্মবিরুদ্ধ; দেশের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য তোমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহা ভুল; তোমাদের মত এতগুলি মহৎ, উন্নতজীবনকে এমন একটা অন্যায় চেষ্টায় নষ্ট হইতে আমি কখনই অনুমোদন করিতে পারি না।

বিপ্লবকারীদের মধ্যে একজন বলিলেন, ইহা ব্যতীত আমাদের যে অন্য কোন পন্থাই নাই। যে-কোন উপায়েই হউক অন্যায় অবিচার হইতে দেশকে স্বাধীন করিতে না পারিলে অন্নাভাবে সমস্ত দেশ প্রাণত্যাগ করিবে।

টলষ্টয় বলিলেন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কেহ প্রাণত্যাগ করিয়াছে ইহা আমি বিশ্বাস করি

না। তবু আমি স্বীকার করি দেশে দারিদ্র্য অন্নাভাব যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কিন্তু অন্নাভাবই তো মানুষের একমাত্র অভাব নয়! অবৈধ উপায়ে এই এক অভাবকে নিবারণ করিতে গিয়া তোমরা কি মানুষের অনেকশত অভাবকে জাগ্রত করিবে না? যাহা ন্যায়, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাই মানুষের কর্ত্তব্য, যাহা অন্যায়, যাহা বিচারবুদ্ধিবিবর্জ্জিত তাহা কোনরূপেই মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পারে না। তোমাদের পক্ষে ইহাই এখন একমাত্র কর্ত্তব্য তোমরা বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিকে সম্পূর্ণ অমান্য করিবে।

একজন বিপ্লবকারী বলিলেন—ইহা কিরূপে সম্ভব?

টলষ্টয়—আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তুমি এখন কি কর?

বিপ্লবকারী—কিছুই না।

টলষ্টয়—পূর্ব্বে?

বিপ্লবকারী—কোন এক আফিসে কাজ করিতাম।

টলষ্টয়— তাহা হইলেই আমি বলিব, সমস্ত দেশের অন্যায়কে তুমি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে, আংশিকরূপে সেই অন্যায়ে তোমারও হাত ছিল।

বিপ্লবকারী—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা খুবই সত্য। বর্ত্তমান অবস্থায় এমন কোন কাজ নাই যাহাতে আমরা দেশের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া জীবিকাউপার্জ্জনে সমর্থ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও না; যার যাহা প্রাপ্য তাহা হইতে আমরা তাহদের বঞ্চিত করিতেছি। কিন্তু আমারও তো স্ত্রীপুত্র আছে; তাহাদের ভরণপোষণের জন্য আমাকেও তো অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে!

টলষ্টয় বলিলেন—এইখানেই তোমাদের সমস্ত গলদ। তোমরা দেশের হিত চাও; মঙ্গল চাও; অথচ তোমরা নিজের কিছুই ত্যাগ করিবে না। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, যে আমার অনুবর্ত্তী হইবে তাহাকে মা বাপ ভাই বোন স্ত্রী পুত্র বিষয় সম্পত্তি সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। খ্রীষ্টের বাণীকে যাহারা জীবনের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, ত্যাগই তাহাদের জীবনের যথার্থ আদর্শ। আমি ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে

কার অন্যায় অবিচার মনে করিতাম ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ করিলেও আমি নিজে সে কাজ কখনই করিতাম না।

বিপ্লবকারী—অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও আমি নিজে কখনই ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিব না।

টলষ্টয়—আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি তোমার অত অবজ্ঞা কেন? কোন্ অংশে ধনীরা ভিক্ষুকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

বিপ্লবকারী—যেহেতু মানুষের শক্তিতেই মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব।

টলষ্টয়—মানুষ ভালবাসিতে পারে ইহাতেই মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব। আমাদের মধ্যে যে পশু আছে, সে ই শক্তির বড়াই করে। দৈবী মানুষ (Spiritiul man) উহার বহু উর্দ্ধে। আমি তোমদের এই কথাই বলিতে চাই তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবনকেই পবিত্র উন্নত্ত কর, প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে নিজেদের মুক্ত কর, তাহা হইলে তোমরা অন্যের হিত মঙ্গল-সাধন করিতে সমর্থ হইবে। তোমাদের সমুদয় চেষ্টার কৃতকার্য্যতা ইহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

একজন বিপ্লবকারী বলিলেন, আমাদের জীবন যে অসম্পূর্ণ তাহা আমরাও স্বীকার করি; সত্য ও ন্যায় পথ অবলম্বন করিতে আমরাও যথসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি।

টলষ্টয়—এই সত্য ও ন্যায়ের পথই একমাত্র পথ; ইহা দ্বারাই যথার্থ মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয়। বিদ্বেষ নয়, ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিলে মানুষের আত্মার অবমাননা করা হয়।

একজন বিপ্লবকারী বলিলেন—আমরা তাহাদেরই প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করি যাহারা প্রজাদের জমি কাড়িয়া লইয়া যাহারা তাহাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া নিজেরা সুখভোগে আরামে দিন অতিবাহিত করিতেছে। তাহারা চোর, দস্যু তাহাদের প্রতি হিংসাবিদ্বেষ পোষণ করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

টলষ্টয় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মানসিক আবেগ রুদ্ধ করিবার